নব-প্রবেশিকা রচনা ও অনুবাদ

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দেশানুসারে নব-প্রবেশিকা পরীক্ষার উপযোগী নূতন প্রণালীতে লিখিত)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদান্তশাস্ত্রের অধ্যাপক ও পরীক্ষক, হুগলী গবর্ণমেণ্ট কলেজ ও কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃত ও বাঙ্গালা সাহিত্যের অধ্যাপক, "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা", "অভিনয় দর্পণ", "ভট্টিকাব্য", "রঘুবংশ", "কুমারসম্ভব" "রত্নাবলী", "কিরাতার্জ্জুনীয়" "An up to-date Bengali Composition", "অমরভারতী" "প্রাথমিক রচনাশিক্ষা" প্রভৃতি গ্রন্থের সম্পাদক, "বেদান্ততীর্থ", "শাস্ত্রী" প্রভৃতি উপাধিধারী, ঈশান-স্কলার, মৌয়াট-মেডালিষ্ট, প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ-স্কলার

অধ্যাপক শ্রীঅশোকনাথ ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী, এম্-এ (স্বর্ণপদক প্রাপ্ত)

ও

মৈমনসিংহ, রাজসাহী প্রভৃতি কলেজের ভূতপূর্ব্ব বাঙ্গালা সাহিত্যের অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা ভাষার পরীক্ষক, কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক, "এডভ্যান্স্ বেঙ্গলী এসেস্" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা

অধ্যাপক শ্রীশশাঙ্কশেখর বাগ্‌চী, এম্-এ (স্বর্ণপদক প্রাপ্ত)

মডার্ণ বুক্ এজেন্সী

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক

১০নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

দেড় টাকা

প্রকাশক
শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
মডার্ণ বুক এজেন্সী
১০নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর, ১৯৩৯
দ্বিতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০
তৃতীয় সংস্করণ, নভেম্বর, ১৯৪০
চতুর্থ সংস্করণ, ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১
পরিবর্দ্ধিত পঞ্চম সংস্করণ, নভেম্বর, ১৯৪১

মুদ্রাকর
শ্রীগঙ্গানারায়ণ ভট্টাচার্য্য
তাপসী প্রেস
৩০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নিবেদন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়সমূহের মাননীয় শিক্ষকমহোদয়গণের প্রতি সবিনয় নিবেদন —

আজ কয়েক বৎসর হইল আমার নামে বাঙ্গালা অনুবাদ ও রচনার একখানি গ্রন্থ - "An Up-to-date Bengali Composition" প্রকাশিত হইয়াছে। এই কয় বৎসরের মধ্যেই উহা উচ্চ-ইংরাজী-বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকমহাশয়গণের প্রীতি আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছে। এজন্য সর্বাগ্রে আমি তাঁহাদিগের প্রতি আমার সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় পুরাতন পদ্ধতিতে লিখিত পুস্তক আর নবীন শিক্ষার্থিবৃন্দের উপযোগী হইবে না। এই কারণে কিছুদিন পূর্বে নব-প্রবেশিকা-পরীক্ষার্থিগণের উপযোগী আর একখানি রচনা ও অনুবাদের গ্রন্থ নূতন প্রণালীতে লিখিতে আরম্ভ করি। কয়েক দিন পরে জানিতে পারিলাম যে, আমার শ্রদ্ধাস্পদ সতীর্থ ও সহকর্মী, প্রেসিডেন্সী কলেজের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের যশস্বী অধ্যাপক ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গ-সাহিত্যের পরীক্ষক, সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর বাগচী এম্-এ মহোদয়ও অনুরূপ একখানি গ্রন্থ রচনায় ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহার লিখিত অংশগুলি দর্শনে বুঝিলাম যে সমাপ্তির পর গ্রন্থখানি সর্বাঙ্গসুন্দর হইবে। একই বিষয়ে অনুরূপ দুইখানি গ্রন্থ লিখিয়া বন্ধুদ্বয়ে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবাঞ্ছনীয় ভাবিয়াই আমি শশাঙ্কবাবুর লিখিত অংশের সহিত আমার লিখিত অংশ একত্র মিলাইয়া এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত করিলাম। আশা করি, এ গ্রন্থখানিও আপনাদের সানুগ্রহ স্নেহদৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হইবে না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
১-১২-[illegible]৩১

ইতি—
বিনীত
শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

কলিকাতা—সমস্ত দোকান
ঢাকা—স্কুল সাপ্লাই কোম্পানী
চট্টগ্রাম—শিক্ষক সমবায় লাইব্রেরী
বর্দ্ধমান—শিক্ষাসঙ্ঘ ও বর্দ্ধমান বুক এজেন্সী
বাঁকুড়া—শিক্ষাসঙ্ঘ
ময়মনসিংহ—মডার্ণ বুক ডিপো
কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ—রুদ্রেশ্বর লাইব্রেরী
টাঙ্গাইল—বুক ডিপো
জলপাইগুড়ি—মুখার্জ্জি ব্রাদার্স
বাগেরহাট—ঘোষ ব্রাদার্স
খুলনা—চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স
বগুড়া—বাণী লাইব্রেরী
শ্রীহট্ট—চন্দ্রনাথ লাইব্রেরী
গৌহাটি—ট্রায়ো ষ্টোরস্
শিলং—চপলা বুক ষ্টল
কুমিল্লা—ত্রিপুরা বুক ডিপো
নারায়ণগঞ্জ—ইউনিভার্শাল বুক ডিপো
শিলচর—চক্রবর্ত্তী ব্রাদার্স
মুন্সীগঞ্জ—নারায়ণ লাইব্রেরী
বরিশাল—ওরিয়েণ্টাল বুক ডিপো
কুচবিহার—গুহস্ বুক ডিপো

ভূমিকা

'নব-প্রবেশিকা রচনা' এবার নব কলেবরে প্রকাশিত হইল। নবরূপ ধারণের ইতিহাসটুকু 'নিবেদনে' বলা হইয়াছে।

নূতন সিলেবাস্ অনুসারে পরীক্ষার্থিগণের জন্য যাহা আবশ্যক, তাহা সন্নিবিষ্ট করিয়া পরীক্ষার্থীদিগের সর্ব্বাংশে উপযোগী করিয়া পুস্তকখানি সম্পাদন করা হইয়াছে। এ কার্য্যে আমরা প্রথম ব্রতী। প্রথম ব্রতীর অনেক ত্রুটি একেবারে অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। সহৃদয় শিক্ষকমহাশয়গণ পুস্তকখানির দোষ-ত্রুটি যদি অনুগ্রহ করিয়া দেখাইয়া দেন, তবে পরবর্ত্তী সংস্করণে তাঁহাদিগের নির্দ্দেশমত বইখানিকে নির্দ্দোষ করিবার চেষ্টা করিব।

বাঙ্গালা ভাষার দুইটি রূপ—লেখ্য ও কথ্য; সাহিত্যে এই উভয় রূপই সমাদৃত। বাঙ্গালা ভাষার যাহা কিছু বৈশিষ্ট্য, তাহা এই কথ্যভাষাকে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশিত হয়। এই জন্যই মাতৃভাষার স্বরূপটি বুঝাইবার জন্য কথ্যভাষার প্রকৃতি, ইহার বাগ্‌ধারা, পদ ও পদ-সমষ্টির ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ের যথাসাধ্য আলোচনা গ্রন্থমধ্যে করা হইয়াছে।

রচনার উপকরণ কি করিয়া সংগ্রহ করিতে হয় ও কি কি গুণ থাকিলে রচনা সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে, সে সম্বন্ধেও জ্ঞান বুদ্ধিমত যৎকিঞ্চিৎ বলিবার প্রয়াস পাইয়াছি।

পুস্তকখানি যদি শিক্ষকমহোদয়গণের কৃপাদৃষ্টি ও ছাত্রবর্গের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারে তবেই পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। ইতি—

কলিকাতা
১লা ডিসেম্বর, ১৯৫৯

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী
শ্রীশশাঙ্কশেখর বাগ্‌চী

নূতন সংস্করণের ভূমিকা

এই সংস্করণে বাঙ্গালা ব্যাকরণের অবশ্য জ্ঞাতব্য নানা তথ্য সন্নিবেশিত হইল। ইহাতে পুস্তকের কলেবর প্রায় শতাধিক পৃষ্ঠা বৃদ্ধি পাইয়াছে। আশা করা যায়, এই একখানি পুস্তকেই শিক্ষার্থিগণের ব্যাকরণ, রচনা ও অনুবাদ শিক্ষার কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারিবে।

যে সমস্ত শিক্ষকবন্ধু মৌখিক উপদেশ ও চিঠিপত্র দিয়া এই নূতন সংস্করণ সম্পাদনে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

কলিকাতা
১৫ই নভেম্বর, ১৯৪০

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী
শ্রীশশাঙ্কশেখর বাগচী

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

শব্দপরিচয়, শব্দগঠন ও শব্দপ্রয়োগ

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্যাবহারিক ব্যাকরণ

স্থচীপত্র

তৃতীয় অধ্যায়

বাক্য

চতুর্থ অধ্যায়

উক্তি পরিবর্ত্তন ও উক্তিপূরণ

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

দ্বিতীয় খণ্ড

(প্রবন্ধ রচনা)

নব-প্রবেশিকা
রচনা ও অনুবাদ
প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

শব্দপরিচয়, শব্দগঠন ও শব্দপ্রয়োগ

প্রথম পাঠ—শব্দপরিচয়

ভাষার প্রবাহের সঙ্গে নদীর গতির তুলনা করা হয়। এই তুলনাটি সর্ব্বাংশেই সার্থক। নদীর মূল জলধারা যেরূপ একটি বিশেষ উৎপত্তিস্থান হইতে নির্গত হইয়া নানা ঘাত-প্রতিঘাতে বহু ধারায় বিভক্ত হয়, ভাষার প্রবাহেরও এইরূপ একটি প্রধান উৎপত্তিস্থান আছে এবং উহাও মানুষের অন্তর্নিহিত বিচিত্র ভাব-রসে পুষ্ট ও প্রতিহত হইতে হইতে যুগ হইতে যুগান্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে নানা স্রোতে বহিয়া যায়। নদীর উৎস-সন্ধানে বাহির হইলে যেমন নির্ণয় করা যায় কোন্ স্থান হইতে মূল প্রবাহটি আসিতেছে, সেইরূপ ভাষার প্রবাহের উজান বাহিয়া গেলেও স্থির করিতে পারা যায় সেই ভাষাটির মূল উৎপত্তিস্থান কোথায়।

যে ভাষায় আমরা কথা বলি, আমাদের সেই বাঙ্গলা ভাষার মূল অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে ভারতীয় আর্য্যভাষাসমূহের জননী বা মাতামহীস্থানীয়া 'সংস্কৃত' ভাষা হইতেই ইহার জন্ম। প্রাচীন ভারতে সংস্কৃত ভাষা মাতৃভাষার মত ব্যবহৃত হইত; কিন্তু কালক্রমে সে যুগের স্ত্রীলোক ও সাধারণ লোক সংস্কৃত

শব্দের উচ্চারণ বিকৃত করিয়া ফেলিতে লাগিল। ভাষার এই বিকৃতি ও পরিবর্ত্তন সমস্ত কথ্য ভাষাতেই ঘটে। উচ্চারণের এই পরিবর্ত্তন যদি না ঘটিত, তবে ভারতের সমুদয় আর্য্যজাতি একই ভাষায় একই ভাবে চিরকাল কথা বলিত। ইহাতে যে পরিবর্ত্তন ঘটিল, উহাই **'প্রাকৃত'** নামে জনসমাজে পরিচিত হইল। এই প্রাকৃত আবার কালক্রমে নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া নানা নামে পরিচিত হইতে লাগিল। উহারই একটি বিশেষ শাখা হইতে নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইতে প্রায় হাজার বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান বাঙ্গলা ভাষার প্রাচীনতম রূপটি প্রকাশিত হইয়াছিল।

নদীর স্রোত যখন দেশদেশান্তরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া চলে, তখন নানা স্থান হইতে ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক জলধারা মূলপ্রবাহের সঙ্গে মিশিয়া নদীটিকে পুষ্ট ও স্ফীত করে। অতি প্রাচীনকাল হইতে বাঙ্গলা ভাষার যে মূল প্রবাহটি বহিয়া আসিতেছে, তাহার মধ্যে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষার প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছে। ইহাতে বাঙ্গলা ভাষার অঙ্গপুষ্টি হইয়াছে এবং বিভিন্ন ভাষার শব্দ ও বাগ্‌বৈভব এই ভাষাকে সমৃদ্ধও করিয়াছে সন্দেহ নাই—কিন্তু ইহার মূল প্রকৃতিটিকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে নাই। বাঙ্গলা ভাষায় প্রচলিত শব্দগুলির স্বরূপ আলোচনা করিলে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন ভাষার প্রভাব ও দান স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়। বাঙ্গলা ভাষায় প্রচলিত **শব্দগুলি** স্থূলভাবে চারিটি প্রধান ভাগে বিভক্ত—(১) **সংস্কৃত**, (২) **সংস্কৃতজ**, (৩) **দেশী** ও (৪) **বিদেশী**।

(১) **সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ**—যে সমস্ত সংস্কৃত শব্দ কোনরূপ বিকৃত না হইয়া বাঙ্গলা ভাষায় প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, সেগুলি সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ :—বৃক্ষ, লতা, ফল, জল, গমন, ভোজন, শয়ন, বমন, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, বর্ম্ম, চর্ম্ম, লাভ, ক্ষতি, জয়, পরাজয়, শক্তি, যুক্তি, মুক্তি, ভক্তি ইত্যাদি সংস্কৃত শব্দ। ইহাকে আবার মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়—(ক) যৌগিক, (খ) রূঢ় ও (গ) যোগরূঢ়। যে সমস্ত শব্দ মাত্র প্রকৃতি-প্রত্যয়ের অর্থ বুঝায়, সেগুলি যৌগিক। যেমন—পাচক, কর্ত্তা ইত্যাদি। যে সমস্ত শব্দ প্রকৃতি-প্রত্যয়ের

অর্থকে না বুঝাইয়া অন্য একটি বিশেষ অর্থকে বুঝায়, সেগুলিকে রূঢ় শব্দ বলে। যেমন—মণ্ডপ ইত্যাদি। 'মণ্ডপ' শব্দে মণ্ড পান করে যে তাহাকে না বুঝাইয়া গৃহ বা মন্দির বুঝায়। যে সমস্ত শব্দ প্রকৃতি-প্রত্যয়ের অর্থের সহিত অন্য একটি বিশেষ অর্থকে বুঝায়, সেগুলি যোগরূঢ় শব্দ। যেমন—পঙ্কজ। 'পঙ্কজ' বলিলে পঙ্কজাত দ্রব্যমাত্রকে না বুঝাইয়া কেবল পঙ্কজাত পদ্মকেই বুঝাইয়া থাকে।

(২) **সংস্কৃতজ বা তদ্ভব শব্দ**—যে সমস্ত শব্দের মূল সংস্কৃত অথচ যেগুলি কালক্রমে প্রাকৃত ভাষার মধ্যে পড়িয়া কতকগুলি নিয়মের শাসনে শাসিত হইয়া রূপান্তর লাভ করিয়াছে, সেগুলিকে **সংস্কৃতজ** বা **তদ্ভব** শব্দ বলা হয়। কাজ—(সংস্কৃতে) কার্য্য; কাম—কর্ম্ম; ভাত—ভক্ত; সাঁচা (সাঁচ্চা)—সত্য; আজ—অদ্য; চলে—চলতি; হাল্‌কা—লঘুক; বাঁজা—বন্ধ্যা ইত্যাদি।

অর্দ্ধতৎসম বা ভগ্নতৎসম শব্দ—যে সমস্ত শব্দ বাঙ্গলা ভাষায় মূল সংস্কৃত শব্দ হিসাবেও অবিকৃত নাই, অথচ পূর্ণ তদ্ভব রূপও পায় নাই—অপেক্ষাকৃত অশিক্ষিত লোকের মুখে প্রচলিত থাকায় যে সমস্ত সংস্কৃত শব্দ শৃঙ্খলাহীনভাবে ভাঙ্গিয়া খুব সহজে উচ্চারিত হয়, সেগুলির নাম অর্দ্ধতৎসম বা ভগ্নতৎসম। যেমন—কেষ্ট (তৎসম—কৃষ্ণ, তদ্ভব—কানু); নেমন্তন্ন (তৎসম—নিমন্ত্রণ); ছেরাদ্দ, ছরাদ (তৎসম—শ্রাদ্ধ); বেরাহ্মণ (তৎসম—ব্রাহ্মণ); গতর (তৎসম—গাত্র, তদ্ভব—গা)।

(৩) **দেশী শব্দ**—বাঙ্গলা দেশে আর্য্যগণের উপনিবেশ স্থাপনের পূর্ব্বে যে সমস্ত অনার্য্য জাতি এদেশে বাস করিত, তাহাদের ভাষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন শ্রেণীর ছিল। আর্য্য-সভ্যতার প্রভাবে সেই সমস্ত অনার্য্য জাতির ভাষা ধীরে ধীরে লোপ পায়—কেবল কতকগুলি শব্দ বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত আছে। ঢেঁকি, কুলা, টোপর, খোকা, খুকি, বাঁখারি ইত্যাদি। এই শব্দগুলির আর্য্য ভাষায় কোনও প্রতিরূপ নাই। সাঁওতাল, কোল, ভীল প্রভৃতি অনার্য্যগণের ব্যবহৃত ভাষার চিহ্নস্বরূপ এই শব্দগুলি এখনও বাঙ্গলায় ব্যবহৃত হয়।

(৪) **বিদেশী শব্দ**—বহু প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষ ও বাঙ্গলার সঙ্গে বিদেশী জাতিসমূহের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল; বর্ত্তমান যুগে সেই পরিচয় আরও

ব্যাপক ও গভীর হইতেছে। যে সমস্ত জাতি নানা কার্য্যব্যপদেশে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল, তাহাদের সহিত অতি স্বাভাবিক কারণেই ভারতীয়গণের ভাবজীবনে ও কর্ম্মজীবনে নানাপ্রকার আদান-প্রদান হইয়াছিল। ইহার ফলে বিদেশী ভাষার কতকগুলি শব্দ ভারতীয় ভাষাতে প্রবেশলাভ করিয়াছে। এই শব্দগুলির মধ্যে কতকগুলি এখনও বিদেশী বলিয়া চিনিতে পারা যায়, কিন্তু অনেকগুলি শব্দ এদেশে বহুকাল লোকমুখে প্রচলিত থাকায় বাঙ্গলা ভাষার প্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়া এরূপভাবে বাঙ্গলার নিজস্ব হইয়া গিয়াছে যে, ঐগুলিকে আর এখন বিদেশী বলিয়া চিনিবার কোন উপায় নাই।

(ক) **প্রাচীন পারসিক**—মোজা, মুচি, পুঁথি ইত্যাদি।

(খ) **গ্রীক**—কোণ, সুরঙ্গ, দাম ইত্যাদি।

(গ) **তুর্কী**—বাবু, বাবা, কোর্ম্মা, চাকু, দারোগা, লাশ, উজবুগ, বোঁচ্‌কা ইত্যাদি।

(ঘ) **ফারসী**—জমি, জমা, দরবার, শিকার, কাগজ, কলম, হিসাব, নালিশ, আইন, নরম, সরম, বরফ, দোকান, গজল, আয়না, জামা, বাগিচা, শাল, শিশি, হাজার, পোলাও, কামান, বন্দুক, বারুদ, উকিল, মক্কেল, চশমা, হালুয়া, রুমাল, হুঁকা ইত্যাদি।

(ঙ) **আরবী**—নমাজ, মওলবি, কোরান, হদীশ ইত্যাদি।

(আরবী শব্দগুলি ফারসী ভাষার মধ্য দিয়া বাঙ্গলায় আসিয়াছে।)

(চ) **পর্ত্তুগীজ**—আনারস, সাবান, কাকাতুয়া, পেঁপে, পিস্তল, পাউরুটি, পেরেক, বৈয়াম, আচার, মার্ত্তুল, বোতাম, বালতি, চাবি, মিস্ত্রী, জানালা, বিস্তি ইত্যাদি।

(ছ) **ওলন্দাজ**—হরতন, রুইতন, ইস্কাপন, টেক্কা, তুরুপ ইত্যাদি।

(জ) **ফরাসী**—কুপন, ফিরিঙ্গী, কার্ত্তুজ, বুর্জোয়া, বারুশ ইত্যাদি।

(ঝ) **ইংরাজী**—পকেট, কলেজ, ইস্কুল, বল, মাষ্টার, ডাক্তার, হাসপাতাল, চেয়ার, টেবিল, পাশ, ফেল, রেল, ষ্টীমার, ফাউণ্টেনপেন, পেন্‌সিল ইত্যাদি।

(ঞ) **চীনা**—চা, চিনি, লুচি, গুলাচি (ফুল) ইত্যাদি।

(ট) **জাপানী**—রিক্‌সা, হারিকিরি।

(ঠ) **বর্ম্মী**—ফুঙ্গি, লুঙ্গি, লামা, নাপ্পি ইত্যাদি।

(ড) **রাশিয়ান**—বলশেভিক, সোভিয়েট ইত্যাদি।

(ঢ) **মালয়**—সাগু, গুদাম ইত্যাদি।

এই শব্দগুলি ব্যতীত বাঙ্গলার সহোদরাস্থানীয়া ভারতীয় অন্যান্য ভাষার অনেক শব্দ বাঙ্গলায় ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে হিন্দী শব্দই অধিক। বানী, চরখা, বাচ্চা, কুত্তা, ভয়সা (ঘী), চানাচুর, আচ্ছা ইত্যাদি হিন্দী শব্দ বাঙ্গলায় প্রচলিত আছে। ইহা ছাড়া গুজরাটী, মারাঠী, পাঞ্জাবী প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষার শব্দও বাঙ্গলা ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অনুশীলনী

তৎসম, তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দ বলিতে বাঙ্গলায় কিরূপ শব্দ বুঝা যায়? নিম্নোদ্ধৃত অংশে শব্দগুলিকে এই চারিপ্রকারে ভাগ করিয়া দেখাও :—

(ক) মারণপটু মারছে বটু—মারছে বাছারে,
শস্ত্রপাণি দিচ্ছে হানা বালক নাচারে,
কাঁটার গড়া মারছে কোড়া দুধের ছেলের গায়,
ছাখ্‌রে রাঙা দাগ্‌রাতে ছাখ্‌ আমার দেহ ছায়।

* * * *

যে বিধি নয় ধর্ম্ম্য বুঝি তার আজি রোগ-শোধ,
বিধির টনক নড়ায় শিশুর শিষ্ট প্রতিরোধ। —সত্যেন্দ্রনাথ

(খ) শঙ্কা, তরাস, লজ্জা, সরম, চুকিয়ে দিলেন স্তুতি-নিন্দে,
ধূলো, সে তোর পায়ের ধূলো তাই মেখেছি ভক্তবৃন্দে।

(গ) হাতে লাঠি মাথায় ঝাঁকড় চুল
কানে তাদের গোঁজা জবার ফুল॥ —রবীন্দ্রনাথ

(ঘ) হাত জোড় করে দোয়া মাঙ্‌ দাদু আর খোদা দয়াময়,
আমার দাদুর তরেতে যেন গো ভেস্ত নাজেল হয়। —জসীম উদ্দীন

(ঙ) রেলগাড়ী ধায় হেরিলাম হায় নামিয়া বর্দ্ধমানে
কৃষ্ণকান্ত অতি প্রশান্ত তামাক সাজিয়া আনে। —রবীন্দ্রনাথ

(চ) রাত পোহাল ফরসা হল ফুটল কত ফুল
কাঁপিয়ে পাখা নীল পতাকা ছুটল অলিকুল। —দীনবন্ধু

(ছ) পাল্কী চলে
পাল্কী চলে!
গগন তলে
আগুন জ্বলে!
স্তব্ধ গাঁয়ে
আদুল গায়ে
যাচ্ছে কারা
রৌদ্রে সারা! —সত্যেন্দ্রনাথ

(জ) "ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড হইতে প্রেরিত এক ভদ্রলোক ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে কলেরার বিষয় লেকচার দিতে আসিয়াছেন।"

(ঝ) "রেলগাড়ী নির্দ্দিষ্ট স্থানে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য থামিবে, নির্দ্দিষ্ট পথে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাইবে। কঠোর ব্যবস্থা, পদে পদে নিয়ম-অধীন। ঠিক ইউরোপীয় সমাজের সভ্যতার অনুরূপ, সেই পোষাক পরিচ্ছদের কড়াকড়ি, সেই কলার নেক্‌টাই বেল্‌ট্‌ গার্ডারের কসাকসি, সেই ডিনার-টেবিলের ড্রয়িংরুমের এটিকেটের আঁটাআঁটি।"

দ্বিতীয় পাঠ—শব্দগঠন

কৃৎ, তদ্ধিত ও সমাস

পূর্ব্ববর্ত্তী পাঠে বাঙ্গলা ভাষায় প্রচলিত বিভিন্ন প্রকার শব্দের সহিত আমাদের পরিচয় হইয়াছে। আমরা যে যে শব্দের সহিত পরিচিত হইলাম, সেই শব্দগুলি কেমন করিয়া সৃষ্ট হইল, তাহা না জানিলে—ইহাদের মূল প্রকৃতি অজ্ঞাত রহিলে—আমাদের পক্ষে ইহাদের প্রয়োগ যথার্থ ও সুন্দর হইতে পারে না। আমাদের উদ্দেশ্য বাঙ্গলা ভাষায় নির্ভুল রচনা শিক্ষা করা; কাজেই ভাষার ভিত্তি এই শব্দগুলি কেমন করিয়া গঠিত হইল, তাহা জানিবার জন্য বাঙ্গলা শব্দগঠন সম্পর্কে আলোচনা অত্যন্ত প্রয়োজন।

সাধারণভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়,—কতকগুলি ধাতু কতকগুলি প্রত্যয়ের সহিত, কতকগুলি শব্দ কতকগুলি প্রত্যয়ের সহিত এবং কতকগুলি শব্দ কতকগুলি শব্দের সহিত মিলিয়া এক একটি শব্দের সৃষ্টি করে। তন্মধ্যে—

(১) ধাতুর উত্তর কতকগুলি 'কৃৎ' প্রত্যয় যোগ করিয়া যে শব্দ গঠিত হয়, তাহার নাম **কৃদন্ত শব্দ**। যেমন 'কৃ' ধাতুর সহিত 'তব্য' প্রত্যয়যোগে 'কর্ত্তব্য' শব্দের সৃষ্টি হয়। বাঙ্গলা 'লাফ্' ধাতুর সহিত 'আনি' এই কৃৎপ্রত্যয় যুক্ত হওয়ায় 'লাফানি' শব্দের সৃষ্টি হইল।

(২) শব্দের সহিত কতকগুলি তদ্ধিত প্রত্যয় যোগ করিলে যে সকল নূতন শব্দ গঠিত হয়, তাহাদের নাম **তদ্ধিতান্ত শব্দ**। যেমন—'মানুষের ভাব' এই অর্থে—'মনুষ্য' শব্দের সহিত 'ত্ব' এই তদ্ধিত প্রত্যয়যোগে 'মনুষ্যত্ব' শব্দের সৃষ্টি হয়। 'বিষ্ণুর উপাসক' এই অর্থে—'বিষ্ণু' শব্দের সহিত 'ষ্ণ' প্রত্যয়যোগে 'বৈষ্ণব' শব্দের উৎপত্তি হয়। 'দুরন্তের ভাব' অর্থে—'দুরন্ত' শব্দের সহিত বাঙ্গলা 'পনা' এই তদ্ধিত প্রত্যয়যোগে 'দুরন্তপনা' শব্দের সৃষ্টি হয়।

(৩) সমাস হইলে দুই, তিন বা ততোধিক শব্দ একত্র সংযুক্ত হইয়া যে সমস্ত শব্দ গঠিত হয়, তাহাদের নাম **সমাসান্ত শব্দ**। যেমন—'ভাই ও বোন' (ভাইবোন), 'পিতা ও মাতা' (পিতামাতা), 'রণে কুশল' (রণকুশল), 'ফুলের মত বাবু' (ফুলবাবু) ইত্যাদি।

'যিনি সমস্ত প্রকার ত্যাগে অভ্যস্ত হইয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে তিনিই যথার্থ সুখ লাভ করিয়াছেন'—এত বড় একটি বাক্য 'ত্যাগী ব্যক্তিই প্রকৃত সুখী' কিংবা 'ত্যাগীই সুখী', ইত্যাদি ক্ষুদ্র আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াও পূর্ব্ববাক্যেরই অর্থ প্রকাশ করে। বাক্যের মধ্যে অনেক সময় অপ্রয়োজনীয় শব্দ প্রয়োগ করিলে উহা অযথা শ্রুতিকটু ও ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে এবং উহার অর্থবোধেও বিলম্ব হয়। যেখানে একটিমাত্র পদের দ্বারা অনেকগুলি পদের অর্থ সুন্দররূপে প্রকাশ করিতে পারা যায়, সেখানে একাধিক পদের প্রয়োগ করা অনুচিত। কৃদন্ত, তদ্ধিতান্ত ও সমাসনিষ্পন্ন শব্দগুলি জানা থাকিলে অল্প কথায় ভাব-প্রকাশের ক্ষমতা আয়ত্ত করা যায়। রচনায় তাহা প্রয়োগ করিলে রচনা সরল অথচ সমৃদ্ধ হয়। এইজন্য বাঙ্গলা ভাষায় এই সমস্ত পদ বহুলভাবে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

কৃদন্ত শব্দ

কৃৎপ্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন শব্দগুলি বিশেষ্য ও বিশেষণ দুইই হইতে পারে। সংস্কৃত ভাষার বহু কৃৎপ্রত্যয় বাঙ্গলায় প্রচলিত আছে; তন্মধ্যে অক, তৃচ্, ক্ত, তব্য, অনীয়, য, ক্তি, ণিন্, ঘঞ্, অনট্ ইত্যাদি সমধিক প্রসিদ্ধ। বাঙ্গলা ভাষারও নিজস্ব কতকগুলি কৃৎপ্রত্যয় আছে, এই সমস্ত প্রত্যয়ের সাহায্যেও বাঙ্গলা ভাষায় অনেক কৃদন্ত শব্দ গঠিত হইয়াছে।

বাঙ্গলা ভাষায় প্রচলিত সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয়ান্ত শব্দ

(সংস্কৃত অক, তৃচ্, ক্ত প্রভৃতি কৃৎ প্রত্যয় কেবল সংস্কৃত ধাতুর উত্তর প্রযুক্ত হয়।)

অক

গৈ + অক = গায়ক	লিখ্ + অক = লেখক
শাস্ + অক = শাসক	পচ্ + অক = পাচক
স্মৃ + অক = স্মারক	পূজ্ + অক = পূজক

তৃচ্ (তৃন্)

দা+তৃচ্=দাতা
নী+তৃচ্=নেতা
দৃশ্+তৃচ্=দ্রষ্টা
হন্+তৃচ্=হন্তা
কৃ+তৃচ্=কর্ত্তা
বচ্+তৃচ্=বক্তা
ক্রী+তৃচ্=ক্রেতা
বুধ্+তৃচ্=বোদ্ধা

ক্ত (ত)

দা+ক্ত=দত্ত
দহ্+ক্ত=দগ্ধ
কৃ+ক্ত=কৃত
মুহ্+ক্ত=মুগ্ধ
গম্+ক্ত=গত
স্থা+ক্ত=স্থিত
দৃশ্+ক্ত=দৃষ্ট
মৃ+ক্ত=মৃত

আ–রুহ্+ক্ত=আরূঢ়
উৎ–নম্+ক্ত=উন্নত

তব্য ও অনীয়

কৃ+তব্য=কর্ত্তব্য
পূজি+তব্য=পূজিতব্য
কৃ+অনীয়=করণীয়
পূজি+অনীয়=পূজনীয়
গম্+তব্য=গন্তব্য
বচ্+ক্ত=বক্তব্য
গম্+অনীয়=গমনীয়
বচ্+অনীয়=বচনীয়
দৃশ্+তব্য=দ্রষ্টব্য
গ্রহ্+তব্য=গ্রহীতব্য
দৃশ্+অনীয়=দর্শনীয়
গ্রহ্+অনীয়=গ্রহণীয়

য

পা+য=পেয়
লভ্+য=লভ্য
দা+য=দেয়
গ্রহ্+য=গ্রাহ্য
সহ্+য=সহ্য
বি–ধা+য=বিধেয়

ক্তি (তি)

গম্+ক্তি=গতি
দৃশ্+ক্তি=দৃষ্টি
খ্যা+ক্তি=খ্যাতি
শ্রম্+ক্তি=শ্রান্তি

বচ্ + ক্তি = উক্তি　　সৃজ্ + ক্তি = সৃষ্টি

গৈ + ক্তি = গীতি　　হা + ক্তি = হানি

ণিন্ (ইন্)

স্থা + ণিন্ = স্থায়ী　　অপ – রাধ্ + ণিন্ = অপরাধী

পা + ণিন্ = পায়ী　　সত্য – বদ্ + ণিন্ = সত্যবাদী

বদ্ + ণিন্ = বাদী　　অধি – কৃ + ণিন্ = অধিকারী

ঘঞ্

ভূ + ঘঞ্ = ভাব　　প্র – হৃ + ঘঞ্ = প্রহার

নশ্ + ঘঞ্ = নাশ　　বি – সদ্ + ঘঞ্ = বিষাদ

শুচ্ + ঘঞ্ = শোক　　প্র – সদ্ + ঘঞ্ = প্রসাদ

অনট্

গম্ + অনট্ = গমন　　স্মৃ + অনট্ = স্মরণ

দা + অনট্ = দান　　দৃশ্ + অনট্ = দর্শন

ভুজ্ + অনট্ = ভোজন　　হৃ + অনট্ = হরণ

শী + অনট্ = শয়ন　　অধি – ই + অনট্ = অধ্যয়ন

নিম্নে আরও কতকগুলি কৃদন্ত শব্দের উদাহরণ দেওয়া গেল।

কর্ত্তৃকারকের অর্থে

পালন করে যে—পালক।　　প্রসব করে যে- প্রসূতি

পাঠ করে যে—পাঠক।　　দর্শন করে যে—দর্শক।

করে যে—কর্ত্তা, কারক।　　তাপ দেয় যে—তপন।

দয়া করে যে—দয়ালু।　　পাক করে যে—পাচক।

চিরকাল থাকে যাহা—চিরস্থায়ী।　　অবশ্য হইবে যাহা—অবশ্যম্ভাবী।

মনকে হরণ করে যাহা—মনোহারী।　　কুম্ভ করে যে—কুম্ভকার।

বিবেকের অনুশাসনে কার্য্য করে যে—বিবেকী।　　মৎস্য শিকার দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে যে—মৎস্যজীবী।

বুদ্ধির দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করে যে—বুদ্ধিজীবী।
মসীর দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করে যে—মসীজীবী।
পরিণাম দেখিতে পায় যে—পরিণামদর্শী।
জল দান করে যে—জলদ।
ভূ (পৃথিবী) পর্য্যটন করে যে—ভূপর্য্যটক।
স্তন্য পান করে যে—স্তন্যপায়ী।
স্বর্ণের অলঙ্কার প্রস্তুত করে যে—স্বর্ণকার।

কর্ম্মকারকের অর্থে

সুখে লাভ হয় যাহা—সুলভ।
বলা হইয়াছে যাহা—উক্ত।
করা হইয়াছে যাহা—কৃত।
ক্রয় করা হইয়াছে যাহা—ক্রীত।
দিতে হইবে (দেওয়ার যোগ্য বা উপযুক্ত) যাহা—দেয়, দানীয়, দাতব্য।
বলা হইবে (বলা উচিত) যাহা—বক্তব্য, বচনীয়।
করা হইবে (করার উপযুক্ত বা করা উচিত) যাহা—কর্ত্তব্য।
দেখা উচিত (দেখিতে হইবে, দেখিবার উপযুক্ত) যাহা—দ্রষ্টব্য, দর্শনীয়।
শোনা যায় যাহা—শ্রাব্য, শ্রব্য।
দেখা হইয়াছে যাহা—দৃষ্ট।
পান করার উপযুক্ত—পেয়, পানীয়।
দেখা যাইতেছে যাহা—দৃশ্যমান।
ভোগের (উপভোগের) উপযুক্ত যাহা—ভোগ্য।
আহরণ করা হইয়াছে যাহা—আহৃত।
দেওয়া হইয়াছে যাহা—দত্ত।
ভোজনের উপযুক্ত যাহা—ভোজ্য।
বিবরণ দেওয়া হইয়াছে যাহার—বিবৃত।
পাওয়া গিয়াছে যাহা—প্রাপ্ত।

করণ কারকের অর্থে

চলা যায় যাহার দ্বারা—চরণ।
বলা যায় যাহার দ্বারা—বদন।
শোনা যায় যাহার দ্বারা—শ্রবণ (কর্ণ)।
শাসন করা যায় যাহার দ্বারা—শাস্ত্র।
নীত (প্রাপ্ত) হয় যাহার দ্বারা—নয়ন।
খনন করা যায় যাহার দ্বারা—খনিত্র।

অপাদান কারকের অর্থে

ক্ষরণ হয় যাহা হইতে—প্রস্রবণ।
ঝরিতেছে যাহা হইতে—নির্ঝর।

অধিকরণ কারকের অর্থে

জল থাকে যাহাতে—জলধি। থাকা যায় যাহাতে—স্থান।
শয়ন করা যায় যেখানে—শয্যা। নিতান্তরূপে দাহ হয় যে কালে—নিদাঘ।
বাস করা যায় যেখানে—আবাস। পান করা যায় যাহাতে—পাত্র।

ভাব বা ক্রিয়ার্থের প্রকাশে

দেখার ভাব—দর্শন, দৃষ্টি। ভক্ষণ করা—ভোজন।
গমনের ভাব—গতি। শুইয়া থাকা—শয়ন।

খাটি বাঙ্গলা কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত শব্দ

অন্ত, অৎ, অতা, আনি, উনি, না, তি, অন, উরী, আই প্রভৃতি বাঙ্গলা কৃৎপ্রত্যয় প্রায় সকল বাঙ্গলা ধাতুর সহিত যুক্ত হয়।

অন্ত

ভাস্+অন্ত=ভাসন্ত ঘুম্+অন্ত=ঘুমন্ত
জী+অন্ত=জীয়ন্ত (জ্যান্ত) ফুট্+অন্ত=ফুটন্ত
ফল্+অন্ত=ফলন্ত ফুরা+অন্ত=ফুরন্ত (অফুরন্ত)

অৎ, অতা

মান+অৎ=মানৎ জান্+অতা=জান্তা
বহ্+অতা=বহতা ফির+অৎ=ফেরৎ

আনি

জ্বাল্+আনি=জ্বালানি চাল্+আনি=চালানি
রাঙা+আনি=রাঙানি কন্কন্+আনি=কন্কনানি

উনি

রাঁধ্+উনি=রাঁধুনি গাঁথ্+উনি=গাঁথুনি
বক্+উনি=বকুনি নাচ্+উনি=নাচুনি

না

শুক্+না=শুক্‌না	চাক্+না=চাকনা
কাঁদ্+না=কান্না	দে+না=দেনা
বাজ্+না=বাজনা	পাও+না=পাওনা
রাঁধ্+না=রান্না	মাগ্+না=মাগ্‌না
খেল্+না=খেলনা	দুল্+না=দোলনা

তি

উঠ্+তি=উঠতি	পড়্+তি=পড়তি
বাড়্+তি=বাড়তি	কম্+তি=কমতি
চুক্+তি=চুক্তি	গুণ্+তি=গুণ্‌তি

অন

নাচ্+অন=নাচন	ফল্+অন=ফলন
বিঁধ্+অন=বেঁধন	বাঁধ্+অন=বাঁধন
চাহ্+অন=চাওন	ঝুল্+অন=ঝুলন

উরী

ধুন্+উরী=ধুনুরী	ডুব্+উরী=ডুবুরী

আই

বাঁধ্+আই=বাঁধাই	বাছ্+আই=বাছাই
লড়্+আই=লড়াই	খোদ্+আই=খোদাই

নানাজাতীয় বাঙ্গলা কৃৎপ্রত্যয়ান্ত শব্দের আরও কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া হইল।

কর্ত্তৃকারকের অর্থে

যে পড়ে—পড়ুয়া, পড়ো।	পাড়ায় যে—পাড়ানী (ঘুমপাড়ানী)।
যে ধরে—ধরা (ছেলেধরা)।	নাচায় (বা নাচে) যে—নাচনি, নাচুনি।
যে মরিয়াছে—মরা (মনমরা)।	কুড়ায় যে—কুড়ানি, কুড়ুনি।

ঘর ছাড়িয়াছে যে—ঘরছাড়া।
বেড়ায় যে—বেড়ানি।
ফুটিয়াছে বা ফুটিতেছে যাহা—ফুটন্ত।
ঘুমাইয়া রহিয়াছে যে—ঘুমন্ত।
জ্বলিতেছে যাহা—জ্বলন্ত।
চলিতেছে যে—চলন্ত।
বাড়িতেছে যাহা—বাড়ন্ত।
ফুরায় না যাহা—অফুরন্ত।
বাঁচিয়া আছে যে—জীবন্ত, জীয়ন্ত।
রাঁধে যে—রাঁধুনি, রাঁধ্‌নি।
বর্ণ চুরি করে যে—বর্ণচোরা
(বর্ণচোরা আম)
ঢলায় যে—ঢলানি।
সব জানে যে—সবজান্‌তা।
ধার করিয়াছে যে—ধেরো।
মানুষ খায় যে—মানুষখেকো।
বিশেষরূপে বলিতে পারে
যে—বলিয়ে (বলিয়ে কহিয়ে)।
গাহিতে পটু যে—গাহিয়ে, গাইয়ে।
বাজাইতে দক্ষ যে—বাজিয়ে।
লিখে বা লিখিতে পটু যে—লিখিয়ে।
কেবল কাঁদে যে—কাঁদুনে।
যাহা ডুবিতেছে—ডোব-ডোব, ডুবু-ডুবু।
পতনোন্মুখ যাহা—পড়ন্ত।
প্রায় পক্ক যাহা—পাকল।
প্রায় ডাঁশা যাহা—ডাঁশাল।
মরণ তুচ্ছ করিবার ন্যায় উগ্র যে—মরিয়া।
ডুব দিতে অভ্যস্ত যে—ডুবুরী।
পূজা করে যে—পূজারী।
নির্ব্বাণোন্মুখ যাহা—নিব-নিব, নিবু-নিবু।
মাছি মারে যে—মাছিমারা
(মাছিমারা কেরাণী)।

কর্ম্মকারকের অর্থে

জ্বালান যায় যাহা—জ্বালানি।
রাঁধা হইয়াছে যাহা—রাঁধা।
রচনা করা হইয়াছে যাহা—রচা।
চষা হইয়াছে যাহা—চষা।
যাচিয়া সংগ্রহ করা হয় যাহা—যাচা।
চেনা যায় যাহাকে—চেনা।
বাঁধা যায় যাহাকে—বাঁধা।
দেওয়া হয় যাহা—দেনা।
পাওয়া যায় যাহা—পাওনা।
ফেলা যায় যাহা—ফেল্‌না।
চুরি করা হইয়াছে যাহা—চোরাই।
দেখানো হইয়াছে যাহা—দেখানো।
সামলাইয়া রাখা হইয়াছে যাহা—
সাম্‌লানো।
মানা হইয়াছে যাহা—মানত্‌।
বদল দেওয়া হইয়াছে যাহা—বদ্‌লি।
খাওয়ার জন্য যাহা—খাবার।
ভাজা হইয়াছে যাহা—ভাজা।

শুকাইয়া গিয়াছে যাহা—শুক্‌না, শুক্‌নো। পোষা হইয়াছে যাহা—পোষা।
মাগিয়া লওয়া হয় যাহা—মাঙ্‌না, মাগ্‌না। লুকাইয়া রাখা হইয়াছে যাহা—লুকানো।

করণ কারকের অর্থে

যাহা দিয়া পার হওয়া যায়—পারানি। যাহার দ্বারা ঠেক্‌না দেওয়া যায়—ঠেক্‌নো।
যাহা দিয়া কাটা যায়—কাটারি।
যাহার দ্বারা ছাঁকা যায়—ছাঁক্‌নি, ছাঁকুনি। মারা যায় যাহার দ্বারা—মারা।
ঝাড়া যায় যাহার দ্বারা—ঝাড়ন।
যাহার দ্বারা ছেঁচা যায়—ছেঁচুনি। বেলা যায় যাহার দ্বারা—বেলন।
যাহার দ্বারা ছেদন করা যায়—ছেনি। মাজা যায় যাহার দ্বারা—মাজন।
যাহার দ্বারা চালা যায়—চালনি, চালুনি। চড়া (উঠা) যায় যাহার দ্বারা—চড়াই।
যাহার দ্বারা ঢাকা যায়—ঢাক্‌নি, ঢাকুনি। উৎরানো যায় যাহার দ্বারা—উৎরাই।

অপাদান কারকের অর্থে

জল ঝরিয়া পড়ে যেখান হইতে—ঝরণা। ফিরিয়াছে কোনও স্থান হইতে—ফের্‌তা।

অধিকরণ কারকের অর্থে

বহে যাহাতে—বহা (মালবহা)। বাঁধা আছে যাহাতে—বাঁধা (সুরবাঁধা)।
বাস করে যেখানে—বাসা। বসতি করা যায় যেখানে—বস্তি।

ভাব ও ক্রিয়ার অর্থে

কম্পনের ভাব—কাঁপুনি। ভরণ করার ভাব—ভর্তি।
ধম্‌কানোর ভাব—ধম্‌কানি। ফোস্‌লানোর ভাব—ফোস্‌লানি।

দ্রষ্টব্য—'নি', 'মি', 'লি' ভাগান্ত দেশী শব্দগুলির বানান কোন কোন স্থলে 'নী', 'মী', 'লী' রূপেও লেখা হয়। 'রী' ভাগান্ত শব্দগুলিও কখন কখন 'রি' ভাগান্তরূপেও লিখিত হয়।

অনুশীলনী

(১) নিম্নের বাক্যাংশগুলির পরিবর্ত্তে একটি করিয়া বাঙ্গলা শব্দ বসাও :—

যাহা চিন্তা করা যায় না ; যাহা চিন্তা করা যায় নাই ; যাহা বিক্রয় করা হইয়াছে ; যাহা বলা হইয়াছে ; জল দান করে যে ; যাহা দেখা যায় না ; যাহা দেখা উচিত ; যাহা দেওয়া উচিত ; যাহা দেওয়া যায় না ; যাহা উচ্চারণ করা যায় না ; যাহা পরিত্যাগ করা হইয়াছে ; যাহা পরিত্যাগ করা উচিত নয় ; যাহা অতিকষ্টে জানা যায় ; যাহা অনায়াসে লাভ করা যায় ; যাহা পান করা যায় ; যাহার দ্বারা জানা যায় ; যাহা মর্ম্ম স্পর্শ করে ; যাহা দ্বারা লেখা যায় ; পঙ্কে জন্মে যে ; যাহা জ্বালান যায় ; স্বর বাঁধা আছে যাহাতে ; যাহা ফুরায় না ; যাহার দ্বারা ঝাড়া হয় ; সব জানে যে ; পূজা করে যে ; গ্রহণ করে যে ; ত্রাণ করে যে ; অগ্রে জন্মিয়াছে যে ; পরে জন্মিয়াছে যে ; শয়ন করা হয় যাহাতে ; বিলাত হইতে ফিরিয়াছে যে ; বাজার হইতে ফিরিয়াছে যাহা ; মানুষ মারা যায় যাহার দ্বারা।

(২) নিম্নলিখিত ধাতু ও প্রত্যয়গুলি যোগ করিয়া শব্দ গঠন কর :—

মুচ্ + ক্তি ; ভী + অল্ ; দহ্ + ক্ত ; বৃৎ + শানচ্ ; বৃধ্ + শানচ্ ; লভ + ঘঞ্ ; স্পৃশ্ + অল্ ; হন্ + ক্ত ; হন্ + ঘঞ্ ; স্মৃ + অনট্ ; স্মৃ + তব্য ; স্মৃ + অনীয়।

(৩) নিম্নের শব্দগুলি কিরূপে গঠিত হইয়াছে লিখ :—

চোরাই ; কাটারি ; যাচাই ; রাঁধুনি ; পাওনা ; নাচন ; টনটনানি।



তৃতীয় পাঠ—শব্দগঠন

তদ্ধিতান্ত শব্দ

তদ্ধিত-প্রত্যয়ের মধ্যে কতকগুলি সংস্কৃত আর কতকগুলি খাঁটি বাঙ্গলা। এই দ্বিবিধ তদ্ধিত-প্রত্যয়যোগে তদ্ধিতান্ত শব্দগুলিও প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত। তদ্ধিত-প্রত্যয়গুলি নানারূপ অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। নিম্নে যথাক্রমে উভয়বিধ তদ্ধিত-প্রত্যয়ান্ত শব্দের উদাহরণ ও অর্থের ভেদ দেওয়া হইল।

বাঙ্গলা ভাষায় প্রচলিত সংস্কৃত তদ্ধিতান্ত শব্দ

অপত্য অর্থে—ষ্ণ, ষ্ণ্য, ষ্ণি, ষ্ণেয়

ষ্ণ

পৃথার অপত্য—পার্থ।
ভৃগুর অপত্য—ভার্গব।
কুরুর অপত্য—কৌরব।
পাণ্ডুর অপত্য—পাণ্ডব।
মনুর অপত্য—মানব।
দনুর অপত্য—দানব।
পুত্রের পুত্র—পৌত্র।
রঘুর অপত্য—রাঘব।
দুহিতার অপত্য—দৌহিত্র।
কশ্যপের অপত্য—কাশ্যপ।
ভরতের অপত্য—ভারত।
যদুর অপত্য—যাদব।

ষ্ণ্য

দিতির অপত্য—দৈত্য।
অদিতির অপত্য—আদিত্য।
চণকের অপত্য—চাণক্য।

ষ্ণি

অর্জ্জুনের পুত্র—আর্জ্জুনি।
রাবণের অপত্য—রাবণি।
সুমিত্রার পুত্র—সৌমিত্রি।

ষ্ণেয়

বিমাতার পুত্র—বৈমাত্রেয়।
ভগিনীর পুত্র—ভাগিনেয়।
গঙ্গার অপত্য—গাঙ্গেয়।
কুন্তীর পুত্র—কৌন্তেয়।

অস্তি অর্থাৎ আছে যাহার, এই অর্থে—মতুপ্, বতুপ্, ল, আলু

গুণ আছে যাহার—গুণী, গুণবান্।
বিদ্যা আছে যাহার—বিদ্যাবান্।
শ্রী আছে যাহার—শ্রীমান্।
দেহ আছে যাহার—দেহী।

রোম আছে যাহার—রোমশ। মহিমা আছে যাহার—মহিমময়।
রস আছে যাহাতে—রসাল। দয়া আছে যাহার—দয়ালু।
মাংস আছে যাহার—মাংসল। মধু আছে যাহাতে—মধুর।
আয়ুঃ আছে যাহার—আয়ুষ্মান্। পঙ্ক আছে যাহাতে—পঙ্কিল।

ভক্ত বা উপাসক অর্থে—ষ্ণ, ষ্ণ্য

বিষ্ণুর ভক্ত—বৈষ্ণব। বুদ্ধের ভক্ত—বৌদ্ধ।
শক্তির ভক্ত—শাক্ত। জিনের ভক্ত—জৈন।
ব্রহ্মের ভক্ত—ব্রাহ্মণ। গণপতির ভক্ত—গাণপত্য।
শিবের ভক্ত—শৈব। সূর্য্যের ভক্ত—সৌর।

কার্য্য বা জীবিকা অর্থে—তা, ত্ব, ষ্ণ্য, ষ্ণিক

শিক্ষকের কার্য্য—শিক্ষকতা। সারথির কার্য্য—সারথ্য।
চোরের কার্য্য—চৌর্য্য। নেতার কার্য্য—নেতৃত্ব।
পুরোহিতের কার্য্য—পৌরোহিত্য। তৈল বিক্রয় জীবিকা যাহার—তৈলিক।

গুণ বা ভাব অর্থে—ত্ব, তা

মনুষ্যের ভাব—মনুষ্যত্ব। কিশোরের ভাব—কৈশোর।
দেবের ভাব—দেবত্ব। যুবকের ভাব—যৌবন, যুবত্ব।
পশুর ভাব—পশুত্ব। বৃদ্ধের ভাব—বার্দ্ধক্য।
দাসের ভাব—দাসত্ব। মধুরের ভাব—মাধুর্য্য, মধুরতা।
প্রভুর ভাব—প্রভুত্ব। মহতের ভাব—মহত্ত্ব, মহিমা।
শিশুর ভাব—শৈশব। সখার ভাব—সখ্য, সখিত্ব।
তরুণের ভাব—তারুণ্য। নীলের ভাব—নীলিমা।

সম্বন্ধীয় অর্থে—নীয়

নীতি-সম্বন্ধীয়—নৈতিক। দেশ-সম্বন্ধীয়—দেশীয়।
শরীর-সম্বন্ধীয়—শারীরিক। পর-সম্বন্ধীয়—পরকীয়।
মনঃ-সম্বন্ধীয়—মানসিক। ভারতবর্ষ-সম্বন্ধীয়—ভারতবর্ষীয়।

বঙ্গ-সম্বন্ধীয়—বঙ্গীয়। রাজ-সম্বন্ধীয়—রাজকীয়।
সর্ব্বজন-সম্বন্ধীয়—সর্ব্বজনীন। বেদ-সম্বন্ধীয়—বৈদিক।
পরলোক-সম্বন্ধীয়—পারলৌকিক। শাস্ত্র-সম্বন্ধীয়—শাস্ত্রীয়।
ইহলোক-সম্বন্ধীয়—ইহলৌকিক। ভবৎ-সম্বন্ধীয়—ভবদীয়।
জল-সম্বন্ধীয়—জলীয়। রাষ্ট্র-সম্বন্ধীয়—রাষ্ট্রীয়।
স্ব-সম্বন্ধীয়—স্বীয়, স্বকীয়। স্বর্গ-সম্বন্ধীয়—স্বর্গীয়।

অভূততদ্ভাব অর্থে—চ্বি

যাহা ভস্ম ছিল না এখন ভস্ম হইয়াছে—ভস্মীভূত।
যাহা এক ছিল না এখন এক হইয়াছে—একীভূত।
যাহা বশ ছিল না এখন বশ হইয়াছে—বশীভূত।
যে নিরস্ত্র নহে তাহাকে নিরস্ত্র করা—নিরস্ত্রীকরণ।
যাহা লঘু নহে তাহাকে লঘু করা—লঘূকরণ।
যাহা একত্র নহে তাহাকে একত্র করা—একত্রীকরণ।

কিঞ্চিৎ ন্যূন অর্থে—কল্প

ঋষি হইতে কিঞ্চিৎ ন্যূন—ঋষিকল্প। পিতা হইতে কিঞ্চিৎ ন্যূন—পিতৃকল্প।
ইন্দ্র হইতে কিঞ্চিৎ ন্যূন—ইন্দ্রকল্প। মৃত হইতে কিঞ্চিৎ ন্যূন—মৃতকল্প।

তুল্যার্থে—স্থানীয়

পিতার তুল্য—পিতৃস্থানীয়। মাতার তুল্য—মাতৃস্থানীয়।
ভ্রাতার তুল্য—ভ্রাতৃস্থানীয়। পুত্রের তুল্য—পুত্রস্থানীয়।

বিকার, সংসর্গ, ব্যাপ্তি বা প্রাচুর্য্য অর্থে—ময়

স্বর্ণের বিকার—স্বর্ণময়। ধূমের দ্বারা ব্যাপ্ত—ধূমময়।
হিরণ্যের বিকার—হিরণ্ময়। জলের দ্বারা ব্যাপ্ত—জলময়।
পাপের সংসর্গ—পাপময়। আনন্দের প্রাচুর্য্য—আনন্দময়।

উৎপন্ন, দেয়, জাত বা যুক্ত অর্থে—ইত, ষ্ণিক

ফল জন্মিয়াছে যাহাতে—ফলিত। দুঃখ জন্মিয়াছে যাহাতে—দুঃখিত।
পুষ্প জন্মিয়াছে যাহাতে—পুষ্পিত। নিদ্রা যুক্ত—নিদ্রিত।

মাসে মাসে উৎপন্ন বা দেয়—মাসিক। পুলক যুক্ত যাহাতে—পুলকিত।
তারকা যুক্ত যাহাতে—তারকিত। কলঙ্ক যুক্ত যাহাতে—কলঙ্কিত।

সাদৃশ্য অর্থে—বৎ (স্থানীয়)

মাতার মত—মাতৃবৎ। মাতার সদৃশ—মাতৃস্থানীয়।
চন্দ্রের মত—চন্দ্রবৎ। পিতার সদৃশ—পিতৃস্থানীয়।
পিতার মত—পিতৃবৎ। ভ্রাতার সদৃশ—ভ্রাতৃস্থানীয়।

ক্রিয়াবিশেষণ অর্থে—চশস্, তস্, ধা

ক্রমে ক্রমে—ক্রমশঃ। প্রথম—প্রথমতঃ।
দুই ভাগে—দ্বিধা। দ্বিতীয়—দ্বিতীয়তঃ।
বহু ভাগে—বহুধা। শত ভাগে—শতধা।
যে প্রকারে—যথা। সর্ব্ব প্রকারে—সর্ব্বথা।

খাঁটি বাঙ্গলা তদ্ধিতান্ত শব্দ

কার্য্য, ভাব, জীবিকা অর্থে—ই, ঈ, মি, পনা

পণ্ডিতের কার্য্য—পণ্ডিতি। ছেলের ভাব—ছেলেমি।
মাষ্টারের কার্য্য—মাষ্টারি। বুড়োর ভাব—বুড়োমি।
বাজী করে যে—বাজীকর। কুঁড়ের ভাব—কুঁড়েমি।
মুচির কার্য্য—মুচিগিরি। ফাজিলের ভাব—ফাজ্‌লামি।
ডাক্তারের কার্য্য—ডাক্তারি। পাকার ভাব—পাকামি।
উকিলের কার্য্য—ওকালতি। ন্যাকার ভাব—ন্যাকামি।
ঘটকের কার্য্য—ঘটকালি। গোঁয়ারের ভাব—গোঁয়ার্ত্তুমি।
গিন্নির কার্য্য—গিন্নীপনা। কেরাণীর কার্য্য—কেরাণীগিরি।
দালালের কার্য্য—দালালি। চৌকি দেওয়ার কার্য্য—চৌকিদারি।
বেহায়ার ভাব—বেহায়াপনা। চালাকের ভাব—চালাকি।
দুরন্তের ভাব—দুরন্তপনা। সাহেবের ভাব—সাহেবি।
বড়র ভাব—বড়াই। পাগলের ভাব—পাগলামি।
বামুনের ভাব—বাম্‌নাই। জ্যাঠার ভাব—জ্যাঠামি।

পূজা করা জীবিকা যাহার—পূজারী। ভিক্ষা করা জীবিকা যাহার—ভিখারী।
ঢাক বাজান জীবিকা যাহার—ঢাকী। কাঁসার কাজ জীবিকা যাহার—কাঁসারী।
জুয়াখেলা জীবিকা যাহার—জুয়ারী, জুয়াড়ী। শাঁখা তৈয়ারি জীবিকা যাহার—শাঁখারী।

উৎপন্ন বা আগত অর্থে—ই, আ, আই ইত্যাদি

বিলাতে উৎপন্ন—বিলাতি। ঘাম হইতে উৎপন্ন—ঘামাচি।
কাবুলে উৎপন্ন—কাবুলি। পাড়াগাঁ হইতে আগত—পাড়াগেঁয়ে।
পাটনায় উৎপন্ন—পাটনাই। শহর হইতে আগত—শহুরে।
ঢাকায় উৎপন্ন—ঢাকাই। জাপান হইতে আগত—জাপানি।
মহিষ হইতে উৎপন্ন—ভঁয়সা। চীন হইতে আগত—চীনা।

অস্তি অর্থাৎ আছে যাহার—এই অর্থে—ল, ও, লি

ধার আছে যাহার—ধারাল। শাঁস আছে যাহার—শাঁসাল।
সার আছে যাহার—সারাল। ঝাঁঝ আছে যাহার—ঝাঁঝাল।
জোর আছে যাহার—জোরাল। জাঁক আছে যাহার—জাঁকাল।
বাত আছে যাহার—বেতো। জমক আছে যাহার—জমকাল।
দাঁত আছে যাহার—দেঁতো। লাঠি আছে যাহার—লাঠিয়াল, লেঠেল।
দুধ আছে যাহার—দুধাল, দুধল। ঢোল আছে যাহার—ঢুলি।

প্রস্তুত অর্থে—ঈ

পশমে প্রস্তুত—পশমী। রেশমে প্রস্তুত—রেশমী।

সম্বন্ধীয় ও তাচ্ছিল্য অর্থে—উয়া, ও

মাছ-সম্বন্ধীয়—মেছো, মাছুয়া। বন-সম্বন্ধীয়—বুনো।
হাট-সম্বন্ধীয়—হেটো, হাটুয়া। বাঘ-সম্বন্ধীয়—বাঘা।
গাছ-সম্বন্ধীয়—গেছো, গাছুয়া। বাঁদর-সম্বন্ধীয়—বাঁদুরে।
ধান-সম্বন্ধীয়—ধেনো। ঘর-সম্বন্ধীয়—ঘরোয়া।

ঈষৎ ও তুল্য অর্থে—টে

ঈষৎ তামার মত—তামাটে। ঈষৎ ধোঁয়াযুক্ত—ধোঁয়াটে।
ঈষৎ ঘোলা—ঘোলাটে। জলের মত—জলপানা।
ঈষৎ রোগা—রোগাটে। চাঁদের মত—চাঁদপানা।
ঈষৎ ক্ষেপা—ক্ষেপাটে। পাগলের মত—পাগলাটে।

অধিক বা আসক্তি অর্থে—উক

মিথ্যা কথা অধিক বলে যে—মিথ্যুক। পেটে (ভোজনে) আসক্তি যাহার অধিক—পেটুক।
লজ্জা যাহার অধিক—লাজুক।
নাটকে আসক্তি যাহার অধিক—নাটুকে।

বাঙ্গলায় ব্যবহৃত কয়েকটি বিদেশী তদ্ধিত

কতকগুলি বিদেশী, বিশেষতঃ ফারসী তদ্ধিত-প্রত্যয় বাঙ্গলায় পাওয়া যায়; প্রথমতঃ বিদেশী শব্দের সঙ্গের সঙ্গেই প্রত্যয়গুলি পাওয়া যাইত, কিন্তু এখন ঐ প্রত্যয়গুলি বিদেশী শব্দ ব্যতীত অন্যান্য বাঙ্গলা শব্দেও যুক্ত হইয়াছে।

চালানো ও অস্তি অর্থে—আন, ওয়ান্

গাড়ী চালায় যে—গাড়োয়ান।
বাগ আছে যাহাতে—বাগোয়ান, বাগান।

ভাব, কার্য্য বা অভ্যাস অর্থে—আনা, আনী

বাবুর ভাব—বাবুয়ানা। সাহেবের ভাব—সাহেবিয়ানা।
হিন্দুর ভাব—হিন্দুয়ানী। গরীবের ভাব—গরিবিয়ানা।

স্থান বা দোকান অর্থে—খানা

মুদীর দোকান—মুদীখানা। শুঁড়ির দোকান—শুঁড়িখানা।
ছাপার স্থান বা দোকান—ছাপাখানা। ডাক্তারের স্থান—ডাক্তারখানা।
পিলের (হাতীর) স্থান—পিলখানা। বসার স্থান—বৈঠকখানা।

খাদক বা অভ্যস্ত অর্থে—খোর

যে গাঁজা খাইতে অভ্যস্ত—গাঁজাখোর। যে ঘুষ খাইতে অভ্যস্ত—ঘুষখোর।
যে গুলি খায়—গুলিখোর। যে আফিম খায়—আফিমখোর।

করে বা গড়ে এই অর্থে—গর (কর)

যে সওদা করে—সওদাগর। যে বাজি করে—বাজিকর।
যে কারু গড়ে বা করে—কারিগর, কারিকর।

ব্যবহার বা ব্যবসা অর্থে—গিরি

কেরানীর কাজ—কেরানীগিরি। বাবুর ব্যবহার—বাবুগিরি।
মুটিয়ার কাজ—মুটিয়াগিরি। দারোগার কাজ—দারোগাগিরি।

আধার বা ক্ষুদ্রার্থে চা, চি

ছোট বাগ—বাগিচা। ছোট চামচ—চামচা।
ছোট ডেক—ডেকচি। ধূনার আধার—ধূনাচি।
নলের আধার—নলিচা।

আধার অর্থে—দান, দানী

কলমের আধার—কলমদানী। নস্যের আধার—নস্যদানী।
নিমকের আধার—নিমকদানী। আতরের আধার—আতরদান।

অস্ত্যর্থে বা কর্তা অর্থে—দার

বাজায় যে—বাজনদার। চৌকি দেয় যে—চৌকিদার।
চড়ে যে—চড়নদার। যাচে যে—যাচনদার।
বুটি আছে যাহাতে—বুটিদার। জিল্লা আছে যাহাতে—জিল্লাদার।
জমি আছে যাহার—জমিদার। অংশ আছে যাহার—অংশীদার।
ভাগ আছে যাহার—ভাগীদার। মজা আছে যাহাতে—মজাদার।

যোগ্য বা উপযুক্ত অর্থে—সই

মানানের যোগ্য—মানানসই। পছন্দের উপযুক্ত—পছন্দসই।
টেঁকার যোগ্য—টেঁকসই। প্রমাণের উপযুক্ত—প্রমাণসই।

পদ-পরিবর্ত্তন

১। বিশেষ্য হইতে বিশেষণ (সংস্কৃত তদ্ধিত-প্রত্যয় যোগে)

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
অংশ	আংশিক	কায়	কায়িক
অগ্নি	আগ্নেয়	গিরি	গৈরিক
অণু	আণব, আণবিক	গো	গব্য
অধ্যয়ন	অধীত	গ্রহণ	গৃহীত
অনুরাগ	অনুরক্ত	গ্রাম	গ্রাম্য, গ্রামীণ
অবধান	অবহিত	গ্রাস	গ্রস্ত
অভ্যাস	অভ্যস্ত	চন্দ্র	চান্দ্র
অস্ত	অস্ত্য	জগৎ	জাগত, জাগতিক
অরণ্য	আরণ্য	জটা	জটিল
অন্তর্জাতি	আন্তর্জাতিক	জ্ঞান	জ্ঞেয়
অকস্মাৎ	আকস্মিক	ত্যাগ	ত্যক্ত
অনুভব	অনুভূত	দম্পতী	দাম্পত্য
আঘাত	আহত	দর্শন	দার্শনিক, দৃষ্ট
আশ্বাস	আশ্বস্ত	দিন	দৈনিক
আরোহণ	আরূঢ়	দেব	দৈব
ইতিহাস	ঐতিহাসিক	নক্ষত্র	নাক্ষত্রিক, নাক্ষত্র
ঈশ্বর	ঐশ্বর, ঐশ্বরিক	নগর	নাগরিক
উদ্যম	উদ্যত	নাশ	নষ্ট
উদীচি	উদীচ্য	নিশা	নৈশ
উন্মাদ	উন্মত্ত	নীতি	নৈতিক
উপনিবেশ	ঔপনিবেশিক	পরলোক	পারলৌকিক
ঋষি	আর্ষ	পশু	পাশব

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
পশ্চাৎ	পাশ্চাত্ত্য	বিমান	বৈমানিক
পঞ্চ বর্ষ	পঞ্চবার্ষিক	বিধান	বিহিত
পঙ্ক	পঙ্কিল	বুদ্ধ	বৌদ্ধ
পিতা	পৈতৃক	ভ্রম	ভ্রান্ত
পৃথিবী	পার্থিব	ভয়	ভীত
পুর	পৌর	ভূগোল	ভৌগোলিক
প্রসঙ্গ	প্রাসঙ্গিক	ভোগ	ভোগ্য
প্রশ্ন	পৃষ্ট	ভোজন	ভুক্ত
প্রমাণ	প্রামাণ্য	মদ	মত্ত
প্রতীচি	প্রতীচ্য	মনঃ	মানস, মানসিক
প্রাচ্	প্রাচ্য	মাংস	মাংসল
ফেন	ফেনিল	মুখ	মৌখিক
বধ	হত	মোহ	মুগ্ধ
বন	বন্য	লয়	লীন
বন্ধু	বান্ধব	লাভ	লব্ধ
বস্তু	বাস্তব	লোভ	লুব্ধ
বরণ	বৃত	লোক	লৌকিক
ব্যবহার	ব্যাবহারিক	শয়ন	শায়িত
ব্যাঘাত	ব্যাহত	শরৎ	শারদ, শারদীয়
বায়ু	বায়বীয়, বায়ব	শরীর	শারীরিক
বিদ্যুৎ	বৈদ্যুতিক, বৈদ্যুত	শোক	শোচনীয়
বিধি	বৈধ	সন্ধ্যা	সান্ধ্য
বিষাদ	বিষণ্ণ	সময়	সাময়িক
বিপ্লব	বৈপ্লবিক	সমুদ্র	সামুদ্রিক
বিপদ	বিপন্ন	স্নায়ু	স্নায়বীয়, স্নায়বিক
বিষ্ণু	বৈষ্ণব	স্পর্শ	স্পৃষ্ট

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
স্মৃতি	স্মার্ত্ত	হেম	হৈম
সূর্য্য	সৌর	হৃদয় (হৃৎ)	হৃদ্য
স্নেহ	স্নিগ্ধ	হরণ	হৃত
স্ত্রী	স্ত্রৈণ	ক্ষোভ	ক্ষুব্ধ
হর্ষ	হৃষ্ট	মোহ	মুগ্ধ

বাঙ্গলায় চলিত কথার উদাহরণ

(বাঙ্গলা তদ্ধিত-প্রত্যয়-যোগে)

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
আদর	আদুরে	মাটি	মেটে
খেয়াল	খেয়ালী	মেয়ে	মেয়েলি
বাত	বেতো	সূতা	সূতি
গাঁ	গেঁয়ো	ঝগড়া	ঝগড়াটে
ঘর	ঘরোয়া	হিংসা	হিংসুটে
জল	জলো	সর্ব্বনাশ	সর্ব্বনেশে
তেজ	তেজী	সোনা	সোনালি
গাছ	গেছো	দাঁত	দাঁতাল
ভাত	ভেতো	গোলাপ	গোলাপি
শহর	শহুরে	বেগুন	বেগুনি
বিলাত	বিলাতী	কাজ	কেজো
ঢাকা	ঢাকাই	মাছ	মেছো
পাটনা	পাটনাই	দরদ	দরদী
বেনারস	বেনারসী	লাজ	লাজুক
রংপুর	রংপুরী	পেট	পেটুক
কাবুল	কাবুলী	ঝড়	ঝড়ো
বন	বুনো	কোণ	কুণো

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
ভূত	ভূতুড়ে	পুষ্টি	পোষ্টাই
মাঠ	মেঠো	দরকার	দরকারী
পাথর	পাথুরে	রং	রংদার

২। বিশেষণ হইতে বিশেষ্য

(সংস্কৃত তদ্ধিত-প্রত্যয়-যোগে)

বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য
অতিশয়	আতিশয্য	তরল	তারল্য
অধিক	আধিক্য	দরিদ্র	দারিদ্র্য
অনুকূল	আনুকূল্য	দীন	দৈন্য
অলস	আলস্য	দীর্ঘ	দৈর্ঘ্য
ঋজু	আর্জ্জব	ধীর	ধৈর্য্য
রক্ত	রক্তিমা, রাগ	নবীন	নবীনতা
শ্রান্ত	শ্রান্তি	নীল	নীলিমা
সুস্থ	স্বাস্থ্য	প্রচুর	প্রাচুর্য্য
উচিত	ঔচিত্য	বিচিত্র	বৈচিত্র্য
এক	ঐক্য	বীর	বীর্য্য
কপট	কাপট্য	মহৎ	মহত্ত্ব
করুণ	কারুণ্য	লঘু	লাঘব, লঘুতা
কিশোর	কৈশোর	ললিত	লালিত্য
কুমার	কৌমার্য্য	মধুর	মধুরতা, মাধুর্য্য
	কৌলীন্য	স্বাদু	স্বাদ
কৃপণ	কার্পণ্য	হ্রস্ব	হ্রাস
কৃশ	কার্শ্য	ক্ষীণ	ক্ষয়
	গাম্ভীর্য্য	শিথিল	শিথিলতা, শৈথিল্য

বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য
গুরু	গৌরব, গুরুত্ব, গরিমা	শূর	শৌর্য্য
চঞ্চল	চঞ্চলতা, চাঞ্চল্য	দৃঢ়	দৃঢ়তা, দার্ঢ্য
চতুর	চতুরতা, চাতুর্য্য	উৎকৃষ্ট	উৎকর্ষ
চেতন	চৈতন্য	সরল	সারল্য, সরলতা

বাঙ্গলায় চলিত কথার উদাহরণ

(বাঙ্গলা তদ্ধিত-প্রত্যয়-যোগে)

বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য
পাগল	পাগ্‌লামি	ধূর্ত্ত	ধূর্ত্তপনা
ন্যাকা	ন্যাকামি	পাকা	পাকামি
ভণ্ড	ভণ্ডামি	বেহায়া	বেহায়াপনা
চালাক	চালাকি	মাতাল	মাতলামি
দুরন্ত	দুরন্তপনা	গরীব	গরীবানা, গরীবপনা
ইতর	ইতরামি	কুঁড়ে	কুঁড়েমি

অনুবাদের সাহায্যার্থে কতকগুলি বিশিষ্ট শব্দের প্রয়োগ

Western culture—পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি।
Five year plan—পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা।
Revolutionary tendencies—বৈপ্লবিক চিন্তাধারা।
Sudden danger—আকস্মিক বিপদ্।
Communal harmony—সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি।
Primary education—প্রাথমিক শিক্ষা।
Oral examination—মৌখিক পরীক্ষা।
International reputation—আন্তর্জাতিক খ্যাতি।

Moral support—নৈতিক সমর্থন।
Original research—মৌলিক গবেষণা।
National interest—জাতীয় স্বার্থ।
Political agitation—রাষ্ট্রীয় (রাজনৈতিক) আন্দোলন।
International situation—আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি।
National wealth—জাতীয় সম্পদ্।
Scientific invention—বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার।
Favourable circumstances—অনুকূল অবস্থা।
Pecuniary condition—আর্থিক অবস্থা।
Geographical division—ভৌগোলিক বিভাগ।
Secondary education—মাধ্যমিক শিক্ষা।
Imperial policy—সাম্রাজিক নীতি।
Advance payment—অগ্রিম দাদন।
Autumnal vacation—শারদীয় অবকাশ।
Historical truth—ঐতিহাসিক সত্য।
Untamed elephant—আরণ্য গজ।
Daily wages—দৈনিক মজুরী।
Illegal act—অবৈধ কার্য্য।
Final effort—অন্তিম প্রচেষ্টা।
Mental distress—মানসিক কষ্ট।
Nervous weakness—স্নায়বিক দুর্ব্বলতা।
Spiritual force—আত্মিক শক্তি।
Decimal fraction—দশমিক ভগ্নাংশ।
Fortnightly paper—পাক্ষিক পত্র।
Daily income—দৈনিক আয়।
Profitable business—লাভজনক ব্যবসায়।

অনুশীলনী

১। নিম্নের বিশেষ্যগুলিকে বিশেষণে পরিবর্ত্তিত কর :—

বর্ষ, চন্দ্র, সূর্য্য, নিন্দা, দেব, বিস্তার, মোহ, লোভ, স্নেহ, পান, গমন, স্তব, অভ্যাস, বিষয়, ন্যায়, ব্যবহার, সমাজ, কায়, নিন্দা, সংযম, পতন, ঝগড়া, মেয়ে, ভ্রম, শরৎ, পরিবার, প্রাসাদ, ঢাকা।

২। নিম্নোদ্ধৃত বিশেষণগুলি বিশেষ্য পদে পরিবর্ত্তিত কর :—

অবসন্ন, পরাভূত, বিষণ্ণ, হীন, ধৌত, মগ্ন, ভুক্ত, সিদ্ধ, মত্ত, মধুর, শান্ত, আরূঢ়, নষ্ট, পরিণত, বিরত, অবগত, নিহত, প্রলুব্ধ, পাগল, নীল, লঘু, চতুর, চালাক, গোঁয়ার, সবল, কৃপণ, সিক্ত, মাতাল, মুগ্ধ, মূঢ়, আবৃত ; আদৃত।

৩। এক কথায় কি হইবে বল :—

বাজনা বাজাইয়া যে জীবিকা নির্ব্বাহ করে ; সারথির কাজ ; ঘটকের কাজ ; গণপতির উপাসক ; শিবের ভক্ত ; রাবণের পুত্র ; পাণ্ডুর পুত্র ; দুহিতার অপত্য ; ভগিনীর অপত্য, দালালের কাজ ; হিন্দুর ভাব ; ব্রহ্মের উপাসক।

৪। সাধু বাঙ্গলায় অনুবাদ কর :—

Western world ; night school ; national song ; heavenly pleasure : military strength ; mental disease ; universal language ; monthly income ; daily expenditure ; annual examination ; personal loss ; empty purse ; firm resolution ; autumnal festival ; foreign language ; moving train ; weekly newspaper ; domestic quarrel ; oriental learning ; imaginary trouble ; conjugal love ; solar system ; ghostly affairs ; quarrelsome boy ; divine power ; physical labour ; paternal property ; poetic diction ; philanthropic ideal ; stolen ornaments.

চতুর্থ পাঠ—শব্দগঠন

সমাস-নিষ্পন্ন শব্দ

সমাস শব্দগঠনের একটি অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ (উপায়)। পরস্পর আকাঙ্ক্ষাযুক্ত দুই বা বহু পদকে এক পদে পরিণত করার নাম **সমাস**। সুতরাং সমাসনিষ্পন্ন শব্দের ব্যবহারে বাক্যের সংক্ষেপ সাধন করা যায়। ইহাতে বাক্য সরস ও শ্রুতিমধুর হয়। কিন্তু সমাসনিষ্পন্ন শব্দ যাহাতে শ্রুতিকটু না হয়, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার। আবার অযথা সমাসান্ত পদের ব্যবহারে রচনার প্রসাদ-গুণ নষ্ট হইয়া যায়। নিম্নে বাঙ্গলায় প্রচলিত সমাসের কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া হইল।

বাঙ্গলা ভাষায় প্রচলিত সংস্কৃত সমাস

তৎপুরুষ সমাস

পূর্ব্বপদে দ্বিতীয়া, তৃতীয়া প্রভৃতি বিভক্তির লোপ হইয়া পরপদের সহিত যে সমাস হয়, তাহাকে **তৎপুরুষ সমাস** বলে। তৎপুরুষ সমাসে প্রায় পর-পদের অর্থ প্রধান হয়।

দ্বিতীয়া তৎপুরুষ

আত্মাকে সমর্পণ—আত্মসমর্পণ। গঙ্গাকে প্রাপ্ত—গঙ্গাপ্রাপ্ত।
দেবকে দত্ত—দেবদত্ত। অর্দ্ধরূপে মৃত—অর্দ্ধমৃত।
বিস্ময়কে আপন্ন—বিস্ময়াপন্ন। দেবকে আশ্রিত—দেবাশ্রিত।
মাস ব্যাপিয়া অশৌচ—মাসাশৌচ। চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী—চিরসুখী।
ক্ষণকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী—ক্ষণস্থায়ী। চিরকাল ধরিয়া শত্রু—চিরশত্রু।

তৃতীয়া তৎপুরুষ

শোকের দ্বারা আকুল—শোকাকুল। মেঘ দ্বারা আচ্ছন্ন—মেঘাচ্ছন্ন।
জ্ঞান দ্বারা শূন্য—জ্ঞানশূন্য। কীট দ্বারা দষ্ট—কীটদষ্ট।

ছায়া দ্বারা শীতল—ছায়াশীতল। বুদ্ধি দ্বারা হীন—বুদ্ধিহীন।
রস দ্বারা সিক্ত—রসসিক্ত। কণ্টক দ্বারা আকীর্ণ—কণ্টকাকীর্ণ।
বাল্মীকিকর্ত্তৃক রচিত—বাল্মীকিরচিত। বিস্ময় দ্বারা বিহ্বল—বিস্ময়বিহ্বল।

চতুর্থী তৎপুরুষ

দেবতার উদ্দেশে উৎসৃষ্ট—দেবোৎসৃষ্ট।
দন্তের নিমিত্ত কাষ্ঠ—দন্তকাষ্ঠ।

পঞ্চমী তৎপুরুষ

শাপ হইতে মুক্ত—শাপমুক্ত। সত্য হইতে ভ্রষ্ট—সত্যভ্রষ্ট।
স্থান হইতে চ্যুত—স্থানচ্যুত। অগ্নি হইতে ভয়—অগ্নিভয়।
দুগ্ধ হইতে জাত—দুগ্ধজাত। লোক হইতে ভয়—লোকভয়।
জন্ম অবধি অন্ধ—জন্মান্ধ। বিদেশ হইতে আগত—বিদেশাগত।

ষষ্ঠী তৎপুরুষ

জগতের ঈশ্বর—জগদীশ্বর। রাজার পুত্র—রাজপুত্র।
হস্তীর দন্ত—হস্তিদন্ত। ছাগীর দুগ্ধ—ছাগদুগ্ধ।
অতিথির সেবা—অতিথিসেবা। দূতের আবাস—দূতাবাস।
কবিদিগের গুরু—কবিগুরু। সতের সঙ্গ—সৎসঙ্গ।
বিশ্বের মিত্র—বিশ্বামিত্র। বনের পতি—বনস্পতি।

সপ্তমী তৎপুরুষ

সমরে নিপুণ—সমরনিপুণ। জলে মগ্ন—জলমগ্ন।
রৌদ্রে পক্ক—রৌদ্রপক্ক। অকালে মৃত্যু—অকালমৃত্যু।
মাতায় ভক্তি—মাতৃভক্তি। বনে জাত—বনজাত।
বিশ্বে বিখ্যাত—বিশ্ববিখ্যাত। দুষ্ক্রিয়ায় আসক্ত—দুষ্ক্রিয়াসক্ত
শিরে ধার্য্য—শিরোধার্য্য। পরিহাসে পটু—পরিহাসপটু।

কর্ম্মধারয় সমাস

বিশেষ্য পদের সহিত বিশেষণ পদের যে সমাস হয় তাহাকে **কর্ম্মধারয় সমাস** বলে। এই সমাসে প্রায় পরপদের অর্থ প্রধান হয়। ব্যাসবাক্যে যে, যেমন, অথচ ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে।

গুণী যে জন—গুণিজন। পুণ্য এমন অহন্ (দিন)—পুণ্যাহ।
রাজা অথচ ঋষি—রাজর্ষি। মহান্ যে ঋষি—মহর্ষি।
নীল যে আকাশ—নীলাকাশ। অগ্রে সুপ্ত পরে উত্থিত—সুপ্তোত্থিত।
রক্ত যে উৎপল—রক্তোৎপল। কাল যে সর্প—কালসর্প।
পণ্ডিত হইয়াও মূর্খ—পণ্ডিতমূর্খ। পুণ্য যে ভূমি—পুণ্যভূমি।

মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয়

যে কর্ম্মধারয় সমাসের ব্যাসবাক্যে ব্যাখ্যানমূলক মধ্যপদের লোপ হয় তাহাকে **মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয়** বলে।

সিংহচিহ্নিত আসন—সিংহাসন। পলমিশ্রিত অন্ন—পলান্ন।
বাষ্পদ্বারা চালিত যান—বাষ্পযান। ভিক্ষাদ্বারা লব্ধ অন্ন—ভিক্ষান্ন।

রূপক কর্ম্মধারয়

উপমান ও উপমেয়ের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া উভয়ের মধ্যে অভেদ কল্পনা করিয়া যে সমাস হয় তাহাকে **রূপক কর্ম্মধারয়** বলে।

শোকরূপ অগ্নি—শোকাগ্নি। জ্ঞানরূপ আলোক—জ্ঞানালোক।
বিদ্যারূপ ধন—বিদ্যাধন। বিষাদরূপ সিন্ধু—বিষাদসিন্ধু।
মুখরূপ চন্দ্র—মুখচন্দ্র। চরণরূপ কমল—চরণকমল।

উপমান ও উপমিত কর্ম্মধারয়

উপমানের সহিত উপমেয়ের যে সমাস হয় তাহাকে **উপমান কর্ম্মধারয়** বলে। যথা, তুষারের ন্যায় শীতল—তুষার-শীতল।

যেখানে উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে সাদৃশ্য স্পষ্ট নহে, অথচ উহাদের অন্তর্নিহিত কোনও গুণের কথা ভাবিয়া উপমা করা হয় সেখানে **উপমিত**

কর্ম্মধারয় হয়। উপমিত কর্ম্মধারয় সমাসে পূর্ব্বপদের অর্থ প্রধান হইয়া থাকে। যথা, নর ব্যাঘ্রের ন্যায়—নরব্যাঘ্র।

দ্বিগু

সংখ্যাবাচক শব্দ পূর্ব্বে থাকিয়া যদি সমাহার বুঝায় তাহা হইলে **দ্বিগু সমাস** হয়।

পঞ্চ নদীর সমাহার—পঞ্চনদ। পঞ্চ বটের সমাহার—পঞ্চবটী।
শত শব্দের সমাহার—শতাব্দী। পঞ্চভূতের সমাহার—পঞ্চভূত।

বহুব্রীহি

যে সকল পদে সমাস হয় তাহাদের মধ্যে কোনটিরই অর্থ প্রধান ভাবে না বুঝাইয়া যদি অন্য কোন পদার্থকে প্রধানভাবে বুঝায় তাহা হইলে **বহুব্রীহি সমাস** হয়।

শীর্ণ কলেবর যাহার—শীর্ণকলেবর। সমান জাতি যাহার—সজাতি।
জিত ইন্দ্রিয় যৎকর্ত্তৃক—জিতেন্দ্রিয়। আদি নাই যাহার—অনাদি।
অন্য বিষয়ে মন যাহার—অন্যমনস্ক। ধন নাই যাহার—নির্ধন।
অল্প আয়ু যাহার—অল্পায়ু। চন্দ্রের ন্যায় মুখ যাহার—চন্দ্রমুখ।
চন্দ্র শেখরে যাহার—চন্দ্রশেখর। পূর্ব্বে দৃষ্ট হয় নাই যাহা—অদৃষ্টপূর্ব্ব।
সমান গোত্র যাহার—সগোত্র। পীত অম্বর যাহার—পীতাম্বর।
বীণা পাণিতে যাহার—বীণাপাণি। স্থির প্রতিজ্ঞা যাহার—স্থিরপ্রতিজ্ঞ।

দ্বন্দ্ব

যে সমাসে প্রত্যেক পদের অর্থই প্রধানভাবে বুঝায়, তাহাকে **দ্বন্দ্ব সমাস** বলে।

পান ও ভোজন—পানভোজন। খাদ্য ও অখাদ্য—খাদ্যাখাদ্য।
ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম—ধর্ম্মাধর্ম্ম। হিত ও অহিত—হিতাহিত।
মাতা ও পিতা—মাতাপিতা। শোক ও তাপ—শোকতাপ।
শত্রু ও মিত্র—শত্রুমিত্র। দেব ও অসুর—দেবাসুর।

অব্যয়ীভাব

যে সমাসে পূর্ব্বপদে অব্যয় থাকে ও অব্যয়ের অর্থ প্রধান হয়, তাহাকে **অব্যয়ীভাব সমাস** বলে।

কূলের সমীপে—উপকূল।
কণ্ঠের সমীপে—উপকণ্ঠ।
দিনে দিনে—প্রতিদিন।
গৃহে গৃহে—প্রতিগৃহ।
শক্তিকে অতিক্রম না করিয়া—যথাশক্তি।
ভিক্ষার অভাব—দুর্ভিক্ষ।
আমিষের অভাব—নিরামিষ।
কণ্ঠ পর্য্যন্ত—আকণ্ঠ।
মরণ পর্য্যন্ত—আমরণ।
জীবন পর্য্যন্ত—আজীবন।
বনের সদৃশ—উপবন।
দ্বীপের সদৃশ—উপদ্বীপ।
পদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত—আপাদমস্তক।

নিত্যসমাস

নিত্যসমাস দুই প্রকার :—যাহার ব্যাসবাক্য হয় না (অবিগ্রহ), যেমন—কৃষ্ণসর্প; আর যাহার ব্যাসবাক্যে সমাসের মধ্যস্থপদ ব্যতীত অন্যপদ ব্যবহৃত হয়—অন্য গৃহ গৃহান্তর।

অন্য গৃহ—গৃহান্তর।
অন্য গ্রাম—গ্রামান্তর।
অন্য দেহ—দেহান্তর।
পূজার নিমিত্ত—পূজার্থ।

প্রাদি

কুৎসিত পুরুষ—কুপুরুষ, কাপুরুষ।
সুন্দর পুরুষ—সুপুরুষ।

বাঙ্গলা সমাস

তৎপুরুষ সমাস

দ্বিতীয়া তৎপুরুষ

ফুলকে তোলা—ফুলতোলা।
বাসনগুলিকে মাজা—বাসনমাজা।
মনকে ভোলানো—মনভোলানো।
বরকে দেখা—বরদেখা।
নথটাকে নাড়া—নথনাড়া।
বইকে পড়া—বইপড়া।

তৃতীয়া তৎপুরুষ

ঢেঁকি দ্বারা ছাঁটা—ঢেঁকিছাঁটা।
বাদুড় দ্বারা চোষা—বাদুড়চোষা।
দা দ্বারা কাটা—দা-কাটা।
হাত দ্বারা গড়া—হাতগড়া, হাতেগড়া।

ঝাঁটা দ্বারা পেটা—ঝাঁটাপেটা। মা কর্ত্তৃক হারা—মাহারা।
জাঁতা দ্বারা ভাঙ্গা—জাঁতাভাঙ্গা। ঘি দ্বারা মিশ্রিত ভাত—ঘি-ভাত।
কাঁচি দ্বারা ছাঁটা—কাঁচিছাঁটা। মধু দ্বারা মাখা—মধুমাখা।

চতুর্থী তৎপুরুষ

বিয়ের জন্য পাগলা—বিয়েপাগলা। মেয়েদের জন্য ইস্কুল—মেয়েস্কুল।
মড়ার জন্য কান্না—মড়াকান্না। তেল মাখিবার জন্য ধুতি—তেলধুতি।

পঞ্চমী তৎপুরুষ

বিলাত হইতে ফেরত—বিলাতফেরত। পাল হইতে ছাড়া—পালছাড়া।
গাঁ হইতে ছাড়া—গাঁছাড়া। আগা হইতে গোড়া—আগাগোড়া।

ষষ্ঠী তৎপুরুষ

ঠাকুরের পো—ঠাকুরপো। ফুলের বাগান—ফুলবাগান।
মালের গাড়ী—মালগাড়ী। সাঁজের বাতি—সাঁজবাতি।
মধুর চাক—মৌচাক। বামুনদের পাড়া—বামুনপাড়া।

সপ্তমী তৎপুরুষ

গাছে পাকা—গাছপাকা। গোলায় ভরা—গোলাভরা।
বাক্সে বন্দী—বাক্সবন্দী। তালে কানা—তালকানা।

কর্ম্মধারয়

ঠাকুর দাদা—ঠাকুরদাদা। দুই দিক—দুদিক।
তিন বছর—বছরতিন। এক বার—বারেক।
অন্য নাম—বেনাম। কাঁচা কলা—কাঁচকলা।
মন্দ গাছ—আগাছা। মন্দ সুর—বেসুর।
উড়িয়া যায় এমন জাহাজ—উড়োজাহাজ। সমান ঘর—সঘর।

উপমান, উপমিত ও রূপক কর্ম্মধারয়

মিশির মত কাল—মিশকালো। ফুলের ন্যায় বাবু—ফুলবাবু।
গজের (দাঁতের) ন্যায় দাঁত—গজদাঁত। দাঁত কবাটের ন্যায় রুদ্ধ—দাঁতকবাটি

ফুলের মত বাতাসা—ফুলবাতাসা। গাধার মত (চলে যে) বোট—গাধাবোট।
পাল্কির ন্যায় গাড়ী—পাল্কিগাড়ী। মন রূপ মাঝি—মনমাঝি।
ওলের ন্যায় কপি—ওলকপি। প্রাণ রূপ পাখী—প্রাণপাখী।
মেয়ের মত কান্না—মেয়েকান্না।

বহুব্রীহি

অল্প বয়স যাহার—অল্পবয়সী। পাঁচ গাড়ী (পরিমাণ) যাহার—পাঁচগাড়ী।
আট হাত (পরিমাণ) যাহার—আটহাতি। চারি রাস্তার মিলন যেখানে—চৌরাস্তা।
এক মণ (ওজন) যাহার—একমণি। চারি মাথার মিলন যেখানে—চৌমাথা।
তিন পায়া যাহার—তেপায়া। চার চাল যাহার—চৌচালা।
তিনটি কাঠি যাহাতে—তেকাঠা। মা মরিয়াছে যাহার—মা-মরা।
আট মাসে জন্মিয়াছে যে—আটাসে। ছন্ন মতি যাহার—মতিচ্ছন্ন।
অল্প আয়ু যাহার—অল্পেয়ে। দুটি নল যাহাতে আছে—দুনলা।
উঁচু কপাল যাহার—উঁচ্‌কপালে। নাই মুখ যাহার—নিমুখ।
আন্ (অন্য বিষয়ে) মন যাহার—আন্‌মনা। লাঠিতে লাঠিতে যুদ্ধ—লাঠালাঠি।
ভুল নাই যাহাতে—নির্ভুল। প্রত্যাশা নাই যাহার—হাপিত্যেশ।
ঔষধ মাড়া হয় যাহাতে—ঔষধমাড়া। সাত লহরী যাহাতে—সাতনরি।
টাক পড়িয়াছে যাহাতে—টাকপড়া। কাল মুখ যাহার—কালামুখো।
বুঝ নাই যাহার—অবুঝ। হাঁড়ির মত মুখ যাহার—হাঁড়িমুখো।
হায়া (লজ্জা) নাই যার—বেহায়া। বাজ পড়িয়াছে যাহাতে—বাজপড়া।
মরিচা ধরিয়াছে যাহাতে—মরিচাধরা।

উপপদ

বাজি করে যে—বাজিকর। নেশা করে যে—নেশাখোর।
লুচি ভাজে যে—লুচিভাজিয়ে। তামাক খায় যে—তামাকখোর।
অগ্রে সরে যে—আগুসার। ভাত খায় যে—ভাতখেকো।
ধামা ধরে যে—ধামাধরা। ঘর ভাঙ্গে যে—ঘরভাঙ্গানী।

পাড়া বেড়ায় যে—পাড়া-বেড়ানী (মেয়ে)।

দ্বন্দ্ব

বাপ ও মা—বাপ-মা। নাম ও ধাম—নামধাম।
হাট ও বাজার—হাটবাজার। লেপ ও কাঁথা—লেপকাঁথা।
কানা ও খোঁড়া—কানাখোঁড়া। ভাই ও বোন—ভাইবোন।

অব্যয়ীভাব

জনে জনে—প্রতিজন। ঘরে ঘরে—প্রতিঘর।
রোজ রোজ—হররোজ। মিলের অভাব—অমিল।
ঘাটের অভাব—আঘাটা। ভাতের অভাব—হাভাত।
লবণের অভাব—আলুনি। ঘরের অভাব—হা-ঘর।

বাঙ্গলা ভাষায় প্রচলিত কতকগুলি বৈদেশিক শব্দ-ঘটিত সমাস-নিষ্পন্ন শব্দ

মুন্সির স্থান—মুন্সিখানা। নবাবের মহল—নবাবমহল।
খাস (নিজ) মহাল—খাসমহাল। ঘাসের জমা—ঘাসজমা।
বদ্ (মন্দ) হজম—বদ্‌হজম। জমা ও খরচ—জমাখরচ।
রাজি নয় যে—নারাজ। হক্ নয়—নাহক্।
দস্তের (হস্তের) খত (লিখন)—দস্তখত। মানানের অভাব—বেমানান।
দিল্ দরিয়ার ন্যায় যাহার—দিল্‌দরিয়া। চশম (দৃষ্টি) যে খাইয়াছে—চশমখোর
হাজির নয় যে—গর্‌হাজির। চারা নাই যাহার—নাচার।
বে (বিহীন) ইমান (ধর্ম্ম) যে—বেইমান। বে (বিহীন) কার (কর্ম্ম) যে—বেকার
আক্কেল নাই যাহার—বে-আক্কেল। মালের সহিত—বামাল।
রাজির নামা—রাজিনামা। ইজারা দেওয়া মহাল—ইজারামহাল
আমলের (অধিকারের) নামা—আমলনামা।
নরম ও গরম—নরমগরম। হাই (প্রধান) কোর্ট—হাইকোর্ট।
পোষ্টের (ডাকের) আফিস—পোষ্টাফিস। ষ্টীমারের ঘাট—ষ্টীমারঘাট।
পোষ্টের মাষ্টার—পোষ্টমাষ্টার। ষ্টেশনের মাষ্টার—ষ্টেশনমাষ্টার।

টিকিটের মাষ্টার—টিকিটমাষ্টার। স্কুলের মাষ্টার - স্কুলমাষ্টার।
হেড (প্রধান) আফিস—হেড্-আফিস। ডাকের পিয়ন—ডাকপিয়ন।
রেলের আফিস—রেল-আফিস। ট্রামের জন্য নির্ম্মিত লাইন—ট্রামলাইন।
কুইনাইনের মিক্শ্চার—কুইনাইন্মিক্শ্চার। মোটর চালিত গাড়ী—মোটর গাড়ী।
ক্যাশের বাক্স—ক্যাশবাক্স। হাই যে বেঞ্চ—হাইবেঞ্চ।
ম্যাজিষ্ট্রেট ডেপুটি—ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট। হেড কন্স্টেবল—হেড্ কন্স্টেবল।
টেবিল ও চেয়ার—টেবিলচেয়ার। টাইম-নির্দ্দেশক টেবল—টাইম-টেবল।
নেকে (গলায়) বাঁধিবার টাই—নেকটাই। রিস্টে বাঁধিবার ওয়াচ—রিস্টওয়াচ।
নিমক (লবণ) খাইয়া হারামি করে যে—নিমকহারাম বদ (মন্দ) মাশ (জীবিকা) যাহার—বদমাশ, বদমাইশ।
নাই বন্দোবস্ত যাহার বা যাহাতে—বে-বন্দোবস্ত। বদ (মন্দ) মেজাজ যাহার—বদ্মেজাজ।
কালা পানি (জল) যাহাতে—কালাপানি।
বুক (পুস্তক) বাইণ্ড করে যে—বুকবাইণ্ডার। কাপ ও ডিস্—কাপডিস্।
শাঁখ মার্কা যার—শাঁখমার্কা। বুটের সহিত বর্ত্তমান যাহা—সবুট।

কতকগুলি খাঁটি বাঙ্গলা শব্দের সহিত অন্যান্য শব্দের সহযোগে সমাস

লক্ষ্মীকর্ত্তৃক ছাড়া—লক্ষ্মীছাড়া। লজ্জা ও সরম—লজ্জাসরম।
বোতলে বোঝাই—বোতলবোঝাই। হেড্ পণ্ডিত—হেড্পণ্ডিত।
চরখায় বোনা—চরখাবোনা। সদরের পথ—সদরপথ।
কৃষাণ ও মজুর—কৃষাণমজুর। সেপাই ও সান্ত্রী—সেপাইসান্ত্রী।
বোতামের ঘর (ছিদ্র)—বোতামঘর। মাখন ও বিস্কুট—মাখনবিস্কুট।
ফিতা দ্বারা বাঁধা—ফিতাবাঁধা। বোতলে ভর্ত্তি—বোতলভর্ত্তি।
জানালা ও কপাট—জানালাকপাট। এসের (রচনার) বই—এসেবই।
নিম দ্বারা তৈয়ারী টুথপেষ্ট—নিমটুথপেষ্ট।

সমাস-সাহায্যে শব্দগঠন

সমাসের নিয়মে একই শব্দের সহিত বিভিন্নার্থক শব্দ যুক্ত হইলে বিভিন্ন অর্থবোধক শব্দের সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই শব্দগুলি পূর্ব্বপদ ও পরপদ উভয়রূপেই ব্যবহৃত হয়।

পূর্ব্বপদের ব্যবহার

অগ্নি—অগ্ন্যুদ্গার, অগ্নিকোণ, অগ্নিকাণ্ড, অগ্নিকার্য্য, অগ্নিগর্ভ, অগ্নিপক্ব, অগ্নিজিহ্ব, অগ্নিতরঙ্গ, অগ্নিদগ্ধ, অগ্নিপরীক্ষা, অগ্নিবৃদ্ধি, অগ্নিবৃষ্টি, অগ্নিবাণ, অগ্নিমান্দ্য, অগ্নিমূল্য, অগ্নিযুগ, অগ্নিশর্ম্মা, অগ্নিশিলা, অগ্নিসংস্কার, অগ্নিসৎকার, অগ্নিসাক্ষ্য, অগ্নিহোত্রী।

কর্ম্ম—কর্ম্মকর্ত্তা, কর্ম্মকাণ্ড, কর্ম্মকার, কর্ম্মকুশল, কর্ম্মক্ষেত্র, কর্ম্মখালি, কর্ম্মচারী, কর্ম্মত্যাগ, কর্ম্মদোষ, কর্ম্মনাশা, কর্ম্মফল, কর্ম্মপাশ, কর্ম্মভোগ, কর্ম্মযোগ, কর্ম্মসন্ন্যাস, কর্ম্মসাক্ষী, কর্ম্মসিদ্ধি, কর্ম্মস্থান, কর্ম্মসূত্র।

কুল—কুলকণ্টক, কুলকর্ম্ম, কুলকলঙ্ক, কুলপ্রিয়া, কুলগর্ব্ব, কুলতিলক, কুলদেবতা, কুলধর্ম্ম, কুলত্যাগ, কুলনাশ, কুলপতি, কুলপুরোহিত, কুলপ্রদীপ, কুলবধূ, কুলভূষণ, কুলভ্রষ্ট, কুলমর্য্যাদা, কুললক্ষণ, কুলশীল, কুলাচার, কুলাঙ্গার।

গঙ্গা—গঙ্গাগর্ভ, গঙ্গাজল, গঙ্গাঞ্জলি, গঙ্গাতীর, গঙ্গাধর, গঙ্গাপুত্র, গঙ্গাফড়িং, গঙ্গাযাত্রা, গঙ্গারক্ষক, গঙ্গালাভ, গঙ্গাসাগর।

গুরু—গুরুকুল, গুরুকরণ, গুরুগম্ভীর, গুরুগিরি, গুরুগৃহ, গুরুচাণ্ডালী, গুরুদক্ষিণা, গুরুদ্বার, গুরুনিন্দা, গুরুপাক, গুরুবংশ, গুরুবার, গুরুভাই, গুরুভার, গুরুবরণ, গুরুমারা, গুরুমুখী, গুরুসেবা, গুরুহত্যা।

গৃহ—গৃহকর্ত্তা, গৃহকর্ম্ম, গৃহচ্ছিদ্র, গৃহজন, গৃহজাত, গৃহত্যাগ, গৃহদাহ, গৃহদেবতা, গৃহধর্ম্ম, গৃহপ্রবেশ, গৃহবিচ্ছেদ, গৃহভেদী, গৃহযুদ্ধ, গৃহলক্ষ্মী, গৃহশিক্ষক, গৃহসজ্জা, গৃহস্থ।

চির—চিরকাল, চিরজীবী, চিরদিন, চিরদুঃখী, চিরনিদ্রা, চিরবিদায়, চিররুগ্ণ, চিরহরিৎ।

জল—জলকর, জলকল্লোল, জলকেলি, জলখাবার, জলচর, জলচল, জলতরঙ্গ, জলস্তম্ভ, জলদস্যু, জলধর, জলনালী, জলপাত্র, জলপথ, জলপ্রপাত, জলপ্লাবন, জলবায়ু, জলযন্ত্র, জলযাত্রা, জলযান, জলযোগ, জলসত্র, জলসেক, জলহস্তী, জলাতঙ্ক, জলোচ্ছ্বাস।

জ্ঞান—জ্ঞানকাণ্ড, জ্ঞানগম্য, জ্ঞানগর্ভ, জ্ঞানগোচর, জ্ঞানচর্চ্চা, জ্ঞানতৃষ্ণা, জ্ঞানদান, জ্ঞাননেত্র, জ্ঞানপাপী, জ্ঞানপিপাসা, জ্ঞানবাপী, জ্ঞানবীর, জ্ঞানবৃদ্ধ, জ্ঞানযোগ, জ্ঞানলিপ্সা, জ্ঞানহীন।

তত্ত্ব—তত্ত্বকথা, তত্ত্বজিজ্ঞাসা, তত্ত্বজ্ঞান, তত্ত্বতল্লাস, তত্ত্বতাবাস, তত্ত্বদর্শী, তত্ত্বনির্ণয়, তত্ত্ববিদ্, তত্ত্বসার।

তীর্থ—তীর্থকর্ম্ম, তীর্থঙ্কর, তীর্থকাক, তীর্থবাস, তীর্থমৃত্যু, তীর্থযাত্রা, তীর্থরাজ, তীর্থসেবা।

দন্ত—দন্তকাষ্ঠ, দন্তধাবন, দন্তপংক্তি, দন্তবিকাশ, দন্তমূল, দন্তমূলীয়, দন্তরুচি, দন্তরোগ, দন্তশূল, দন্তস্ফুট, দন্তহীন।

দেব—দেবকল্প, দেবকর্ম্ম, দেবকুল, দেবগৃহ, দেবদর্শন, দেবদারু, দেবদাসী, দেবদূত, দেবদ্বেষী, দেবদুর্ল্লভ, দেবদেব, দেবনিন্দা, দেববাক্য, দেবভাষা, দেবভোগ্য, দেবমন্দির, দেবমায়া, দেবযোনি, দেবলোক, দেবসেনা।

ধন—ধনকষ্ট, ধনকুবের, ধনক্ষয়, ধনগর্ব্ব, ধনজন, ধনতৃষ্ণা, ধনদৌলত, ধনধান্য, ধনপিশাচ, ধনপতি, ধনপ্রাণ, ধনবৃদ্ধি, ধনলাভ, ধনলিপ্সা, ধনস্থান, ধনহীন, ধনাধিকার, ধনাধ্যক্ষ।

নর—নরকপাল, নরকঙ্কাল, নরখাদক, নরগণ, নরনারায়ণ, নরপতি, নরপশু, নরপিশাচ, নরবর, নরমালা, নরমেধ, নরলোক, নরশার্দ্দূল, নরসিংহ, নরহরি।

পথ—পথকর, পথখরচ, পথচারী, পথনির্দ্দেশ, পথপ্রদর্শক, পথভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট, পথহারা, পথরোধ।

পদ—পদক্ষেপ, পদগৌরব, পদচারণ, পদচিহ্ন, পদচ্যুত, পদচ্ছায়া, পদত্যাগ, পদদলিত, পদধূলি, পদপল্লব, পদপ্রার্থী, পদব্রজে, পদমর্য্যাদা, পদরেণু, পদলেহন, পদসেবা, পদস্খলন, পদাঘাত, পদানত, পদাবলী।

পিতৃ—পিতৃকল্প, পিতৃকার্য্য, পিতৃকুল, পিতৃতর্পণ, পিতৃদায়, পিতৃপক্ষ, পিতৃপুরুষ, পিতৃবন্ধু, পিতৃবিয়োগ, পিতৃভক্তি, পিতৃরিষ্টি, পিতৃলোক, পিতৃশোক, পিতৃস্থানীয়, পিতৃহীন।

প্রাণ—প্রাণকান্ত, প্রাণকৃষ্ণ, প্রাণঘাতী, প্রাণতুল্য, প্রাণত্যাগ, প্রাণদণ্ড, প্রাণদান, প্রাণধর্ম্মী, প্রাণধারণ, প্রাণপণ, প্রাণপাত, প্রাণপ্রতিষ্ঠা, প্রাণবধ, প্রাণবান্, প্রাণবায়ু, প্রাণবিয়োগ, প্রাণবিসর্জ্জন, প্রাণমাত্রা, প্রাণসংহার, প্রাণ-সঙ্কট, প্রাণরক্ষা, প্রাণান্ত।

ফল—ফলকর, ফলকাম, ফলগ্রাহী, ফলপ্রাপ্তি, ফলভোগ, ফলশালী, ফলশ্রুতি, ফলহানি, ফলহীন, ফলাহার।

ফুল—ফুলকাটা, ফুলকোঁচা, ফুলখড়ি, ফুলছড়ি, ফুলঝুরি, ফুলদানি, ফুলদার, ফুলদিদি, ফুলদোল, ফুলধনু, ফুলবড়ি, ফুলবাবু, ফুলবাতাসা, ফুলশয্যা, ফুলসাজি।

বন—বনকর, বনচর, বনজঙ্গল, বনদেবতা, বনফল, বনফুল, বনবাস, বনবিড়াল, বনভোজন, বনমানুষ, বনমালা, বনস্পতি।

বিষ—বিষকন্যা, বিষকণ্ঠ, বিষকুম্ভ, বিষক্রিয়া, বিষঝাড়া, বিষদাঁত, বিষদুষ্ট, বিষধর, বিষদৃষ্টি, বিষনাশক, বিষফোড়া, বিষবড়ি, বিষবাণ, বিষবৃক্ষ, বিষহরি।

বুদ্ধি—বুদ্ধিজীবী, বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিবল, বুদ্ধিবৃত্তি, বুদ্ধিভ্রংশ, বুদ্ধিমত্তা, বুদ্ধিমান্, বুদ্ধিলোপ, বুদ্ধিশুদ্ধি, বুদ্ধিহীন।

মন্ত্র—মন্ত্রকুশল, মন্ত্রগুপ্তি, মন্ত্রগুরু, মন্ত্রতন্ত্র, মন্ত্রদাতা, মন্ত্রদান, মন্ত্রপাঠ, মন্ত্রপূত, মন্ত্রমুগ্ধ, মন্ত্রশক্তি, মন্ত্রসিদ্ধ।

মুখ—মুখকমল, মুখগহ্বর, মুখচোরা, মুখচন্দ্র, মুখচন্দ্রিকা, মুখঝামটা, মুখদোরস্ত, মুখচ্ছবি, মুখনাড়া; মুখপাত, মুখপাত্র, মুখফোড়, মুখবন্ধ, মুখব্যাদান, মুখভঙ্গী, মুখমিষ্টি, মুখযন্ত্র, মুখরক্ষা, মুখরোচক, মুখশুদ্ধি, মুখশ্রী, মুখসর্ব্বস্ব, মুখাগ্নি, মুখাপেক্ষী।

যোগ—যোগনিদ্রা, যোগফল, যোগমায়া, যোগসূত্র, যোগবল, যোগভঙ্গ, যোগাসন, যোগাযোগ।

রক্ত—রক্তকমল, রক্তগঙ্গা, রক্তচন্দন, রক্তজবা, রক্তদৃষ্টি, রক্তনদী, রক্তপাত, রক্তপান, রক্তপিপাসু, রক্তপিত্ত, রক্তবমন, রক্তবীজ, রক্তবৃষ্টি, রক্তশোধন, রক্তশোষণ, রক্তসম্বন্ধ, রক্তস্রোত।

রণ—রণকৌশল, রণক্ষেত্র, রণচণ্ডী, রণজয়, রণতূর্য্য, রণবাদ্য, রণভঙ্গ, রণরঙ্গ, রণশয্যা, রণসজ্জা, রণহস্তী।

রাম—রামকলা, রামকেলী, রামগিরি, রামছাগল, রামধনু, রামপাখী, রামবাণ, রামরাজ্য, রামলীলা, রামশিঙ্গা, রামশালিক, রামানন্দ, রামানুজ।

লীলা—লীলাক্ষেত্র, লীলাখেলা, লীলাচঞ্চল, লীলাবতী, লীলাময়ী, লীলা-সংবরণ, লীলাস্থলী, লীলাবসান।

লোক—লোকচরিত্র, লোকজন, লোকনিন্দা, লোকপরম্পরা, লোকপাল, লোকপ্রবাদ, লোকবিশ্রুত, লোকলজ্জা, লোকলস্কর, লোকলৌকিকতা, লোক-শিক্ষা, লোকসংখ্যা, লোকস্থিতি, লোকহিত, লোকাচার, লোকাতীত, লোকান্তর, লোকারণ্য, লোকালয়, লোকোত্তর।

রাজ—রাজকন্যা, রাজকর, রাজচ্ছত্র, রাজটীকা, রাজতন্ত্র, রাজদণ্ড, রাজদূত, রাজদ্রোহ, রাজনীতি, রাজপথ, রাজপুরুষ, রাজপ্রাসাদ, রাজবংশী, রাজযক্ষ্মা, রাজযোটক, রাজসর্প, রাজসভা, রাজহংস, রাজর্ষি।

শিক্ষা—শিক্ষাকর, শিক্ষাগুরু, শিক্ষাদান, শিক্ষাদীক্ষা, শিক্ষানবীশ, শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষালাভ, শিক্ষাসমস্যা, শিক্ষাসংস্কার, শিক্ষাসঙ্কট।

সত্য—সত্যনারায়ণ, সত্যপরায়ণ, সত্যপাঠ, সত্যপালন, সত্যব্রত, সত্যবাদী, সত্যভঙ্গ, সত্যযুগ, সত্যরক্ষা, সত্যসন্ধ, সত্যসেবী, সত্যাগ্রহ।

সর্ব্ব—সর্ব্বজনীন, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বনাম, সর্ব্বনাশ, সর্ব্বপ্রধান, সর্ব্ব-বাদী, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভুক্, সর্ব্বমঙ্গলা, সর্ব্বময়, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বসাধারণ, সর্ব্বাঙ্গ, সর্ব্বস্ব, সর্ব্বস্বান্ত।

হস্ত—হস্তকৌশল, হস্তক্ষেপ, হস্তগত, হস্তচালন, হস্তরেখা, হস্তচ্যুত, হস্তদোষ, হস্তলিপি, হস্তান্তর, হস্তাক্ষর, হস্তামলক।

হাত—হাতকড়ি, হাতখরচ, হাতছাড়া, হাতছানি, হাতটান, হাততালি, হাততোলা, হাতনাড়া, হাতফের, হাতবদল, হাতবাক্স, হাতভারী, হাতমাটি, হাতযশ, হাতসাফাই।

পরপদের ব্যবহার

আচার—বীরাচার, কুলাচার, পাপাচার, সদাচার, অসদাচার, দেশাচার, মিথ্যাচার, লোকাচার, স্ত্রী-আচার, ধর্ম্মাচার, অধর্ম্মাচার, অনাচার, কদাচার, স্বেচ্ছাচার, অত্যাচার, ম্লেচ্ছাচার।

আশ্রম—অনাথাশ্রম, আতুরাশ্রম, কুষ্ঠাশ্রম, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, গার্হস্থ্যাশ্রম, সন্ন্যাসাশ্রম।

উদ্ধার—আপদুদ্ধার, কণ্টকোদ্ধার, পঙ্কোদ্ধার, পতিতোদ্ধার, বর্ণোদ্ধার, পাঠোদ্ধার।

কষ্ট—অন্নকষ্ট, জলকষ্ট, অর্থকষ্ট, দুঃখকষ্ট, শ্বাসকষ্ট।

কাল—মৃত্যুকাল, সম্পৎকাল, বিপৎকাল, বর্ষাকাল, মহাকাল, কালাকাল, অকাল।

ক্ষয়—অর্থক্ষয়, আয়ুক্ষয়, ধনক্ষয়, পাপক্ষয়, পুণ্যক্ষয়, লোকক্ষয়, জনক্ষয়, রক্তক্ষয়।

গ্রহ—দুষ্টগ্রহ, দুর্গ্রহ, শুভগ্রহ, উপগ্রহ, পাপগ্রহ, গলগ্রহ, নিগ্রহ, বিগ্রহ, প্রতিগ্রহ।

তন্ত্র—রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, স্বতন্ত্র, পরতন্ত্র, পঞ্চতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, মন্ত্রতন্ত্র, কালীতন্ত্র, আমলাতন্ত্র।

তল—করতল, ভূতল, রসাতল, সমতল, পদতল, দ্বিতল, বৃক্ষতল, অন্তস্তল, নভস্তল।

দান—অন্নদান, কন্যাদান, চক্ষুর্দান, তুলাদান, বিদ্যাদান, ভূমিদান, মহাদান, গ্রহদান।

পত্র—লগ্নপত্র, কোষ্ঠীপত্র, জন্মপত্র, জয়পত্র, সংবাদপত্র, নিমন্ত্রণপত্র, পুঁথিপত্র, ভূর্জ্জপত্র, সন্ধিপত্র, উপাধিপত্র, পরিচয়পত্র।

ভয়—রাজভয়, মারীভয়, মৃত্যুভয়, লোকভয়, সর্পভয়।

উপসর্গ-সাহায্যে শব্দগঠন

কতকগুলি অব্যয় ধাতুর পূর্ব্বে বসিয়া নূতন নূতন শব্দ গঠন করে; ঐ অব্যয়গুলিকে উপসর্গ বলে। বিভিন্ন উপসর্গ যুক্ত হইলে শব্দের অর্থেরও বিভিন্নতা ঘটে।

বাঙ্গলা শব্দে ব্যবহৃত উপসর্গ ত্রিবিধ :—সংস্কৃত, বাঙ্গলা ও বিদেশী।

(১) প্র, পরা, অপ, সম্, অনু, অব, নির্, দুর্, অভি, বি, অধি, সু, উৎ, অতি, নি, প্রতি, পরি, অপি, উপ, আ—এই কুড়িটি সংস্কৃত উপসর্গ সংস্কৃত ধাতুর পূর্ব্বে বসিয়া ক্রিয়ার অর্থের নানারূপ পরিবর্ত্তন ঘটায়।

'হৃ' এই সংস্কৃত ধাতুর পূর্ব্বে উপসর্গ যুক্ত হওয়াতে অর্থের কিরূপ পরিবর্ত্তন হয় তাহা নিম্নলিখিত শব্দগুলি হইতে দেখা যাইবে :—

প্রহার	প্রতিহার
সংহার	পরিহার
বিহার	উপহার
উদ্ধার	আহার

(২) অ, আ, অনা, নি, ভর, সু, হা প্রভৃতি কতকগুলি বাঙ্গলা উপসর্গ বাঙলা ধাতু ও শব্দের আদিতে বসে। যথা—অনামা, আধোয়া, অনাছিষ্টি, নির্খোঁজ, ভরপেট, সুখবর, হাবাত প্রভৃতি।

(৩) গর্, ফি, বে প্রভৃতি কতকগুলি বিদেশী উপসর্গ বাঙ্গলা ধাতু ও শব্দের পূর্ব্বে ব্যবহৃত হয়। যথা,—গরমিল, ফিসন, বেমানান ইত্যাদি।

সংস্কৃত উপসর্গের ব্যবহার

প্র—(খ্যাতি, উৎকর্ষ, আধিক্য, সর্ব্বতোভাব, উৎপত্তি প্রভৃতি অর্থে) :

প্রকট, প্রকম্পিত, প্রকাশ, প্রকোপ, প্রক্রিয়া, প্রক্ষেপ, প্রগতি, প্রগাঢ়, প্রচণ্ড, প্রচলন, প্রচার, প্রচেষ্টা, প্রজনন, প্রশংসা, প্রণাম, প্রণয়ন, প্রতাপ, প্রদান, প্রসাদ, প্রদক্ষিণ, প্রফুল্ল, প্রবর্ত্তন, প্রবাস, প্রবাহ, প্রবাদ, প্রবেশ, প্রভাব, প্রমাণ, প্রযত্ন, প্রয়াণ, প্রয়োগ, প্রলেপ, প্ররোচন, প্রলাপ, প্রশস্তি, প্রসার, প্রহর, প্রহসন।

পরা—(আতিশয্য, প্রাধান্য, অতিক্রম, ব্যতিক্রম, অনাদর প্রভৃতি অর্থে) : পরাকাষ্ঠা, পরাক্রম, পরাঙ্মুখ, পরাজয়, পরাভব, পরামর্শ।

অপ—(মন্দ, ত্যাগ, নিন্দা, স্থানান্তর, প্রতিকূল প্রভৃতি অর্থে) :

অপকর্ম্ম, অপকার, অপকীর্ত্তি, অপকৃষ্ট, অপগম, অপঘাত, অপচয়, অপদেবতা, অপপ্রয়োগ, অপভ্রংশ, অপমান, অপমৃত্যু, অপবাদ, অপলাপ, অপসরণ, অপস্মার, অপহরণ, অপেক্ষা।

সম্—(সম্যক্, সহিত, সমীপ, সমান প্রভৃতি অর্থে) :

সংস্কৃত, সংগ্রাম, সংগত, সংখ্যা, সংক্ষেপ, সঞ্চয়, সঙ্কীর্ণ, সম্পূর্ণ, সম্প্রদান, সম্প্রদায়, সম্প্রতি, সম্বন্ধ, সংবরণ, সম্বোধন, সম্ভব, সম্ভাষণ, সম্ভ্রম, সম্মান, সম্মার্জ্জন, সম্মেলন, সম্মোহন।

অনু—(পশ্চাৎ, সাদৃশ্য, সহিত, বীপ্সা, সম্যক্, নিকৃষ্ট, যোগ্য, সমীপ প্রভৃতি অর্থে) :

অনুকরণ, অনুকম্পা, অনুকূল, অনুগত, অনুগ্রহ, অনুচর, অনুতাপ, অনুনয়, অনুপান, অনুপ্রাস, অনুবর্ত্তন, অনুবাদ, অনুমতি, অনুসন্ধান, অনুযোগ, অনুরাগ, অনুরোধ, অনুশাসন, অনুশীলন, অনুষ্ঠান, অনুসরণ, অনুসন্ধান।

অব—(নিশ্চয়, অপকৃষ্ট, নিম্ন, দূর, পশ্চাৎ, বিপরীত প্রভৃতি অর্থে) :

অবকাশ, অবগতি, অবগুণ্ঠন, অবতরণ, অবতার, অবদান, অবধারণ, অবধান, অবনত, অবরোধ, অবলম্বন, অবলেহ, অবলোকন, অবসন্ন, অবসারণ, অবস্থিতি, অবহেলা।

নির্—(নিশ্চয়, অভাব প্রভৃতি অর্থে) :

নির্গমন, নির্ণয়, নিরীক্ষণ, নির্দ্ধারণ, নিঃসারণ, নির্য্যাতন।

দুর্—(নিন্দা, দুঃখ, অভাব প্রভৃতি অর্থে) :

দুর্গতি, দুর্লভ, দুঃসহ, দুষ্কৃতি, দুঃশাসন, দুর্ভিক্ষ, দুরাশা।

অভি—(সম্মুখ, সমীপ, চতুর্দ্দিক, সর্ব্বদা, পুনঃপুনঃ, বিরুদ্ধ প্রভৃতি অর্থে) :

অভিচার, অভিজ্ঞান, অভিধান, অভিনন্দন, অভিনয়, অভিনব, অভিনিবেশ, অভিপ্রায়, অভিভাবক, অভিভাষণ, অভিমন্যু, অভিমান, অভিযান, অভিযোগ,

অভিরুচি, অভিলাষ, অভিশাপ, অভিষেক, অভিসন্ধি, অভিসম্পাত, অভীষ্ট, অভ্যঙ্গ।

বি—(বিশেষ, অভাব, বিপরীত, বিরুদ্ধ প্রভৃতি অর্থে) :

বিকট, বিকর্ষণ, বিকার, বিকাশ, বিক্রম, বিক্রয়, বিক্ষেপ, বিক্ষোভ, বিগত, বিগর্হিত, বিঘ্ন, বিচলিত, বিচার, বিচিত্র, বিচ্ছিন্ন, বিজয়, বিজিত, বিজ্ঞান, বিজ্ঞাপন, বিতর্ক, বিতরণ, বিতৃষ্ণা, বিদায়, বিধান, বিন্যাস, বিবর্ণ, বিফল।

অধি—(প্রাধান্য, আধিক্য, উপরি, অধিকার, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি অর্থে) :

অধিকার, অধিগত, অধিত্যকা, অধিবেশন, অধিবাস, অধিপতি, অধিরাজ, অধিপতি, অধ্যক্ষ, অধ্যবসায়, অধ্যায়, অধ্যাত্ম, অধ্যাপনা, অধিকরণিক।

সু—(শুভ, মঙ্গল, সুন্দর, অধিক, অনায়াস, সহজ প্রভৃতি অর্থে) :

সুকঠিন, সুকুমার, সুকৃতি, সুকেশী, সুকৌশল, সুযোগ, সুগন্ধ, সুগোল, সুজলা, সুদর্শন, সুদূর, সুদৃশ্য, সুনাম, সুনিশ্চয়, সুন্দর, সুপর্ণ, সুপ্রতিষ্ঠ, সুপ্রভাত, সুবচনী, সুপ্রসিদ্ধ, সুবিচার, সুরভি।

উৎ—(ঊর্দ্ধ, প্রশংসা প্রভৃতি অর্থে) :

উৎকর্ষ, উচ্চারণ, উত্তম, উত্থান, উদ্ধার, উদ্যম, উদ্দেশ, উৎক্ষিপ্ত, উৎপীড়ন, উৎপত্তি।

অতি—(অতিশয়, অধিক, অতিরিক্ত, অনুচিত প্রভৃতি অর্থে) :

অতিকায়, অতিক্রম, অত্যাচার, অত্যধিক, অতিপ্রাকৃত, অতিবাদ, অতিভক্তি, অতিভোজন, অতিমানুষ, অতিরিক্ত, অতিসার, অতীন্দ্রিয়, অত্যন্ত, অত্যাবশ্যক।

নি—(নিকট, অতিশয়, অভাব, নিশ্চয় প্রভৃতি অর্থে) :

নিকট, নিপুণ, নিকুঞ্জ, নিকেতন, নিক্ষেপ, নিখাত, নিখিল, নিগমন, নিগূঢ়, নিষ্ণাত, নিপাত, নিমগ্ন, নিম্ন, নিবৃত্তি, নিদাঘ, নিবেদন।

প্রতি—(বিস্তার, পুনঃপুনঃ, পরস্পর, সমীপ, পরিবর্ত্ত, বিপরীত প্রভৃতি অর্থে) :

প্রতিবাসী, প্রতিবেশী, প্রতিকার, প্রতিকূল, প্রতিক্রিয়া, প্রতিগ্রহণ,

প্রতিঘাত, প্রতিবিধান, প্রতিপালন, প্রতিরোধ, প্রতিশোধ, প্রতিশ্রুতি, প্রতিমাস, প্রতিষ্ঠা, প্রতীক্ষা, প্রত্যাগমন, প্রত্যাশা।

পরি—(চতুর্দ্দিক্, অতিশয়, ক্রমশঃ, সংজ্ঞা প্রভৃতি অর্থে) :

পরিবেষ্টন, পরিচ্ছদ, পরিচ্ছেদ, পরিক্রম, পরিণয়, পরিচর্য্যা, পরিভাষা, পরিতাপ, পরিত্যাগ, পরিপূর্ণ, পরিচারক, পরিশোধ, পরিকীর্ণ, পরিগণিত, পরিস্থিতি, পরিণাম, পরিতুষ্ট, পরিতৃপ্ত, পরিত্রাহি, পরিপন্থী, পরিপাটী, পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন।

অপি—(নিশ্চয়, সম্ভাবনা প্রভৃতি অর্থে) :

অপিধান, অপিনদ্ধ।

উপ—(নিকট, সহিত, তুল্য, সাদৃশ্য প্রভৃতি অর্থে) :

উপকূল, উপাসনা, উপমার্গ, উপদ্বীপ, উপনেত্র, উপবন, উপহার, উপযাচক, উপনয়ন, উপকরণ, উপকার, উপকথা, উপকণ্ঠ, উপক্রম, উপচার, উপচিকীর্ষা, উপজীবিকা, উপঢৌকন, উপদংশ, উপদেশ, উপনদী, উপনিষদ্, উপনিবেশ, উপন্যাস, উপভাষা, উপভোগ।

আ—(নিষেধ, সীমা, ঈষৎ প্রভৃতি অর্থে) :

আকর্ষণ, আরাধনা, আদেশ, আচরণ, আদান, আহার, আধার, আচ্ছাদন, আগমন, আজন্ম, আবেগ, আবেদন, আব্রহ্ম, আভরণ, আভোগ, আকর্ণ, আকুল, আকুঞ্চিত।

বাঙ্গলা উপসর্গের প্রয়োগ

অ, আ, অনা—(অভাব, মন্দ প্রভৃতি অর্থে)—অনামা, অজ্ঞানা, অবেলা, অবনিবনা, অখুসী, অহিসাবী, আলুনি, আধোয়া, আকাঁড়া, অনামুখ, অনাসৃষ্টি।

নি—(নি নাই অর্থে)—নিখুঁত, নিখোঁজ, নিলাজ।

ভর্—(পূর্ণ অর্থে)—ভরদিন, ভরপেট, ভরসাঁঝ, ভরগাঙ্গ।

সু—(ভাল অর্থে)—সুখবর, সুডোল, সুনজর, সুদিন, সুসময়।

হা—(নাই অর্থে)—হাভাত, হাঘর, হাপুত।

বিদেশী উপসর্গ

গর—(বিপরীত ও না অর্থে)—গরমিল, গরহজম, গরহাজির, গরকবুল।

ফি—(প্রত্যেক অর্থে)—ফিবছর, ফিদিন।

বে—(অভাব অর্থে)—বে-আক্কেল, বে-আইন, বে-গতিক, বে-জোড়, বে-তালা, বে-সুর, বে-হুঁসিয়ার, বে-নামী, বে-বন্দোবস্ত, বে-মালুম, বে-দখল, বে-কায়দা, বে-কার, বে-হেড্, বে-ঘোর, বে-রসিক, বে-চাল।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত ব্যাক্যাংশগুলির পরিবর্ত্তে এক একটী সমাস-নিষ্পন্ন পদ বসাও :—

শক্তিকে অতিক্রম না করিয়া ; নীল যে উৎপল ; মনকে মুগ্ধ করে যে (নারী) ; পঞ্চ বটের সমাহার ; চরণ কমলের ন্যায় ; কূলের সমীপে ; জরা দ্বারা জীর্ণ ; বাক্যে পটু ; ভিক্ষার অভাব ; মরণ পর্য্যন্ত ; বিঘ্নের অভাব ; নদী মাতা যাহার ; জলদান করে যাহা ; পুত্রের সহিত বর্ত্তমান ; আচার হইতে ভ্রষ্ট ; সমুদ্র পর্য্যন্ত ; আদি নাই যাহার ; সিংহ-চিহ্নিত আসন ; মহৎ প্রাণ যাহার ; মৃতা স্ত্রী যাহার ; চারি রাস্তার মিলন যেখানে ; মাস ব্যাপিয়া অশৌচ ; হস্তীর ন্যায় মূর্খ ; শত অব্দের সমাহার ; ঘর পুড়িয়াছে যাহার ; সরোবরে জন্মে যে।

২। নিম্নলিখিত পদগুলির ব্যবহার করিয়া বাক্য রচনা কর :—

প্রসন্নসলিলা ; জ্ঞানবৃদ্ধ ; দলভ্রষ্ট ; দোটানা ; প্রত্যক্ষ ; বর্ণচোরা ; ভুঁইফোড় ; অচেনা ; মহাজন ; টানাপাখা ; মহামানব ; হস্তগত ; অকালমৃত্যু ; বস্তাপচা ; জনাকীর্ণ ; বিলাতফেরত ; সর্পদষ্ট ; ধামাধরা ; বিয়েপাগলা ; পথহারা ; শোকানল ; গাধাবোট ; মনমাঝি ; গোবরগণেশ ; পুরুষসিংহ ; পদ্মদীঘি ; ধূলিধূসর ; তুষারধবল ; মুখচোরা ; লক্ষ্মীছাড়া ; আজানু ; গরমিল ; অগ্নিমূর্ত্তি ; বিষাদসিন্ধু ; অকুতোভয় ; গঙ্গাযাত্রা ; শ্রীহীন ; কলকণ্ঠ।

৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলিকে পূর্ব্বপদরূপে ব্যবহার করিয়া যতগুলি পার সমাসবদ্ধ পদ রচনা কর :—

অর্থ ; কন্যা ; নর ; দেব ; জাতি ; নিদ্রা ; বিশ্ব ; পর ; শিব ; জীব ; প্রাণ ; পুত্র ; যুদ্ধ।

৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলিকে পরপদরূপে ব্যবহার করিয়া সমাসবদ্ধ পদ গঠন কর :—

যাত্রা ; রক্ষা ; পাত্র ; ভাজন ; আহত ; আলয় ; বিয়োগ ; ভঙ্গ ; অন্তর ; পতি ; শালা।

৫। নিম্নলিখিত শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া এক একটি বাক্য রচনা কর :—

অঙ্গচ্ছেদ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, অঙ্গহীন, অঙ্গহানি, অঙ্গভঙ্গী, অঙ্গরাগ, অঙ্গলেপ, অঙ্গশুদ্ধি, অঙ্গসঞ্চালন, অঙ্গসৌষ্ঠব, অঙ্গস্পর্শ।

পঞ্চম পাঠ—শব্দপ্রয়োগ

প্রায়-সমোচ্চারিত ভিন্নার্থবোধক শব্দ

আমাদের ভাষায় কতকগুলি শব্দ আছে যাহাদের উচ্চারণ প্রায় একরূপ, কিন্তু বানান বিভিন্ন, অর্থও বিভিন্ন। এই জাতীয় শব্দগুলির বানান ও অর্থের পার্থক্য ভাল করিয়া শিক্ষা করিতে হয়, নতুবা রচনা নির্ভুল হয় না।

অনু—পশ্চাৎ।
অণু—ক্ষুদ্রতম অংশ।
অন্ন—ভাত।
অন্য—অপর।
অনিল—বায়ু।
অ-নীল—যাহা নীল নয়।
অন্নপুষ্ট—খাদ্য দ্বারা পুষ্ট।
অন্যপুষ্ট—কোকিল।
অন্ত—শেষ।
অন্ত্য—নিকৃষ্ট।
অশন—ভোজন।
অসন—নিক্ষেপ।
অপচয়—ক্ষতি।
অবচয়—চয়ন।
অসিত—কৃষ্ণ।
অশিত—ভক্ষিত।
অসক্ত—অনাসক্ত।
অশক্ত—অসমর্থ।

অবদান—সৎকর্ম্ম।
অবধান—মনোযোগ।
অবিহিত—অনুচিত।
অভিহিত—কথিত।
অর্ঘ—মূল্য।
অর্ঘ্য—পূজার উপকরণ-বিশেষ।*
অবিরাম—অনবরত।
অভিরাম—সুন্দর।
আপন—নিজের।
আপণ—দোকান।
আভাষ—ভূমিকা।
আভাস—ইঙ্গিত, দীপ্তি।
আহুতি—মোহ।
আহূতি—আহ্বান।
আসার—ধারাসম্পাত।
আষাঢ়—বর্ষা ঋতুর মাস।
আদি—মূল।
আধি—মনঃকষ্ট।

---

* এই অর্থে 'অর্ঘ' বানানও চলে

আবরণ—আচ্ছাদন।
আভরণ—ভূষণ।

ইতি—অবসান।
ঈতি—ষড়্‌বিধ শস্যবিঘ্ন।

উদ্যত—প্রবৃত্ত।
উদ্ধত—অবিনীত।

উপাদান—মূল কারণ।
উপাধান—বালিস।

ওষধি—একবার ফল হইলেই যে গাছ মরিয়া যায়।
ঔষধি—রোগনিবারক দ্রব্য।

কমল—পদ্ম।
কোমল—নরম।

কটি—কোমর।
কোটি—সংখ্যাবিশেষ।

কতক—কিছু।
কথক—বক্তা।

কুল—বংশ।
কূল—নদীর তীর।

কুট—দুর্গ, পর্ব্বত।
কূট—কপট, সমষ্টি, জটিল, মায়া।

কুজন—কুলোক।
কূজন—পক্ষীর রব।

কৃত—সম্পন্ন।
ক্রীত—কেনা।

কৃতি—যত্ন।
কৃতী—পণ্ডিত।

কৃত্য—কার্য্য।
কৃত্ত—ছিন্ন।

কৃত্তিবাস—মহাদেব, রামায়ণ-রচয়িতা বাঙ্গালী কবি।
কীর্ত্তিবাস—যশস্বী।

কোণ—বিদিক্—অগ্নি, বায়ু ইত্যাদি।
কোন—কিছু।

গিরিশ—মহাদেব।
গিরীশ—হিমালয়, মহাদেব।

গোলক—বর্ত্তুল।
গোলোক—শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত বাসস্থান।

চির—দীর্ঘকাল।
চীর—ছিন্নবস্ত্র।

চ্যুত—ভ্রষ্ট।
চূত—আম্র।

চতুষ্পথ—চৌমাথা।
চতুষ্পদ—পশু।

জড়—অলস।
জ্বর—রোগ।

জাল—পাশ, ফাঁদ।

জ্বাল—অগ্নিশিখা।

জালা—বড় মাটির পাত্র।

জ্বালা—অগ্নিশিখা, যন্ত্রণা।

তত্ত্ব—সত্য।

তথ্য—সংবাদ।

তরণী—নৌকা।

তরুণী—নবীনা।

দার—পত্নী।

দ্বার—দরজা।

দিন—দিবস।

দীন—দরিদ্র।

দ্বিপ—হস্তী।

দীপ—প্রদীপ।

দ্বীপ—জলবেষ্টিত ভূখণ্ড।

দেশ—রাজ্য।

দ্বেষ—হিংসা।

দূত—চর।

দ্যূত—পাশাখেলা।

দেবত্ব—দেবতার ভাব।

দেবত্র—দেবোদ্দেশে প্রদত্ত (সম্পত্তি)।

ধরা—পৃথিবী।

ধড়া—কটিবাস।

ধনী—ধনবান্।

ধ্বনি—শব্দ।

ধাতৃ—বিধাতা।

ধাত্রী—পৃথিবী, ধাই।

নিশীথ—মধ্যরাত্রি।

নিশিত—শাণিত।

নিবার—নিষেধ কর।

নীবার—ধান্যবিশেষ।

নিরশন—অনাহার।

নিরসন—দূরীকরণ।

নীর—জল।

নীড়—পাখীর বাসা।

নির্জর—দেবতা।

নির্ঝর—ঝরণা।

পদ্য—কবিতা।

পদ্ম—কমল।

পরুষ—কর্কশ।

পুরুষ—নর।

পরশ্ব (পরশ্বঃ)—আগামী দিনের পরদিন (অথবা, গতদিনের পূর্ব্বদিন)

পরস্ব—পরধন।

প্রসাদ—অনুগ্রহ।

প্রাসাদ—অট্টালিকা।

পৃষ্ট—জিজ্ঞাসিত।

পৃষ্ঠ—পশ্চাদ্ভাগ।

প্রকার—বিবিধরূপ।

প্রাকার—প্রাচীর।

প্রকৃত—যথার্থ।

প্রাকৃত—সাধারণ, স্বাভাবিক, ভাষাবিশেষ।

পক্ষ—পাখীর ডানা।

পক্ষ্ম—নেত্রলোম।

বান—বন্যা।

বাণ—শর।

বিত্ত—ধন।

বৃত্ত—গোলাকৃতি।

বিনা—ব্যতীত।

বীণা—বাদ্যযন্ত্র।

বেধ—গভীরতা।

বেদ—ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব—এই চারি শাস্ত্র।

বন্ধ—বন্ধন।

বন্ধ্য—নিষ্ফল।

বঙ্গ—দেশবিশেষ।

ব্যঙ্গ—বিদ্রূপ।

বসন—বস্ত্র।

ব্যসন—(বিলাসে) অত্যাসক্তি।

বলি—উপহার।

বলী—বলবান্।

বাণী—বাক্য।

বানি—পারিশ্রমিক (সেক্‌রার)।

বিস্মিত—বিস্ময়াবিষ্ট, চমৎকৃত।

বিস্মৃত—বিস্মরণযুক্ত।

মন—চিত্ত।

মণ—চল্লিশ সের।

মাস—ত্রিশ দিন।

মাষ—মাষকলাই।

মুখ—বদন।

মূক—বাক্যহীন, বোবা।

মেদ—চর্ব্বি।

মেধ—যজ্ঞবিশেষ।

যাম—প্রহর।

জাম—ফলবিশেষ।

যজ্ঞ—হোম।

যোগ্য—উপযুক্ত।

যতি—মুনি।

জ্যোতিঃ—দীপ্তি।

লক্ষ—সংখ্যাবিশেষ।

লক্ষ্য—উদ্দেশ্য।

লক্ষণ—চিহ্ন।

লক্ষ্মণ—রামানুজ।

শঙ্কর—মহাদেব।

সঙ্কর—মিশ্রণ।

শিকার—মৃগয়া।
স্বীকার—অঙ্গীকার।

শিকড়—গাছের মূল।
শীকর—জলকণা।

শ্রবণ—কর্ণ।
স্রবণ—ক্ষরণ।

শব—মৃতদেহ।
সব—সমস্ত।

শম—শান্তি।
সম—তুল্য।

শরণ—আশ্রয়।
স্মরণ—চিন্তা।

শ্মশ্রু—দাড়ি।
শ্বশ্রূ—শাশুড়ী।

শান্ত—ধীর।
সান্ত—সসীম।

শয্যা—বিছানা।
সজ্জা—বেশভূষা।

শূর—বীর।
সুর—দেবতা।

শূকর—বরাহ।
সুকর—সহজসাধ্য।

শুচি—পবিত্র।
সূচী—ছুঁচ, তালিকা

শারদা—দুর্গা।
সারদা—সরস্বতী।

শীত—শীতকাল।
সিত—সাদা।

সুত—পুত্র।
সূত—সারথি।

সর—দুগ্ধ প্রভৃতির উপরে যে স্তর ভাসে।

সরঃ—সরোবর।

স্মর—কামদেব।
স্বর—শব্দ।

সর্গ—অধ্যায়, সৃষ্টি।
স্বর্গ—সুরলোক।

সত্ত্ব—গুণবিশেষ।
স্বত্ব—অধিকার।

সহিত—সঙ্গে।
স্বহিত—নিজের কল্যাণ।

সাক্ষর—বিদ্বান্, অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন।
স্বাক্ষর—দস্তখত।

প্রায়-সমোচার্য্য শব্দ দ্বারা বাক্যগঠন

আভাষ—নাটকের পূর্ব্বাভাষটি মোটেই ভাল লাগে নাই।

আভাস—মহাযুদ্ধের পূর্ব্বাভাস ক্রমেই ঘনাইয়া উঠিতেছে।

কটি—হস্তে দীর্ঘ বর্শা, কটিতে কোষবদ্ধ কৃপাণ—এই বীর কে?

কোটি—ভারতবর্ষে প্রায় পঁয়ত্রিশ কোটি লোকের বাস।

চির—চিরদিন কাহারও সমান যায় না।

চীর—জটাচীরধারী রামচন্দ্রকে দেখিয়া ভরত অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না।

দিন—সব দিন সমান যায় না; সুদিন, দুর্দ্দিন সকলেরই আছে।

দীন—দীন জনে দয়া কর।

দূত—দূত অবধ্য।

দ্যূত—পাণ্ডবগণ কপট দ্যূতে পরাজিত হইলেন।

দেশ—মহামারীতে দেশ ছারখার হইয়া গেল।

দ্বেষ—জ্ঞাতিদ্বেষের পরিণাম কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ।

জালা—ঐ দিক্‌কার জালাটায় গঙ্গার জল তোলা আছে।

জ্বালা—যার জ্বালা সেই জানে।

পরশ্ব—পরশ্ব বাড়ী রওনা হইব।

পরস্ব—প্রাচীন কালে পরস্ব অপহরণ করিলে অনেক দেশে মৃত্যুদণ্ড হইত।

নীর—চির স্থির কবে নীর হায় রে! জীবনহ্রদে।

নীড়—পাখীরা ফিরিছে নীড়ে।

প্রকার—সংসারে কত প্রকার লোকই না আছে।

প্রাকার—প্রাকারে বেষ্টিত নগর শত্রু অবরোধ করিল।

প্রকৃত—প্রকৃত সাধুর লক্ষণই তো এই!

প্রাকৃত—প্রাকৃত ভাষা হইতে বাঙ্গলা ভাষার জন্ম।

লক্ষ—গত মহাযুদ্ধে প্রায় পঁচানব্বই লক্ষ সৈনিক নিহত হইয়াছিল।

লক্ষ্য—স্বাস্থ্যের প্রতি আমাদের লক্ষ্য নাই, সেইজন্যই ত এত দুর্দ্দশা!

লক্ষণ—ঐ রোগের লক্ষণই তো এই!

লক্ষ্মণ—সৌভ্রাত্রের কথা মনে উঠিলেই রাম-লক্ষ্মণের চিত্র মনে পড়ে।

বসন—বসন-ভূষণের ব্যয়বাহুল্য বর্ত্তমান যুগের একটি লক্ষণ।

ব্যসন—বৃথা ব্যসনে কালহরণ করিও না।

শরণ—ভগবানের শরণ গ্রহণ কর।

স্মরণ—তোমার কথা আমার স্মরণ হইতেছে না।

শয্যা—প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করা উচিত।

সজ্জা—অমরবাবুর গৃহসজ্জাগুলি মোটেই আধুনিক নয়।

সব—সব শিয়ালের এক রা।

শব—চিতার উপর শবটি যেন একটু নড়িয়া উঠিল।

সভা—সভার সময় বহুক্ষণ অতীত হইয়াছে, কিন্তু সভাপতির দেখা নাই

শোভা—প্রকৃতির সান্ধ্য শোভা বড়ই মনোরম।

সর্গ—মেঘনাদবধের নবম সর্গে প্রমীলার চিতারোহণ।

স্বর্গ—মর্ত্ত্যের মানুষই হৃদয়ের মহত্ত্বে স্বর্গের দেবতা।

১। নিম্নলিখিত শব্দযুগলের মধ্যে অর্থের যে পার্থক্য আছে, তাহা বাক্য রচনা করিয়া বুঝাইয়া দাও:—

উদ্যত, উদ্ধত; কতক, কথক; জালা, জ্বালা; নিরস্ত, নিরস্ত্র; কমল, কোমল; কুল, কূল; বিনা, বীণা: বলি, বলী; তত্ত্ব, তথ্য।

২। অর্থের পার্থক্য নির্দ্দেশ কর:—কৃত, ক্রীত; জড়, জ্বর; নীর, নীড়; লক্ষণ, লক্ষ্মণ; গোলক, গোলোক; নিশিত, নিশীথ; গিরিশ, গিরীশ; অন্নপুষ্ট, অস্থপুষ্ট; আভাব, আভাস; আদি, আধি; সম, শম; যজ্ঞ, যোগ্য; বান, বাণ; সর, স্বর, শর, স্মর; সুর, শূর; বর, বড়; তরণি, তরণী, তরুণী; জাম, যাম; বিস্মিত, বিস্মৃত; যতি, জ্যোতিঃ; শুচি, সূচি; শঙ্কর, সঙ্কর; বেদ, বেধ; প্রসাদ, প্রাসাদ; প্রকৃত, প্রাকৃত, প্রকার, প্রাকার; শুক্র, শুক্ক।

ষষ্ঠ পাঠ—ভিন্নার্থক শব্দ

একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গলায় এইরূপ শব্দের ব্যবহার চলিত আছে।

অঙ্ক— (১) গণিত—ছেলেটি অঙ্কে বড় কাঁচা।

(২) দৃশ্যকাব্যের অংশবিশেষ—নাটকটির তৃতীয় অঙ্ক বড়ই করুণ।

(৩) ক্রোড়—ভূমিষ্ঠ হইয়াই যে মাতৃ-অঙ্ক হইতে বিচ্যুত হইল, তাহার মত দুঃখী আর কে?

(৪) রেখা, চিহ্ন—গণকঠাকুর ভূমিতলে গম্ভীরমুখে বিচিত্র অঙ্কপাত করিতে লাগিলেন।

অর্থ— (১) টাকাকড়ি—অর্থ অনর্থের মূল।

(২) মানে—কবিতাটি পড়িয়াছি, কিন্তু অর্থ বুঝিতে পারি নাই।

(৩) উদ্দেশ্য—তোমার এ কথার অর্থ কি?

উত্তর— (১) জবাব—প্রশ্নের উত্তর দিতেছ না কেন?

(২) দিগ্‌বিশেষ—ভারতের উত্তরে হিমালয়।

(৩) পরবর্ত্তী—পরিত্যক্ত বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকার লইয়া বিবাদ বাধিল।

(৪) ভবিষ্যৎ, ভাবী—এই বালক উত্তর জীবনে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইবে।

(৫) অসাধারণ—কাহারও মতে রামচন্দ্রের লোকোত্তর চরিত্রে শম্বুকবধই একমাত্র কলঙ্ক।

(৬) বিরাটরাজার পুত্র—উত্তর অগণন কুরুসৈন্য দর্শনে ভীত হইল।

কথা— (১) গল্প—কথক ঠাকুর বেহুলার কথা আরম্ভ করিলেন।

(২) প্রতিশ্রুতি—সে যখন কথা দিয়াছে তখন আর ভয় নাই।

(৩) অনুরোধ—আমার কথা রাখ।

(৪) বাক্য—কথায় তাহার সঙ্গে কে পারিবে।
(৫) প্রসঙ্গ—আজকাল সর্ব্বত্রই কেবল যুদ্ধের কথা।
(৬) পরামর্শ—তোমার সঙ্গে জরুরী কথা আছে।
(৭) অসদ্ভাব—ভায়ে ভায়ে কথা বন্ধ।
(৮) ব্যাপার, কাণ্ড—ভরাপেটে চার সের সন্দেশ—একি সহজ কথা!

কর্ম্ম— (১) কার্য্য—কর্ম্মের নেশায় তিনি স্বাস্থ্যের প্রতি উদাসীন।
(২) কর্ত্তব্য—কর্ম্মই ধর্ম্ম, কর্ম্মেই মুক্তি।
(৩) অনুষ্ঠান—ক্রিয়াকর্ম্মে যজ্ঞযাগে বহু খ্যাতি ছিল আগে।
(৪) পেশা—এখন কুলকর্ম্ম করে খাও।
(৫) প্রাক্তন—কর্ম্মের ভোগ এড়াবে কে?
(৬) উপকার—তুমি কোন কর্ম্মের নও, কুঁড়ের বাদ্‌শা!

কর— (১) হস্ত—মহাবীরের করধৃত কৃপাণ সূর্য্যকিরণে ঝলসিত হইল।
(২) কিরণ—সূর্য্যকরে অনেক রোগবীজাণু নষ্ট হয়।
(৩) টেক্স, খাজ্‌না—সরকারের রাজস্ব কমিয়া যাওয়ায় আয়করের হার বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কাণ্ড— (১) সাধারণ বিবেচনা—তোমার মোটেই কাণ্ডজ্ঞান নাই!
(২) ব্যাপার—এ যে খুনোখুনি কাণ্ড বাঁধিয়েছ!
(৩) গাছের গুঁড়ি—বৃক্ষের কাণ্ড সাধারণতঃ মৃত্তিকার উপরে থাকে।
(৪) অধ্যায়—"সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা রামের পিসী।"

গুণ— (১) বিশিষ্ট ধর্ম্ম—জলের গুণ শৈত্য।
(২) উৎকর্ষ—তোমার কোনও গুণ নাই, একেবারে অপদার্থ!
(৩) রজ্জু—গুণ না টানিলে প্রবল স্রোত ঠেলিয়া নৌকা অগ্রসর হইতে পারিবে না।

(৪) একটি অঙ্কের দ্বারা অপর অঙ্কের গুণনফল—এই ঘটনার পর তাঁহার সুখ্যাতি চতুর্গুণ বর্দ্ধিত হইল।

(৫) সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—প্রকৃতি এই ত্রিগুণময়ী।

(৬) জ্যা—রামচন্দ্র ধনুতে গুণ দিলেন।

ঘন— (১) নিবিড়—তারপর প্রাণভয়ে তাহারা ঘন বনে আশ্রয় লইল।

(২) জমাট, গাঢ়—খুব ঘন দুধ না হলে তার মুখে রোচে না।

(৩) মেঘ—ঘনঘটায় আকাশ ছেয়ে এল।

(৪) বারবার—ঘনঘন তোমার জ্বর হচ্ছে কেন?

(৫) দীর্ঘ, প্রস্থ ও উচ্চতার পরিমাণ (volume)—এই বেদীটির ঘনফল নির্ণয় করিতে পার কি

চাল— (১) চাউল—ঢেঁকিছাঁটা চাল স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল।

(২) ছাদ—বাটীর খাজনা না পেয়ে জমিদারের কর্ম্মচারী লোকজন নিয়ে প্রজার ঘরের চাল কেটে তুলে দিল।

(৩) প্রতিমার পিছনের চিত্র—এবারের চালচিত্রটা ভাল হয়েছে।

(৪) আশ্রয়—যার চাল নেই চুলো নেই সে খাতির পায় না।

(৫) ব্যবহার—ওসব বনেদি চাল এখন ছাড়।

(৬) ফন্দী—আচ্ছা চাল চেলেছো, এক চালেই কিস্তি মাৎ।

ছল— (১) ছলনা—'ছল করে শাখে আঁচল বাধায়ে ফিরে চায় পিছু পানে।'

(২) উদ্দেশ্য—কি ছলে যে সন্ন্যাসী সেজেছে বোঝা কঠিন।

(৩) প্রসঙ্গে—ঠাট্টাচ্ছলে ওরকম কথা বলা চলে।

(৪) দোষ—কথার এত ছল ধর কেন?

(৫) কপট—'অতি ছল, অতি খল, অতীব কুটিল।'

ছোট— (১) কনিষ্ঠ—এ আমার ছোট ভাই।

(২) নীচ—বড় লোকের এত ছোট নজর, ছি!

(৩) ক্ষুদ্র—ছোট একটি গ্রাম, মাত্র কুড়ি বাইশ ঘর লোকের বাস।

(৪) নম্র—'বড় যদি হতে চাও ছোট হও আগে।'

জাল— (১) ফাঁদ—মাকড়সারা জাল পাতিয়া খাদ্য সংগ্রহ করে।
(২) পাশ, ছল—মায়াবীর ইন্দ্রজালে কে না অভিভূত হয় ?
(৩) নকল, কৃত্রিম, মেকি—এ জাল নোটখানা তোমাকে কে দিল ?.

জোর— (১) শক্তি—জোর যার মুলুক তার।
(২) তীব্র—জোর গলায় তিনি বক্তৃতা করলেন।
(৩) জবরদস্তি—অবাধ্য পুত্র জোর করিয়াই বাড়ীর বাহির হইল, কাহারও নিষেধ শুনিল না।

তত্ত্ব— (১) মতবাদ—বর্ত্তমানে ডাঃ জিন্সের বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব বহুবাদিসম্মত।
(২) ব্রহ্ম—তত্ত্বজ্ঞান সহজে লাভ করা যায় না, তৎপূর্ব্বে চিত্তশুদ্ধি দরকার।
(৩) সংবাদ—মাঝে মাঝে আত্মীয়দের তত্ত্বতাবাস লওয়া উচিত।
(৪) উপঢৌকন—মেজবৌয়ের বাপের বাড়ী হইতে দামী দামী পূজার তত্ত্ব আসিয়াছে।

তন্ত্র— (১) শাস্ত্রবিশেষ—কাপালিকের উপাসনা তন্ত্রমতের উপর প্রতিষ্ঠিত।
(২) গ্রন্থ—কালীতন্ত্র পড়িয়াছ কি ?
(৩) শাসনপদ্ধতি—ইংলণ্ডের শাসনপ্রণালীতে নিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্র প্রচলিত।
(৪) অধীন—কদাচ ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র হইও না।

তাপ— (১) উত্তাপ—সূর্য্যই পৃথিবীর সমুদয় তাপের উৎস।
(২) কষ্ট—সংসারে বাস করিতে হইলে দুঃখতাপ সহ্য করিতে হয়।

তাল— (১) ফলবিশেষ—ভাদ্রমাসে তাল খাইতে হয়।
(২) সঙ্গীতে সময়-পরিমাণ—পঞ্চানন গান গায়, কিন্তু তাহার তালজ্ঞান নাই।
(৩) পিশাচ—সভাপতি বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেলেন, সভায় তাল-বেতালের নৃত্য আরম্ভ হইল।
(৪) প্রতিদ্বন্দ্বীকে আহ্বানার্থ বাহুতে করতলাঘাত—দুই কুস্তীগির রঙ্গমঞ্চে নামিয়া তাল ঠুকিতে লাগিল।
(৫) আঘাত—দোষ যেই করুক, তাল পড়ে কেবল আমার মাথায় !

দণ্ড— (১) যষ্টি—আততায়ীর লৌহদণ্ডের আঘাতে পথিকের মস্তক চূর্ণ হইল।

(২) শাস্তি—লঘু পাপে গুরুদণ্ড হইয়াছে!

(৩) সময়ের বিভাগ—একদণ্ড বিশ্রাম নাই, অষ্টপ্রহর কেবল কাজ, কাজ!

দল— (১) পত্র, পাঁপড়ি—'ফুল দল দিয়া কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?'

(২) সমূহ—'যাত্রীদল ফিরে এল, সঙ্গে এল মেলা।'

(৩) সম্প্রদায়—'অরুণ প্রাতের তরুণ দল, চল্‌রে চল্‌রে চল্‌।'

ধর্ম্ম— (১) পুণ্যকার্য্য—অহিংসা পরম ধর্ম্ম।

(২) আচরণ, বৈশিষ্ট্য—যুগধর্ম্ম না মানিলে জাতি বাঁচিতে পারে না।

(৩) যম—বেটা যেন ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির!

ধারা— (১) বর্ষণ—শ্রাবণের বারিধারা প্রায় পড়ে অস্র বাদলের গায়।

(২) প্রবাহ—বঙ্গদেশে গঙ্গা ভাগীরথী ও পদ্মা এই দুইটি ধারায় বিভক্ত হইয়াছে।

(৩) রীতি—এ বংশের এই ধারা।

(৪) আচরণ—"বুঝিতে পারি না মা এ তোমার কেমন ধারা।"

(৫) স্বভাব—তুমি কেমন ধারার লোক হে?

(৬) আইনের বিভাগ—শহরে ১৪৪ ধারা জারি হইয়াছে, সাবধান।

নাম— (১) আখ্যা—হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শিখরের নাম 'এভারেষ্ট'।

(২) জপ—বৃদ্ধা হরিনামের ঝুলি লইয়া নামে বসিলেন।

(৩) খ্যাতি—রায় বাহাদুর নাম আর উপাধির জন্য পাগল।

(৪) সামান্য—জাহাঙ্গীর নামমাত্র সম্রাট্ ছিলেন, সর্ব্বময় কর্তৃত্ব ছিল সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের হাতে।

পদ— (১) পা—ঊর্দ্ধে অনন্ত আকাশ, পদতলে নিশ্চল পৃথিবী!

(২) শব্দ—অযথা সমাসবদ্ধ পদ ব্যবহার করিলে রচনার লালিত্য নষ্ট হয়।

(৩) কার্য্য—তিনি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ পাইয়াছেন।

পত্র— (১) চিঠি—পত্রের উত্তর দাও নাই কেন ?

(২) পাতা—পত্র-পুষ্প না থাকিলে বৃক্ষের শোভা হয় না।

(৩) দ্রব্যাদি—জিনিষপত্র বাঁধ, একঘণ্টা পরেই গাড়ী।

পক্ষ— (১) দল—বরপক্ষে কন্যাপক্ষে প্রায় হাতাহাতি বাধিয়াছিল।

(২) বিবাহিতা পত্নীদের মধ্যে একটি—সুরেশবাবুর শান্তি নাই, ঘরে তৃতীয় পক্ষ, বাহিরে দেনা।

(৩) ব্যাধি—ঠাকুরদাদা ছয় মাস হইল পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী।

(৪) চান্দ্রমাসার্দ্ধ—শুক্লপক্ষের অষ্টমীর রাত্রি, গঙ্গার বুকে আধখানা চাঁদের শোভা !

(৫) পাখা—রাবণের খড়্গাঘাতে জটায়ুর পক্ষ ছিন্ন হইল।

পূর্ব্ব— (১) দিক্‌বিশেষ—বাঙ্গলার পূর্ব্বে আসাম ও ব্রহ্মদেশ।

(২) প্রাচীন, গত—আমাদের পূর্ব্বপুরুষ প্রাচীন আর্য্যজাতি মধ্য এশিয়া হইতে ভারতে আসিয়াছিলেন।

(৩) প্রাচীন কাল—পূর্ব্বে বঙ্গদেশে টাকায় আট মণ চাউল পাওয়া যাইত।

(৪) প্রাচ্যদেশ—পূর্ব্ব ও পশ্চিমে কখনও মিল হইবে না।

ফল— (১) উদ্ভিদ্‌জাত শস্য—টাট্‌কা ফল খাও, শরীর ভাল থাক্‌বে।

(২) পরিণাম—পরীক্ষার ফল শেষ পর্য্যন্ত কি হবে কে জানে ?

(৩) শেষ—ফল কথা, এবার ছুটিতে আগ্রায় যেতেই হবে।

বর্ণ— (১) অক্ষর—কি বিশ্রী লেখা ! একবর্ণও পড়া যায় না।

(২) রং—উদ্যানে নানা বর্ণের পুষ্প, তাহাতে বিচিত্র বর্ণের প্রজাপতি আসিয়া জুটিয়াছে।

(৩) জাতি—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—হিন্দুসমাজের চারিটি প্রধান বর্ণ।

বাস— (১) অবস্থান—ভারতবর্ষে প্রায় পঁয়ত্রিশ কোটি লোকের বাস।

(২) বস্ত্র—ব্রাহ্মণের পরিধানে পট্টবাস, অঙ্গে নামাবলী, হস্তে পূজোপকরণ।

(৩) গন্ধ—কাছেই বাগান, তাইতো ফুলের বাস পাচ্ছ।

বাম— (১) বাঁ—বাম দিক্ হইতে আক্রান্ত হইয়া বিরাট বাহিনী মুহূর্ত্তের মধ্যে বিধ্বস্ত হইয়া গেল।

(২) প্রতিকূল—বিধি আমার প্রতি বাম, কি করিব বল ?

বর— (১) দেবতার প্রসাদ—ব্রহ্মার বরেই রাবণের এত দম্ভ।

(২) বিবাহকারী—বর বাসরে নাই, কোথায় গেল ?

(৩) শ্রেষ্ঠ—বন্ধুবর যে এখনও এলেন না!

বিধি— (১) ঈশ্বর—বিধি বাম, তোমার কি দোষ!

(২) বিধান—ভারতীয় দণ্ডবিধির ৭ ধারা ভাল করিয়া দেখা আছে।

(৩) শাস্ত্র—যতদূর সম্ভব বিধিমতেই সমস্ত করা হইয়াছে।

(৪) ভাগ্য—বিধিবিড়ম্বনা ভোগ আমি করব না তো করবে কে ?

ভাব— (১) সম্প্রীতি—তাহার সঙ্গে কাহারও ভাব হয় না, যে রাগী মানুষ!

(২) অভিপ্রায়—তোমার ভাবগতিক কিছুই বুঝিতে পারি না।

(৩) মর্ম্মার্থ—কবিতাটির ভাবার্থ বুঝাইয়া বল।

(৪) উন্মাদনা—কীর্ত্তন শুন্‌তে শুন্‌তে তোমার ভাব লাগ্‌ল নাকি ?

ভার— (১) বোঝা—পৃথিবী আর পাপের ভার সইতে পারে না।

(২) গুরুত্ব—অনেক সময় ধারে কাটে না, ভারে কাটে।

(৩) বিষাদ—মুখ ভার করে বসে কেন ?

(৪) সমূহ—ঢালে কুসুমভার।

(৫) কঠিন—যা দিনকাল পড়েছে শহরে থাকা এখন ভার হোল দেখ্‌ছি।

(৬) দায়িত্ব—কাজের ভার নিয়েছ, এখন পেছিয়ে গেলে চলবে কেন?

ভূত— (১) প্রাণী, প্রেত—ভূতনাথের আবার ভূতের ভয় কি?

(২) অতীত—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান—সব যে তোমার নখদর্পণে!

(৩) জীব—সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি, এই তো সাধুর লক্ষণ!

ভোর— (১) প্রত্যূষ—"ভোর হোল, দোর খোল, খুকুমণি উঠবে।"

(২) পূর্ণ—মাসভোর কোথায় ছিলে? টিকিটি দেখ্‌তে পাইনি যে!

(৩) তন্ময়—"চণ্ডীদাসে কয়, ব্যাধি সমাধি নয়, দেখিয়া হইনু ভোর।"

(৪) আচ্ছন্ন—নিশ্বাস গরলে তনু ভোর।

(৫) উন্মুক্ত—ক্ষণে আঁচর ঢাকে, ক্ষণে হয় ভোর।

মাথা— (১) অঙ্গবিশেষ—মাথার ঘাম পায়ে ফেলে টাকা রোজগার করেছি, সে কি তোমার বাবুগিরির জন্য।

(২) অর্থসঙ্গতি—কথার মাথা নাই, কি বাজে বক?

(৩) বুদ্ধি—ছেলেটির অঙ্কে খুব মাথা।

(৪) শীর্ষস্থানীয়—শুধু টাকার জোরে গাঁয়ের মাথা হওয়া যায় না।

মুখ— (১) প্রত্যঙ্গবিশেষ—ছোট ছেলে যা পায় তাই মুখে দেয়।

(২) ভাষা—মুখে মধু অন্তরে গরল!

(৩) দিক্—কাশীর নিকট গঙ্গা উত্তরমুখে প্রবাহিত।

(৪) মুখমণ্ডল—মুখরুচি কত শুচি ধরিয়াছে শোভা।

(৫) মর্য্যাদা—আগেই তো বলেছিলাম, এখন মুখ রইল কোথায়?

(৬) ক্ষমতা—যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা।

(৭) তিরস্কার—শাশুড়ীর মুখের ভয়ে নূতন বউ সর্ব্বদাই জড়সড়।

যোগ— (১) মিলন—জিব্রাল্টার প্রণালী ভূমধ্যসাগরের সহিত আট্‌লান্টিকের যোগসাধন করিতেছে।

(২) অঙ্ক—এই কয়টি রাশির যোগফল কত?

(৩) চিত্তবৃত্তির নিরোধ—গুরু ব্যতীত যোগাভ্যাস হয় না।

(৪) পর্ব্ব, উৎসব—এবার চূড়ামণি যোগে কলকাতায় তেমন লোকের ভীড় হয় নি।

(৫) সাহায্য—তিনি নৌকাযোগে গঙ্গা পার হইয়া রেলযোগে বর্দ্ধমানে পৌঁছিলেন।

রস— (১) সার—কমলালেবুর রস, খেতেও ভাল, উপকারীও বটে।

(২) শরীরের ধাতুবিশেষ—রস পরিপাক হয় নি, আজও ভাত খেও না।

(৩) কাব্যের সারভূত প্রীতিকর বস্তু—কিছুমাত্র রসজ্ঞান নাই, তুমি হবে সমালোচক ?

রাগ— (১) ক্রোধ—পাগলের কথায় রাগ করে কি ?

(২) বর্ণ—'সন্ধ্যারক্তরাগসম তন্দ্রাতলে হয় হোক লীন।'

(৩) অনুরাগ—'রাগে ডগমগ প্রভু দেয় সন্তরণ।'

(৪) স্বর—হিন্দু সঙ্গীতবিজ্ঞান মতে ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী।

রূপ— (১) সৌন্দর্য্য—'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে, গুণে মন ভোর।'

(২) মূর্ত্তি—"রূপহীন মরণেরে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে" ; "বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।"

(৩) রীতি, প্রকার—এ তোমার কিরূপ আচরণ।

(৪) শিল্প—রূপদক্ষ অবনীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতীয় চিত্রবিদ্যার পুনরুজ্জীবন করিয়াছেন।

(৫) সজ্জা—অন্নদা কুলবধূর রূপ ধরিয়া গাঙ্গিনীর তীরে উপনীত হইলেন।

লোক—(১) জন—নানা লোকের নানা মত।

(২) স্থান—স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল—এই ত্রিলোক।

(৩) ভৃত্য—সে নিজে কিছুই করে না, লোক দিয়ে করায়।

(৪) জন্ম—ইহলোকে যা পাওনি, পরলোকে তা কি পাবে ?

সন্ধি— (১) যুদ্ধবিরতি—সন্ধির সর্ত্ত ভঙ্গ করিলেই আবার যুদ্ধ।
(২) শরীরের অস্থি প্রভৃতির মিলন—সন্ধিস্থানে আঘাত, বড়ই চিন্তার কথা!
(৩) বর্ণমিলন—স্বরসন্ধির নয়মগুলি ভাল করিয়া পড়িও।

সুর— (১) দেবতা—সুরাসুরের যুদ্ধ হয়েছিল সত্যযুগে।
(২) সঙ্গীতের ধ্বনি—মাঠের ওপার থেকে মেঠো গানের মিষ্টি সুর ভেসে আসে।
(৩) কণ্ঠস্বর—তাঁহার নাকি সুরের বক্তৃতা শুনে গা জ্বালা করে।
(৪) উদ্দেশ্য—এসেম্বিতে যাওয়ার পর থেকেই তিনি সুর বদ্‌লে ফেলেছেন

সূত্র— (১) স্বল্পাক্ষর বাক্য—গৌতমসূত্র বুঝিতে পারিলে কি?
(২) সূতা—রেশমসূত্রনির্ম্মিত বস্ত্রাদি দানাদিতে প্রশস্ত।
(৩) ধারা—নাটকের তৃতীয় অঙ্কের ঘটনাটির সূত্র অনুসরণ করিয়া চলিলে নাটকের পরিসমাপ্তির রহস্য নির্ণয় করিতে পারিবে।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলি একাধিক অর্থে ব্যবহার করিয়া বাক্য রচনা কর :—গুণ, রস, পক্ষ, পত্র।

২। নিম্নোদ্ধৃত পদ্যাংশের অন্তর্গত 'অঙ্ক' শব্দের কোথায় কি অর্থ হইয়াছে লিখ :—

"এই নাটকের এই অঙ্কে
পেয়েছি স্থান তব অঙ্কে
চলে যাব পর অঙ্কে
পর অঙ্কে পুত্র সাজে!"

সপ্তম পাঠ—প্রতিশব্দ

একার্থবোধক ভিন্ন ভিন্ন শব্দের প্রত্যেকটিকেই **প্রতিশব্দ** বলে। রচনাকে সরস ও শ্রুতিমধুর করিতে হইলে প্রতিশব্দের জ্ঞান ও ব্যবহার আবশ্যক। কোন শব্দের বা কোন বাক্যের অর্থ বুঝাইতে হইলে প্রতিশব্দ আবশ্যক হয়। একটি শব্দের অনেক প্রতিশব্দ আছে, কিন্তু সচরাচর বাঙ্গলায় যে সমস্ত প্রতি-শব্দ ব্যবহৃত হয়, নিম্নে তাহারই কতকগুলি লিখিত হইল।

অগ্নি—আগুন, অনল, পাবক, বহ্নি, হুতাশন, সর্ব্বশুচি, সর্ব্বভুক্, বিভাবসু, বৈশ্বানর, শিখী।

অতিথি—আগন্তুক, অভ্যাগত, গৃহাগত।

অন্ধকার—আঁধার, তিমির, তমঃ, তমিস্রা।

অশ্ব—ঘোটক, তুরঙ্গম, তুরঙ্গ, তুরগ, বাজী, হয়।

আকাশ—গগন, অম্বর, অন্তরীক্ষ, নভোমণ্ডল, নভস্তল, ব্যোম, শূন্য।

ইচ্ছা—সাধ, অভিলাষ, অভিরুচি, রুচি, আকাঙ্ক্ষা, বাঞ্ছা, মনোরথ, লালসা, বাসনা, স্পৃহা, কামনা, ঈপ্সা, অভিপ্রায়।

ঈশ্বর—ঈশ, পরমেশ, পরমেশ্বর, জগদীশ, জগদীশ্বর, ধাতা, ভগবান্, বিধাতা, বিভু, বিধি, জগৎপতি, জগৎপাতা, জগৎপিতা।

কর্ণ—কান, শ্রোত্র, শ্রবণ, শ্রুতি।

কেশ—চুল, কুন্তল, চিকুর, অলক (চূর্ণকুন্তল), শিরোরুহ।

গঙ্গা—ভাগীরথী, জাহ্নবী, সুরধুনী, শৈলসুতা।

গৃহ—ঘর, আলয়, নিলয়, নিকেতন, আবাস, আগার, ভবন, সদন।

চন্দ্র—চাঁদ, সুধাংশু, শশধর, সুধাকর, শশাঙ্ক, চন্দ্রমা, ইন্দু, সোম, নিশাকর, নিশানাথ, হিমকর, হিমাংশু, সিতাংশু, তারাপতি, মৃগাঙ্ক, দ্বিজরাজ।

জল—সলিল, অম্বু, নীর, বারি, উদক, জীবন, অম্ভঃ, তোয়, পানীয়।

তট—তীর, কূল, পুলিন (বালুকাময়)।

ধন—টাকাকড়ি, অর্থ, বিভব, সম্পদ্, বিত্ত, সম্পত্তি, নিধি।

নদী—তটিনী, তরঙ্গিণী, সরিৎ, স্রোতস্বতী, স্রোতস্বিনী, প্রবাহিণী।

পক্ষী—পাখী, বিহঙ্গম, বিহগ, খেচর।

পদ্ম—কমল, উৎপল, শতদল, অরবিন্দ (শ্বেতপদ্ম), পঙ্কজ, কুবলয়, সরোজ, সরোরুহ, অব্জ, সরসিজ।

পর্ব্বত—পাহাড়, ভূধর, গিরি, শৈল, অচল, অদ্রি, নগ, ধরাধর।

পৃথিবী—ধরিত্রী, ধরণী, ধরা, মহী, মেদিনী, বসুমতী, বসুন্ধরা, অবনী, ক্ষিতি, ভূমি।

মেঘ—বারিদ, জলদ, জলধর, অভ্র, জীমূত, ঘন, অম্বুদ, পর্জ্জন্য।

মৃত্যু—বিনাশ, নাশ, নিধন, মরণ, পতন, পঞ্চত্বপ্রাপ্তি, মানবলীলা-সংবরণ, স্বর্গলাভ, মহাযাত্রা, মহানিদ্রা, মহাপ্রয়াণ, লয়, লোকান্তরপ্রাপ্তি।

রাজা—ভূপ, ভূপাল, ভূপতি, নরেন্দ্র, নরেশ, নরপতি, নৃপ, নৃপতি, মহীপতি, মহীপাল, ক্ষিতিপ, ক্ষিতিপতি, ক্ষিতিপাল, প্রজাপাল, প্রজাধিপ।

রাত্রি—রাত, রজনী, যামিনী, নিশা, শর্ব্বরী, বিভাবরী।

বাতাস—বাতাস, বাত, বায়ু, অনিল, পবন, সমীরণ, প্রভঞ্জন, গন্ধবহ।

সমুদ্র—সাগর, পাথার, পারাবার, বারিধি, অব্ধি, অম্বুধি, পয়োধি, অম্ভোধি, অর্ণব, সিন্ধু, জলধি, জলনিধি, রত্নাকর।

সূর্য্য—ভাস্কর, রবি, প্রভাকর, দিবাকর, তপন, সবিতা, ভানু, অর্ক, মিহির, আদিত্য, অরুণ, মার্ত্তণ্ড, দিনমণি, সপ্তাশ্ববাহন, অংশুমালী।

হস্তী—হাতী, গজ, মাতঙ্গ, করী, কুঞ্জর, দ্বিরদ, দ্বিপ, বারণ।

একার্থবোধক শব্দগুলি বিশেষরূপে জানা থাকিলে লিখিবার সময় ভাবপ্রকাশে ভাষার দৈন্য পরিহার করা যায়। একই শব্দ বার বার প্রয়োগ করিলে রচনা শ্রুতিমধুর হয় না। সেইজন্য একার্থবোধক শব্দগুলি ভাল করিয়া জানা প্রয়োজন। কিন্তু রচনায় শব্দ প্রয়োগ করিবার সময় সাবধান হওয়া উচিত। প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে রচনায় গুরুগম্ভীর শব্দ প্রয়োগ করিয়া

রচনাকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবার চেষ্টা খুবই স্বাভাবিক। সেইজন্যই অপ্রচলিত, দুরূহ শব্দ ব্যবহারের দিকে প্রথম শিক্ষার্থিগণের ঝোঁক খুব বেশী থাকে। "সূর্য্য উঠিয়াছে' না লিখিয়া যদি 'ভাস্কর উদিত হইলেন' বা 'প্রভাকর উদয়াচলে আরোহণ করিলেন' লিখা যায়, তাহাতে রচনা সমৃদ্ধ হয় না বরং লেখকের ভাষাজ্ঞানের ন্যূনতাই ধরা পড়ে।

সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে, সমানার্থ-বোধক শব্দগুলির আভিধানিক অর্থ একপ্রকার হইলেও ভাষায় একটি শব্দ যে বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে, যে দ্যোতনা বা ব্যঞ্জনা ফুটাইয়া তুলে, অন্য আর একটি শব্দের সাহায্যে সেই অর্থ বা ব্যঞ্জনা প্রকাশিত হইতে পারে না।

প্রত্যেকটি শব্দের একটি 'ওজন' বা উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্য আছে, আবার প্রত্যেকটি শব্দের একটি বিশিষ্ট ভাবমূর্ত্তি বা রসমূর্ত্তি আছে। যাঁহারা সুলেখক তাঁহাদের নিকট শব্দের এই রহস্য ধরা পড়ে। যেখানে যে শব্দটি খাটে তাঁহারা সেখানে সেই শব্দটি প্রয়োগ করেন। প্রত্যেকটি শব্দেরই সার্থকতা থাকে। অযথা কোন শব্দ তাঁহারা ব্যবহার করেন না। রবীন্দ্রনাথের রচনা হইতে কয়েক ছত্র পদ্য বা গদ্য লইয়া পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে তাঁহার রচনায় কোনখানে একটি শব্দ তুলিয়া তাহার পরিবর্ত্তে আর একটি শব্দ বসান কত কঠিন।

নদী, স্রোতস্বতী, তটিনী, প্রবাহিণী, তরঙ্গিণী—এই পাঁচটি শব্দই সমানার্থ-বোধক। কিন্তু নিম্নলিখিত বাক্যগুলি দেখিলে ভাবার্থপ্রকাশে ইহাদের সূক্ষ্ম পার্থক্য বুঝিতে পারা যাইবে।

নদীর কলধ্বনি শুনিতে শুনিতে কত দণ্ড প্রহর কাটিয়া যাইত; কি রহস্য-মন্ত্র অনাদিকাল হইতে অস্ফুটকণ্ঠে উচ্চারিত হইতেছে, তাহা জানিবার জন্য কবির আকুলি-বিকুলির অন্ত ছিল না।

অগণিত **স্রোতস্বতীর** স্রোতোধারায় বঙ্গভূমি সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা।

বর্ষার জলোচ্ছ্বাসে **তটিনীর** তটরেখা পর্য্যন্ত নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

জাহ্নবী-যমুনারূপিণী দুইটি **প্রবাহিণী** ভারতের গ্রাম নগরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া যেমন সমগ্র দেশকে সরস ও সমৃদ্ধ করিয়াছে, রামায়ণ-মহাভারতের দুইটি ভাবপ্রবাহও তেমনি দেশের সমস্ত নরনারীর চিত্ত বিচিত্র সম্পদে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছে।

লীলাচঞ্চলা **গিরিতরঙ্গিণী** কখনও বনান্তরালে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে, আবার কখনও তরঙ্গবাহু তুলিয়া উপলখণ্ডের নূপুর বাজাইয়া প্রগল্ভ কলহাস্যে দিক্ মুখরিত করিতেছে।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির অন্ততঃ তিনটি করিয়া প্রতিশব্দ লিখ এবং ঐ শব্দগুলি বাক্যে ব্যবহার করিয়া দেখাও :—

আকাশ, চন্দ্র, ইচ্ছা, ধন, পদ্ম, পর্ব্বত, রাজা, গঙ্গা, হস্ত, হস্তী, বিদ্বান্, পক্ষী, মেঘ, রাত্রি, সূর্য্য, গৃহ, অশ্ব, সুন্দর, স্বর্গ, বাতাস, পাপ, কুল, শব্দ, মা, জল, বিদ্যুৎ, সমুদ্র।

২। বাক্যে ব্যবহার কর :—

আগুন, বৈশ্বানর। আকাশ, অন্তরীক্ষ। সমুদ্র, রত্নাকর।
মৃত্যু, মহাপ্রয়াণ। আলয়, নিলয়।

৩। নিম্নলিখিত বাক্যগুলি সংশোধন কর :—

(১) বড় খিদে পেয়েছে, অন্ন দান কর।
(২) বড় পিপাসা, অম্বু কোথায় ?
(৩) তালপুকুরের ধারে আমাদের নিকেতন।
(৪) তোমাদের আগার কোথায় ?
(৫) এই অশ্বের মালিক কে ?
(৬) লড়াই ফতে করিয়া বীরপুঙ্গব ঘোড়ায় চড়িয়া প্রস্থান করিলেন।
(৭) দুর্গন্ধপূর্ণ স্থান মশামাছির নিলয়।

অষ্টম পাঠ—বিপরীতার্থক শব্দ

শব্দ	বিপরীত শব্দ	শব্দ	বিপরীত শব্দ
অগ্র	পশ্চাৎ	আবাহন	বিসর্জ্জন
অধম	উত্তম	আদান	প্রদান
অলস	পরিশ্রমী	আদি	অন্ত
অল্প	অধিক	আয়	ব্যয়
অনুরাগ	বিরাগ	আরম্ভ	শেষ
অনুগ্রহ	নিগ্রহ	আর্দ্র	শুষ্ক
অতিবৃষ্টি	অনাবৃষ্টি	আরোহণ	অবরোহণ
অনুলোম	প্রতিলোম, বিলোম	আবির্ভাব	তিরোভাব
অধমর্ণ	উত্তমর্ণ	আবৃত	অনাবৃত
অন্তর	বাহির	আবিল	অনাবিল
অপকৃষ্ট	উৎকৃষ্ট	আশা	নিরাশা
অন্ধকার	আলোক	আস্তিক	নাস্তিক
অর্ব্বাচীন	প্রাচীন	আসল	নকল
অর্পণ	গ্রহণ	আস্থা	অনাস্থা
অভিজ্ঞ	অনভিজ্ঞ	আহার	অনাহার
অর্থ	অনর্থ	আকুঞ্চন	প্রসারণ
অর্থী	প্রত্যর্থী	আত্মীয়	অনাত্মীয়
অলীক	সত্য	আপন	পর
অবনত	উন্নত	ইতর	ভদ্র
অধিত্যকা	উপত্যকা	ইচ্ছা	অনিচ্ছা
অনুকূল	প্রতিকূল	ইষ্ট	অনিষ্ট
আগমন	প্রত্যাগমন	ইহকাল	পরকাল

শব্দ	বিপরীত শব্দ	শব্দ	বিপরীত শব্দ
ইহলোক	পরলোক	ক্রয়	বিক্রয়
উচিত	অনুচিত	কৃশ	স্থূল
উচ্চ	নীচ	কৃষ্ণ	শুক্ল
উগ্র	সৌম্য	ক্রোধ	ক্ষমা
উৎকর্ষ	অপকর্ষ	ক্ষুদ্র	বৃহৎ
উত্থান	পতন	গরল	অমৃত
উদয়	অস্ত	গরিষ্ঠ	লঘিষ্ঠ
উন্নতি	অবনতি	গুণ	দোষ, ভাগ
উন্মীলন	নিমীলন	গুরু	লঘু
উপচয়	অপচয়	গুপ্ত	ব্যক্ত
উপকার	অপকার	গ্রহণ	বর্জ্জন, দান
উপস্থিত	অনুপস্থিত	গ্রাম্য	বন্য
উর্দ্ধগ	নিম্নগ	পৌর	জানপদ
উষ্ণ	শীতল	গোপন	প্রকাশ
ঋজু	বক্র	ঘন	তরল
ঐক্য	অনৈক্য	ঘাত	প্রতিঘাত
ঐহিক	পারত্রিক	ঘৃণা	শ্রদ্ধা
কোমল	কর্কশ	চঞ্চল	স্থির
কঠিন	কোমল	চেতন	অচেতন, জড়
কুটিল	সরল	জন্ম	মৃত্যু
কুৎসিত	সুন্দর	জাগরণ	নিদ্রা
কুৎসা	প্রশংসা	জীবন	মরণ
কৃতজ্ঞ	কৃতঘ্ন	জয়	পরাজয়
কনিষ্ঠ	জ্যেষ্ঠ	জাগ্রৎ	স্বপ্ন, সুষুপ্তি
কৃত্রিম	স্বাভাবিক	জ্বলন	নির্ব্বাণ

শব্দ	বিপরীত শব্দ	শব্দ	বিপরীত শব্দ
তরুণ	বৃদ্ধ	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
তিরস্কার	পুরস্কার	প্রতিযোগী	সহযোগী
তিক্ত	মধুর	প্রবল	দুর্ব্বল
তাপ	শৈত্য	প্রভু	ভৃত্য
তস্কর	সাধু	প্রবীণ	নবীন
ত্যাগ	গ্রহণ	প্রসন্ন	বিষণ্ণ
তিমির	আলোক	প্রাচীন	নবীন, নব্য, অর্ব্বাচীন
দক্ষিণ	বাম	বন্ধন	মুক্তি
দাতা	গ্রহীতা	বন্ধু	শত্রু
দীর্ঘ	হ্রস্ব	বিধি	নিষেধ
দুরন্ত	শান্ত	বন্ধুর	মসৃণ
দুর্লভ	সুলভ	বেশী	কম, অল্প
দুষ্কৃতি	সুকৃতি	বাদী	প্রতিবাদী
দুর্ব্বল	সবল	বিষ	অমৃত
দৃঢ়	শিথিল	বিনীত	দুর্বিনীত
দেনা	পাওনা	বিপথ	সুপথ
ধনী	দরিদ্র, নির্ধন	বিস্তৃত	সংক্ষিপ্ত
নিন্দা	প্রশংসা, স্তুতি	ব্যর্থ	সার্থক
নির্ম্মল	মলিন	ভয়	সাহস
নিরাকার	সাকার	ভূত	ভবিষ্যৎ
নিশ্চেষ্ট	সচেষ্ট	ভদ্র	ইতর, অভদ্র
নিঃশ্বাস	প্রশ্বাস	মহৎ	নীচ
পাপ	পুণ্য	মিলন	বিরহ
পুরোভাগ	পশ্চাদ্ভাগ	মিথ্যা	সত্য
প্রকৃতি	বিকৃতি	মুখ্য	গৌণ

শব্দ	বিপরীত শব্দ	শব্দ	বিপরীত শব্দ
মৃদু	প্রবল, উগ্র, তীব্র	সংযোগ	বিয়োগ
যোগ	বিয়োগ	স্বতন্ত্র	পরতন্ত্র
যশঃ	অপযশঃ, কলঙ্ক	স্মৃতি	বিস্মৃতি
শিব	অশিব	সমষ্টি	ব্যষ্টি
শিষ্ট	অশিষ্ট	সম্পদ্	বিপদ্
শীত	গ্রীষ্ম	স্বর্গ	নরক
শুভ	অশুভ	সৃষ্টি	প্রলয়
শোক	হর্ষ	স্থাবর	অস্থাবর, জঙ্গম
শ্রদ্ধা	অশ্রদ্ধা, ঘৃণা	সুশ্রী	বিশ্রী
সন্ধি	বিগ্রহ	সুস্পষ্ট	অস্পষ্ট
সুগম	দুর্গম	হর্ষ	বিষাদ
সুখ্যাতি	অখ্যাতি, নিন্দা	হ্রাস	বৃদ্ধি
সুধা	হলাহল	হরণ	পূরণ
সংক্ষেপ	বিস্তার, বাহুল্য	হৃদ্য	কটু

বিপরীতার্থক শব্দের বাক্যে প্রয়োগ

উঁচু, নীচু—'উঁচু-নীচু' না দেখিয়া পথ চলিলে হোঁচট খাইতে হয়।

আয়, ব্যয়—রায় বাহাদুরের 'আয়' অধিক, কিন্তু 'ব্যয়' ততোধিক।

মুখ্য, গৌণ—জার্ম্মাণীর রাজ্যবিস্তারের আকাঙ্ক্ষাই মহাযুদ্ধের 'মুখ্য' কারণ, ইহা ছাড়া কতকগুলি 'গৌণ' কারণও আছে।

সঞ্চয়, অপচয়—প্রত্যহ কিছু কিছু 'সঞ্চয়' করিলে দরিদ্রও অবস্থার উন্নতি করিতে পারে; নিত্য 'অপচয়ে' কুবেরের ভাণ্ডারও শূন্য হইয়া যায়।

অনুগ্রহ, নিগ্রহ—আর সহ্য করিতে না পারিয়া উপস্থিত ভদ্রলোকটি কহিলেন, "নিরপরাধের এ 'নিগ্রহ' ভোগ কেন? যথেষ্ট হইয়াছে, এখন 'অনুগ্রহ' করিয়া ইহাকে মুক্তিদান করুন।"

উত্থান, পতন—'উত্থান-পতন' সংসারের নিয়ম।

ঐহিক, পারত্রিক—পাশ্চাত্ত্য জাতিগণ 'ঐহিক' সুখ অর্জ্জনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে, কিন্তু ভারতবাসী চাহে 'পারত্রিক' কল্যাণ।

বিধি, নিষেধ—সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইলে সভার 'বিধি-নিষেধ'গুলি মানিতে হইবে বই কি!

প্রাচীন, নবীন—কাব্যবিচারের অনেক স্থলে 'প্রাচীনে' ও 'নবীনে' মতানৈক্য দেখা যায়।

সংক্ষিপ্ত, বিস্তৃত—'সংক্ষিপ্ত' ভাবে না লিখিয়া এই প্রশ্নের উত্তরটি 'বিস্তৃত' ভাবে আলোচনা করিতে হইবে।

অমৃত, গরল—দেবভোগ্য 'অমৃত' উপেক্ষা করিয়া দেবাদিদেব সৃষ্টিরক্ষার জন্য 'গরল' পান করিলেন।

সাকার, নিরাকার—'সাকার' উপাসনার সোপান বাহিয়া 'নিরাকার' উপাসনার অধিকার অর্জ্জন করিতে হয়।

স্বার্থ, পরার্থ—সব সময় কেবল 'স্বার্থ' দেখিলেই চলে না, 'পরার্থেও' মাঝে মাঝে কিছু ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়

সঙ্কুচিত, প্রসারিত—শৈত্যে সমস্ত পদার্থই 'সঙ্কুচিত' হয় আর উত্তাপে 'প্রসারিত' হয়।

অনুশীলনী

১। বিপরীতার্থক শব্দ বল :—

ভিতর; সম্পদ্; স্থূল; লঘু; পাপ, উজান, ধীর, জ্যোৎস্না, প্রবুদ্ধ, আসল, পূর্ণ, আদি।

২। বিপরীতার্থক শব্দ ব্যবহার করিয়া বাক্য রচনা কর :—

সুপ্ত, স্থির, হ্রাস, তিরোভাব, অলস, মুক্ত, আমিষ, গৃহী।

৩। বিপরীতার্থক শব্দ বল :—

স্থাবর, সুশ্রী, প্রতিযোগী, মুক্ত, সুকর, নরক, সরল, প্রশংসা, সংযোগ, বন্য, দুর্লভ, উষ্ণ, জরা, কৃতজ্ঞ, আবাহন, ভক্ষ্য, সুকৃত, ইহলোক, দাতা, পরোক্ষ, পতন, ভয়, স্বার্থ, ক্ষতি, বাহির, পাতাল, বিচ্ছেদ, তিরস্কার, রাগ, দাবী, নত, উৎকর্ষ, কৃত্রিম, কোমল, মসৃণ, প্রলয়, বিনীত, নিন্দা, নব্য, গুপ্ত, লঘিষ্ঠ, সুখ, শিষ্য।

নবম পাঠ—বিভিন্ন পদরূপে একই শব্দের ব্যবহার

অন্ধ—বি—অন্ধকে দান কর।

বিণ—সেই অন্ধ ভিক্ষুকটিকে আজ পথে দেখিলাম না।

অন্যায়—বি—এই অন্যায়, এই অত্যাচার—ইহার কি কোন প্রতিকার নাই?

বিণ—তুমি যাই বল না কেন, তুমি অন্যায় কাজ করেছ।

আদি—বি—বিশ্বসৃষ্টির আদি ভগবান্।

বিণ—আমাদের আদি নিবাস পূর্ব্ববঙ্গে।

উপর—বি—পাওনাদারের ভয়ে নরেনবাবু আজকাল উপরেই থাকেন, নীচে আসেন না।

বিণ—রাধানাথের উপর পাটির দুইটি দাঁত পোকায় খেয়েছে।

ক্রি-বিণ—উপর উপর একই ভুল তিনবার করলে।

বিণ-বিণ—তুমি বড় উপর চালাক।

এ—বিণ—এ বই খানা খুব ভাল।

সর্ব্ব—এ কে?

ঐ—বিণ—ঐ লোকটিকে আমি চিনি।

অব্যয়—ঐ যা! ছাতাটা ট্রামে ফেলে এসেছি।

ওস্তাদ—বি—ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে।

বিণ—রামবাবু ওস্তাদ লোক, একই জমি তিনজনের কাছে বেচেছেন।

কর্ত্তব্য—বি—এক্ষেত্রে আমার কর্ত্তব্য কি?

বিণ—কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করিও না।

কোন—সর্ব্ব—কোন্‌টি খাব তুমিই বলনা ভাই।

বিণ—কোন্‌দিকে চলেছ?

গুরু—বি—গুরুর আদেশ পালন কর।

বিণ—গুরুপাক বস্তু বেশী খাওয়া উচিত নহে।

ঘোর—বি—ঘুমের ঘোর এখনও কাটিল না ?

বিণ—চতুর্দ্দিকে ঘোর অন্ধকার, নির্জ্জন পথে নিঃসঙ্গ পথিক চলিয়াছে।

চূর্ণ—বি—প্রলেপ আর চূর্ণ—নিধিরাম কবিরাজের এইই সম্বল।

বিণ—চূর্ণ-কুন্তলের শোভা বড়ই সুন্দর।

জোর—বি—জোর যার, মুলুক তার।

বিণ—আজ আমার জোর তলব কেন ?

ঠিক—বি—কি বলতে কি বলেছে, তখন কি আর তার মাথার ঠিক ছিল !

বিণ—ঠিক খবর শুনেছি, সে পাশ করেছে।

ক্রি-বিণ—কেন এত ভাবচ, আমি ঠিক আসব।

দরিদ্র—বি—দরিদ্রের সকল আশাই ব্যর্থ হয়।

বিণ—ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ।

দুষ্ট—বি—দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন রাজার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

বিণ—দুষ্ট জনের সংসর্গ ত্যাগ কর।

দুঃখী—বি—দুখীর মুখের দিকে চাও।

বিণ—দুঃখী লোকটাকে ভিক্ষা তো দিলেই না, তার উপর অপমান করে তাড়ালে !

দৃশ্য—বি—সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির দৃশ্য অতুলনীয়।

বিণ—নাটককে দৃশ্যকাব্য বলা হয়।

পড়া—বি—পুরাতন পড়া মুখস্থ কর।

বিণ—পড়া বই আবার পড়।

পশ্চাৎ—বি—পশ্চাতে তাকাও।

বিণ—পশ্চাৎ দিক্ হইতে সহসা আক্রান্ত হইয়া সমস্ত সৈন্য বিহ্বল হইয়া পড়িল।

ক্রিয়া-বিণ—তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতেছ কেন ?

অব্যয়—এখন যাও, পশ্চাৎ তোমার কথা শুনিব।

পাপ—বি—পাপের অসাধ্য কিছুই নাই, সে সমস্ত অন্যায় অবহেলায় করিতে পারে।

বিণ—নরহত্যা বড় পাপকার্য্য।

পুণ্য—বি—পুণ্যের মত সুখকর কিছুই নাই।

বিণ—রাণী অহল্যাবাই অনেক পুণ্য কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

বড়—বি—বড়োর সঙ্গে ছোটোর বন্ধুত্ব স্থায়ী হয় না।

বিণ—বড় মানুষ কেবল টাকায় হয় না।

ক্রি-বিণ—তুমি বড বাজে বক !

বাঁধা—বিণ—বাঁধা বেতনে কয়মাস কাজ করিয়া সে চাকরি ছাড়িয়া দিল।

ক্রি—সাহসে বুক বাঁধ।

ভাল—বি—তোমার ভাল হউক।

বিণ—আজ 'ভাল' খবর আছে।

মূর্খ—বি—মূর্খের অশেষ দোষ।

বিণ—মূর্খ দুর্বিনীত পুত্রের চেয়ে অপুত্রক থাকা ভাল।

যে—সর্ব্ব—যে সত্যকথা বলে সে সকলের প্রিয় হয়।

বিণ—তুমি যে কাজ করিয়াছ, তোমাকে আর বিশ্বাস করা যায় না।

অব্যয়—তুমি যে আজ বাড়ী যাইবে, তাহা আমি জানি।

রক্ত—বি—কি হিন্দু—কি মুসলমান—সকলের রক্তই সমান লাল।

বিণ—রক্ত জবা মায়ের বড় আদরের বস্তু।

রুদ্র—বি—প্রলয়ে তাণ্ডবনৃত্য করিয়া রুদ্র এই বিশাল জগৎকে শ্মশানে পরিণত করিবেন।

বিণ—মাষ্টারমহাশয়ের রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া ছাত্রগণ ভয়ে পলাইয়া গেল।

রৌদ্র—বি—গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রৌদ্র মানুষকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলে।

বিণ—মধুসূদনের রচনায় রৌদ্র রসের আধিক্য দেখা যায়।

শোনা—বিণ—শোনা কথায় বিশ্বাস কি ?

ক্রি—এমন কথা কোন কালেও শোনা যায় নাই।

সত্য—বি—সত্যই ধর্ম্ম।

বিণ—সত্য কথা বল।

সাধু—বি—সাধুকে সম্মান করা, সাধুর অনুকরণ করা সকলের কর্ত্তব্য।

বিণ—জষ্টিস্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত সাধু ব্যক্তি সচরাচর দেখা যায় না। সভাস্থ সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "সাধু! সাধু!"

সার—বি—জীবে দয়া সকল ধর্ম্মের সার।

বিণ—প্রবন্ধটির সার মর্ম্ম বুঝাইয়া দাও।

সে—সর্ব্ব—সে এখন আসতে পারবে না।

বিণ—সে কথা এখন থাক্।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলিকে বিভিন্ন পদরূপে ব্যবহার করিয়া বাক্য রচনা কর:—

কোন্, কর্ত্তব্য, দুষ্ট, ঠিক, সার, দরিদ্র, দ্রুত, ধীর, অদৃষ্ট, উপর, সাধু।

২। নিম্নরেখ পদগুলি কোন্ পদ—নির্দ্দেশ কর:—

গরম পড়েছে। গরম জামা কৈ? গোল ক'রো না। পৃথিবী গোল। ঘষা টাকাটা কোথায় পেলে? মাথা ঘষবে না? যুদ্ধের বাজারে অনেক জিনিষেরই দাম চড়েছে। তোমার বড় চড়া মেজাজ। চাপা গলায় কি বলছ? দেখ্‌ছ না কাপড়খানা যে চাপা পড়ে গেল তাড়া দিচ্ছ কেন? কাগজের তাড়া বগলে তাকে যেতে দেখেছি।

দশম পাঠ—শব্দের বিশিষ্ট প্রয়োগ

বাঙ্গলা ভাষায় যে কোনো রচনা দেখিলেই লক্ষ্য করা যায় উহার কতকগুলি শব্দ চলিত কথায় ব্যবহৃত হয়, আর কতকগুলি শব্দের সাধুভাষায় ব্যবহার করা হয়। রচনায় এই উভয় রকম শব্দের ব্যবহার শিক্ষা করা উচিত। বিশেষ্য পদের পূর্ব্বে বিশেষণ ব্যবহার করিতে হইলে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। সাধুভাষায় সংস্কৃত বিশেষ্য বা বিশেষণ পদগুলির সহিত চলিত ভাষার পদের সংমিশ্রণ যেন কখনও না হয়। 'আলুলায়িত' এই বিশেষণটি বলিলেই তাহার পরে 'কুন্তল' বা 'কেশ' এই জাতীয় বিশেষ্যের কথা মনে পড়ে। 'আলুলায়িত চুল' বলিলে বড়ই অশোভন হয়, ইহাতে ভাষার সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়। বাঙ্গলা ভাষায় শিষ্ট প্রয়োগ অনুসারে কতকগুলি বিশেষণ পদের নাম করিলেই সঙ্গে সঙ্গে উহাদের পরে কি কি বিশেষ্য পদ বসিবে তাহা মনে আসে। উপযুক্ত বিশেষণ প্রয়োগ করিতে পারিলে রচনার সৌন্দর্য্য ও গৌরব বৃদ্ধি পায়, ভাবপ্রকাশও অনায়াস-সাধ্য হইয়া থাকে।

নিম্নে কতকগুলি নিত্যসম্বন্ধযুক্ত বিশেষণ ও বিশেষ্য পদের তালিকা দেওয়া হইল।

অকলঙ্ক	চরিত্র	অতল	সমুদ্র
অকাট্য	প্রমাণ, যুক্তি	অতুল	বৈভব
অকূল	সমুদ্র, পাথার	অদম্য	উৎসাহ
অক্ষয়	ভাণ্ডার, পরমায়ু	অট্ট	হাস্য
অক্লান্ত	কর্ম্মী	অনাসক্ত	জীবন, যোগী
অখণ্ড (বা দোর্দ্দণ্ড)	প্রতাপ	অনাঘ্রাত	পুষ্প
অগাধ	বিশ্বাস	অনিন্দিত	রূপ
অগণিত	নক্ষত্র	অনবদ্য	রূপ
অগ্রিম	মূল্য	অনিমিষ	দৃষ্টি

অন্তিম	দশা, মিনতি, গতি	আপেক্ষিক	গুরুত্ব
অনুর্ব্বর	ক্ষেত্র	আর্থিক	উন্নতি
অপরিমিত	অর্থ	আদিম	প্রবৃত্তি, জাতি
অপার	করুণা, দুঃখ	আদ্যোপান্ত	ঘটনা
অপোগণ্ড	শিশু	উগ্র	গন্ধ, মূর্ত্তি
অপ্রতিহত	গতি, প্রভাব	উচ্চ	অভিলাষ, পদ
অপ্রাসঙ্গিক	কথা	উচ্ছৃঙ্খল	স্বভাব
অবৈতনিক	বিদ্যালয়	উচ্ছ্বসিত	প্রশংসা
অভিশপ্ত	জীবন, জাতি	উজ্জ্বল	আলোক
অভ্রভেদী	গিরিশিখর	উত্তেজক	ঔষধ
অমানুষিক	অত্যাচার	উৎকট	ব্যাধি
অমিত	বিক্রম, তেজ	উৎপীড়িত	জনসংঘ
অমূলক	সন্দেহ	উদার	হৃদয়
অলীক	জনরব	উদীয়মান	লেখক
অবশ্যম্ভাবী	পরিণাম	উদ্দাম	প্রবৃত্তি, যৌবন
অবিরাম	প্রবাহ, বৃষ্টি	উদ্ভট	কবিতা
অসাধ্য	ব্যাধি	উপদ্রুত	অঞ্চল
অস্থাবর	সম্পত্তি	উপস্থিত	বুদ্ধি
অহেতুকী	ভক্তি	একচ্ছত্র	সম্রাট্
অসূর্য্যম্পশ্যা	নারী	একেশ্বর	অধিপতি
অহিংস	অসহযোগ	ঐতিহাসিক	তথ্য
অচিকিৎস্য	ব্যাধি	ঐশী	শক্তি
অস্পষ্ট	কথা, আলোক	ঐহিক	সুখ, দুঃখ
আকাঙ্ক্ষিত	বিপদ, বস্তু	ঔর্দ্ধদেহিক	ক্রিয়া
আন্তরিক	যত্ন, ধন্যবাদ, আগ্রহ	কলকণ্ঠ	বিহঙ্গ
আকস্মিক	দুর্ঘটনা	কণ্টকিত	দেহ

কুসুমিত	কানন, উপবন	নিঃসম্বল	পথিক
কাল্পনিক	কথা, রোগ	নিগূঢ়	রহস্য, তত্ত্ব
খরস্রোতা	তরঙ্গিণী	নিবিড়	বর্ন
গতানুগতিক	ভাব, জীবন	নিরপেক্ষ	বিচার
গৈরিক	বাস, বসন, পতাকা	নিরাপদ্	আশ্রয়
চতুষ্পদ	জন্তু	নির্দ্দিষ্ট	পথ, দিন
চতুষ্পদী	কবিতা	নিষ্কাম	কর্ম্ম, সাধনা
দলভ্রষ্ট	নেতা	নৈশ	আক্রমণ
জ্যোতির্ম্ময়	পুরুষ	পরিণত	বুদ্ধি
ত্রিকালজ্ঞ	ঋষি	পরিমিত	আহার
ত্রৈমাসিক	পত্রিকা, পরীক্ষা	পর্য্যুসিত	অন্ন
দশম	দশা	পাঠ্য	পুস্তক
দাহ্য	বস্তু, পদার্থ	পারলৌকিক	কর্ম্ম
দাম্পত্য	কলহ, জীবন, প্রণয়	পারিভাষিক	শব্দ
দারুণ	গ্রীষ্ম	পারিপার্শ্বিক	অবস্থা
দুঃসহ	যন্ত্রণা, কষ্ট	পার্ব্বত্য	প্রদেশ
দুরপনেয়	কলঙ্ক	পার্থিব	সুখ
দুর্গম	পথ	পিঙ্গল	জটা
দুর্জ্জয়	অভিমান	পৈতৃক	ধন, সম্পত্তি
দুর্জ্ঞেয়	রহস্য	পৌরাণিক	কথা, বিবরণ
দুর্ব্বিষহ	যন্ত্রণা, দুঃখ	প্রচণ্ড	ক্রোধ
দুর্লঙ্ঘ্য	পর্ব্বত	প্রতিকূল	গ্রহ, বায়ু
দুশ্চর	তপস্যা	প্রতিলোম	বিবাহ
দূষিত	জল, বায়ু	প্রাক্তন	সংস্কার, কর্ম্ম
দৈব	ঔষধ, বল	প্রত্যক্ষ	প্রমাণ
ধূলিধূসর	দেহ	প্রাদেশিক	ভাষা

প্রাথমিক	শিক্ষা	বার্ষিক	উৎসব
ফলবান্	বৃক্ষ	বৈষয়িক	বুদ্ধি
বিকচ	কমল	বিকট	মূর্ত্তি, বদন
বামাবর্ত্ত	শঙ্খ	বিলোল	কটাক্ষ

চলিত বাঙ্গলায় উদাহরণ

অঢেল	টাকা	ডেঁপো	ছোকরা, ছেলে
অথই	জল	ঢলঢল	মুখ
আজগুবি	গল্প	তুল্‌তুলে	বিছানা
উঠ্‌তি	বয়স, গাছ	তোব্‌ড়ান	গাল
এঁচোড়েপাকা	ছেলে	তেজী	ঘোড়া
কন্‌কনে	শীত	থম্‌থমে	মেঘ
কাঁদুনে	ছেলে	থরথর	কম্পন
কুনো	বেঙ	থুড়থুড়ে	বুড়ো
খুনোখুনি	ব্যাপার	দম্‌কা	বাতাস
গায়েপড়া	আলাপ	দামাল	ছেলে
ঘরপোড়া	গরু	দু'মুখো	সাপ
ঘিয়েভাজা	লুচি	দেঁতো	হাসি
চলন্ত	গাড়ী	দোফলা	আম, ছুরি
চুলচেরা	কথা, বিচার	দোআঁস্‌লা	মাটি
চাঁছাছোলা	কথা	ধড়িবাজ	ছেলে
ঝরা	ফুল	ধিঙ্গী	মেয়ে
ঝড়ো	কাক, হাওয়া	ধেনো	জমি
ঠাণ্ডা	বাতাস	নবাবী	খরচ, চাল
ডাগর	মেয়ে, চোখ	নরম	স্বভাব
ডাহা	মিথ্যা, রক্ত	নিখুঁত	কাজ, ছবি, গড়ন

নিটোল	গড়ন	ফুল্‌কো	লুচি
নিদান	সময়	ফুটিফাটা	রোদ
নিরেট	মূর্খ	বাজে	কাজ, কথা
নেওটা	ছেলে	বিদ্‌ঘুটে	স্বভাব
ন্যাড়া	মাথা	বেফাঁস	কথা
পশমী	কাপড়, শাল	বাঁকা	কথা, লাঠি
পড়ন্ত	রোদ	ভুতুড়ে	কাণ্ড
পাটোয়ারি	বুদ্ধি	মনমাতানো	গন্ধ
পাঁড়	মাতাল	বোমারু	বিমান
পায়েচলা	পথ	বৌকাঁট্‌কী	শাশুড়ী
প্রাণজুড়ানো	ডাক, কথা	মাছিমারা	কেরানী
ফলারে	বামন	লিক্‌লিকে	বেত, চেহারা
ফসকা	গেরো	স্যাঁত্‌সেঁতে	মেজে, ঘর
ফাল্‌তো	জিনিষ	সোনালী	রৌদ্র, রং
ফলন্ত	গাছ	হাড়ভাঙা	খাটুনি
ফিন্‌ফিনে	ধুতি	হারানো	রতন
ফুট্‌ফুটে	মেয়ে	হাসিভরা	মুখ

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত বিশেষ্যগুলির পূর্ব্বে উপযুক্ত বিশেষণ বসাও :—

তৃণ, আকাশ, রাত্রি, অন্ধকার, হাস্য, রূপ, অভিনয়, নির্ণয়, বিহঙ্গ, কান্ত, তাপস, মুখ, আলো, বাতাস, ঘর, পাজামা, ওল, অরণ্য, খরচ, পাথার, সমুদ্র, সৌরজগৎ, সংগ্রাম।

২। নিম্নলিখিত বিশেষণগুলির পরে উপযুক্ত বিশেষ্য বসাও :—

ফেনিল, কৃষ্ণ, শুক্ল, লোহিত, শীত, সবুজ, নীল, দুর্গম, জটিল, সমৃদ্ধ, সরস, অপ্রতিদ্বন্দ্বী, বেসুরো, ছিঁচ্‌কাঁদুনে, তালকানা, আধমরা, চুলচেরা, অপূর্ব্ব, বিভক্ত, মর্ম্মস্পর্শী, গালভরা, জরাজীর্ণ,

কুসুমিত, নিবিড়, নৈশ, খরস্রোতা, উচ্ছ্বসিত, আকাঙ্ক্ষিত, ঢুলুঢুলু, ধূসর, ধারকরা, জলহারা, নির্লজ্জ, লিক্‌লিকে, নশ্বর, লম্বা-চওড়া, বঞ্চিত, হাড়ভাঙ্গা, নির্ব্বাক, প্রদীপ্ত।

৩। ডানদিকের বিশেষ্যপদগুলির পূর্ব্বে বাঁদিক্ হইতে বিশেষণ পদ বাছিয়া লইয়া বসাও :—

কৃত্রিম	বিপদ্
বিশুদ্ধ	কবিতা
অনির্ব্বচনীয়	নজর
বারমেসে	ক্রোধ
অবৈধ	বিছানা
ত্রৈমাসিক	ভাত
দুধারী	পাওনা
দুরপনের	বিশ্বাস
বেনামী	কুকুর
ছোট	ঝগড়া
ঐকান্তিকী	বেগুন
ঝরঝরে	দন্ত
খেঁকী	খাদ্য
দুর্জ্জয়	ভক্তি
উপরি	চেহারা
আসন্ন	আনন্দ
উদ্ভট	আচরণ
ঘরজোড়া	পরীক্ষা
সরল	কলঙ্ক
লিক্‌লিকে	তরোয়াল
তুমুল	সম্পত্তি

একাদশ পাঠ

বিশেষণের বিশিষ্ট প্রয়োগ

বাঙ্গলা ভাষায় এমন কতকগুলি বিশেষণ শব্দ আছে যেগুলি বিভিন্ন প্রকার বিশেষ্যের পূর্ব্বে বসিলে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। একই বিশেষণ শব্দের বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করিবার রীতি বাঙ্গলা ভাষার বিশিষ্ট সম্পদ্। নিম্নে এইরূপ কয়েকটি বিভিন্ন অর্থবোধক বিশেষণ শব্দের প্রয়োগ দেওয়া হইল।

উচ্চ—উচ্চ আশা, উচ্চ নজর, উচ্চ মন, উচ্চ বিদ্যালয়, উচ্চ কণ্ঠ, উচ্চ হাসি, উচ্চ বাক্য, উচ্চ কুল, উচ্চ পদ, উচ্চ বেতন।

কড়া—কড়া ওষুধ, কড়া আঁচ, কড়া পাহারা, কড়া হুকুম, কড়া মেজাজ, কড়া মনিব, কড়া পাক।

কাঁচা—কাঁচা আম, কাঁচা বয়স, কাঁচা গাথুনি, কাঁচা কাজ, কাঁচা রং, কাঁচা মাল, কাঁচা চুল, কাঁচা খাতা, কাঁচা হাত, কাঁচা দুধ, কাঁচা ছেলে, কাঁচা পয়সা, কাঁচা ঘুম, কাঁচা-পাকা।

খোলা—খোলা কথা, খোলা খুলি, খোলা মন, খোলা বাতাস, খোলা মাথা, খোলা চুল, খোলা রং, খোলা রাস্তা, খোলা ঘর, খোলা চাল, খোলা ভাঁটি।

গরম—গরম কাল, গরম জল, গরম কাপড়, গরম মেজাজ, গরম মশলা।

ঘন—ঘন বন, ঘন দুধ, ঘন বরষা, ঘন ঘোর, ঘন জল, ঘন রাশি, ঘনশ্যাম।

চড়া—চড়া কথা, চড়া গলা, চড়া মেজাজ, চড়া দর, চড়া সুর, চড়া সুদ, চড়া ঔষধ, চড়া বাজার, চড়া হার।

ছোট—ছোট লোক, ছোট মন, ছোট নজর, ছোট আদালত, ছোট বোন, ছোট ঘর, ছোট জাত।

নরম—নরম বিছানা, নরম কথা, নরম মেজাজ, নরম মন, নরম মাছ, নরম বাজার, নরম সুর, নরম মুড়ি।

পাকা—পাকা আম, পাকা ফোড়া, পাকা চোর, পাকা বাড়ী, পাকা কথা, পাকা পাতা, পাকা খাতা, পাকা সোনা, পাকা ওজন, পাকা রং, পাকা হাড়, পাকা মাথা, পাকা ঘুঁটি, পাকা ব্যবস্থা, পাকা-পাকা।

পোড়া—পোড়া কাঠ, পোড়াকপাল, পোড়ামুখ, পোড়া মন, পোড়া ভাগ্য, পোড়া চোখ।

ফাঁকা—ফাঁকা মাঠ, ফাঁকা কথা, ফাঁকা আওয়াজ, ফাঁকা জায়গা, ফাঁকা মন।

বড়—বড় বাড়ী, বড় বৌ, বড় কথা, বড় মন, বড় লোক, বড় ঘর, বড় নজর, বড় ঠাকুর, বড় দিন, বড় সরিক, বড় কুটুম, বড় বিদ্যা, বড় তামাক।

বাঁকা—বাঁকা লাঠি, বাঁকা সীথি, বাঁকা চাহনি, বাঁকা পথ, বাঁকা কথা, বাঁকা বুদ্ধি, বাঁকা শ্যাম।

বাঁধা—বাঁধা গৎ, বাঁধা বেতন, বাঁধা বই, বাঁধা সুর, বাঁধা গরু।

বিষম—বিষম শীত, বিষম কাণ্ড, বিষম রাশি, বিষম সমস্যা, বিষম দায়, বিষম জ্বর।

ভাঙ্গা—ভাঙ্গা বাড়ী, ভাঙ্গা মন, ভাঙ্গা শরীর, ভাঙ্গা টাকা, ভাঙ্গা বুক, ভাঙ্গা হাট, ভাঙ্গা আসর, ভাঙ্গা-ভাঙ্গা।

ভারী—ভারী কথা, ভারী গলা, ভারী কাজ, ভারী বোঝা, ভারী মন, ভারী হাত।

ময়লা—ময়লা জল, ময়লা জামা, ময়লা রং, ময়লা মন।

মন্দ—মন্দ বাতাস, মন্দ স্বভাব, মন্দ কথা, মন্দ গন্ধ।

মহান্—মহাকাল, মহাব্রাহ্মণ, মহাপণ্ডিত, মহামাংস, মহাশঙ্খ, মহাযাত্রা, মহাশয়, মহানিদ্রা।

মুক্ত—মুক্ত দ্বার, মুক্ত কেশ, মুক্ত পুরুষ, মুক্ত কণ্ঠ, মুক্ত হস্ত, মুক্ত বাতাস।

মোটা—মোটা গলা, মোটা বুদ্ধি, মোটা কাজ, মোটা কাপড়, মোটা ভাত, মোটা বেতন।

শক্ত—শক্ত কথা, শক্ত কাজ, শক্ত মাথা, শক্ত রোগ, শক্ত ঘানি, শক্ত বুলি।

সরু—সরু হার, সরু গলা, সরু বুদ্ধি, সরু চাল।

সাদা—সাদা কাগজ, সাদা কাপড়, সাদা রং, সাদা কথা, সাদা চোখ, সাদা মন, সাদা মাথা।

সাধু—সাধু ব্যক্তি, সাধু আচরণ, সাধুভাষা, সাধুপ্রয়োগ, সাধু-বাদ, সাধুসঙ্গ।

সূক্ষ্ম—সূক্ষ্ম কাজ, সূক্ষ্ম তত্ত্ব, সূক্ষ্ম বুদ্ধি, সূক্ষ্মদৃষ্টি, সূক্ষ্ম বিচার, সূক্ষ্ম দেহ, সূক্ষ্ম শরীর।

হত—হতবুদ্ধি, হতভাগ্য, হতমূর্খ, হতশ্রী, হতচ্ছাড়া, হতজ্ঞান।

হাল্‌কা—হাল্‌কা গহনা, হাল্‌কা শরীর, হাল্‌কা স্বভাব, হাল্‌কা কথা, হাল্‌কা কাজ, হাল্‌কা হাসি।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত বিশেষণগুলি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিয়া বাক্য রচনা কর :—

মোটা, কাঁচা, গরম, ভারী, ছোট, লঘু, মিঠা, নরম, বড়, হীন।

২। অর্থ বল :—

বাঁকা কথা, মোটা বুদ্ধি, ফাঁকা আওয়াজ, পাকা ঘুঁটি।

দ্বাদশ পাঠ

একই ক্রিয়াপদের বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ

আসা— (১) কাল বলেছিলে আসবে, কিন্তু এলে কৈ ?
(২) পরীক্ষার সময় ভাই একটা কথাও মনে আসে না।
(৩) মোড়ের মাথায় দোকান, তাতে বেশ দুপয়সা আসে।
(৪) বৃষ্টি আস্‌ছে, এ দিকে ঝড়ও আস্‌ছে।
(৫) তুমি খেলে না, এতে আমার কি আসে যায় ?
(৬) বিপদ যখন আসে তখন একা আসে না।
(৭) দিনের আলো নিভে আস্‌ছে।

উঠা— (১) 'উঠ শিশু মুখ ধোও'।
(২) ছেলেটা যা খেয়েছিল, সব উঠে গেল।
(৩) পাকা ব্যবসাদার, দেনা পড়তেই পারে না, দেখে নিও আবার উঠবে।
(৪) বাগবাজার ছেড়ে বৌবাজারে উঠে এলে কবে ?
(৫) কিছুতেই তার মন উঠছে না।
(৬) এবারে বারোয়ারীতে অনেক টাকা উঠেছে।
(৭) এ রংটা পাকা নয়, দেখে নিও, উঠে যাবে।

করা— (১) মেঘ করেছে, জল হবে।
(২) ইচ্ছা করে পাহাড়ে উঠি, কিন্তু বড় ভয় করে।
(৩) একা মানুষ, হাটবাজার করি, না তীর্থ করি !
(৪) হেঁটে যেও না, গাড়ী ক'রে যাও।
(৫) ছাতাটা ফেলে এসো না, মনে ক'রে নিয়ে এস।
(৬) একটা নতুন কিছু কর।
(৭) অসুখ করেছে, ভয় কি, এক দাগ ওষুধেই আরাম করে দেব।

কাটা— (১) দিন কাটে তো রাত কাটে না

(২) তিলক কেটেছ আবার তেড়িও কেটেছ—মানিয়েছে বেশ !

(৩) যাক্ বিপদ্ কেটেছে ! এবারের মত ফাঁড়া কাট্‌লো !

(৪) বইখানা কাট্‌ছে কেমন, না আলমারীতে পোকায় কাট্‌ছে ?

(৫) চিম্‌টি কাট্‌ছ কেন ?

(৬) তাল কাট্‌লে কি গান জমে ?

(৭) ধারেও কাটে, আবার ভারেও কাটে ।

(৮) 'রাশি রাশি ভরা ভরা, ধান কাটা হল সারা' ।

খাওয়া—(১) পান খাও, তামাক খাও, এত তাড়াতাড়ি কি জন্য ?

(২) ধমক খেয়ে এতক্ষণে ছেলেটা চুপ করেছে ।

(৩) ঘুষ খাওয়া অভ্যাস হয়েছে কিনা, বাঁধা বেতনে এখন বড় কষ্ট হচ্ছে ।

(৪) পাশবালিশটা আরও অনেক তুলো খাবে ।

(৫) ডাক্তার যখন এলেন, রোগী তখন খাবি খাচ্ছে ।

(৬) তেলে জলে কখনও মিল খায় না ।

(৭) অনেক নুন খেয়েছি, আজ ভুল্‌লে চল্‌বে কেন ?

(৮) টাকা খেয়েছ, না ? দাঁড়াও তোমার চাকরী খেয়ে দিচ্ছি ।

খাটা— (১) উপমাটি এখানে খাটে না ।

(২) খাটলেই পয়সা, ব'সে থাক্‌লেই অভাব ।

(৩) ব্যবসাতে অনেক টাকা খাট্‌ছে, কিন্তু লাভ তেমন হচ্ছে কৈ ?

(৪) পেরেক ঠুকে একটা মসারি খাটাতে পার না, তুমি হবে ইঞ্জিনিয়ার !

চলা— (১) এখানে আর থাক্‌তে হবে না, বাড়ী চল ।

(২) ঘড়িটা চল্‌ছে না কেন, চাবি দাওনি বুঝি ?

(৩) জামার এই ফ্যাসানটাই ত আজকাল বাজারে চল্‌ছে ।

(৪) দশটাকায় এ মাস চল্‌বে না।

(৫) ও সব ওখানে চলবে না।

(৬) চলুক, গানটা থামালে কেন?

(৭) সৎপথে চল, তবেই দোকান চল্‌বে।

(৮) বাবা তো চল্‌লেন, এখন আমাদের উপায়!

চাওয়া—(১) 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে'।

(২) একটু চিনি ওবাড়ী থেকে চেয়ে আন তো।

(৩) মুখ তুলে চাও ঠাকুর?

(৪) ফিরে চাও, অমন করে চ'লে যেও না।

চাপা— (১) বিছানাটা চেপে বাঁধ।

(২) সে কথা এখন চাপা পড়েছে।

(৩) ঘোড়ায় চেপে চলেছ কোথায়?

(৪) সর্দ্দিতে গলা একেবারে চেপে ধরেছে।

ছাড়া— (১) ঐ হতভাগার সঙ্গ ছাড়।

(২) এগার দিন পরে আজ ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

(৩) গলা ছেড়ে গান গাও।

(৪) সকাল আটটায় গাড়ী ছাড়বে।

(৫) কোথায় যাবে, আজকে তোমায় ছাড়লে ত?

(৬) একদিনে একেবারে নাকাল ক'রে ছেড়েছে।

(৭) আর দেখ্‌ছ কি, নাড়ী যে ছাড়ছে।

(৮) আমি ভাই হাল ছেড়ে দিয়েছি।

(৯) সে চাকরী ছাড়লে, কিন্তু মদ ছাড়তে পারলে না।

(১০) এখন আমায় ছেড়ে দাও, ছেড়ে কথা কইতে তো আর কসুর করনি।

ঝাড়া— (১) সে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল।
(২) এত ঝাল ঝাড়ছ কার উপর।
(৩) "খেংরে বিষ ঝেড়ে দেব"।
(৪) ঝুলি ঝেড়ে তোমায় দিলাম, এখন আমি নিঃসম্বল।

টানা— (১) মশারির দড়িটা টান্‌ছ কেন, ছিঁড়ে যাবে যে!
(২) এ মাসটা একটু টেনে চল, টাকা ফুরিয়ে এসেছে।
(৩) তুমি ত ওর দিকে টেনে কথা বল্‌বেই, আমি তোমার দু'চোখের বিষ কি না!
(৪) লক্ষ্মীছাড়াটা গেল কোথায়, তামাক টান্‌ছে বুঝি?

ডাকা—(১) ওঃ সে কি আওয়াজ, নাক ডাক্‌ছে না বাজ ডাক্‌ছে।
(২) শীঘ্র ডাক্তার ডাক।
(৩) আজ গঙ্গায় ষাঁড়াষাঁড়ির বান ডাক্‌বে, সামাল সামাল।
(৪) ভগবান্‌কে ডাক্‌লে ফল পাবে।

তোলা—(১) মোটটা মাথায় ক'রে তোল।
(২) হাজার টাকা চাঁদা তোলা হয়েছে তো? এইবার তোমাদের জাতে তুল্‌বো।
(৩) ঘুম থেকে উঠেই সে মস্ত হাই তুল্‌ল!
(৪) মেয়েটা কেবল দুধ তুলে ফেল্‌ছে, ডাক্তারবাবু!
(৫) এই বাগান থেকে ফুল তুল্‌তে পারবে না।

থাকা— (১) দেশে থাক্‌তেই ম্যালেরিয়া ধরেছে।
(২) আজ বিকালে আমার সঙ্গে দেখা কোরো, মনে থাকে যেন।
(৩) যা দিনকাল পড়েছে, মানসম্ভ্রম আর থাক্‌বে না।
(৪) ও কথা এখন থাক, কাজ কর।

দেওয়া—(১) ভাগলপুরী গরু অনেক দুধ দেয়।
(২) এইবার আমাকে একটু ছুটি দিতে হবে।

(৩) চিঠিখানা ডাকে দাও।

(৪) পরীক্ষা দিতে গিয়া সে বুঝিল, তাহার পড়াশুনা কত অল্প।

(৫) দরজা দেও, দেখ্‌ছ না ঘরে জল আস্‌ছে।

(৬) ভাত কাপড় দিয়ে মানুষ করলাম, টাকা দিয়ে ব্যবসা করালাম, অবশেষে মেয়ে দিলাম, আর নিমকহারামটা কিনা এই রকম ফাঁকি দিয়ে চম্পট দিল।

(৭) সাড়া দিচ্ছ না কেন? পরিচয় দাও।

দেখা— (১) আমি আর তার মুখ দেখ্‌ব না।

(২) আমি ছেলেটিকে দেখ্‌ছি, তুমি ডাক্তার ডাক।

(৩) নাড়ী দেখে কি বুঝ্‌লে?

(৪) ডাক্তার তো দেখ্‌ছে, দেখি কি হয়!

(৫) দেখ, যেন বলে দিও না।

(৬) আমি তোমাকে দেখে নেব? কি বল্‌লে, ঢের দেখেছ?

ধরা— (১) মাছ ধরতে এসে শেষে চোর ধ'রে ফেল্‌লে।

(২) সব জিনিষেরই এখন দাম ধ'রে দেওয়া হয়েছে, বাড়াবাড়ি লাভ করা আর চল্‌ছে না।

(৩) যাকে যমে ধরে, সে কি বন্ধুর কথা শোনে?

(৪) সোজা পথ ধ'রে চল।

(৫) সাহেবকে ধ'রে বেশ একটা চাকৃরি বাগিয়ে নিয়েছে।

নামা— (১) কয়েকটা টাকার জন্য সে যে এত নীচে নেমে যেতে পারে তা ভাবিনি।

(২) জলে না নাম্‌লে সাঁতার শিখ্‌বে কি ক'রে?

(৩) বর্ষা নেমেছে, এইবার ম্যালেরিয়ার মরশুম।

(৪) দুই একদিনের মধ্যেই লোহার দর নেমে যাবে।

পড়া— (১) জল পড়ছে, বাইরে যেও না।

(২) আমার বাইরের ঘরটা তো প'ড়েই আছে, এখানে এসে থাক না।

(৩) ভয়ানক গরম পড়েছে, মোটা মানুষ এবার মারা পড়বে।

(৪) ক্ষুরের ধারটা একেবারে প'ড়ে গেছে।

(৫) তোমার মাথায় টাক পড়ল কি ক'রে ?

ফেলা— (১) এখানে থুতু ফেলা নিষেধ।

(২) কাজটা শেষ ক'রে ফেল।

(৩) দুপুরবেলা তুমি কি করছিলে তা আমি দেখে ফেলেছি।

বসা— (১) এস, মাটীতেই বসা যাক।

(২) কাল থেকে সকাল বিকাল দুবেলা বাজার বস্‌বে।

(৩) বুকে সর্দ্দি বসেছে, কিছুদিন ভুগ্‌তে হবে।

(৪) দুদিন রাত জাগাতে নরহরির চোখ ব'সে গেছে।

বাঁধা— (১) দল বেঁধে কোথায় চলেছ ?

(২) সাহসে বুক বাঁধ।

(৩) বই বাঁধ্‌তে পার ?

(৪) ট্রেণ এখানে বাঁধ্‌বে না।

যাওয়া—(১) এখানে আর শরীর টিক্‌ছে না, দেশে যাও।

(২) মাস যায় বছর যায়, কিন্তু রাজপুত্রের আর দেখা নাই।

(৩) ব'লে যাও, আমি শুন্‌ছি।

(৪) এই টাকায় আর ক'দিন যাবে ?

রাখা— (১) বস্তাটা সিঁড়ির ধারে রাখ।

(২) ছেলেটি বেঁচে থাক্‌লে বাপের নাম রাখ্‌বে।

(৩) কাজ করি, খাই, কারও তোয়াক্কা রাখি না।

(৪) হুজুর, গরীবকে চরণে রাখুন।

লওয়া, নেওয়া—(১) ভগবানের নাম লও।
(২) প্রতি রবিবার তিনি জোলাপ নেন।
(৩) তোমার টাকা নেওয়া হয়েছে কি ?
(৪) অপরাধ নিও না ঠাকুর।
(৫) এবার দেখে নেব !
(৬) সবই তো গেল, আর কি নিয়ে সংসারে থাকা।
(৭) এর মধ্যেই খাওয়া হয়ে গেল, আর ভাত নিলে না।

লাগা— (১) কাপড়ে দাগ লেগেছে।
(২) পড়াশুনায় মন লাগছে না কেন ?
(৩) আমার পিছনে লাগছ কেন ?
(৪) চোখে খোঁচা লেগেছে।
(৫) কথাটা মনে লেগেছে।
(৬) নৌকা ঘাটে লাগিয়াছে।
(৭) "নয়নে লেগেছে ভাল"। "আগুন লেগেছে কোথা" ?
(৮) এবার তোমার মুখে চুণকালী লাগ্‌বে।
(৯) ভাঙ্গা মন কি আর জোড়া লাগে ?

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত ক্রিয়াপদগুলি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিয়া বাক্য রচনা কর :—

চাপা, টানা, দেখা, নামা, পড়া, বাঁধা, মারা, লাগা।

২। অর্থের বিভিন্নতা বুঝাইয়া লিখ :—

(ক) ছানা কাটা, ছড়া কাটা, জিভ্‌ কাটা, কান কাটা।
(খ) পটল তোলা, হাত তোলা, চাঁদা তোলা, তল্পী তোলা।
(গ) কাঁধ দেওয়া, কাণ দেওয়া, দম দেওয়া, লম্বা দেওয়া।
(ঘ) ট্রেণ ধরা, মদ ধরা, পায়ে ধরা, মাথা ধরা, রোগে ধরা।
(ঙ) গলা বসা, পা বসা।
(চ) ভাতে মারা, ডুব মারা, দুধ মারা।
(ছ) বিষম লাগা, তাক লাগা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্যাবহারিক ব্যাকরণ

প্রথম পাঠ—পদপ্রকরণ

পদ পাঁচ প্রকার—বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্ব্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া।

বিশেষ্য

যে পদ দ্বারা কোন ব্যক্তি, বস্তু, জাতি, গুণ ও কার্য্যের নাম বুঝায় তাহাকে বিশেষ্য পদ বলে। বিশেষ্য পদ আবার পাঁচ প্রকারের।

(১) ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য—(কোন ব্যক্তি বা স্থানের নাম)
রাম, রহিম, বীণা, দিল্লী, কলিকাতা ইত্যাদি।

(২) বস্তুবাচক বিশেষ্য—(কোন বস্তুর নাম)
দুধ, জল, কলম, বস্ত্র, লৌহ প্রভৃতি।

(৩) জাতিবাচক বিশেষ্য—(কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের নাম)
বাঙ্গালী, পশু, ব্রাহ্মণ, গরু ইত্যাদি।

(৪) গুণবাচক বিশেষ্য—(কোন গুণের নাম)
দয়া, বিনয়, সৌন্দর্য্য, সাধুতা ইত্যাদি।

(৫) ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য—(কোন কার্য্যের নাম)
গমন, শয়ন, ভোজন, ক্রন্দন ইত্যাদি।

বিশেষণ

যে পদ দ্বারা অন্য কোন পদের গুণ, অবস্থা, পরিমাণ প্রভৃতি প্রকাশ করা হয় তাহাকে বিশেষণ পদ বলে। বিশেষণ তিন প্রকার—

(১) বিশেষ্যের বিশেষণ
শীতল জল, অনেক লোক, মধুর সঙ্গীত, গরম দুধ প্রভৃতি।

বিশেষণ বিশেষ্যের পূর্ব্বে না বসিয়া পরে বসিলে উহাকে বিধেয় বিশেষণ বলে।

ছেলেটি চালাক ; দুধটা ঠাণ্ডা ; বালিকাটি সুশ্রী।

(২) বিশেষণের বিশেষণ—

অতি দরিদ্র গৃহস্থ ; পরম দয়ালু ভগবান্; খুব ভাল ছেলে।

(৩) ক্রিয়ার বিশেষণ—

দ্রুত চল ; শীঘ্র খেয়ে নাও ; তাড়াতাড়ি হাঁট।

সর্ব্বনাম

যে পদ সমস্ত বিশেষ্যের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয় তাহাকে **সর্ব্বনাম** বলে।

আমি, তুমি, সে, তিনি, ইনি, উনি, আপনি, যে, যিনি, এ, ও, ইহা, উহা, যাহা, তাহা, কে, কি প্রভৃতি সর্ব্বনাম পদ।

অব্যয়

যে সকল শব্দের কোন বিভক্তিতেই ব্যয় বা রূপান্তর হয় না তাহাদিগকে **অব্যয়** বলে।

তবে, বটে, তা, এবং, ও, আর প্রভৃতি শব্দের কোন অবস্থাতেই ব্যয় অর্থাৎ পরিবর্ত্তন হয় না। অব্যয় সাধারণতঃ তিন প্রকার।

(১) **সংযোজক অব্যয়**—যে সকল শব্দ এক পদের সহিত অন্য পদের অথবা এক বাক্যের সহিত অন্য বাক্যের সংযোগ সাধন করে তাহাদিগকে **সংযোজক অব্যয়** বলে।

ও, এবং, অথচ, সুতরাং, তবু, বরং প্রভৃতি সংযোজক অব্যয়।

(২) **বিযোজক অব্যয়**—যে সকল অব্যয় বিভিন্ন পদ বা বাক্যকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয় তাহাদিগকে **বিযোজক অব্যয়** বলে।

নতুবা, নচেৎ, কিংবা, অথবা প্রভৃতি বিযোজক অব্যয়।

(৩) **মনোভাববাচক অব্যয়**—যে সকল অব্যয় বিস্ময়, আনন্দ, দুঃখ, ঘৃণা, ভয়, বিরক্তি প্রভৃতি মনোভাব প্রকাশ করে তাহাদিগকে **মনোভাববাচক অব্যয়** বলে।

আচ্ছা, বটে, হায়, বেশ, মরি মরি, ধিক্, উহুঃ প্রভৃতি মনোভাববাচক অব্যয়। ইহা ব্যতীত হে, ওহে, ওগো, ওরে, হাঁগো প্রভৃতি কতকগুলি

সম্বোধনসূচক অব্যয় ; খাঁ খাঁ, ঝাঁ ঝাঁ, চিক্‌মিক্‌, মচ্‌মচ্‌, ঝম্‌ঝম্‌ প্রভৃতি কতকগুলি অনুকারধ্বনিসূচক অব্যয় এবং যথা, যেন, তথা, যেমন, তেমন প্রভৃতি কতকগুলি উপমাবাচক অব্যয় শব্দ আছে।

ক্রিয়া

যে পদ দ্বারা করা, খাওয়া, যাওয়া প্রভৃতি কাজ বুঝায় তাহাকে **ক্রিয়া** পদ বলে। ক্রিয়া দুই প্রকার—**সমাপিকা** ও **অসমাপিকা**।

১। যে ক্রিয়ায় একটি বাক্য সমাপ্ত হয় তাহার নাম **সমাপিকা ক্রিয়া**। যেমন,—সূর্য্য উঠিয়াছে। এখানে 'উঠিয়াছে' সমাপিকা ক্রিয়া, ইহার প্রয়োগে বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে, অন্য ক্রিয়ার আর আকাঙ্ক্ষা নাই।

২। যে ক্রিয়ার দ্বারা বাক্য ও আকাঙ্ক্ষার শেষ হয় না তাহাকে **অসমাপিকা ক্রিয়া** বলে। যেমন,—সূর্য্য উঠিলে খোকার ঘুম ভাঙ্গিবে। এখানে 'উঠিলে' অসমাপিকা ক্রিয়া, কারণ কেবল 'উঠিলে' বলিলে বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় না, অন্য ক্রিয়াপদের আকাঙ্ক্ষা থাকিয়া যায়।

ধাতুর পরে ইয়া, ইলে, ইতে প্রভৃতি যোগ করিয়া অসমাপিকা ক্রিয়াপদ গঠন করিতে হয়।

সমাপিকাই হোক্ অথবা অসমাপিকাই হোক্ যে ক্রিয়াপদের কার্য্যের কোনও বিষয় থাকে অথবা বাক্যের অর্থ পূর্ণরূপে বুঝিতে যে ক্রিয়ার কর্ম্ম পদের প্রয়োজন থাকে তাহা **সকর্ম্মক ক্রিয়া**। যেমন, ছেলেরা দুধ খাইতেছে।

যে ক্রিয়াপদের অর্থ বুঝাইতে কোন কর্ম্মের দরকার হয় না তাহা **অকর্ম্মক ক্রিয়া**। যেমন, শিশু হাসিতেছে।

যে ক্রিয়ার দুইটি কর্ম্ম থাকে তাহাকে **দ্বিকর্ম্মক ক্রিয়া** বলে। যথা—শিক্ষক ছাত্রকে ভূগোল পড়াইতেছেন। এখানে 'ভূগোল' মুখ্য কর্ম্ম ও 'ছাত্রকে' গৌণ কর্ম্ম।

দুইটি ক্রিয়া (একটি অসমাপিকা ও একটি সমাপিকা) মিলিয়া বাঙ্গলায় আর এক প্রকার ক্রিয়াপদ গঠিত হয়, ইহাকে **যৌগিক ক্রিয়া** বলে। যেমন,—খাইয়া ফেলা, রাগিয়া উঠা, চলিয়া যাওয়া ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পাঠ

লিঙ্গ ও বচন

বাঙ্গলা ভাষায় লিঙ্গ তিন প্রকার—পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ।

পুংলিঙ্গ—পিতা, পুরুষ, বাঘ, ষাঁড়, রাজা, বাদশাহ, পণ্ডিত, মৌলভী, শিক্ষক, ছাত্র ইত্যাদি।

স্ত্রীলিঙ্গ—মাতা, স্ত্রী, রাণী, বেগম, শিক্ষয়িত্রী, ছাত্রী, বধূ, সুন্দরী ইত্যাদি।

ক্লীবলিঙ্গ—গাছ, পাথর, বই, জল, বন্দুক, মশা, মাছি ইত্যাদি।

পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ এই তিনটি বিভাগে কেবল নামবাচক শব্দ বা বিশেষ্যকেই ভাগ করা যায়। বিশেষণ শব্দও বিশেষ্যেরই লিঙ্গ পাইয়া থাকে। সর্ব্বনাম শব্দ বাঙ্গলায় তিন লিঙ্গেই একরূপ থাকে। সংস্কৃত ভাষায় লিঙ্গ অর্থগত নয়, অভিধান ও ব্যাকরণ অনুসারে সংস্কৃত শব্দের লিঙ্গ নির্ণয় হয়। স্ত্রীজাতি বুঝাইলেই যে স্ত্রীলিঙ্গ বা পুরুষ জাতি বুঝাইলেই যে পুংলিঙ্গ হইবে এমন কোন অকাট্য নিয়ম সংস্কৃতে নাই। দার, ভার্য্যা, কলত্র এই তিনটি শব্দেই স্ত্রী বুঝায়। অথচ প্রথমটি পুংলিঙ্গ, দ্বিতীয়টি স্ত্রীলিঙ্গ ও তৃতীয়টি ক্লীবলিঙ্গ।

বাঙ্গলা ভাষায় তিনটি লিঙ্গই আছে, তবে ক্লীবলিঙ্গে শব্দের কোন পৃথক্ রূপ নাই। কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত প্রত্যয় বা বিভক্তির সাহায্যে সাধারণতঃ লিঙ্গের পার্থক্য সূচিত হয় না। বিশেষণ পদ অবিকৃত থাকে, ইহাই বাঙ্গলার সাধারণ নিয়ম। স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্য শব্দের বিশেষণে স্ত্রী-প্রত্যয়ের প্রয়োগ বাঙ্গলা ভাষা হইতে প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। সংস্কৃত বা হিন্দির মত বিশেষণ দেখিয়া বিশেষ্যের লিঙ্গ বিচার করা বাঙ্গলা ভাষায় প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। 'বড় ছেলে', 'বড় মেয়ে', 'বড় গাছ',—এখানে 'বড়' বিশেষণটির তিন লিঙ্গেই এক রূপই রহিল। এইরূপ 'ভাল ছেলে' ও 'ভাল

মেয়ে', 'ছোট ছেলে' ও 'ছোট বউ', 'মেজ শালা' ও 'মেজ শালী', 'লক্ষ্মী ছেলে' ও 'লক্ষ্মী মেয়ে', 'ফরসা বর' ও 'ফরসা ক'নে' ইত্যাদি।

বাঙ্গলা ভাষায় প্রচলিত রীতি ইহাই। কিন্তু বাঙ্গলায় অবিকৃত বহু সংস্কৃত শব্দ রহিয়াছে। এই সমস্ত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়া গুরুগম্ভীর রচনা করিবার সময় সংস্কৃতের অনুকরণে এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়।

সুন্দরী রমণী	বিদুষী নারী
স্নেহময়ী জননী	মৃন্ময়ী মূর্তি
মহতী সভা	মহীয়সী মহিলা
পতিপ্রাণা নারী	পয়স্বিনী গাভী
বেগবতী নদী	কুহকিনী আশা
অর্থকরী বিদ্যা	সর্ব্বংসহা বসুমতী
নীলবসনা সুন্দরী	মায়াবিনী মরীচিকা

বাঙ্গলায় পুংলিঙ্গ শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গে পরিণত করিবার তিনটি উপায় আছে।

(১) স্ত্রীবাচক স্বতন্ত্র শব্দের ব্যবহার।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
বাবা	মা	রাজা	রাণী
দাদা	দিদি	শুক	শারী, সারী
শ্বশুর	শাশুড়ী	নবাব	বেগম
ভাই	বোন	গোলাম	বাঁদী
স্বামী	স্ত্রী	কর্ত্তা	গৃহিণী, গিন্নী
ষাঁড়	গাই	সাহেব	বিবি
ভূত	পেত্নী	চাকর	ঝি
যুবক	যুবতী	খান্‌সামা	আয়া
ছেলে	মেয়ে	বেহাই	বেয়ান
পুত্র	কন্যা	দেবর, ভাসুর	যা

(২) পুংলিঙ্গ মূল শব্দটির সহিত পূর্ব্বে বা পরে স্ত্রীবোধক শব্দের যোগ।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
পুরুষ মানুষ	মেয়ে মানুষ	গোঁসাই	মা গোঁসাই
ব্যাটাছেলে	মেয়েছেলে	সভ্য	মহিলা সভ্য
বলদ গরু	গাই গরু	কর্ম্মী	নারীকর্ম্মী
এঁড়ে বাছুর	বকনা বাছুর	উড়ে	উড়েবৌ
বন্ধু	বন্ধুজায়া	বেনে	বেনেবৌ
গয়লা	গয়লাবৌ	মদ্দাহাঁস	মাদীহাঁস
ঠাকুরপো	ঠাকুরঝি	ঔপন্যাসিক	মহিলা ঔপন্যাসিক
ডাক্তার	লেডি-ডাক্তার	প্রভু	প্রভুপত্নী

(৩) স্ত্রী-প্রত্যয় যোগ করিয়া (আ, ঈ, ইকা, নী প্রভৃতি যোগে)

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
বৃদ্ধ	বৃদ্ধা	মনোহর	মনোহরা
শিষ্য	শিষ্যা	অজ	অজা
মহাকায়	মহাকায়া	বৈদ্য	বৈদ্যা
দীন	দীনা	অশ্ব	অশ্বা
প্রথম	প্রথমা	কোকিল	কোকিলা
দ্বিতীয়	দ্বিতীয়া	সুন্দর	সুন্দরী
তৃতীয়	তৃতীয়া	নদ	নদী
প্রিয়	প্রিয়া	দেব	দেবী
সরল	সরলা	তরুণ	তরুণী
কৃশ	কৃশা	কুমার	কুমারী
নবীন	নবীনা	খোকা	খুকী
চপল	চপলা	কাকা	কাকী
মলিন	মলিনা	বামুন	বামনী

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
ব্যঙ্গমা	ব্যঙ্গমী	মৃগ	মৃগী
পাগল	পাগলী	পাঁঠা	পাঁঠী
ব্যাটা	বেটী	ছাত্র	ছাত্রী
মুসলমান	মুসলমানী	নর্ত্তক	নর্ত্তকী
মোরগ	মুরগী	কপোত	কপোতী
হংস	হংসী	ভুজঙ্গ	ভুজঙ্গী
সিংহ	সিংহী	পিতামহ	পিতামহী
ঘোটক	ঘোটকী	কিন্নর	কিন্নরী
ময়ূর	ময়ূরী	চতুর্থ	চতুর্থী
কিঙ্কর	কিঙ্করী	অর্থকর	অর্থকরী
ভয়ঙ্কর	ভয়ঙ্করী	প্রলয়ঙ্কর	প্রলয়ঙ্করী
সহচর	সহচরী	বনচর	বনচরী
স্নেহময়	স্নেহময়ী	সর্ব্বময়	সর্ব্বময়ী
রজক	রজকী	নর্ত্তক	নর্ত্তকী
ভব	ভবানী	ব্রহ্মা	ব্রহ্মাণী
ইন্দ্র	ইন্দ্রাণী	বরুণ	বরুণানী
সুকেশ	সুকেশা, সুকেশী	সুমুখ	সুমুখা, সুমুখী
কৃশোদর	কৃশোদরা, কৃশোদরী	চন্দ্রমুখ	চন্দ্রমুখা, চন্দ্রমুখী
লেখক	লেখিকা	গায়ক	গায়িকা
বালক	বালিকা	চালক	চালিকা
পাচক	পাচিকা	বাহক	বাহিকা
পাঠক	পাঠিকা	প্রচারক	প্রচারিকা
দুঃখী	দুঃখিনী	পক্ষী	পক্ষিণী
রোগী	রোগিণী	বিদেশী	বিদেশিনী
কর্ত্তা	কর্ত্রী	দাতা	দাত্রী

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
সৎ	সতী	মহৎ	মহতী
শ্রীমান্	শ্রীমতী	রূপবান্	রূপবতী
ভগবান্	ভগবতী	পাপীয়ান্	পাপীয়সী

নিম্নলিখিত স্ত্রীলিঙ্গবোধক পদগুলি সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে অশুদ্ধ হইলেও বাঙ্গলায় প্রচলিত :—

অপ্সরী	চাতকিনী	প্রেতিনী
অনাথিনী	বিহঙ্গিনী	মাতঙ্গিনী
কুরঙ্গিণী	রজকিনী	শ্বেতাঙ্গিনী

বচন

একটি সংখ্যা বুঝাইলে একবচন ও একাধিক সংখ্যা বুঝাইলে বহুবচন হয়। বাঙ্গলায় দ্বিবচন নাই।

টি, টা, গাছি, গাছা, খানা, খানি, টুকু প্রভৃতি নির্দ্দেশক শব্দ কোন শব্দের সঙ্গে যুক্ত হইলে উহা একবচন বুঝায়। যথা—

মেয়েটি, ছেলেটা, দড়িগাছি, ঝাঁটাগাছা, বইখানা, ঘরখানি, দইটুকু ইত্যাদি।

বহুবচন প্রকাশের উপায় বাঙ্গলায় সাধারণতঃ এই কয়টি :—

(১) রা, এরা, গুলি, গুলা (গুলিন্, গুলান্) ইত্যাদি শব্দের যোগ করিয়া :—যথা, ছেলেরা, বালকেরা, বানরেরা, কাকগুলি, পয়সাগুলা ইত্যাদি।

(২) শব্দের শেষে গণ, সকল, সব, সমূহ, বর্গ, সমস্ত, মহল, বৃন্দ, কুল, মালা প্রভৃতি বহুবচনবোধক শব্দ যোগ করিয়া :—

শিশুগণ, বৃক্ষসকল, ভাইসব, নক্ষত্রসমূহ, শিষ্যবর্গ, লেখকমহল, ছাত্রবৃন্দ, বিহঙ্গকুল, তরঙ্গমালা ইত্যাদি।

(৩) শব্দের পূর্ব্বে বহুবচনবোধক বিশেষণ যোগ করিয়া :—

বহু লোক, অনেক বাঘ, বিস্তর টাকা ইত্যাদি।

(৪) একই বিশেষণ দুইবার উল্লেখ করিয়া :—

ছোট ছোট পাখী, সুন্দর সুন্দর ফুল, বড় বড় গাছ ইত্যাদি।

তৃতীয় পাঠ

কারক ও বিভক্তি

ক্রিয়ার সহিত যাহার অন্বয় বা সম্বন্ধ থাকে তাহাকে **কারক** বলে।

'পঞ্চবটী বনে লক্ষ্মণ বৃক্ষ হইতে স্বহস্তে ফুল আহরণ করিয়া সীতাকে দিলেন।' এইবাক্যে 'দিলেন' এই ক্রিয়াপদের সহিত বাক্যের অন্তর্গত অন্যান্য পদের নানারূপ সম্বন্ধ রহিয়াছে।

কে দিলেন? লক্ষ্মণ—এইখানে ক্রিয়ার সহিত কর্ত্তৃসম্বন্ধ, সুতরাং 'লক্ষ্মণ' কর্ত্তৃকারক।

কি দিলেন? ফুল—এইখানে কর্ম্মসম্বন্ধ, সুতরাং 'ফুল' কর্ম্মকারক।

কিসের দ্বারা দিলেন? স্বহস্তে—এইখানে করণসম্বন্ধ, সুতরাং 'স্বহস্তে' করণকারক।

কাহাকে দিলেন? সীতাকে—সম্প্রদান-সম্বন্ধ, সুতরাং 'সীতাকে' সম্প্রদানকারক।

কোথা হইতে দিলেন? বৃক্ষ হইতে—এইখানে অপাদান-সম্বন্ধ, সুতরাং 'বৃক্ষ হইতে' অপাদানকারক।

কোথায় দিলেন? পঞ্চবটী বনে—এইখানে অধিকরণ-সম্বন্ধ, সুতরাং 'বনে' অধিকরণকারক।

কারক ছয় প্রকার :—কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, অধিকরণ।

ক্রিয়ার সহিত অন্বয় হয় না বলিয়া বা তেমন কোন সম্পর্কে থাকে না বলিয়া 'সম্বন্ধ' কারক বলিয়া বিবেচিত হয় না। সম্বন্ধ পদে ক্রিয়া ভিন্ন অন্যান্য শব্দের সহিত বিশেষ্যের বা সর্ব্বনামের সম্পর্ক থাকে।

সম্বোধনও কারক নহে, পদ। যে বিশেষ্য পদের দ্বারা কাহাকেও সম্বোধন করা যায় বা ডাকা যায় তাহাকে **সম্বোধন পদ** বলা হয়।

যে সমস্ত চিহ্নের সংযোগে কারক নির্দ্দিষ্ট করা হইয়া থাকে সেগুলির নাম **বিভক্তি**। বাঙ্গলায় বিভক্তি দুই প্রকারের :—

(১) খাঁটি বিভক্তি—কতকগুলি পদাংশ শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া কারকের চিহ্ন হিসাবে কাজ করে। যেমন এ, কে, রে, তে ইত্যাদি। এগুলির কোন স্বাধীন ব্যবহার বাঙ্গলা ভাষায় নাই, পৃথক শব্দ হিসাবে এগুলির কোন অর্থও হয় না। বাঙ্গলায় খাঁটি বিভক্তি এইগুলি – এ, যে, য়, তে, এতে, কে, রে, এর ইত্যাদি।

(২) বিভক্তিরূপে ব্যবহৃত পরপদ—কতকগুলি পদ বাঙ্গলা ভাষায় বিভক্তির কাজ করিয়া থাকে। দ্বারা, দিয়া, কর্ত্তৃক, উপরে, তরে প্রভৃতি পরপদ বাঙ্গলায় শব্দের পরে বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। এগুলির স্বতন্ত্র ব্যবহার ভাষায় আছে, তবে বিশেষ্য বা সর্ব্বনামের পরে বসিয়া এগুলি কারক-বিভক্তির কাজ করিয়া থাকে। বাঙ্গলা ভাষায় ইহাদের সংখ্যাই বেশী। সংস্কৃত ব্যাকরণের মত বাঙ্গলায় এত কারক-বিভক্তি নাই, সেইজন্য বাঙ্গলা শব্দরূপে জটিলতা নাই বলিলেই চলে!

কারক বিভক্তির ব্যবহার

কর্ত্তৃকারক

যে ক্রিয়া সম্পাদন করে তাহা **কর্ত্তা**। কর্ত্তৃকারকে প্রথমা বিভক্তি হয়।

জল পড়িতেছে। পাতা নড়িতেছে।

তাহারা কোথায় যাইবে?

বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর ছিলেন।

কর্ত্তৃকারকের একবচনে সাধারণতঃ বিভক্তির কোন চিহ্ন থাকে না।

মিনি বড় চঞ্চল মেয়ে।

'মহাবীর শিখ এক পথ বহি যায়।'

সে রোজ স্কুল হইতে পালায়।

অনেক স্থলেই কর্ত্তায় 'এ' বা 'তে' বিভক্তি-চিহ্ন যুক্ত হয়। যেখানে কর্ত্তা সুনির্দ্দিষ্ট কাহাকেও বুঝায় না প্রায় সেখানেই 'এ', 'য়' 'তে' প্রভৃতি বিভক্তি-চিহ্ন যুক্ত হয়।

লোকে বলে। চোরে চুরি করে।
গরুতে ঘাস খায়। গাধায় বোঝা বয়।
পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়।
দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে?
রামে মারিলেও নির্ব্বংশ, রাবণে মারিলেও নির্ব্বংশ।
ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া করিতেছে।
বাপ বেটায় চাকরী করে, অভাব কিসের?

কর্ম্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে কখনও 'কে' বা 'য়' বিভক্তি-চিহ্ন যুক্ত হয়।

তোমাকে যাইতে হইবে।
তোমায় যাইতে হইবে।

কর্ম্মকারক

ক্রিয়াপদের বিষয়ের নাম **কর্ম্ম** অর্থাৎ কর্ত্তা যাহা করে, খায়, দেখে, শুনে তাহাই কর্ম্ম। কর্ম্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। 'কে', 'রে', 'এ' প্রভৃতি দ্বিতীয়া বিভক্তির চিহ্ন। বাঙ্গলায় কর্ম্মকারকে বিভক্তির চিহ্ন অনেক সময় লোপ হয়, কখন কখন লোপ হয় না।

অচেতন পদার্থ বুঝাইলে সাধারণতঃ একবচনে কর্ম্মকারকে বিভক্তি যুক্ত হয় না।

বই পড়। মশা মার, মাছি তাড়াও।
কলম আন। হাত মুখ ধোও।

ব্যক্তির নাম বুঝাইলে প্রায়ই কর্ম্মে 'কে' বিভক্তি-চিহ্ন থাকে।

মানুষকে অবিশ্বাস করিও না। কানাকে কানা বলিতে নাই।

'এ', 'রে' বিভক্তি-চিহ্ন বেশীর ভাগ কবিতায়ই পাওয়া যায়।

'ভ্রাতৃভাব করি মনে দেখো দেশবাসী জনে।'

'ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী।'

'রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণ-লতিকারে।'

'বিহগে ললিত গীতি শিখায়েছ ভালবাসি।'

'আমারে তুমি করিবে ত্রাণ এ নহে মোর প্রার্থনা।'

কর্ম্মবাচ্যে কর্ম্মকারকে প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা,—বালকগণ-কর্ত্তৃক চোর ধৃত হইয়াছে।

করণকারক

যে উপায়ে বা যাহার সাহায্যে কর্ত্তা ক্রিয়া সম্পাদন করে তাহা **করণকারক**। করণকারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। 'এ', 'য়', 'তে', 'এতে' তৃতীয়া বিভক্তির চিহ্ন।

ইহা ছাড়া 'দ্বারা', 'দিয়া', 'কর্ত্তৃক' প্রভৃতি শব্দ বিশেষ্য বা সর্ব্বনামের পরে বসিয়া করণ কারকের সৃষ্টি করে। ব্যক্তিবাচক সংস্কৃত শব্দের সহিত 'কর্ত্তৃক' সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়।

সে কানে শোনে না।

আগুনে সীতার দেহ দগ্ধ হয় নাই।

টাকায় সব পাওয়া যায়।

মিষ্ট কথায় সকলেই বশীভূত হয়।

ভক্তের সেবায় ভগবান্ তুষ্ট হন।

'দ্বারা', 'দিয়া', 'কর্ত্তৃক' প্রভৃতি পরপদ-সাহায্যে—

'ফুলদল দিয়া কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?'

মানুষের দ্বারা এদেশে পশুর কাজ করান হয়

গুপ্তধন তস্কর কর্ত্তৃক অপহৃত হইল।

সাধারণতঃ ক্রীড়ার্থক ও প্রহারার্থক ধাতুর বেলায় করণ-কারকের বিভক্তি থাকে না।

যাহার কাজ নাই সেই সারাদিন তাস খেলে।
লাঠি মারিয়া মাথা ফাটাইয়া দিল।

সম্প্রদানকারক

যাহাকে কিছু দান করা যায় বা যাহার উদ্দেশ্যে কিছু করা যায়, তাহাকে **সম্প্রদান কারক** বলে। সম্প্রদানে চতুর্থী বিভক্তি হয়। বাঙ্গলায় সম্প্রদান কারকের নিজস্ব কোন বিভক্তি নাই। কর্ম্মকারকের 'কে', 'রে', 'এ', 'য়' প্রভৃতি বিভক্তি চিহ্নই সম্প্রদানে ব্যবহার করা হয়। স্বত্বত্যাগপূর্ব্বক দান হইলেই সম্প্রদান হয়।

সৎপাত্রে দান কর।
'গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে।'
আমায় একটু জল দেবেন কি ?
'তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি।'
তাঁহাকে আমার নমস্কার জানাইবে।

'জন্য', 'তরে' প্রভৃতি পরপদ-সংযোগেও সম্প্রদান হয়।

'যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর।'
'কার তরে তুই শয্যা দাসী র'চিস্ আনন্দে।'

অপাদানকারক

যে স্থান হইতে কোন ঘটনার আরম্ভ বা যাহা হইতে কোন বস্তু বা ব্যক্তির উৎপত্তি, চলন, ভয়, উত্থান, পতন ইত্যাদি সংঘটিত হয় তাহা **অপাদানকারক**। অপাদানকারকে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। কিন্তু বাঙ্গলায় অপাদানকারক বুঝাইবার জন্য কোন খাঁটি বিভক্তি নাই। 'হইতে', 'চেয়ে',

'কাছে', 'অপেক্ষা', 'থেকে', 'পর্য্যন্ত', 'অবধি' প্রভৃতি পরপদ-সহযোগে অপাদান-কারকের অর্থ বুঝান হইয়া থাকে।

তাহারা ঘর হইতে বাহির হইল।

খুব ভোরে ঘুম হইতে উঠিবে।

গাছ হইতে পাকা ফল পড়িতেছে।

কখনও 'এ' বিভক্তি চিহ্নের সাহায্যে অপাদানকারকের অর্থ প্রকাশ করা হইয়া থাকে।

মেঘে জল হয়।

'বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা।'

অধিকরণকারক

ক্রিয়ার আধার অর্থাৎ যে স্থানে বা যে কালে ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহার নাম **অধিকরণ**। অধিকরণ সাধারণতঃ চারি প্রকার।

(ক) **স্থানাধিকরণ**—ভারতবর্ষে ছত্রিশ কোটি লোকের বাস।

বনে বাঘ থাকে।

'বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালী ভাত পায় না।'

(খ) **কালাধিকরণ**—শৈশবে বিদ্যাভ্যাস, যৌবনে অর্থোপার্জ্জন ও বার্দ্ধক্যে ধর্ম্মচর্চ্চা করিবে।

'প্রভাতে উঠিল রবি লোহিত বরণ।'

(গ) **বিষয়াধিকরণ**—ধর্ম্মে মতি হউক। বয়সে বালক হইলে কি হয়, বুদ্ধিতে সে বৃদ্ধকেও হার মানায়।

(ঘ) **ভাবাধিকরণ**—বড় দুঃখে পড়িয়া আমি আপনার শরণ লইয়াছি।

অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি হয়। একবচনে এই বিভক্তির চিহ্ন 'এ', 'য়', 'তে', 'এতে' প্রভৃতি।

'কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল।'

'দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায়!'

রথের মেলায় অনেক লোক জড় হয়।

নদীতে এখন জোয়ার আসিবে।

ইহা ছাড়া 'মধ্যে', 'উপরে' প্রভৃতি পরপদের সাহায্যে অধিকরণকারকের অর্থ প্রকাশ করা হইয়া থাকে।

বাক্সটি মাথার উপরে তোল।

দুধের মধ্যে চুল পড়িয়াছে।

অনেক স্থলে অধিকরণে কোন বিভক্তি থাকে না।

'আজ নগদ কাল ধার।'

আগামী শনিবার আমি কলিকাতা যাইব।

গৃহস্থ বাড়ী আপনি উপবাসী থাকিবেন?

'প্রত্যেক' অর্থ বুঝাইলে অধিকরণ কারকের দ্বিত্ব হয়।

'পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির।'

'চর্কার ঘর্ঘর পল্লীর ঘর ঘর।'

এইরূপ ডালে ডালে, বনে বনে, দ্বারে দ্বারে ইত্যাদি।

চতুর্থ পাঠ

বিশেষণের তারতম্য

বিশেষ্য বা সর্ব্বনামের গুণ, পরিমাণ ও অবস্থা বিশেষণের সাহায্যে প্রকাশিত হয়। আবার এই সমস্ত গুণ, অবস্থা, পরিমাণ ইত্যাদির সহিত অন্যের গুণ অবস্থা ইত্যাদির তুলনা হইতে পারে। এইরূপে বিশেষণের তুলনা করার নাম বিশেষণের তারতম্য। সংস্কৃতে বিশেষণের তারতম্য বুঝাইবার জন্য কয়েকটি বিশেষ প্রত্যয় আছে। কিন্তু বাঙ্গলায় বিশেষণের এইরূপ তুলনা করার জন্য কোন প্রত্যয় নাই। খাঁটি বাঙ্গলায় বিশেষণটি ঠিকই থাকে। দুইটি বা দুইয়ের অধিক ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে তুলনা করিয়া একের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ বুঝাইতে হইলে এই অবিকৃত বিশেষণের পূর্ব্বে সাধারণতঃ চেয়ে, থেকে, অপেক্ষা, হইতে, অনেক, অল্প ইত্যাদি যোগ করা হয়। যথা—

'বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়'।

'মায়ের থেকে মাসীর দরদ বেশী'।

'রূপার চেয়ে সোনা দামী'।

বিশেষণের তারতম্যবোধক প্রত্যয় সংস্কৃতে তর, তম ও ঈয়স্, ইষ্ঠ প্রভৃতি। এই প্রত্যয়-যুক্ত কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ বাংলা ভাষায় বহুল ভাবেই প্রচলিত আছে। যথা—বৃহত্তম, উচ্চতর, প্রাচীনতম, শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি। এই সংস্কৃত প্রত্যয় কেবল সংস্কৃত শব্দেই যুক্ত হয়, খাঁটি বাঙ্গলা শব্দে তর, তম ইত্যাদি যোগ করিলে ভুল হইবে। চালাকতর, বোকাতম প্রভৃতি শব্দ বাঙ্গলায় অচল।

নিম্নে তর, তম, ঈয়স্ ও ইষ্ঠ প্রত্যয়ান্ত কতকগুলি বাঙ্গলায় বহু প্রচলিত শব্দের তালিকা দেওয়া গেল।

গুরু	গুরুতর, গরীয়ান্	গুরুতম, গরিষ্ঠ
মহৎ	মহত্তর, মহীয়ান্	মহত্তম, মহিষ্ঠ

বৃদ্ধ	বর্ষীয়ান্, জ্যায়ান্	বর্ষিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ
যুবা	যবীয়ান্, কনীয়ান্	যবিষ্ঠ,
বহু	ভূয়ান্	ভূয়িষ্ঠ
লঘু	লঘুতর, লঘীয়ান্	লঘুতম, লঘিষ্ঠ
পাপী	পাপীয়ান্	পাপিষ্ঠ
অল্প	কনীয়ান্	কনিষ্ঠ
মিষ্ট	মিষ্টতর	মিষ্টতম
বলী	বলীয়ান্	বলিষ্ঠ
বৃহৎ	বৃহত্তর	বৃহত্তম
ধীর	ধীরতর	ধীরতম
প্রিয়	প্রেয়ান্, প্রিয়তর	প্রেষ্ঠ, প্রিয়তম
বলবান্	বলবত্তর	বলবত্তম

পঞ্চম পাঠ

বাচ্য পরিবর্ত্তন

যেখানে কর্ত্তৃপদের পুরুষ অনুসারে ক্রিয়াপদের পুরুষ হয় সেখানে ক্রিয়া কর্ত্তৃবাচ্যে এবং যেখানে কর্ম্মপদের পুরুষ অনুসারে ক্রিয়াপদের পুরুষ হয় সেখানে ক্রিয়া কর্ম্মবাচ্যে হয়। কর্ম্মবাচ্য হইলে সাধারণতঃ কর্ত্তায় তৃতীয়া ও কর্ম্মে প্রথমা বিভক্তি হয়।

আমি মাছটি ধরিয়াছি—এই বাক্যে ক্রিয়া কর্ত্তৃবাচ্যে হইয়াছে, কারণ 'ধরিয়াছি' ক্রিয়াপদটি 'আমি' এই কর্ত্তৃপদের সহিত যুক্ত; ক্রিয়াপদটি উত্তম পুরুষের।

এই বাক্যটির ক্রিয়াকে কর্ম্মবাচ্যে পরিবর্ত্তিত করিতে হইলে কর্ত্তৃপদকে তৃতীয়া বিভক্তি যুক্ত করিয়া 'আমা কর্ত্তৃক', কর্ম্মপদটিকে প্রথমা বিভক্তি যুক্ত করিতে হইবে এবং 'ধরিয়াছি' ক্রিয়াপদকে কর্ম্মের সঙ্গে অন্বিত করিয়া 'ধৃত হইয়াছে' এইরূপ পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

কর্ত্তৃবাচ্য—শিক্ষক মহাশয় রহিমকে পুরস্কার দিলেন।

কর্ম্মবাচ্য—শিক্ষক মহাশয় কর্ত্তৃক রহিমকে পুরস্কার প্রদত্ত হইল।

কর্ত্তৃবাচ্য—আমি এ কাজ করি নাই।

কর্ম্মবাচ্য—আমা কর্ত্তৃক এ কাজ কৃত হয় নাই।

কর্ত্তৃবাচ্য—তিনি এই বইখানি পাঠ করিতেছেন।

কর্ম্মবাচ্য—তাঁহা কর্ত্তৃক এই বইখানি পঠিত হইতেছে।

কিন্তু বর্ত্তমানে এই প্রকারের কর্ম্মবাচ্যের ব্যবহার বাঙ্গলা ভাষার রীতিসিদ্ধ নহে।

ভাববাচ্য ও কর্ম্ম-কর্ত্তৃবাচ্যের প্রয়োগ বাঙ্গলা ভাষায় বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়—এইগুলি বাঙ্গলার বাগ্‌ধারা-সম্মত।

যেখানে ক্রিয়ার কর্ম্ম থাকে না এবং ক্রিয়াপদটি কর্ত্তার সহিত অন্বিত হয় না, সেখানে ক্রিয়ার ভাববাচ্য হয়।

তোমার যাইতে হইবে না।
তোমাকে থামিতে হইবে।

ভাববাচ্যে ক্রিয়া প্রথম পুরুষের এবং কর্ত্তায় দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, ষষ্ঠী বা সপ্তমী বিভক্তি হয়।

ক্রিয়াপদের রূপটি যেখানে কর্ত্তৃবাচ্যের কিন্তু উহার অন্বয় কর্ম্মের সহিত ও কর্ম্মপদটি যেখানে কর্ত্তৃপদের কাজ করে—সেখানে ক্রিয়া কর্ম্ম-কর্ত্তৃবাচ্যে হয়।

নাড়ী দুর্ব্বল লাগে।
চেহারাটা শুক্‌না দেখায়।
বেশী দামী কাপড় বিকায় না।
পূজার বাজারে ছবির বই কাটে।

এই বাক্যগুলিতে ক্রিয়ার কর্ম্ম-কর্ত্তৃবাচ্য হইয়াছে।

থাকা হয়, যাওয়া চলে, জানা আছে, করা হয়, বলা হয়, ধ'রে নেওয়া যাক—প্রভৃতি বাঙ্গলায় বহুল ভাবে ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গলার এই বিশিষ্ট প্রয়োগগুলি প্রায়ই কর্ম্মবাচ্যের।

প্রত্যয় যোগ করিয়া কর্ম্মবাচ্য ও ভাববাচ্য গঠনের রীতি সংস্কৃতের; এই রীতি বাঙ্গলায় প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। বিশ্লেষণাত্মক প্রক্রিয়াই আধুনিক বাঙ্গলায় চলিতেছে। কর্ম্মবাচ্যের প্রয়োগ বাঙ্গলাতে অত্যন্ত বেশী বাড়িয়া গিয়াছে। কতকগুলি ক্ষেত্রে আমরা বুঝিতেও পারি না যে সাধারণ কথাবার্ত্তায় আমরা এত কর্ম্মবাচ্যের ক্রিয়ার ব্যবহার করি। খাওয়া যায়, খাওয়া যায় না, সহা যায়, সওয়া যায় না, করা যায় প্রভৃতি কর্ম্মবাচ্যের প্রয়োগ।

কি চাও ?—কর্ত্তৃবাচ্য ; কিন্তু কি চাই ?—কর্ম্মবাচ্য।

ষষ্ঠ পাঠ

ক্রিয়ার কাল

সময়ানুসারে ক্রিয়ার কালকে সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়—**বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ।**

ক্রিয়ার রূপ ও অর্থের দিক হইতে বিচার করিয়া কালকে মোটামুটি প্রধান দুইটি ভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে—

(১) সরল বা মৌলিক কাল

(২) মিশ্র বা যৌগিক কাল

মূল ধাতুতে প্রত্যয় বা বিভক্তি যোগ করিয়া যে কাল সৃষ্ট হয় তাহা সরল বা **যৌগিক কাল**। মৌলিক কালের সৃষ্টির জন্য অন্য কোন ধাতুর আবশ্যক হয় না।

চল্‌+ই=চলি ; চল্‌+ইল=চলিল ; চল্‌+ইব=চলিব।

মিশ্র বা যৌগিক কালের সৃষ্টি-পদ্ধতি অন্যরূপ। প্রথমতঃ মূল ধাতুর সহিত 'ইয়া' বা 'ইতে' প্রত্যয় যোগ করিয়া উহাকে অসমাপিকা ক্রিয়ায় পরিণত করা হয়। পরে ঐ অসমাপিকা ক্রিয়ার সহিত 'আছ' ধাতুর মৌলিক কালের রূপ যুক্ত করিয়া যে কালের সৃষ্টি করা হয় তাহার নাম **মৌলিক কাল।**

যা+ইতে+আছিলাম=যাইতেছিলাম

ফির্‌+ইতে+আছিল=ফিরিতেছিল

চল্‌+ইয়া+আছিলে=চলিয়াছিলে

বাঙ্গলায় যৌগিক কাল চারিটি ও মৌলিক কাল ছয়টি।

মৌলিক কাল ঃ—

(১) সাধারণ বা নিত্য বর্ত্তমান—যখন সাধারণ ভাবে কোনও ক্রিয়া ঘটিয়া থাকে তখন তাহার নাম সাধারণ বর্ত্তমান বা নিত্য বর্ত্তমান।

'পাখী সব করে রব।'

'কাশীরাম দাস ভণে শুনে পুণ্যবান্।'

রাজা প্রজা পালন করেন।

কোনও অতীত ঐতিহাসিক ঘটনা জানাইবার জন্যও নিত্য বর্ত্তমান প্রযুক্ত হয়।

বিজয়সিংহ লঙ্কা জয় করেন।

হজরৎ মোহাম্মদ মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার করেন।

(২) সাধারণ বা নিত্য অতীত—সচরাচর অতীত সময়ে যে কাজ হইয়াছে, তাহা সাধারণ বা নিত্য অতীত। এইরূপ অতীত বুঝাইতে 'ইল' প্রত্যয়যুক্ত সাধারণ অতীত ব্যবহৃত হয়।

আমি বাড়ী ফিরিলাম।

রাম বনগমন করিলেন।

(৩) নিত্যবৃত্ত অতীত—যে কাজ অতীতে কিছুকাল নিয়মিত ভাবে করা হইত বা যাহা করা এক প্রকার অভ্যাসের মতই ছিল, তাহা বুঝাইতে নিত্য-বৃত্ত অতীতের প্রয়োগ হয়।

দিদিমা প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতেন।

তুমি রোজই কানমলা খাইতে।

(৪) সামান্য ভবিষ্যৎ—যাহা এখন পর্য্যন্ত হয় নাই ভবিষ্যতে হইবে তাহা সামান্য ভবিষ্যৎ। কাজটি পরে হইবে, অল্প পরেও হইতে পারে, অনেক পরেও হইতে পারে।

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাইবে।

আর কখনও একাজ করিব না।

যৌগিক কাল :—

(১) ঘটমান বর্ত্তমান—যে কাজ চলিতেছে, এখনও শেষ হয় নাই, তাহা ঘটমান বর্ত্তমান।

বৃষ্টি পড়িতেছে।

আমি এখন লিখিতেছি।

(২) ঘটমান অতীত—অতীত কালে যে ক্রিয়া চলিতেছিল তাহা ঘটমান অতীত।

রাজকন্যা চুল বাঁধিতেছিলেন।

'আপন মনে গাহিতেছিলাম গান।'

(৩) ঘটমান ভবিষ্যৎ—ভবিষ্যতে যে কাজ ঘটিতে থাকিবে তাহা ঘটমান ভবিষ্যৎ।

তুমি বলিতে থাকিবে, আমি লিখিতে থাকিব।

তুমি গেলেও কাজ চলিতে থাকিবে।

(৪) পুরাঘটিত বর্ত্তমান—যে কাজ অল্প পূর্ব্বে শেষ হইয়াছে কিন্তু যাহার ফল এখনও চলিতেছে তাহা পুরাঘটিত বর্ত্তমান।

রাস্তায় বড় কাদা হইয়াছে

আমি খাইয়াছি।

(৫) পুরাঘটিত অতীত—যে ব্যাপার অনেক পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল তাহার নাম পুরাঘটিত অতীত

আমাদের গ্রামে একবার ডাকাত পড়িয়াছিল।

সেবার বন্যায় সমস্ত দেশ ডুবিয়া গিয়াছিল।

(৬) পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ—অতীতে কোনও কাজ হয়তো হইয়া থাকিবে বা হইয়াছিল ইহা বুঝাইতে পুরাঘটিত ভবিষ্যতের প্রয়োগ হয়।

ঠিক মনে নাই, হয় তো আমি বলিয়া থাকিব।

বোধ হয় এই গল্পটি তুমি মেজদার নিকট হইতে শুনিয়া থাকিবে।



সপ্তম পাঠ

সন্ধি

কথা বলিবার সময় উচ্চারণের সুবিধার জন্য অনেক ক্ষেত্রে দুইটি বর্ণ মিলিয়া এক হইয়া যায়, অনেক সময় একটির প্রভাবে অপরটি বদলাইয়া যায়। পরস্পর সন্নিহিত দুই বর্ণের এইরূপ মিলন বা পরিবর্ত্তনের নাম **সন্ধি**।

সন্ধি দুই প্রকার—**স্বরসন্ধি** ও **ব্যঞ্জনসন্ধি**। স্বরবর্ণের সহিত স্বরবর্ণের সংযোগ বা মিলন হইলে তাহাকে **স্বরসন্ধি** বলা হয় আর ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণের সংযোগ বা মিলনের নাম দেওয়া হয় **ব্যঞ্জনসন্ধি**। বাঙ্গলায় বিসর্গসন্ধি ব্যঞ্জনসন্ধির অন্তর্গত।

স্বরসন্ধি

(১) অকার কিংবা আকারের পর অকার কিংবা আকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া আকার হয়। আকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়।

শুভ + অশুভ = **শুভাশুভ**   দেব + আলয় = **দেবালয়**

কথা + অমৃত = **কথামৃত**   কারা + আগার = **কারাগার**

নব + অন্ন = **নবান্ন**   বেদ + অন্ত = **বেদান্ত**

(২) ইকার কিংবা ঈকারের পর ইকার কিংবা ঈকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঈকার হয়। ঈকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়।

রবি + ইন্দ্র = **রবীন্দ্র**   কবি + ইন্দ্র = **কবীন্দ্র**

অতি + ইত = **অতীত**   অধি + ঈশ্বর = **অধীশ্বর**

শচী + ইন্দ্র = **শচীন্দ্র**   সতী + ঈশ = **সতীশ**

(৩) উকার কিংবা ঊকারের পর উকার কিংবা ঊকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঊকার হয়। ঊকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়।

গুরু + উপদেশ = **গুরূপদেশ**   লঘু + ঊর্ম্মি = **লঘূর্ম্মি**

কটু + উক্তি = **কটূক্তি**।

(৪) অকার কিংবা আকারের পর ইকার কিংবা ঈকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া একার হয়। একার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়।

দেব + ইন্দ্র = **দেবেন্দ্র** পরম + ঈশ্বর = **পরমেশ্বর**

যথা + ইচ্ছা = **যথেচ্ছা** মহা + ঈশ্বর = **মহেশ্বর**

(৫) অকার কিংবা আকারের পর উকার কিংবা ঊকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ওকার হয়। ওকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়।

হিত + উপদেশ = **হিতোপদেশ** চল + ঊর্ম্মি = **চলোর্ম্মি**

মহা + উৎসব = **মহোৎসব** মহা + ঊর্ম্মি = **মহোর্ম্মি**

(৬) অকার কিংবা আকারের পর একার কিংবা ঐকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঐকার হয়। ঐকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়।

এক + এক = **একৈক** রাজ + ঐশ্বর্য্য = **রাজৈশ্বর্য্য**

সদা + এব = **সদৈব** মহা + ঐশ্বর্য্য = **মহৈশ্বর্য্য**

হিত + এষী = **হিতৈষী** মত + ঐক্য = **মতৈক্য**

(৭) অকার কিংবা আকারের পর ওকার কিংবা ঔকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঔকার হয়। ঔকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়।

দিব্য + ওষধি = **দিব্যৌষধি** দিব্য + ঔষধ = **দিব্যৌষধ**

মহা + ওষধি = **মহৌষধি** মহা + ঔষধ = **মহৌষধ**

(৮) অকার কিংবা আকারের পর ঋকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া অর্ হয়। অর্ এর অ পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয় ও র্ পরবর্ণের মস্তকে যায়।

দেব + ঋষি = **দেবর্ষি**

মহা + ঋষি = **মহর্ষি** রাজা + ঋষি = **রাজর্ষি**

(৯) ইকার কিংবা ঈকারের পর ই ঈ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে ই ঈ স্থানে য্ হয়। য্ পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়।

অতি + অন্ত = **অত্যন্ত** অতি + আচার = **অত্যাচার**

প্রতি + এক = **প্রত্যেক** অতি + উক্তি = **অত্যুক্তি**

প্রতি + আদেশ = **প্রত্যাদেশ** অতি + অহিত = **অত্যহিত**

(১০) উকার কিংবা ঊকারের পর উ ঊ ভিন্ন স্বরবর্ণ থাকিলে উকার কিংবা ঊকার স্থানে ব্ হয়।

সু+আগত=**স্বাগত** পশু+অধম=**পশ্বধম**

অনু+এষণ=**অন্বেষণ** অনু+অয়=**অন্বয়**

(১১) একারের পর স্বরবর্ণ থাকিলে একার স্থানে অয়্ হয়। অকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং পরের স্বর য্-কারে যুক্ত হয়।

শে+অন=**শয়ন**

নে+অন=**নয়ন**

(১২) ঐকারের পর স্বরবর্ণ থাকিলে ঐকার স্থানে আয়্ হয়। আকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং পরের স্বর য্-কারে যুক্ত হয়।

গৈ+অক=**গায়ক**

নৈ+অক=**নায়ক**

(১৩) ওকারের পর স্বরবর্ণ থাকিলে ওকার স্থানে অব্ হয়। অকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং পরের স্বর ব্-কারে যুক্ত হয়।

পো+অন=**পবন**

ভো+অন=**ভবন**

(১৪) ঔকারের পর স্বরবর্ণ থাকিলে ঔকার স্থানে আব্ হয়। আকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং পরের স্বর ব্-কারে যুক্ত হয়।

ভৌ+উক=**ভাবুক**

নৌ+ইক=**নাবিক**

অসংস্কৃত বাঙ্গলা কথার সন্ধি করা হয় না।

আমি+আসিব=আম্যাসিব ;

তুমি+আমি=তুম্যামি ; এইরূপ সন্ধি হয় না।

কিন্তু সংস্কৃত ও অসংস্কৃত শব্দের সন্ধি কতকগুলি ক্ষেত্রে বাঙ্গলায় প্রচলিত হইয়া গিয়াছে।

মশা+অরি=**মশারি** বাপ+অন্ত=**বাপান্ত**

খরচ + অন্ত = **খরচান্ত** ঢাকা + ঈশ্বরী = **ঢাকেশ্বরী**

জেলা + অন্তর্গত = **জেলান্তর্গত**

আইন + অনুসারে = **আইনানুসারে**

এইগুলি ছাড়াও বাঙ্গলার কতকগুলি নিজস্ব সন্ধি আছে; সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াই এই সন্ধিগুলি হইয়াছে।

আর + ও = **আরো**

কোন + ও = **কোনো**

তেমন + ই = **তেমনি**

বার + এক = **বারেক**

ক্ষণ + এক = **ক্ষণেক**

দিন + এক = **দিনেক**

ব্যঞ্জন সন্ধি

(১) স্বরবর্ণের পর ছ্ থাকিলে ছ্ স্থানে চ্ছ্ হয়।

পরি + ছদ = **পরিচ্ছদ** অঙ্গ + ছেদ = **অঙ্গচ্ছেদ**

বি + ছেদ = **বিচ্ছেদ** আ + ছাদন = **আচ্ছাদন**

বট + ছায়া = **বটচ্ছায়া**

(২) চ কিংবা ছ্ পরে থাকিলে ত্ ও দ্ স্থানে চ্ হয়।

উৎ + চারণ = **উচ্চারণ** উৎ + ছেদ = **উচ্ছেদ**

সৎ + চরিত্র = **সচ্চরিত্র**

(৩) জ্ কিংবা ঝ্ পরে থাকিলে ত্ ও দ্ স্থানে জ্ হয়।

তৎ + জন্য = **তজ্জন্য** সৎ + জন = **সজ্জন**

উৎ + জ্বল = **উজ্জ্বল**

(৪) ল্ পরে থাকিলে ত্ ও দ্ স্থানে ল্ হয়।

উৎ + লেখ = **উল্লেখ** উৎ + লিখিত = **উল্লিখিত**

(৫) ক্, চ্, ট্, ত্, প্—ইহাদের পর স্বরবর্ণ থাকিলে ক্, চ্, ট্, ত্, প্ স্থানে যথাক্রমে গ্, জ্, ড্, দ্, ব্ হয়।

দিক্ + অন্ত = **দিগন্ত** বাক্ + ঈশ = **বাগীশ**

জগৎ + ঈশ্বর = **জগদীশ্বর** ষট্ + আনন = **ষড়ানন**

জগৎ + ইন্দ্র = **জগদিন্দ্র**

(৬) বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ বর্ণ এবং য্, র্, ল্, ব্, হ্ পরে থাকিলে বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে তৃতীয় বর্ণ হয়।

বাক্ + দত্তা = **বাগ্দত্তা** উৎ + যোগ = **উদ্যোগ**

সৎ + গুরু = **সদ্গুরু** জগৎ + গুরু = **জগদ্গুরু**

(৭) শ্ পরে থাকিলে ত্ ও দ্ স্থানে চ্ ও শ্ স্থানে ছ্ হয়।

উৎ + শৃঙ্খল = **উচ্ছৃঙ্খল** উৎ + শ্বাস = **উচ্ছ্বাস**

চলৎ + শক্তি = **চলচ্ছক্তি**

(৮) ত্ কিংবা দ্-এর পর হ্ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া দ্ধ হয়।

উৎ + হত = **উদ্ধত** তৎ + হিত = **তদ্ধিত**

উৎ + হৃত = **উদ্ধৃত**

(৯) ন্ কিংবা ম্ পরে থাকিলে বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে পঞ্চম বর্ণ হয়।

বাক্ + ময় = **বাঙ্ময়** মৃৎ + ময় = **মৃন্ময়**

জগৎ + নাথ = **জগন্নাথ** জগৎ + মাতা = **জগন্মাতা**

দিক্ + নাগ = **দিঙ্নাগ** দিক্ + মণ্ডল = **দিঙ্মণ্ডল**

কিঞ্চিৎ + মাত্র = **কিঞ্চিন্মাত্র**

(১০) ম্ এর পর য্ র্ ল্ ব্ হ্ শ্ ষ্ স্ থাকিলে ম্ স্থানে অনুস্বার (ং) হয়।

কিম্ + বা = **কিংবা** সম্ + সার = **সংসার**

সম্ + বাদ = **সংবাদ** সম্ + শয় = **সংশয়**

সম্ + যোগ = **সংযোগ** সম্ + শোধন = **সংশোধন**

সম্ + হার = **সংহার** সম্ + লগ্ন = **সংলগ্ন**

(১১) স্পর্শবর্ণ (ক্ হইতে ম্ পর্য্যন্ত বর্ণ) পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার হয় ; অথবা যে বর্গের বর্ণ পরে থাকে, সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়।

সম্ + কীর্ণ = **সংকীর্ণ** অথবা **সঙ্কীর্ণ**

সম্ + খ্যা = **সংখ্যা** অথবা **সঙ্খ্যা**

সম্ + পূর্ণ = **সংপূর্ণ** অথবা **সম্পূর্ণ**

অহম্ + কার = **অহংকার** অথবা **অহঙ্কার**

সম্ + বুদ্ধ = **সংবুদ্ধ** অথবা **সম্বুদ্ধ**

(১২) উৎ উপসর্গের পর স্থা ও স্তন্ভ্ ধাতুর স্-কারের লোপ হয়।

উৎ + স্থান = **উত্থান** উৎ + স্থিত = **উত্থিত**

উৎ + স্তম্ভন = **উত্তম্ভন**

(১৩) বর্গের প্রথম কিংবা দ্বিতীয় বর্ণ অথবা শ্ ষ্ স্ পরে থাকিলে বর্গের তৃতীয় কিংবা চতুর্থ বর্ণ স্থানে প্রথম বর্ণ হয়।

আপদ্ + কাল = **আপৎকাল**

বিপদ্ + কাল = **বিপৎকাল**

বিপদ্ + সময় = **বিপৎসময়**

ক্ষুধ্ + পীড়িত = **ক্ষুৎপীড়িত**

হৃদ্ + কমল = **হৃৎকমল**

(১৪) সম্ ও পরি উপসর্গের পর কৃ ধাতু থাকিলে উপসর্গের পর স্ আগম হয়।

সম্ + কৃত = **সংস্কৃত** পরি + কৃত = **পরিষ্কৃত**

নিম্নলিখিত কয়েকটি **নিপাতনে সিদ্ধ** ব্যঞ্জনসন্ধি আছে, এই পদগুলি বাঙ্গলাতে প্রচলিত আছে—

আ + চর্য্য = **আশ্চর্য্য** হরি + চন্দ্র = **হরিশ্চন্দ্র**

বৃহৎ + পতি = **বৃহস্পতি** বন + পতি = **বনস্পতি**

তৎ + কর = **তস্কর**

বিসর্গ সন্ধি

(১) র্-জাত কিংবা স্-জাত বিসর্গের পর চ্ বা ছ্ থাকিলে বিসর্গস্থানে শ্ হয়।

নিঃ+চয়=**নিশ্চয়** দুঃ+চিন্তা=**দুশ্চিন্তা**

নিঃ+চল=**নিশ্চল** দুঃ+ছেদ্য=**দুশ্ছেদ্য**

দুঃ+চরিত্র=**দুশ্চরিত্র** শিরঃ+ছেদ=**শিরশ্ছেদ**

(২) র্-জাত কিংবা স্-জাত বিসর্গের পর ট্ বা ঠ্ থাকিলে বিসর্গস্থানে ষ্ হয়।

নিঃ+ঠুর=**নিষ্ঠুর**

ধনুঃ+টঙ্কার=**ধনুষ্টঙ্কার**

(৩) র্-জাত কিংবা স্-জাত বিসর্গের পর ত্ বা থ্ থাকিলে বিসর্গ-স্থানে স্ হয়।

মনঃ+তাপ=**মনস্তাপ** দুঃ+তর=**দুস্তর**

নিঃ+তার=**নিস্তার** ইতঃ+ততঃ=**ইতস্ততঃ**

অধঃ+তন=**অধস্তন** নভঃ+তল=**নভস্তল**

(৪) ক্, খ্, প্, ফ্ পরে থাকিলে অকার বা আকারের পরস্থিত বিসর্গস্থানে স্ হয়।

নমঃ+কার=**নমস্কার** পুরঃ+কার=**পুরস্কার**

অয়ঃ+কান্ত=**অয়স্কান্ত** ভাঃ+কর=**ভাস্কর**

এই নিয়মের ব্যতিক্রম :—

শিরঃ+পীড়া=**শিরঃপীড়া**

মনঃ+কষ্ট=**মনঃকষ্ট**

অধঃ+পাত=**অধঃপাত**

অন্তঃ+করণ=**অন্তঃকরণ**

কিন্তু অ, আ ভিন্ন স্বরবর্ণের পরস্থিত বিসর্গস্থানে ষ্ হয়।

আবিঃ+কার=**আবিষ্কার** ভ্রাতুঃ+পুত্র=**ভ্রাতুষ্পুত্র**

নিঃ+কর=**নিষ্কর** নিঃ+ফল=**নিষ্ফল**

(৫) স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ অথবা য্, র্, ল্, ব্, হ্ পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত 'র্-জাত' বিসর্গস্থানে র্ হয়।

অন্তঃ+আত্মা=**অন্তরাত্মা** পুনঃ+আগত=**পুনরাগত**

অন্তঃ+গত=**অন্তর্গত** অন্তঃ+যামী=**অন্তর্যামী**

প্রাতঃ+আশ=**প্রাতরাশ** প্রাতঃ+ভোজন=**প্রাতর্ভোজন**

অন্তঃ+হিত=**অন্তর্হিত** পুনঃ+জন্ম=**পুনর্জন্ম**

(৬) অ, আ, ভিন্ন স্বরবর্ণের পরস্থিত বিসর্গের পর যদি স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ এবং য, র্, ল্, ব্, হ্ থাকে তাহা হইলে বিসর্গ-স্থানে র্ হয়।

দুঃ+অবস্থা=**দুরবস্থা** দুঃ+লভ=**দুর্লভ**

দুঃ+নাম=**দুর্নাম** দুঃ+ভাবনা=**দুর্ভাবনা**

নিঃ+অবধি=**নিরবধি** নিঃ+গত=**নির্গত**

দুঃ+গম=**দুর্গম** ধনুঃ+বিদ্যা=**ধনুর্বিদ্যা**

(৭) অকারের পরস্থিত স্-জাত বিসর্গের পর যদি বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ পঞ্চম বর্ণ অথবা য্ র্ ল্ ব্ হ্ থাকে, তাহা হইলে বিসর্গ ও পূর্ব্ববর্ত্তী আকার—উভয়ে মিলিয়া ওকার হয়।

মনঃ+যোগ=**মনোযোগ** মনঃ+ভাব=**মনোভাব**

মনঃ+রম=**মনোরম** বয়ঃ+বৃদ্ধি=**বয়োবৃদ্ধি**

তপঃ+বল=**তপোবল** যশঃ+লাভ=**যশোলাভ**

অধঃ+গতি=**অধোগতি** সদ্যঃ+জাত=**সদ্যোজাত**

যৎপরঃ+নাস্তি=**যৎপরোনাস্তি**

অষ্টম পাঠ

ণত্ব ও ষত্ব বিধান

বাঙ্গলা ভাষায় মূর্দ্ধন্য 'ণ্' কিম্বা মূর্দ্ধন্য 'ষ্' ধ্বনি নাই। এজন্য বাঙ্গলা ভাষার ধ্বনির বিচারে ঠিক 'ণত্ব'-বিধান বা 'ষত্ব'-বিধান আসে না। কিন্তু বাঙ্গলা ভাষায় বহু সংস্কৃত শব্দ রহিয়াছে। এগুলিকে বাঙ্গলা ভাষা কখনও বাদ দিয়া চলিতে পারে না। বাঙ্গলা ভাষাকে এইগুলি ঐশ্বর্য্যশালী করিয়াছে। সুতরাং বাঙ্গলাভাষায় ব্যবহৃত এই সমস্ত সংস্কৃত শব্দের 'ণ্' ও 'ষ্' এর অবস্থান বুঝিবার জন্যই বাঙ্গলা ভাষার আলোচনায় প্রধানতঃ 'ণত্ব' ও 'ষত্ব' বিধানের প্রয়োজন।

অনেক বিদেশী শব্দও বাঙ্গলায় প্রচলিত আছে। বিশেষতঃ ইংরাজী এবং আরও কোনও কোনও ইউরোপীয় ভাষার অনেক শব্দ বাঙ্গলায় গৃহীত ও স্বীকৃত হইয়াছে। ক্রমশঃই এইরূপ শব্দের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। এইরূপ বিদেশাগত শব্দের বানানেও উষ্মবর্ণ (শ্, স্, ষ্) কিংবা দন্ত্য বর্ণের (ণ্, ন্) উচ্চারণ ও লিখনপদ্ধতি বিষয়ে একটা নিয়ম দরকার। এই নিয়ম এখনও সম্পূর্ণ ঠিক হয় নাই। যে শব্দগুলি ভাষায় বহুদিন প্রচলিত থাকার ফলে একরূপ চলিয়া গিয়াছে, যাঁহারা ভাষা ব্যবহার করেন তাঁহারা যে শব্দের বানান যেরূপ মানিয়া লইয়াছেন, সেইরূপ শব্দের সেই বানানই মোটামুটি চলিতে পারে। কতকগুলি শব্দে দুই রকম বানানই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। ইহাতেও কোন দোষ নাই।

সাধারণতঃ বাঙ্গলায় 'ণ্' ও 'ষ্' ধ্বনির উচ্চারণ করা হয় না। সুতরাং মোটামুটি ভাবে 'ন্' ও 'শ্' লিখিলে উচ্চারণের দিক্ দিয়া কোনও ভুল হয় না। কিন্তু বানান সব সময়েই উচ্চারণের অনুযায়ী করা যায় না। প্রচলিত রূপের পরিবর্ত্তনে নানারকম অসুবিধা ও গোলমাল হওয়ার খুবই সম্ভাবনা আছে। খাঁটি বাঙ্গলা শব্দে 'ণ'ত্ব ও 'ষ'ত্ব বিধির প্রচলিত রীতির উল্লেখ করা যাইতে পারে মাত্র।

ণত্ব

অনেক বাঙ্গলা শব্দের মূল উৎপত্তি খুঁজিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে সেগুলি সংস্কৃত শব্দ হইতে উৎপন্ন। এইরূপ শব্দে অনেক সময় 'ণ্'-ই রাখা হয়; যেমন 'কাণ', সোণা' প্রভৃতি। 'কাণ' শব্দ সংস্কৃত 'কর্ণ' শব্দ হইতে এবং 'সোণা' শব্দ সংস্কৃত 'স্বর্ণ' শব্দ হইতে আসিয়াছে। এইরূপ 'রাণী' (সংস্কৃত 'রাজ্ঞী',) 'কাঁকণ' (সংস্কৃত 'কঙ্কণ') ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি শব্দের বানানে 'দন্ত্য ন' ও 'মূর্দ্ধন্য ণ' দুইই চলিয়া থাকে। যেমন—রাণী—রানী, কাণ—কান, সোণা—সোনা, ঠাকরুণ্—ঠাকুরান্।

আবার কোথাও এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেমন—'বামুন' (সংস্কৃত 'ব্রাহ্মণ'), গিন্নী (সংস্কৃত 'গৃহিণী')।

কতকগুলি খাঁটি বাঙ্গলা শব্দ যাহাদের কোনও সংস্কৃত মূল পাওয়া যায় না, তাহাদেরও বানানে এই নিয়ম দেখা যায়। যথা—ঝরণা—ঝরনা; হারাণো—হারানো; পরণ—পরন ইত্যাদি

বিদেশী শব্দেও সংস্কৃতের অনুকরণে 'ণ্' অনেকে লিখিয়া থাকেন। ইহা ঠিক নয়। এই সব শব্দে খাঁটি বাঙ্গলা উচ্চারণ করিয়া 'দন্ত্য ন্' লিখিলেই ঠিক হইবে। 'পুরাণ' শব্দের দেখাদেখি বাঙ্গলাতে অনেকে 'কোরাণ' লিখিয়া থাকেন। কিন্তু 'কোরান্' বা মূল আরবী 'কোর-আন্' বা 'কুর-আন্' লেখাই সঙ্গত। এইরূপ অনেকে লেখেন 'গভর্ণর', 'ট্রেণ', 'রিপণ', 'জার্ম্মাণী', 'ইরাণ', 'কুর্ণিশ', 'দূরবীণ' ইত্যাদি। এই শব্দগুলি দন্ত্য 'ন্' দিয়া লেখাই উচিত। যথা—'গভর্নর', 'ট্রেন', 'রিপন', 'জার্ম্মানী', 'ইরান্', 'কুর্নিশ', 'দূরবীন্' ইত্যাদি।

সাধারণতঃ ক্রিয়াপদে বাঙ্গলায় 'ণত্ব' হয় না। 'করুন', 'করেন', 'ধরেন', 'মারেন' ইত্যাদি।

সংস্কৃত শব্দের মূর্দ্ধন্য 'ণ্' বাঙ্গলায় অবিকৃতই থাকে এইরূপ শব্দে সংস্কৃত ণত্ব-বিধান প্রযোজ্য; এ বিষয়ে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম নীচে দেওয়া হইল

(১) ঋ, র্, ষ্ এই তিনটি বর্ণের পরবর্ত্তী পদ-মধ্যস্থিত ন-কার ণ-কার হয়। যথা:—

ঋণ, কর্ণ, স্বর্ণ, বর্ণ, অর্ণব, তৃণ, তৃষ্ণা, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, পূর্ণ, তূর্ণ, মৃণাল, ঘৃণা উত্তীর্ণ ইত্যাদি।

(২) যদি ঋ-কার, র-কার, ষ-কারের পরে এবং ন-কারের মধ্যে স্বরবর্ণ, ক-বর্গ, প-বর্গ, য্, র্, ল্, ব্, হ্ এবং 'ং' (অনুস্বার) এর ব্যবধান থাকে, তাহা হইলেও 'দন্ত্য ন্' 'মূর্দ্ধন্য ণ্' হইয়া যায়। যথা:—

কৃপণ, চরণ, হরিণ, রেণু, রুক্মিণী, রুগ্‌ণ, অর্পণ, তর্পণ, দর্পণ, বক্ষ্যমাণ, ব্রাহ্মণ, প্রয়াণ, শ্রবণ, বৃংহণ ইত্যাদি।

অন্য বর্ণ ব্যবধান থাকিলে অথবা সমাসবদ্ধ পদের বেলায় এই নিয়ম খাটে না। যথা:—মর্দ্দন, দর্শন, অর্চ্চনা, রচনা, প্রার্থনা, ত্রিনয়ন, দুর্নাম, সর্ব্বনাম, রঘুনন্দন ইত্যাদি।

(৩) সমাস হইলেও কতকগুলি শব্দে 'ন্' 'ণ্' হয়। যথা:—পূর্ব্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ, অগ্রহায়ণ, পরায়ণ, রামায়ণ, অগ্রণী, উত্তরায়ণ, শূর্পণখা ইত্যাদি।

(৪) টবর্গ-যুক্ত দন্ত্য 'ন্' মূর্দ্ধন্য 'ণ্' হয়। যথা:—লুণ্ঠন, দণ্ড, কণ্টক, অবগুণ্ঠন, ভাণ্ড, দণ্ড, চণ্ড, ভণ্ড ইত্যাদি।

কিন্তু তবর্গযুক্ত দন্ত্য 'ন্' ণত্ব-কারণ-সত্ত্বেও মূর্দ্ধন্য 'ণ্' হয় না। যথা:—রন্ধন, ক্রন্দন, বৃন্ত, গ্রন্থ, ভ্রান্তি ইত্যাদি।

(৫) প্র, পরা, পরি, নির্ এই কয়েকটি উপসর্গ ও অন্তর্ শব্দের পরস্থিত নদ্, নম্, নশ্, নহ, নী, নুদ্, অন্, হন্ এই কয়টি ধাতুর দন্ত্য 'ন্' মূর্দ্ধন্য 'ণ্' হয়। যথা:—প্রণয়, প্রণাম, প্রণীত, পরিণতি, প্রহণন, প্রণিপাত, প্রণিধান, প্রণোদিত, প্রণাশ; কিন্তু **প্রনষ্ট** শব্দে 'ন্' থাকে।

(৬) কতকগুলি শব্দে স্বাভাবিক 'ণ্' বা নিত্য 'ণ'-কার দেখা যায়।

গণ গুণ শণ বাণ বিপণি চিক্কণ।

অণু কণ শোণ শাণ বণিক কঙ্কণ॥

লাবণ্য শোণিত বাণী কল্যাণ নিপুণ।
বাণিজ্য কণিকা পুণ্য ফণী ফণা ঘুণ ॥
পাণি মণি তূণ পণ আপণ লবণ।
গণ্য গৌণ বেণী বীণা পণ্য বেণু কোণ ॥

ষত্ব

সংস্কৃত শব্দে 'ষ' থাকিলে তাহা হইতে জাত বাঙ্গলা শব্দেও সচরাচর 'ষ'ই লিখিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে খাঁটি 'ষ' এর উচ্চারণ বাঙ্গলায় নাই, বাঙ্গলায় তিনটি উষ্মবর্ণ ই (শ, স, ষ) সাধারণতঃ তালব্য 'শ'র মত উচ্চারিত হইয়া থাকে। কচিৎ 'স' এর উচ্চারণ (যেমন 'সহস্র' শব্দে) পাওয়া যায়। কিন্তু মূর্দ্ধন্য 'ষ' এর উচ্চারণ একেবারেই পাওয়া যায় না। কাজেই ইহা কেবল বানানের বিষয় মাত্র। যথা:—ষাঁড় (মূল ষণ্ড), ষোল (ষোড়শ), আঁষ (মূল আমিষ), ঘষা (মূল ঘর্ষ), নিষুতি (মূল নিষুপ্তিক) ইত্যাদি।

কতকগুলি শব্দে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। যথা:—মিন্‌সে (মূল মনুষ্য); 'নিশুতি' শব্দের ব্যবহারও আছে।

বিদেশী শব্দে মূর্দ্ধন্য 'ণ'এর মতই মূর্দ্ধন্য 'ষ' বর্জ্জনীয়। কিন্তু কেহ কেহ এইরূপ শব্দে 'ষ' লিখিয়া থাকেন, যথা:—মুষলমান, জিনিষ, খরগোষ, আপ্‌শোষ, হ্যারিষণ্‌ ইত্যাদি। এই সব ক্ষেত্রে 'ষ' বর্জ্জন করাই ভাষায় রীতিসম্মত হইবে। 'মুসলমান', 'জিনিস', 'খরগোস', 'আপ্‌শোস্‌', 'হ্যারিসন' ইত্যাদিই লিখা উচিত।

ষ্টেশন, খ্রীষ্ট প্রভৃতি স্টেশন, খ্রীস্ট লিখাই সঙ্গত।

যে সমস্ত **সংস্কৃত** শব্দে 'ষ' অবিকৃত থাকে, সচরাচর বাঙ্গলায় প্রচলিত এইরূপ শব্দের **ষত্ববিধানের** কতকগুলি নিয়ম দেওয়া হইল।

(১) অ-কার বা আ-কার ভিন্ন স্বরবর্ণ ও ক্‌ র্‌ পূর্ব্বে থাকিলে পরবর্ত্তী দন্ত্য 'স' মূর্দ্ধন্য 'ষ' হয়। যথা:—ভবিষ্যৎ, শুশ্রূষা, মুমূর্ষু,

জিগীষা, পরিষ্কার, আবিষ্কার, শ্রীচরণেষু, শ্রদ্ধাস্পদেষু, কল্যাণীয়েষু, বন্ধুবরেষু ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম—'সাৎ' প্রত্যয়ের দন্ত্য 'স' মূর্দ্ধণ্য 'ষ' হয় না। যথা:—ধূলিসাৎ, ভূমিসাৎ, পাত্রসাৎ, অগ্নিসাৎ ইত্যাদি।

(২) অভি, অতি, অধি, পরি, প্রতি, সু, বি, অনু প্রভৃতি কতকগুলি উপসর্গের পর কতকগুলি ধাতুর দন্ত্য 'স' মূর্দ্ধন্য 'ষ' হইয়া থাকে। যথা:— অভিষেক (সিচ্ ধাতু), অধিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান (স্থা ধাতু), সুষুপ্ত (স্বপ্ ধাতু), সুষমা (সম্ ধাতু), বিষম, প্রতিষেধ, অনুষঙ্গ, পরিষদ্, নিষেধ, বিষণ্ণ, বিষাদ, ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম—অনুসন্ধান, বিসর্গ, অনুস্বার ইত্যাদি।

(৪) কতকগুলি **স্বাভাবিক 'ষ'ত্বের** উদাহরণ:—

দূষণ ঔষধ ভূষা বিষাণ ভাষণ।
আষাঢ় মূষিক বর্ষা ওষধি পোষণ॥
প্রত্যূষ ঈষৎ শেষ ভীষ্ম শোষ ষড়ানন।
মহিষ বিশেষ মেষ বিষ পৌষ বিশেষণ॥
পাষাণ কষায় বাষ্প সর্ষপ প্রদোষ।
প্রহর্ষ নিকষ শ্লেষ বৃষ তৃষ্ণা রোষ॥

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত নিত্যসম্বন্ধী অব্যয়গুলি ব্যবহার করিয়া পাঁচটি পৃথক্ বাক্য রচনা কর:—
বটে—কিন্তু; বরং—তথাপি; যদি—তথাপি; হয়—নতুবা; হয়—নয়।

২। উদাহরণ দাও:—
কর্ত্তায় 'কে' বিভক্তি; করণে 'হইতে' বিভক্তি; অপাদানে 'এ' বিভক্তি; অধিকরণে বিভক্তির লোপ।

৩। 'আপনি' শব্দ তিন পুরুষেই ব্যবহৃত হয় দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

৪। স্ত্রীলিঙ্গে কিরূপ হইবে বল:—
বসু, তনু, অগ্নি, ঘটক, গুরু, ব্রহ্মা।

৫। দৃষ্টান্ত দাও:—

ঐতিহাসিক বর্ত্তমান, কর্ম্মে ৭মী, করণে ৫মী, অকর্ম্মক ধাতুর সকর্ম্মকরূপে ব্যবহার।

৬। যে কোন কারকেই যে 'এ' বিভক্তির প্রয়োগ হইতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত দাও।

৭। সন্ধি কর:—

উপরি+উপরি ; মনু+আদি ; ইতঃ+ততঃ ; স্ব+অল্প ; তপঃ+বন ; সৎ+চিৎ+আনন্দ ; সৎ+আলাপ ; মুখ+ছবি ; অন্য+অন্য ; কটু+উক্তি ; বাক্+দান ; বিপদ্+চয় ; অন্তঃ+দৃষ্টি ; সম্+পূর্ণ ; সৎ+আশয় ; প্রতি+উপকার ; বহিঃ+জগৎ ; সরঃ+বর ; বি+ছেদ।

৮। সন্ধি বিচ্ছেদ কর:—

যথেষ্ট ; চন্দ্রোদয় ; ভাবুক ; পুরোহিত ; নমস্কার ; পুনরপি ; চতুষ্কোণ ; ততোধিক ; ভাস্কর ; আদ্যন্ত ; পূর্ণেন্দু।

৯। শুদ্ধ কর:—

দুরাবস্থা ; অত্যাধিক ; বয়োপ্রাপ্ত ; তেজোপূর্ণ ; বিদ্যুতালোক ; পশ্বাধম ; অনুমত্যানুসারে ; ভূম্যাধিকারী ; অত্যান্ত ; তেজময় ; সন্যাসী ; উপরোক্ত ; পৃথকান্ন।

১০। কারণ নির্দ্দেশপূর্ব্বক নিম্নলিখিত শব্দগুলি শুদ্ধ কর:—

ভবিস্যৎ, লাবন্য, সর্ব্বনাম, বর্ণনা. প্রনাম, প্রণষ্ট, ভূমিষাৎ, পুরুস, মুমূর্ষু।

তৃতীয় অধ্যায়

বাক্য

প্রথম পাঠ

বাক্যের লক্ষণ

যে পদসমূহের সাহায্যে বক্তার মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, তাহাকে **বাক্য** বলে। আমাদের মুখের ভাষা বা লিখিবার ভাষা কতকগুলি শব্দ লইয়া গঠিত। কিন্তু এই শব্দগুলিকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করিয়া আমরা মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারি না। কথা বলিবার পূর্ব্বে বা লিখিবার পূর্ব্বে আমাদের মনের ভাবটি একটি বিশেষ মূর্ত্তি ধারণ করে—মনের সেই অব্যক্ত ভাবকে ভাষার আকারে রূপ দান করিবার চেষ্টা হইতেই বাক্যের উৎপত্তি। ভাষার আলোচনার সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অংশই বাক্যের আলোচনা। বাক্যে পদগুলিকে কিভাবে সাজাইতে হইবে, বাঙ্গলায় বাক্যগঠনের সাধারণ নিয়ম কি, কোন্ কোন্ স্থানে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়—এই সমস্ত বিষয় বিশেষ মনোযোগ দিয়া লক্ষ্য করিতে হইবে।

দুই বা ততোধিক শব্দের সাহায্যে বাক্য গঠিত হয়।

(ক) তুমি যাও।

(খ) গত রাত্রিতে ঘরে চোর ঢুকিয়াছিল।

(গ) আকাশে অনেক নক্ষত্র দেখিতেছি।

উপরের এই তিনটি কথাই বাক্য। উহাদের সাহায্যে মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

বাক্য রচনার অনেক কৌশল আছে, বাক্যের অন্তর্গত পদগুলিকে নানা-ভাবে সাজাইয়া ভাবপ্রকাশের নানা রীতি বাঙ্গলায় প্রচলিত আছে। কিন্তু

সর্ব্বাগ্রে নির্ভুলভাবে বাক্য রচনা করিতে শিক্ষা করা উচিত। নির্ভুল বা বিশুদ্ধ বাক্যের লক্ষণ কি ? কোন্ দোষে দুষ্ট হইলে বাক্যের অর্থ ও তাৎপর্য্য সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় না তাহা জানা প্রয়োজন। বিশুদ্ধ বাক্যে—**আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা** ও **আসত্তি**—এই তিনটি অত্যন্ত আবশ্যক। এই তিনটির একটিও যদি না থাকে, তবে বাক্য কিছুতেই অর্থ প্রকাশ করিতে পারে না।

১। বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণভাবে বুঝিবার জন্য বাক্যের একটি বা একাধিক শব্দ শুনিয়া অন্য শব্দটি শুনিবার জন্য মনে যে ইচ্ছা জাগে, তাহার নাম **আকাঙ্ক্ষা**। যদি বলা হয়—

(ক) তুমি এখন——

তবে এই পর্য্যন্ত শুনিয়া আরও কিছু শুনিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা থাকে, ইহার পরে একটি ক্রিয়াপদ না শুনা পর্য্যন্ত এই আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না। 'তুমি এখন' কেবল এই দুইটি পদ শুনিবার পর একটি ক্রিয়াপদ শুনিবার আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে এবং সেই ক্রিয়াপদটি (যথা, 'যাও') না বলা পর্য্যন্ত বাক্য সম্পূর্ণ হইবে না।

(খ) গত রাত্রিতে ঘরে——ঢুকিয়াছিল।

উপরের এই শব্দ কয়টি শুনিয়াও সম্পূর্ণ অর্থপ্রতীতি হইতেছে না। একটি কর্ত্তৃপদ শুনিবার আকাঙ্ক্ষা এখানে রহিয়া গিয়াছে এবং উহা (যথা, 'চোর') না শুনা পর্য্যন্ত বাক্য সম্পূর্ণ হয় না।

(গ) আকাশে অনেক——দেখিতেছি।

এখানেও একটি কর্ম্মপদ (যথা, 'নক্ষত্র') শুনিবার আকাঙ্ক্ষা আছে।

২। বাক্যের অন্তর্গত বিভিন্ন পদগুলি পরস্পরের সহায়তায় বাক্যের সম্পূর্ণ অর্থটিকে প্রকাশ করে। বাক্যার্থপ্রকাশে পদসমূহের যে ক্ষমতা, তাহার নাম **যোগ্যতা**। বাক্যের অন্তর্গত পদগুলি অর্থপ্রকাশে বাধা না দিয়া সহায়ক হইলে যোগ্যতা প্রমাণিত হয়।

(ক) তুমি এখন স্বর্গে আছ।

স্বর্গস্থ কোনও আত্মীয়কে উদ্দেশ্য করিয়া এ কথা বলিলে সুন্দর অর্থপ্রতীতি

হয় ; কিন্তু বক্তা যাহাকে বলিতেছেন, তাহার উপস্থিতিতে এ কথা বলা সঙ্গত হয় না। যে লোক বর্ত্তমানে সম্মুখে আছে, তাহার তখনই স্বর্গে অবস্থান কল্পনা করা যায় না।

(খ) গত রাত্রিতে ঘরে পাহাড় ঢুকিয়াছিল।

পাহাড়ের ঘরে ঢুকিবার যোগ্যতা নাই ; সুতরাং ব্যাকরণ অনুসারে কোন দোষ না থাকিলেও অর্থপ্রতীতির ব্যাঘাত হয় বলিয়া ইহা বাক্য নয়।

(গ) আকাশে অনেক গাধা দেখিতেছি।

এখানেও অর্থবোধের ব্যাঘাত হয়, কারণ গাধার আকাশে যাওয়ার কোনও যোগ্যতা দেখা যাইতেছে না।

৩। অর্থবোধের সহায়তার জন্য বাক্যের অন্তর্গত পদগুলিকে পরস্পর যথাযোগ্য স্থানে (আসন্ন বা নিকটবর্ত্তী স্থানে) স্থাপন বা ব্যবহারের নাম **আসত্তি**।

'পুকুর হইতে উঠিয়া আসিয়া দুধ খাও'—এই ভাবে পদগুলি সাজাইবার ফলে অর্থবোধে কোন অসুবিধা বা বিলম্ব হয় না, অর্থবোধে কোনও অস্পষ্টতাও নাই। কিন্তু যদি বলা হয় 'দুধ হইতে উঠিয়া আসিয়া পুকুর খাও', তবে অর্থ-বোধে অসুবিধা হইবে।

খাও দুধ পুকুর আসিয়া হইতে উঠিয়া

অথবা

উঠিয়া হইতে দুধ পুকুর আসিয়া খাও

অথবা

দুধ হইতে পুকুর উঠিয়া আসিয়া খাও

অথবা

খাও আসিয়া উঠিয়া পুকুর হইতে দুধ

ইহাদের মধ্যে কোনখানেই আসত্তি নাই বলিয়া অর্থবোধ সুস্পষ্ট হইল না, বক্তার মনের ভাবও প্রকাশিত হইল না।

বাক্যের অন্তর্গত বিভিন্ন পদগুলি কোন্‌টি কাহার পরে বসিবে—এ সম্বন্ধে

বিভিন্ন ভাষার বিভিন্ন রীতি। আমাদের বাঙ্গলা ভাষায় বাক্য রচনার একটি বিশেষ রীতি আছে। কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, অধিকরণ এবং ক্রিয়া, সম্বন্ধ, সম্বোধন পদ বাক্যের কোন্ কোন্ স্থানে থাকিবে, বিশেষণ বা ক্রিয়া-বিশেষণ প্রভৃতি কোথায় বসিবে—এ বিষয়ে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আছে। রচনাকে বিশিষ্ট অর্থবোধক ও মধুর করিবার জন্য সুলেখকগণ অবশ্য বহু স্থলেই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছেন। কিন্তু প্রথম শিক্ষার্থিগণের পক্ষে সাধারণ নিয়মগুলি মনে রাখিয়া চলাই কর্ত্তব্য ও নিরাপদ্; প্রথমেই অসাধারণ হইবার চেষ্টা করিতে নাই। সুলেখকগণের রচনা লইয়া আলোচনা ও নিজে কিছু কিছু লিখিবার চেষ্টা করা নিতান্ত প্রয়োজন। ইহার ফলে কিছু দিনের মধ্যেই ভাষার প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় ঘটে ও নিজস্ব একটা রচনাভঙ্গী গড়িয়া উঠে। বাঙ্গলা-রচনার সাধারণ নিয়মগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) কর্ত্তৃপদ বাক্যের প্রথমে বসিবে এবং সমাপিকা ক্রিয়া পদটি বাক্যের শেষে বসিবে। কর্ম্মপদ থাকিলে তাহা সকর্ম্মক ক্রিয়ার অব্যবহিত পূর্ব্বে বসিবে।

'সময় কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না।'

'আমি তোমাকে একখানি বই দিয়াছিলাম।'

'সময়' ও 'আমি' কর্ত্তৃপদ, বাক্যের প্রথমে বসিয়াছে; 'করে না' ও 'দিয়াছিলাম' সমাপিকা ক্রিয়া, বাক্যের শেষে বসিয়াছে; 'বই' কর্ম্মপদ, 'দিয়াছিলাম' এই ক্রিয়াপদের পূর্ব্বে বসিয়াছে।

নিম্নে এই নিয়মের কতকগুলি ব্যতিক্রম দেখান যাইতেছে।

'সেই বনে ছিল এক বাঘ।'

'সমস্ত দিন বনের মধ্যে ফিরিয়া সন্ধ্যাবেলায় বহুকষ্টে পথ খুঁজিয়া অনাহারে মৃতপ্রায় অবস্থায় মৃত্যুঞ্জয় গ্রামে ফিরিল।'

'ঘরে কেউ নাই, কেবল বিছানার উপর পড়িয়া রহিয়াছে একটি তাকিয়া।'

'বিরাট ভারতবর্ষের বিশাল সভ্যতার সমগ্র রূপটি লইয়া অমর জ্যোতিতে ফুটিয়া রহিয়াছে সেই নাম—'মহাভারত'।

কর্ত্তৃপদ ও ক্রিয়াপদ এই দুইটির মধ্যে ব্যবধান দূর করিয়া কাছাকাছি আনিবার জন্য বা কর্ত্তৃপদের প্রাধান্য বিশেষভাবে প্রকাশ করিবার জন্য স্থান-বিশেষে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়।

(২) বাঙ্গলা বাক্যে ক্রিয়াপদ উহ্য রাখিলেও চলে। অনেক সময় ক্রিয়াপদ উহ্য রাখিলেই বাক্যটি সুন্দর হয়।

"প্রকাণ্ড রাজ্য। রাজধানী অযোধ্যা। অযোধ্যার রাজা দশরথ। দশরথের তিন রাণী। বড় রাণীর নাম কৌশল্যা, মেজ রাণীর নাম কৈকেয়ী আর ছোট রাণীর নাম সুমিত্রা। তিন রাণীর চার ছেলে। কৌশল্যার ছেলে রাম······ইত্যাদি।"

"খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী অতীতপ্রায়। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্যের সুশাসন-মহিমায় ভারতভূমি সম্পত্তিশালিনী। মহারাষ্ট্ররাজ মহাবীর দ্বিতীয় পুলকেশীর বীরত্বে ভারতের বীরত্বকীর্ত্তি উজ্জ্বলতর। নালন্দায় ভারতীর অপূর্ব্ব পূজায় ভারতের গৌরব চারিদিকে পরিব্যাপ্ত।"

(৩) করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ পদ ব্যবহারের বিশেষ কোনও বাঁধাধরা নিয়ম নাই। এইগুলি কর্ম্মপদের পূর্ব্বেও বসে, পরেও বসে, কখন কখন বাক্যের শেষেও ব্যবহৃত হয়।

'ছুরি দিয়া সে পেন্সিল কাটিতেছে।' 'সে পেন্সিল ছুরি দিয়া কাটিতেছে।' (দ্বিতীয় বাক্যটিতে করণ স্থানভ্রষ্ট হওয়ায় একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হইতেছে—ছুরি দিয়া, বঁটি দিয়া নয়, ইহাই এখানকার প্রধান বৈশিষ্ট্য।)

'আজ দেখিলাম জজ সাহেব দাঁত মাজিতেছেন নিমের ডাল দিয়া।'

এইরূপে এক একটি কারকের বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য সম্প্রদান, অপাদান, অধিকরণ পদগুলিকে স্থানচ্যুত করিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে।

(৪) সম্বোধন পদ বাক্যের প্রথমেই বসে, কখনও কখনও শেষেও বসে।

(৫) যাহার সহিত সম্বন্ধ বুঝায়, সম্বন্ধপদ তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে বসে।

(৬) বিশেষণ বিশেষ্যের পূর্ব্বে, বিশেষণের বিশেষণ বিশেষণের পূর্ব্বে ও ক্রিয়ার বিশেষণ ক্রিয়াপদের পূর্ব্বে বসে।

সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম গদ্যে যেমন দেখা যায়, পদ্যে তদপেক্ষা অনেক বেশী। বাক্যে শব্দস্থাপনার সাধারণ নিয়ম বাঙ্গলায় এইরূপ :—

সীতা লক্ষ্মণকে ফল দিলেন (কর্ত্তা, সম্প্রদান, কর্ম্ম, ক্রিয়া)। সীতা কুটীর হইতে বাহির হইলেন (কর্ত্তা, অপাদান, ক্রিয়া)। সীতা পঞ্চবটী বনে বাস করিতেছিলেন (কর্ত্তা, অধিকরণ, ক্রিয়া)। রাজা স্বহস্তে দরিদ্রকে ধন দিলেন (কর্ত্তা, করণ, সম্প্রদান, কর্ম্ম, ক্রিয়া)।

অনুশীলনী

১। শব্দগুলি যথাস্থানে বসাও :—

(ক) করিলে, সত্যের, হয়, পাপ, অপলাপ।

(খ) নাই, ভিন্ন, শান্তি, মরণ, আমার।

(গ) করিয়াছিলেন, দেশবন্ধু, উৎসর্গ, জীবন, সেবায়, স্বদেশের।

(ঘ) বঙ্গোপসাগরে, হইতে, পড়িতেছে, গঙ্গা, হিমালয়, হইয়া, উৎপন্ন।

(ঙ) ছিলেন, মহর্ষি, কণ্বের, কন্যা, পালিতা, শকুন্তলা।

(চ) অনেকানেক, ভারতের, স্থানেই, দৌরাত্ম্য, ব্যাঘ্রের, বিলক্ষণ।

(ছ) আমি, জলপান, করিয়া, সরোবরে, দূর, ক্লান্তি, করিলাম, এক, ও, স্নান।

(জ) ছিলাম, আমি, এতদিন, ডুবিয়া, আমোদে, বিলাসের।

(ঝ) কি, বাপের, নাম, তোমার ?

২। বাঙ্গলা বাক্যের রীতি অনুসারে নিম্নলিখিত বাক্যটির পদগুলি যথাস্থানে সাজাইয়া বসাও :—

আমার হাতে দেখিতেছ সেই পুঁথিখানি যাহা দিয়াছিলে কাল তুমি রমেশকে পড়িতে এবং পাঠ করিয়া যাহা পারে নাই হাস্য সংবরণ করিতে রমেশ।

দ্বিতীয় পাঠ

উদ্দেশ্য ও বিধেয়

প্রত্যেক বাক্যের দুইটি অংশ—**উদ্দেশ্য** ও **বিধেয়**।

যাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া (যাহার সম্বন্ধে কিছু) বলা হয়, তাহাকে **উদ্দেশ্য** বলে এবং উদ্দেশ্যের সম্বন্ধে যাহা বলা হয় তাহাকে **বিধেয়** বলে।

বাক্যটি যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন, একটি উদ্দেশ্য ও একটি বিধেয় থাকিবেই। ইহাদের মধ্যে কোন একটি না থাকিলে বাক্য হয় না।

'বালকেরা মাঠে খেলিতেছে।'

এই বাক্যে 'বালকেরা' উদ্দেশ্য ; কারণ এই বাক্যে বালকদের সম্বন্ধে কিছু বলা হইতেছে। 'মাঠে খেলিতেছে' এই অংশটি বিধেয় ; কারণ এই অংশটিতে উদ্দেশ্য বালকদের লক্ষ্য করিয়া খেলার কথা বলা হইতেছে।

উদ্দেশ্য বা বিধেয় একটি মাত্র পদ লইয়া হইতে পারে, দুই বা ততোধিক পদের সমষ্টিও হইতে পারে। সুতরাং উদ্দেশ্য ও বিধেয়কে ইচ্ছামত সম্প্রসারিত বা বর্দ্ধিত করা যায়। উদ্দেশ্যের পূর্ব্বে ও পরে কতকগুলি সহায়ক বা পরিপোষক শব্দ যোগ করিয়া উদ্দেশ্যের সম্প্রসারণ করা যাইতে পারে। ঐরূপে বিধেয় অংশটিও সম্প্রসারিত করা যায়। উদ্দেশ্যের সহায়ক ও পরিপোষক শব্দগুলিকে মোটামুটি উদ্দেশ্যের বিশেষণ বলে। যে শব্দগুলির দ্বারা বিধেয়কে সম্প্রসারিত করা যায়, সেইগুলিকে স্থূলভাবে বিধেয়-বিশেষণ বলা যাইতে পারে। নিম্নে উদ্দেশ্য ও বিধেয় সম্প্রসারণের কতকগুলি নিয়ম ও দৃষ্টান্ত দেখান হইল।

উদ্দেশ্য-সম্প্রসারণের উপায়

(ক) বিশেষণ-যোগে—

'নদী' প্রবাহিত হইতেছে।

'খরস্রোতা নদী' প্রবাহিত হইতেছে।

(খ) সমকারক পদসংযোগে—

'খরস্রোতা গঙ্গা নদী প্রবাহিত হইতেছে।

(গ) বিশেষণস্থানীয় পদ বা পদসমষ্টির সংযোগে—

'ভারতবাসীর মাতৃস্বরূপিণী খরস্রোতা গঙ্গা নদী' প্রবাহিত হইতেছে।

(ঘ) অসমাপিকা ক্রিয়াসংযুক্ত পদসমষ্টির সংযোগে—

'ভারতবাসীর মাতৃস্বরূপিণী খরস্রোতা গঙ্গা নদী হিমালয় হইতে বহির্গত হইয়া' প্রবাহিত হইতেছে।

বিধেয়-সম্প্রসারণের উপায়

(ক) ক্রিয়া-বিশেষণ-যোগে—

গঙ্গা নদী 'প্রবাহিত হইতেছে'।

গঙ্গা নদী 'বেগে প্রবাহিত হইতেছে'।

(খ) ক্রিয়া-বিশেষণ-যুক্ত বাক্যাংশ দ্বারা—

গঙ্গা নদী 'চিরকাল ধরিয়া বেগে প্রবাহিত হইতেছে'।

(গ) অন্যান্য কারক দ্বারা—

গঙ্গা নদী 'চিরকাল ধরিয়া সাগরাভিমুখে বেগে প্রবাহিত হইতেছে'।

(ঘ) করিয়া, পূর্ব্বক, নিবন্ধন, দিয়া প্রভৃতি শব্দ বা সেই সমস্ত শব্দযুক্ত বাক্যাংশ-সংযোগে—

গঙ্গা নদী 'চিরকাল ধরিয়া সমস্ত দেশকে ফলে জলে শস্যে পূর্ণ করিয়া সাগরাভিমুখে বেগে প্রবাহিত হইতেছে'।

অনুশীলনী

১। উদ্দেশ্য বসাও :—

—আসিয়া পড়িয়াছে। —এখনও উঠে নাই। —কোথায় যাইতেছে? —দপ্ দপ্ করিতেছে। —সহজে ভাঙ্গিয়া যায়। —স্বর্গ অপেক্ষাও গরীয়সী। —লুঠ করিয়া লইয়াছে। —ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কবি। —কলরব করিতেছে। —বনে বাস করে। জলে—আছে। —অমূল্য সম্পদ্। —ক্ষণস্থায়ী। —শাশ্বত। — উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। —কাটিয়া যাইতেছে। —বিপন্নের বন্ধু। — সহজ।

২। নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যের পর বিধেয় অংশ যোগ কর :—

স্বর্ণ। ক্ষমা। জনতা। কোকিল। বিদ্যাসাগর। তাজমহল। অতিথি। আশা। শিশু। আকবর। নগরবাসিগণ। বালিকা। কলিকাতা। পরিশ্রম। প্রজাপীড়ক নরপতি। দরদী কবি। তেজস্বিনী রমণী। দুর্লঙ্ঘ্য হিমাচল। আকাশভরা নক্ষত্রগুলি। রামানুজ লক্ষ্মণ। অবরুদ্ধকণ্ঠ ভক্ত।

৩। উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশ বর্দ্ধিত কর :—

(১) ছেলেরা খেলিতেছে।
(২) বাঙ্গলা আমাদের মাতৃভাষা।
(৩) রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন।
(৪) সৈন্যগণ পরাজিত হইল।
(৫) গ্রামগুলি ডুবিয়া গিয়াছে।
(৬) বিজয়সিংহ সিংহল জয় করেন।
(৭) পক্ষিগণ খাদ্যান্বেষণে বহির্গত হইল।
(৮) যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে।
(৯) অভিনয় ভাল হইয়াছে।
(১০) সিংহ গর্জ্জন করিতেছে।
(১১) তর্কবাগীশ মহাশয় বড় ব্যস্তবাগীশ।

তৃতীয় পাঠ

বাক্যের শ্রেণীভেদ ও বাক্য-পরিবর্ত্তন

বাক্য তিন প্রকার—**সরল**, **জটিল** বা **মিশ্র** ও **যৌগিক**।

(১) একটি মাত্র কর্তৃপদ ও একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া লইয়া যে বাক্য গঠিত হয় তাহা **সরল** বাক্য।

'দাদা কলিকাতা গিয়াছেন।'

'বন্যায় গ্রামখানি ভাসিয়া গিয়াছে।'

'সম্রাট্ শাহ্‌জাহান পরলোকগতা পত্নীর স্মৃতিরক্ষার জন্য অপূর্ব্ব তাজমহল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।'

উল্লিখিত বাক্যগুলি সরল বাক্যের দৃষ্টান্ত।

(২) একটি প্রধান বাক্য এবং তাহার আনুষঙ্গিক এক বা একাধিক অপ্রধান বাক্য লইয়া যে বৃহৎ বাক্যটি গঠিত হয় তাহা **জটিল** বা **মিশ্র** বাক্য।

'যে ছেলেটি প্রথম হইয়াছিল, সে খুব পরিশ্রমী।'

'যদি তোমার কাছে টাকা থাকে, তবে তাহাকে দিও।'

'যখন বাহিরের কোলাহল একে একে নীরব হইয়া যাইত, তখন নদীর সেই কুলুকুলু ধ্বনির মধ্যে কত কথাই শুনিতে পাইতাম।'

উল্লিখিত বাক্যগুলি জটিল বা মিশ্র বাক্যের দৃষ্টান্ত।

(৩) এক বা ততোধিক সরল বা জটিল বাক্য যদি 'ও', 'এবং', 'অতএব', 'সুতরাং', 'কিন্তু' প্রভৃতি অব্যয় দ্বারা সংযুক্ত হইয়া এবং 'যদিও' ইত্যাদি অব্যয়ের দ্বারা বিযুক্ত হইয়া একটি বৃহৎ বাক্য গঠন করে, তবে সেই বৃহৎ বাক্যকে **যৌগিক** বাক্য বলে।

'আমি গরীব, কিন্তু আমার মন সঙ্কীর্ণ নয়।'

'ডাক্তারবাবু তাড়াতাড়ি আসিয়া রোগী দেখিলেন এবং দর্শনী লইয়াই

প্রস্থান করিলেন।' 'সর্ব্বসমক্ষে সে অপরাধ স্বীকার করিয়াছে, সুতরাং দণ্ড তাহাকে ভোগ করিতে হইবেই।'

উল্লিখিত বাক্যগুলি যৌগিক বাক্যের দৃষ্টান্ত।

যে তিন প্রকার বাক্যের কথা বলা হইতেছে, তাহাদের এক এক শ্রেণীর বাক্যকে অন্য শ্রেণীতে রূপান্তরিত বা পরিবর্ত্তিত করিতে পারা যায়, অথচ ইহাতে অর্থের কোন তারতম্য ঘটে না। সরল বাক্যকে জটিল ও যৌগিক বাক্যে, জটিল বাক্যকে সরল ও যৌগিক বাক্যে এবং যৌগিক বাক্যকে সরল ও জটিল বাক্যে পরিবর্ত্তিত করিতে হইলে কিরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হয়, নিম্নে তাহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল।

সরল হইতে জটিল (মিশ্র)

সরল—ধনহীন জীবন বৃথা।

জটিল—যাহার ধন নাই, তাহার জীবন বৃথা।

সরল—সত্যবাদীকে সকলে বিশ্বাস করে।

জটিল—যে সত্য কথা বলে, তাহাকে সকলে বিশ্বাস করে।

সরল—আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

জটিল—আমার যতদূর সাধ্য, আমি ততদূর চেষ্টা করিব।

সরল—চতুষ্পদ জন্তুগণের মধ্যে গরু সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী।

জটিল—যে সমস্ত জন্তুর চারি পা আছে, গরু তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী।

সরল—তিনি তের বৎসর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

জটিল—তাঁহার বয়স যখন তের বৎসর, তখন তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

সরল—আশ্রিতরক্ষণ বলবানের ধর্ম্ম।

জটিল—যাহারা আশ্রিত, তাহাদিগকে রক্ষা করা বলবানের ধর্ম্ম।

অথবা

যাহাদের বল আছে, আশ্রিতরক্ষণ তাহাদের ধর্ম্ম।

সরল বাক্যকে জটিল বাক্যে রূপান্তরিত করিতে হইলে সরল বাক্যের অন্তর্গত কোনও একটি পদ বা পদসমষ্টিকে সম্প্রসারিত করিয়া একটি অংশকে খণ্ড বাক্যে বা অপ্রধান বাক্যে এবং অপর অংশটিকে প্রধান বাক্যে পরিণত করিতে হয়।

সরল হইতে যৌগিক

সরল—ফসলের অবস্থা দেখিয়া কৃষক কাঁদিয়া ফেলিল।

যৌগিক—কৃষক ফসলের অবস্থা দেখিল এবং কাঁদিয়া ফেলিল।

সরল—জ্ঞানার্জ্জন করিতে হইলে, পরিশ্রম করা উচিত।

যৌগিক—যদি জ্ঞানার্জ্জন করিতে চাও, তবে পরিশ্রম কর।

সরল—সে অসুস্থ বলিয়া পরীক্ষা দিল না।

যৌগিক—সে অসুস্থ ছিল, সেইজন্য পরীক্ষা দিল না।

সরল—তাহার খাওয়া-পরার কোন চিন্তা নাই।

যৌগিক—তাহার খাওয়ার কোন চিন্তা নাই এবং পরারও কোন চিন্তা নাই।

সরল—দরিদ্র হইলেও তাঁহার মন ছোট নয়।

যৌগিক—তিনি দরিদ্র, কিন্তু তাঁহার মন ছোট নয়।

সরল—বাড়ীতে গিয়া ভিক্ষুকটিকে একটি পয়সা দিও।

যৌগিক—বাড়ীতে যাও এবং ভিক্ষুকটিকে একটি পয়সা দাও।

সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তরিত করিতে হইলে সরল বাক্যের অন্তর্গত কোনও পদ বা পদসমষ্টিকে ভাঙ্গিয়া নিরপেক্ষ খণ্ড বাক্যে পরিণত করিতে হইবে এবং প্রয়োজন অনুসারে সংযোজক, বিযোজক অথবা নিমিত্তার্থক অব্যয়ের প্রয়োগ করিতে হইবে।

জটিল হইতে সরল

জটিল—যে মিথ্যা কথা বলে, তাহাকে কেহ বিশ্বাস করে না।

সরল—মিথ্যাবাদীকে কেহ বিশ্বাস করে না।

জটিল—আমাদের বিদ্যালয়ের যিনি প্রধান শিক্ষক ছিলেন, তিনি আজ মারা গিয়াছেন।

সরল—আমাদের বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আজ মারা গিয়াছেন।

জটিল—ফলের মধ্যে আম যে শ্রেষ্ঠ, ইহা সকলেই জানে।

সরল—সকলেই আমকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানে।

জটিল—সূর্য্য যখন উদিত হইলেন, তখন পক্ষিগণ নীড় পরিত্যাগ করিল।

সরল—সূর্য্যোদয়ের সময় পক্ষিগণ নীড় পরিত্যাগ কবিল।

জটিল—যে ভদ্রলোকটি গাড়ীচাপা পড়িয়াছিলেন, তিনি এখন ভাল হইয়াছেন।

সরল—গাড়ীচাপা-পড়া ভদ্রলোকটি এখন ভাল হইয়াছেন।

জটিল—তুমি যে ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তেমন দেশ আর পৃথিবীতে নাই।

সরল—তোমার জন্মভূমির মত দেশ আর পৃথিবীতে নাই।

জটিল বাক্যকে সরল বাক্যে পরিবর্ত্তিত করিতে হইলে জটিল বাক্যের অন্তর্গত অপ্রধান বাক্যাংশকে সঙ্কুচিত করিয়া—সমাসবদ্ধ পদ বা পদসমষ্টিতে পরিণত করিয়া একটিমাত্র কর্ত্তৃপদ ও ক্রিয়াপদ দিয়া সমস্ত বাক্যটিকে একটি বাক্যে পরিণত করিতে হয়।

জটিল হইতে যৌগিক

জটিল—যদি তুমি সকলকে ভালবাসিতে পার, তবে তোমার মন শুদ্ধ হইবে।

যৌগিক—তুমি সকলকে ভালবাস, তোমার মন শুদ্ধ হইবে।

জটিল—এখন হইতে মন দিয়া পড়াশুনা না করিলে পরীক্ষার ফল ভাল হইবে না।

যৌগিক—এখন হইতে মন দিয়া পড়াশুনা কর, নতুবা পরীক্ষার ফল ভাল হইবে না।

জটিল—যদি তুমি বড় হইতে চাও, আগে ছোট হও।

যৌগিক—আগে তুমি ছোট হও, তবে বড় হইবে।

জটিল—রবীন্দ্রনাথ যে এ যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি, তাহাতে সন্দেহ নাই।

যৌগিক—রবীন্দ্রনাথ এ যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি, ইহাতে সন্দেহ নাই।

জটিল—যদি সস্তায় মাল কিনিতে পার, তবে এবার মোটা লাভ করিতে পারিবে।

যৌগিক—সস্তায় মাল কেন, মোটা লাভ করিতে পারিবে।

জটিল—সেদিন যে সিকিটি হারাইয়া গিয়াছিল, তাহা আজ পাইয়াছি।

যৌগিক—সেদিন এই সিকিটি হারাইয়াছিল ; আজ ইহা পাইয়াছি।

জটিল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে পরিবর্ত্তিত করিতে হইলে জটিল বাক্যের মধ্যগত গৌণ খণ্ডবাক্য বা বাক্যগুলিকে একটি বৃহৎ বাক্যে পরিণত করিয়া প্রয়োজন অনুসারে সংযোজক বা বিয়োজক অব্যয় যোগ করিতে হয়।

অনেক স্থলে 'কমা' বা 'সেমিকোলন' দিলেই চলে, অব্যয় দিতে হয় না।

যৌগিক হইতে সরল

যৌগিক—এই কথা শুনিয়া সকলেই কাঁদিতে লাগিল, কিন্তু একজন কাঁদিল না।

সরল—এই কথা শুনিয়া একজন ছাড়া সকলেই কাঁদিতে লাগিল।

যৌগিক—দশরথ পুত্রশোকে কাতর হইলেন এবং কয়েকদিনের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করিলেন।

সরল—দশরথ পুত্রশোকে কাতর হইয়া কয়েকদিনের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিলেন।

যৌগিক—এখনি রওনা হও, নতুবা গাড়ী ধরিতে পারিবে না।

সরল—এখনি রওনা না হইলে গাড়ী ধরিতে পারিবে না।

যৌগিক—তাহার চুল পাকিয়াছে কিন্তু বুদ্ধি পাকে নাই।

সরল—তাহার চুল পাকিলেও বুদ্ধি পাকে নাই।

যৌগিক—আমি পারি নাই, কিন্তু তুমি পারিবে।

সরল—আমি না পারিলেও তুমি পারিবে।

যৌগিক—যদি তুমি সকলকেই ভালবাসিতে পার, তবে তোমার ভাল হইবে।

সরল—সকলকে ভালবাসিলেই তোমার ভাল হইবে।

যৌগিক বাক্যকে সরল বাক্যে পরিবর্ত্তিত করিতে হইলে যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত ক্ষুদ্র বাক্যাংশ বর্জ্জন করিয়া একটিমাত্র ক্রিয়া রাখিতে হইবে এবং বর্জ্জিত বাক্যাংশকে পদে বা পদসমষ্টিতে পরিণত করিতে হইবে।

যৌগিক হইতে জটিল

যৌগিক—রামলালের বয়স কম ছিল, কিন্তু দুষ্টবুদ্ধি কম ছিল না!

জটিল—যদিও রামলালের বয়স কম ছিল, তথাপি দুষ্টবুদ্ধি কম ছিল না।

যৌগিক—বাবু না খেয়ে কাছারী চলিয়া গেলেন, তথাপি মা উঠিলেন না।

জটিল—যদিও বাবু না খেয়ে কাছারী চলিয়া গেলেন, তথাপি মা উঠিলেন না।

যৌগিক—সে সারাজীবন অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছে, কিন্তু শান্তি পায় নাই।

জটিল—যদিও সে সারাজীবন অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছে, কিন্তু শান্তি পায় নাই।

যৌগিক—সে দরিদ্র, কিন্তু তাহার আদর্শ অন্যের অনুকরণীয়।

জটিল—যদিও সে দরিদ্র, তথাপি তাহার আদর্শ অন্যের অনুকরণীয়।

যৌগিক বাক্যকে জটিল বাক্যে পরিণত করিতে হইলে যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত প্রধান বাক্যাংশগুলির মধ্যে একটি ব্যতীত অন্যান্য বাক্যগুলিকে অপ্রধান বাক্যাংশে পরিণত করিতে হইবে এবং যখন, যদিও ইত্যাদি অপেক্ষা-সূচক অব্যয় ব্যবহার করিতে হইবে। লক্ষ্য রাখিতে হইবে—ইহা যেন নিরপেক্ষ না হয়।

অনুশীলনী

১। জটিল বাক্যে পরিবর্ত্তিত কর ঃ—

(ক) নিয়ম-শৃঙ্খলা না থাকিলে সমাজ গড়িয়া উঠে না।

(খ) কায়িক পরিশ্রম করিলে আত্মসম্মানের হানি হয় না।

(গ) উপার্জ্জনশীল ব্যক্তি পৈতৃক ভিটা ত্যাগ করিয়া শহরে চলিয়া যায়

(ঘ) পল্লীগ্রামবাসী মানুষ সুখে কাল কাটায়।

(ঙ) পরোপকারী সকলের প্রিয়।

(চ) বিদ্যার বিনিময় কর, তবে আর একটি বিদ্যা পাইবে।

(ছ) বস্ত্র দাও, ইহার শীত যাইবে।

(জ) অপব্যয় কর, পরিণামে অবশ্য দুঃখ পাইবে।

(ঝ) দার্জ্জিলিং যাও, কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখিতে পাইবে।

(ঞ) বৃথা বাক্য ব্যয় কর, আয়ুঃক্ষয় হইবে।

২। যৌগিক বাক্যে পরিণত কর :—

(ক) গুরুভোজন করিলে স্বাস্থ্যের হানি হয়।

(খ) সে সারাজীবন অর্থোপার্জ্জন করিয়াও সুখী হইতে পারে নাই।

(গ) অধ্যবসায় করিলে ফললাভ অবশ্য হইবে।

(ঘ) অনুসন্ধিৎসু অনেক কিছু জানিতে পারে।

(ঙ) তোমার পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়িয়া গিয়াছে।

(চ) তুমি যখন দেশে ফিরিয়া আসিবে, তখন দেশের মর্য্যাদা বুঝিবে।

(ছ) তুমি যদি পরের দুঃখ দূর কর, ভগবান্ তোমার দুঃখ দূর করিবেন।

(জ) কালিদাস যে মহাকবি, ইহাতে কাহারও সন্দেহ নাই।

(ঝ) বেদ যে অতি প্রাচীন, ইহা সর্ব্বসম্মত।

(ঞ) তুমি যদি পরকে প্রতারণা কর, তুমিও প্রতারিত হইবে।

৩। সরল বাক্যে পরিণত কর :—

(ক) তুমি যখন আসিয়াছিলে, তখনই তিনি আসিয়াছিলেন।

(খ) তুমি যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সে দেশের মত আর দেশ নাই।

(গ) যে অনবরত চিন্তা করে, তাহার কোন সুখ নাই।

(ঘ) যে মানুষকে ভালবাসে, সে ভগবান্‌কে ভালবাসে।

(ঙ) শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা সকলেরই শ্রোতব্য।

(চ) চিড়িয়াখানায় যাও, অনেক কিছু দেখিতে পাইবে।

(ছ) ভোরে ওঠ, তোমার স্বাস্থ্য ভাল থাকিবে।

(জ) এখন হইতে চেষ্টা কর, তবেই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে।

(ঝ) নিজের দুঃখকে দুঃখ বলিয়া বুঝ ; তবেই পরের দুঃখ বুঝিতে পারিবে।

(ঞ) তুমি টাকা দাও, তবে ইহা পাইবে।

চতুর্থ পাঠ

বাক্য-সঙ্কোচন

একটি ক্ষুদ্র বাক্যকে উহার উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশ বর্দ্ধিত করিয়া কিভাবে একটি বৃহৎ বাক্যে পরিণত করা যায়, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। একটি বৃহৎ বাক্যকে কিরূপে সংক্ষিপ্ত করা যায়, সেই বিষয়ই এই পাঠের প্রধান আলোচ্য :

জটিল ও যৌগিক বাক্যকে কিভাবে সরল বাক্যে পরিবর্ত্তিত করিয়া সঙ্কুচিত করা যায়, তাহা পূর্ব্বপাঠে আলোচিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত বাক্য-সঙ্কোচনের জন্য কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়ের দ্বারা গঠিত শব্দ এবং সমাসবদ্ধ শব্দেরও সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। বাক্যের মধ্যে একটি বাক্যাংশকে এইভাবে একটি পদে পরিণত করা যায়, অথচ তাহাতে অর্থের কোন পরিবর্ত্তন হয় না।

নিম্নে কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া হইল :—

যে উপকারীর উপকার স্বীকার করে না—**অকৃতজ্ঞ**। যে উপকারীর অনিষ্ট করে—**কৃতঘ্ন**। এ পর্য্যন্ত যাহার শত্রু জন্মে নাই—**অজাতশত্রু**। যাহা পূর্ব্বে শোনা যায় নাই—**অশ্রুতপূর্ব্ব**। অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছা—**অনুসন্ধিৎসা**। যাহা বিনা কষ্টে লাভ করা যায়—**অনায়াসলভ্য**। যাহা পূর্ব্বে হয় নাই—**অভূতপূর্ব্ব**। যাহা পূর্ব্বে দেখা যায় নাই—**অদৃষ্টপূর্ব্ব**। যাহার অন্য দিকে মন নাই—**অনন্যমনাঃ**। যাহা দগ্ধ করা যায় না—**অদাহ্য**। যে প্রবাসে থাকে না—**অপ্রবাসী**। যাহার ঋণ নাই—**অঋণী, অনৃণী**। যিনি দার পরিগ্রহ করেন নাই—**অকৃতদার**। যাহার পুত্র নাই—**অপুত্রক**। যাহার পত্নীবিয়োগ হইয়াছে—**বিপত্নীক**। যাহার প্রতিবিধান করা যায় না—**অপ্রতিবিধেয়**। পূর্ব্বে যাহার আস্বাদন করা হয় নাই—**অনাস্বাদিতপূর্ব্ব**। যিনি ভালমন্দ বিবেচনা না করিয়া কার্য্য করেন—**অবিবেকী**। অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া কার্য্য করা—**অবিমৃশ্যকারিতা**। যাহা

অনুকরণের অযোগ্য—**অননুকরণীয়**। যিনি পণ্ডিত না হইয়াও নিজেকে পণ্ডিত মনে করেন—**পণ্ডিতম্মন্য**। পরলোকে যাহার বিশ্বাস নাই—**নাস্তিক**। যে নারী সূর্য্যকে কখনও দেখে নাই—**অসূর্য্যম্পশ্যা**। যত দিন জীবন থাকিবে —**আজীবন**। যাহার পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ হয়—**জাতিস্মর**। যাহা জলে জন্মে—**জলজ**। যাহার আশ্রয় নাই—**নিরাশ্রয়**। সমুদ্র হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত—**আসমুদ্রহিমালয়**। প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া—**প্রাণপণে**। পাদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত—**আপাদমস্তক**। যাহা চিবাইয়া খাওয়া যায়—**চর্ব্ব্য**। যাহার চূড়ায় চন্দ্র আছে—**চন্দ্রচূড়**। অপনয়ন করা কষ্টসাধ্য এমন (কলঙ্ক) **দুরপনেয়**। যাহা কখনও ভাবা যায় না—**অভাবনীয়**। যাহা চুষিয়া খাওয়া যায়—**চূষ্য** (চোষ্য)। হনন করিবার ইচ্ছা—**জিঘাংসা**। যে পরের মুখ চাহিয়া থাকে—**পরমুখাপেক্ষী**। পরের অন্নে যে জীবনধারণ করে—**পরান্নজীবী**। যাহা নত করা যায় না—**অনমনীয়**। যাহা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে —**চিরন্তন**। জয় করিবার ইচ্ছা—**জিগীষা**। যাহার জন্য কর দিতে হয় না— **নিষ্কর**। যে পরের ছিদ্র (দোষ) খুঁজিয়া বেড়ায়—**পরচ্ছিদ্রান্বেষী**। প্রথমে যাহা মধুর, কিন্তু পরিণামে নহে—**আপাতমধুর**। যাহা সহজে সিদ্ধ হয়— **সহজসাধ্য**। পরিণাম কি হইবে না ভাবিয়া যে কার্য্য করে—**অপরিণামদর্শী**। যে আপনাকে কৃতার্থ বলিয়া মনে করে—**কৃতার্থম্মন্য**। যাহা পান করা যায়—**পেয়**। যে স্বর বীণার স্বরকে নিন্দা করে—**বীণানিন্দিত**। কি করা কর্ত্তব্য তাহা নির্ণয়ে অসমর্থ যে—**কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়**। যাহা বাক্যে বর্ণনা করা যায় না—**অনির্ব্বচনীয়**। যাহাতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়—**হৃদয়-বিদারক**। শূল পাণিতে যাহার—**শূলপাণি**। যাহাকে জয় করা যায় না— **অজেয়**। যাহার সর্ব্বস্ব হৃত হইয়াছে—**হৃতসর্ব্বস্ব**। যাহা সহজে পরিপাক করা যায় না—**দুষ্পাচ্য**। জায়া ও পতি—**দম্পতী**। স্ত্রীর বশীভূত যে—**স্ত্রৈণ**। যে বৃদ্ধি পাইতেছে—**বর্দ্ধিষ্ণু**। যাহা খুব শীতল নয়, খুব উত্তপ্ত নয়—**নাতিশীতোষ্ণ**। যিনি মুক্তি ইচ্ছা করেন—**মুমুক্ষু**। যাহার শেষ সময় (মৃত্যু) উপস্থিত হইয়াছে—**মুমূর্ষু**। উপকার করিবার ইচ্ছা—**উপচিকীর্ষা**।

যে স্ত্রীলোক প্রিয় বাক্য বলে—**প্রিয়ংবদা**। যাহা মর্ম্মে আঘাত করে—**মর্ম্মন্তুদ**। যাহারা নিয়ত একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমন করে—**যাযাবর**। যিনি ন্যায়শাস্ত্র জানেন—**নৈয়ায়িক**। যিনি ব্যাকরণ জানেন—**বৈয়াকরণ**। যাঁহার কলাজ্ঞান আছে—**কলাবিৎ**। যাহা অবশ্য ঘটিবে—**অবশ্যম্ভাবী**। যাহা মাটি ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উঠে—**উদ্ভিদ্**। ফল পাকিলে যে সকল গাছ মরিয়া যায়—**ওষধি**। যাহার দুই প্রকার অর্থ হয়—**দ্ব্যর্থ**। ভোজনের ইচ্ছা—**বুভুক্ষা**। যাহা অতি কষ্টে নিবারণ করা যায়—**দুর্নিবার**। যে অল্প কথা বলে—**অল্পভাষী**। যাহা সহজে ভাঙ্গিয়া যায়—**ভঙ্গুর**। যে সকল দ্রব্য ভোজন করে—**সর্ব্বভুক্**। শোভন হৃদয় যাহার—**সুহৃৎ**। জানু পর্য্যন্ত (লম্বিত)—**আজানু**। কর্ণ পর্য্যন্ত (বিস্তৃত)—**আকর্ণ**। যে পুনঃ পুনঃ রোদন করে—**রোরুদ্যমান**। ক্ষমার যোগ্য—**ক্ষমার্হ**। যাহার দাড়ী গোঁফ উঠে নাই—**অজাতশ্মশ্রু**। যাহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে—**মৃতদার**। যে বেতন গ্রহণ করে না—**অবৈতনিক**। যে অগ্রে জন্মিয়াছে—**অগ্রজ**। যে পরে জন্মিয়াছে—**অনুজ**। যে জন্মে নাই—**অজ**। যাহার অন্য কোন উপায় নাই—**অনন্যোপায়**। যাহাকে মান্য করা যায়—**মাননীয়**। যাহাকে পূজা করা যায়—**পূজনীয়**। যে পরের শুভ অনুধ্যান করে—**শুভানুধ্যায়ী**। যাহা নিবারণ করা যায় না—**অনিবার্য্য**। যাহার সংযম নাই—**অসংযমী**। পরের উপকার করিবার ইচ্ছা—**পরোপচিকীর্ষা**। যিনি দিনে একবারমাত্র আহার করেন—**একাহারী**। যিনি জীবিত থাকিয়াও মৃত—**জীবন্মৃত**। যে মৃগকে বিদ্ধ করে—**মৃগাবিৎ**। যে গাছ অন্য গাছের উপরে জন্মে—**পরগাছা**। যেখানে ঋণ সালিশী দ্বারা স্থির হয়—**ঋণসালিশী**। স্বয়ং সৃষ্ট হইয়াছেন যিনি—**স্বয়ম্ভু**। খাওয়ার নিমিত্ত খরচ—**খাইখরচ**।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত বাক্যাংশগুলি অর্থের পরিবর্তন না করিয়া সংক্ষিপ্ত কর :—

যে প্রাণী আকাশে বিচরণ করে। যিনি ইন্দ্রকে জয় করিয়াছিলেন। যিনি ইন্দ্রিয় জয়

করিয়াছেন। যাহা সহজে উচ্চারণ করিতে পারা যায় না। যাহা সহজে করিতে পারা যায় না। যাহা সহজে আরোগ্য করা যায় না। কোন কিছু হইতে যাহার ভয় নাই। যে পিতৃহত্যা করিয়াছে। যে নিজেকে হত্যা করিয়াছে। যে বিদেশে থাকে না। যে সহজে ভয় পায়। যাহার অন্ত নাই। কোন্‌টা দিক্ কোন্‌টা বিদিক্ (কোণ এ সম্বন্ধে যাহার জ্ঞান নাই। যে নিজেকে বীর মনে করে। শূদ্রজাতীয়া স্ত্রী। উপকার করিবার ইচ্ছা। যে নারী সূর্য্যকে দেখে নাই। যাহা পঞ্চভূত দ্বারা গঠিত। যাহা ভস্ম ছিল না, পরে ভস্ম হইয়াছে। যিনি দারপরিগ্রহ করেন নাই। যাহা সম্পন্ন করিতে ব্যয় হয়। যিনি অধিক কথা বলেন না।

২। নিম্নরেখ অংশগুলি সংক্ষিপ্ত করিয়া নিম্নলিখিত বাক্যগুলি পুনরায় লিখ :—

(ক) যে ভূমিতে উৎপাদিকা শক্তি নাই তাহাতে সার দাও।

(খ) তাঁহার দুঃখ সকলের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করে।

(গ) ভয়ে আমার শরীর পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত কাঁপিতে লাগিল।

(ঘ) দশরথের পুত্র রামচন্দ্র তাড়কা বধ করিয়াছিলেন।

(ঙ) যে কৃত উপকার স্মরণ না করে তাহার কিছুতেই নিস্তার নাই।

(চ) নিদ্রা আমাদের বিশ্রাম দান করিয়া থাকে।

(ছ) যাহার অভিমান নাই, সেই সুখী।

(জ) তিনি আর পঙ্‌ক্তিতে ঠাঁই পাইবার উপযুক্ত নহেন।

পঞ্চম পাঠ

বাক্য-সংযোজন ও বাক্য-বিয়োজন

পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত দুই বা ততোধিক বাক্যকে একটি বাক্যে পরিবর্ত্তিত করা যায়। অর্থের কোন ব্যতিক্রম না করিয়া পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত একাধিক বাক্যকে একটি বাক্যে পরিবর্ত্তিত করার নাম **বাক্য-সংযোজন**।

বিচ্ছিন্ন অথচ সম্বন্ধযুক্ত বাক্যসমূহকে কি ভাবে একটিমাত্র বাক্যে পরিণত করা যায়, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে —

বিচ্ছিন্ন বাক্যাবলী :—

(১) আমি ঘোড়ায় উঠিলাম।

(২) ঘোড়াটাকে ঘন ঘন কষাঘাত করিতে লাগিলাম।

(৩) তখন সে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল।

(৪) তাহার গতি ঠিক বিদ্যুতের মত দ্রুত হইল।

(৫) ঘোড়া উত্তর দিক্ লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিল।

সংযুক্ত বাক্য :—

আমি ঘোড়ায় উঠিয়া ঘন ঘন কষাঘাত করিতেই সে উত্তর দিক্ লক্ষ্য করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে বিদ্যুদ্-গতিতে ছুটিতে লাগিল।

বিচ্ছিন্ন বাক্যাবলী :—

(১) বালক গুরুতর অপরাধ করিয়াছিল।

(২) গুরুমহাশয় সেখানে উপস্থিত হইলেন।

(৩) তিনি বালককে মারিলেন না।

(৪) সে ভয় পাইয়াছিল।

(৫) কিন্তু সে সত্য কথা বলিয়াছিল।

(৬) এজন্য গুরুমহাশয় তাহাকে সেবারের মত মার্জ্জনা করিলেন।

সংযুক্ত বাক্য :—

বালকটি গুরুতর অপরাধ করিলেও গুরুমহাশয় সেখানে উপস্থিত হইয়া সেই ভীত বালকটি সত্য কথা বলিয়াছিল বলিয়া তাহাকে না মারিয়া সেবারের মত মার্জ্জনা করিলেন।

অথবা

বালকটি গুরুতর অপরাধ করিলেও গুরুমহাশয় সেখানে উপস্থিত হইয়া সেই ভীত সত্যবাদী বালকটিকে না মারিয়া সেবারের মত মার্জ্জনা করিলেন।

বিচ্ছিন্ন বাক্যাবলী :—

(১) তিনি হিমালয় পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন।
(২) ঐ পর্ব্বতের তুষাররাশি সূর্য্যকিরণে সমুজ্জ্বল হইয়াছিল।
(৩) তিনি তাহা নিরীক্ষণ করিলেন।
(৪) উহাতে তাঁহার আনন্দ হইল।

সংযুক্ত বাক্য :—

তিনি হিমালয় পর্ব্বতে আরোহণপূর্ব্বক সূর্য্যকিরণে সমুজ্জ্বল তুষাররাশি নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দিত হইলেন।

বিচ্ছিন্ন বাক্যাবলী :—

(১) আমি পথের ভিক্ষুক ছিলাম।
(২) আমার কেহ সহায় ছিল না।
(৩) আপনি আমাকে কৃপা করিয়াছিলেন।
(৪) নিজ গৃহে আমাকে রাখিয়াছিলেন।
(৫) পুত্রবৎ স্নেহে আমাকে পালন করিয়াছিলেন।
(৬) সে কথা আমি আজিও ভুলি নাই।

সংযুক্ত বাক্য :—

অসহায় পথের ভিক্ষুক আমাকে যে আপনি পুত্রবৎ স্নেহে নিজগৃহে রাখিয়া পালন করিয়াছিলেন, সে কথা আমি আজিও ভুলি নাই।

বিচ্ছিন্ন বাক্যাবলী ঃ—

(১) দুর্গাপুরের জমিদার আনন্দবাবু।

(২) তাঁহার পুত্র রতনবাবু।

(৩) তিনি জঙ্গলে শিকার করিতে গিয়াছিলেন।

৪) তাঁহাকে বাঘে কামড়াইয়া আহত করিয়াছিল।

(৫) বাঁচিবার আশা ছিল না।

(৬) সুচিকিৎসা হওয়াতে তিনি এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন।

সংযুক্ত বাক্য ঃ—

দুর্গাপুরের জমিদার আনন্দবাবুর পুত্র রতনবাবু জঙ্গলে বাঘ শিকার করিতে গিয়া বাঘের কামড়ে আহত হইলেও এবং বাঁচিবার আশা না থাকিলেও সুচিকিৎসা হওয়াতে এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন।

পূর্ব্বগঠিত সংযুক্তবাক্যটি সরল, জটিল বা যৌগিক এই তিন প্রকারই হইতে পারে। বাক্য-সংযোজনের সাধারণ নিয়মের মধ্যে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি উল্লেখযোগ্য।

(ক) স্বতন্ত্র বাক্যকে পদের বা বাক্যের বিশেষণরূপে বাক্যাংশে ব্যবহার।

(খ) অব্যয় ও অসমাপিকা-ক্রিয়া পদের ব্যবহার।

(গ) বিধেয় অংশের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ বর্জ্জন।

(ঘ) একাধিক সমাপিকা-ক্রিয়া স্থলে একটি বাক্যকে অপর বাক্যের বিবর্দ্ধক বাক্যরূপে ব্যবহার।

বৃহত্তর বাক্য দ্বারা প্রকাশিত কোন ভাবকে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত কয়েকটি ক্ষুদ্রতর বা সরল বাক্যে প্রকাশ করার নাম—**বাক্য-বিয়োজন**। ইহার কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বৃহত্তর বাক্য ঃ—

বিশ্বহিতে অনুপ্রাণিত, নিয়ত ধর্ম্মচিন্তানিরত, জ্ঞানপিপাসু নবীন যুবক-সন্ন্যাসী ভাবোজ্জ্বল-মূর্ত্তিতে এমন ধীরপদবিক্ষেপে নালন্দার বিশ্ববিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে

প্রবেশ করিয়াছিলেন, যে, তাঁহাকে দেখিবামাত্র দর্শকমাত্রেরই হৃদয় অনির্ব্বচনীয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল।

বিচ্ছিন্ন বাক্যাবলী ঃ—

(১) নবীন যুবক-সন্ন্যাসী ধীরপদবিক্ষেপে নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

(২) তিনি ভাবোজ্জ্বল মূর্ত্তি-বিশিষ্ট ছিলেন।

(৩) তিনি বিশ্বহিতে অনুপ্রাণিত ছিলেন।

(৪) তিনি নিয়ত ধর্ম্মচিন্তানিরত এবং জ্ঞানপিপাসু ছিলেন।

(৫) সেই বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিখ্যাত ছিল।

(৬) তাঁহাকে দেখিবামাত্র দর্শকমাত্রেরই হৃদয় অনির্ব্বচনীয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল।

বৃহত্তর বাক্য ঃ—

এই সেই জনস্থান মধ্যবর্ত্তী প্রস্রবণগিরি; এই গিরির শিখরদেশ নিরন্তর জলধর-পটল সংযোগে নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত। অধিত্যকাপ্রদেশ ঘন-সন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী নদী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে।

বিচ্ছিন্ন বাক্যাবলী ঃ—

(১) এই সেই প্রস্রবণ গিরি।

(২) ইহা জনস্থানের মধ্যস্থলে অবস্থিত।

(৩) এই গিরির শিখরদেশে নিরন্তর জলধর পটলের সংযোগ হয়।

(৪) সেজন্য ইহা সর্ব্বদা নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত।

(৫) ইহার অধিত্যকাপ্রদেশ বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন।

(৬) উহারা ঘনভাবে সন্নিবিষ্ট।

(৭) এইজন্য ঐ স্থানটি সর্ব্বদা স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়।

(৯) ইহার পাদদেশে গোদাবরী নদী প্রবাহিত হইতেছে

(১০) উহাতে তরঙ্গের বিস্তার দেখিতে পাওয়া যায়।

(১১) উহার বেগ প্রবল।

(১২) উহা প্রসন্ন-সলিলা।

অনুশীলনী

১। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্য ব্যবহার করিয়া নিম্নলিখিত অংশগুলি লিখ :—

(ক) "পর্ব্বতের মাথায় চড়িয়া, তাহার গলা ধরিয়া, বুকে পা দিয়া, পৃথিবীতে নামিব ; নির্ঝর পথে স্ফটিক হইয়া বাহির হইব।"

(খ) "আমাদের মধ্যে বিলাসিতা বাড়িয়াছে বলিয়া অনেকে কল্পনা করেন যে ইহা আমাদের শ্রীবৃদ্ধির লক্ষণ।"

(গ) "সমস্ত বাংলা দেশের পল্লীতে পল্লীতে দেবমন্দির ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, পুষ্করিণীর জল স্নানাশনের অযোগ্য হইতেছে, গ্রামগুলি জঙ্গলে ভরিয়া উঠিতেছে এবং যে দেশ বারো মাসে তের পার্ব্বণে মুখরিত হইয়া থাকিত, সে দেশ নিরানন্দ, নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে।"

(ঘ) "বঙ্গজননীর এই চিরভক্ত ও মহাপ্রেমিক সন্তান ১৯২৩ অব্দের ৭ই নবেম্বর আনন্দলোকে প্রস্থান করিয়াছেন।"

(ঙ) "সিন্দূর-চন্দন-লিপ্ত-ললাটে পট্টাম্বরধারিণী সাক্ষাৎ দেবীপ্রতিমা সেই ভেলায় যাইয়া বসিলেন।"

(চ) "আমি তোমায় বধ ক'রে তোমার মূর্ত্তি গড়িয়ে পূজা করব"।

(ছ) "মীরজাফরের মন্ত্রণা-সভায় সিরাজদৌল্লার ভাগ্য-নির্ণয় সুসম্পন্ন হইলে তাঁহাকে জাফর-গঞ্জের রাজপ্রাসাদের অন্ধতমসাচ্ছন্ন নিম্নতলে নিভৃতকক্ষে গোপনে কারারুদ্ধ করা হইল।"

(জ) "পশ্চিম দিকে গয়া দেখিতে পাইলাম যে ফোরাত নদী কুল্‌কুল্ রবে দক্ষিণ বাহিনী হইয়া প্রবাহিত হইতেছে।"

(ঝ) "এ ব্রহ্মাণ্ডে যাহা যত গভীর, যত অচিন্ত্য, যত সীমাহীন—তাহা ত ততই অন্ধকার।"

২। বিচ্ছিন্ন বাক্যাবলীর পরিবর্ত্তে এক একটি বৃহত্তর বাক্য রচনা কর :—

(ক) সে বিদ্বান্। সে সচ্চরিত্র। সে কর্ম্মঠ। সে দরিদ্র।

(খ) সে দরিদ্র। সে সুখী।

(গ) শিক্ষক মহাশয় আমাকে একখানি বই দিয়াছিলেন। বইখানি লাইব্রেরীর। বইখানিতে অনেক ছবি ছিল। বইখানি আমি পড়িয়াছি। বইখানি আমার খুব ভাল লাগিয়াছে।

(ঘ) আশুতোষ বঙ্গদেশের গৌরব। তিনি কার্য্যোপলক্ষে পাটনা গিয়াছিলেন। সেখানে হঠাৎ তিনি রোগে আক্রান্ত হন। উহাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার শবদেহ কলিকাতায় আনীত হইয়াছিল।

(ঙ) ঐ বালকটি সর্ব্বদাই মিথ্যা কথা কহিত। কেহই তাহার কথা এখন বিশ্বাস করিল না। কেহই তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইল না।

(চ) শেকেন্দার শাহ্ মাসিদনের অধিপতি ছিলেন। তিনি অদ্বিতীয় বীর ছিলেন। তিনি বহু দেশ জয় করিয়াছিলেন। তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়বীর পুরুর সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। তিনি পুরুর বীরত্ব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

(ছ) ভক্ত প্রহ্লাদ ভক্তির অবতারস্বরূপ ছিলেন। তিনি দশ বৎসর বয়সে কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে বহুবিধ নিষ্ঠুর দণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন। তাহাতেও তিনি—যে কৃষ্ণ ভবের দুঃখ হরণ করেন, যে কৃষ্ণ বিপদ ভঞ্জন করেন, সেই কৃষ্ণের নাম পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহার পিতার নাম হিরণ্যকশিপু। কৃষ্ণনামে তাঁহার বিদ্বেষ ছিল।

(জ) অকস্মাৎ বসন্তের আবির্ভাব হইল। সমস্ত বনভূমি রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তরুলতা কুসুমাভরণে সজ্জিত হইল। তিনি তাহা নিরীক্ষণ করিলেন। উহাতে তাঁহার আনন্দ হইল।

(ঝ) বাঙ্গালী আর্য্যাবর্ত্ত হইতে অনেক বিদ্যা সংগ্রহ করিয়াছিল। এ কথা স্বীকার করি। কিন্তু সে সকলকে বাঙ্গালীর মনীষা নিজস্ব করিয়া লইয়াছিল। সেগুলির উপর যেন পলিমাটির প্রলেপ দিয়াছিল। তাহাতে সেগুলি মধুর, স্নিগ্ধ ও রসাল হইয়া উঠিয়াছিল।

চতুর্থ অধ্যায়

উক্তি-পরিবর্তন ও উক্তি-পূরণ

প্রথম পাঠ—উক্তি-পরিবর্তন

কতকগুলি বিশেষ নিয়মের অধীনে একটি উক্তিকে অন্য উক্তিতে পরিবর্তিত করার নাম—উক্তি-পরিবর্তন। উক্তি দ্বিবিধ—**প্রত্যক্ষ** ও **পরোক্ষ**।

বক্তার কথা যদি কাহারও মুখে অবিকল উদ্ধৃত হয় **অর্থাৎ** বক্তা নিজে যে কথাগুলি বলিয়াছিল ঠিক সেই কথাগুলিই যদি ব্যবহৃত হয়, তবে তাহাকে **সরল** বা **অপরোক্ষ** বা **প্রত্যক্ষ উক্তি** বলে।

বক্তার কথাগুলি অবিকল উদ্ধৃত না করিয়া অন্য কেহ যদি বক্তার কথার ভাবটি নিজের কথায় প্রকাশ করে, তবে তাহাকে **বক্র** বা **পরোক্ষ উক্তি** বলা হয়।

প্রত্যক্ষ—যদু বলিল, "আমি এখন ভাত খাইতেছি।"

পরোক্ষ—যদু বলিল যে, সে তখন ভাত খাইতেছিল।

প্রথম বাক্যটিতে যদু যাহা বলিয়াছিল, ঠিক সেই কথাগুলিই অবিকল উদ্ধৃত করা হইয়াছে। উদ্ধরণ-চিহ্নের (" ") মধ্যে যে কথাগুলি আছে তাহা বক্তার মুখের কথা,—সে যাহা বলিয়াছিল অবিকল তাহাই।

দ্বিতীয় বাক্যটিতে যদুর মুখের কথাগুলি অবিকল উদ্ধৃত হয় নাই; কিন্তু তাহার বক্তব্য বিষয়টি বা কথার মূল ভাবটি অন্যের ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে।

উক্তি-পরিবর্তনের নিয়ম

(১) প্রত্যক্ষ উক্তিতে উদ্ধরণ-চিহ্ন (" ") ব্যবহৃত হয়। পরোক্ষ উক্তিতে ঐ চিহ্ন উঠাইয়া দিয়া 'যে' প্রভৃতি সংযোজক অব্যয়ের ব্যবহার করিতে হয়।

(২) প্রত্যক্ষ উক্তিতে প্রথম ক্রিয়াপদটি যে 'কালের' হইবে, পরোক্ষ উক্তিতে অনেক স্থলেই ক্রিয়াপদটি সেই কালবাচক হয়।

উক্তি পরিবর্ত্তনে প্রত্যক্ষ উক্তিকে পরোক্ষ উক্তিতে এবং পরোক্ষ উক্তিকে প্রত্যক্ষ উক্তিতে পরিণত করা যায়। নিম্নের উদাহরণ ও নিয়মের প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়।

(৩) 'যে', 'যখন', 'যেখানে' প্রভৃতি পদগুলি 'সে', 'তখন', 'সেখানে' প্রভৃতি পদে পরিবর্ত্তিত হয়।

(৪) বাক্যের অর্থ অনুসারে পরোক্ষ উক্তিতে অনেক সময় নূতন শব্দ যোজনা করিতে হয়।

প্রত্যক্ষ—সন্ন্যাসী কহিলেন, "আমিই সেই শঙ্কর।"

পরোক্ষ—সন্ন্যাসী কহিলেন যে, তিনিই সেই শঙ্কর।

প্রত্যক্ষ—সন্ন্যাসী কহিলেন, "মৃত্যুঞ্জয়, তবে শোন, সমস্ত কথা তোমাকে বলি।"

পরোক্ষ—সন্ন্যাসী মৃত্যুঞ্জয়কে ডাক দিয়া তাহাকে সমস্ত কথা বলিবেন বলিয়া শুনিতে বলিলেন।

প্রত্যক্ষ—বিমলা বলিলেন, "গজপতি! ইষ্টদেবের নাম স্মরণ কর।"

পরোক্ষ—বিমলা গজপতিকে ইষ্টদেবের নাম স্মরণ করিতে বলিলেন।

প্রত্যক্ষ—দত্তজা বলিলেন, "কি হ'য়েছে? কি হ'য়েছে? সব কথা খুলে বল। এখন আস্‌ছ কোথা থেকে?"

পরোক্ষ—দত্তজা তাহাদের কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলেন, আর সব কথা খুলিয়া বলিতে বলিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা তখন কোথা হইতে আসিতেছে।

প্রত্যক্ষ—রাম জোর করিয়া মাথা তুলিয়া বলিল, "ও ডাইনীর আমি গলা টিপে দেব।"

পরোক্ষ—রাম জোর করিয়া মাথা তুলিয়া বলিল যে, সে ঐ ডাইনীর গলা টিপিয়া দিবে।

প্রত্যক্ষ—হরি বলিল, "ছি রাম, এ কি করিয়াছ? তোমার নাম শুনিলেও যে ঘৃণা হয়।"

পরোক্ষ—হরি রামকে ধিক্কার দিয়া বলিল যে সে এ কি করিয়াছে! তাহার নাম শুনিলেও যে ঘৃণা হয়।

প্রত্যক্ষ—রাম শ্যামকে বলিল, "তুমি কি নদীর ধারে বেড়াইতে যাইবে বলিয়া আসিয়াছ? তুমি রুগ্‌ণ, এখনও অতি দুর্ব্বল, নদীর ধারে এই সন্ধ্যাবেলা বেড়াইলে ঠাণ্ডা লাগিয়া তোমার অসুখ বাড়িবে। তুমি আজিকার মত বাড়ী ফিরিয়া যাও।"

পরোক্ষ—রাম শ্যামকে জিজ্ঞাসা করিল, সে নদীর ধারে বেড়াইতে যাইবে বলিয়া আসিয়াছে কিনা? সে রুগ্‌ণ, তখনও অতি দুর্ব্বল। নদীর ধারে সন্ধ্যাবেলা বেড়াইলে ঠাণ্ডা লাগিয়া তাহার অসুখ বাড়িবে। সে তাহাকে সেদিনকার মত বাড়ী ফিরিয়া যাইতে বলিল।

প্রত্যক্ষ—চাণক্য। বন্ধু, ডেকে আন।

কাত্যায়ন। কা'কে?

চাণক্য। ঐ ভিক্ষুক আর ভিক্ষুকবালাকে।

কাত্যায়ন। সে কি!!

চাণক্য। যাও ভাই!

পরোক্ষ—চাণক্য কাত্যায়নকে বন্ধু' বলিয়া সম্বোধন করিলেন এবং ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। কাত্যায়ন কাহাকে ডাকিয়া আনিতে হইবে জিজ্ঞাসা করাতে চাণক্য উত্তর দিলেন যে, ভিক্ষুক ও ভিক্ষুকবালাকে ডাকিয়া আনিতে হইবে। কাত্যায়ন বিস্ময় প্রকাশ করায় চাণক্য কাত্যায়নকে ভ্রাতৃ-সম্বোধন করিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন।

অনুশীলনী

পরোক্ষ উক্তিতে নিম্নলিখিত অংশ পুনরায় লিখ :—

(ক) হরবল্লভ বলিলেন, "ভাল, ব্যস্ত হইও না। আমি টাকার সন্ধানে চলিলাম। ষষ্ঠীর দিন ফিরিব।"

(খ) নারায়ণী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "ও ছোঁড়া একদিন জেলে যাবে—তা জানি, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাকেও না যেতে হয়।"

(গ) রামচরণ বলিল, "আরে ছাই, আমিই কি জান্‌তাম আগে ইস্কুল কার নাম ? আজ না শুনলাম, ইঞ্জিরি পড়ার পাঠশালাকে ইস্কুল বলে।"

(ঘ) মাঝি বলিল, "দত্ত মহাশয়, আজ বড় সুবিধা নয় ; ঐ যে মেঘখানা দেখিতেছেন, ওখানা ভাল নয়। একটু বাদেই ঝড় উঠিবে। আপনারা আপন আপন কামরায় যান। স্থির হইয়া বসিয়া থাকিবেন। বেশী নড়াচড়া করিলে প্রমাদ ঘটিবে জানিবেন।"

(ঙ) সৈন্যগণের মধ্যে একজন বলিল, "তোমার পরিচয় জানিলাম, তুমি হোসেন। তুমি সহস্র অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলেও দিব না। তোমার পুত্র জলপিপাসায় জীবন হারাইলে তাহাতে তোমার দুঃখ কি ? তোমার জীবন ত এখনই যাইবে। এই তোমার সকল জ্বালা যন্ত্রণা একেবারে নিবারণ করিয়া দিতেছি।"

(চ) ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'আজ আর আমার ভিক্ষায় যাওয়া হ'ল না।'

'সে কি ! ঘরে যে সব বাড়ন্ত।'

'আজ ত উপবাস !'

'কিন্তু কাল ?'

'কালকের চেষ্টা কাল ক'রলেই হবে।'

'তা বৈ কি ! দুদিন ত অমনি অমনি কেটে গেল।'



দ্বিতীয় পাঠ

উক্তি-পূরণ

অর্থের সঙ্গতি রক্ষা করিয়া যথাস্থানে উপযুক্ত পদ প্রয়োগ করিতে হয়। এইরূপ পদপ্রয়োগকে **উক্তি-পূরণ** বলে। উহা প্রধানতঃ একটি বা ততোধিক পদের দ্বারা হইয়া থাকে। এইজন্য উহাকে **পদ-পূরণ**ও বলে। নিম্নে উহার কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া হইল।

(১) দৌবারিকমুখে রাজার আদেশ—করিয়া সেনাপতি অনতিবিলম্বে নরপতিগোচরে—হইলেন এবং 'মহারাজের জয় হউক' বলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে—করিলেন, "মহারাজ! সমুদয়—হইয়াছে, আর অনর্থক—করিতেছেন কেন? মৃগয়ায় চলুন।"

পূরণার্থ পদ—শ্রবণ, উপস্থিত, নিবেদন, আয়োজন, বিলম্ব।

(২) যদিও সে দেখিতে অত্যন্ত—ছিল, তথাপি—গুণে আমরা মুগ্ধ হইয়াছিলাম। আমরা যাহাদের সঙ্গে পশুশালা—গিয়াছিলাম, তাহারা নানা প্রকার—দ্বারা আমাদের মনোরঞ্জন করিয়াছিল।

পূরণার্থ পদ—কুৎসিত, তাহার, দেখিতে, গল্প।

(৩) (ক) সায়ংকালে জলধিতটের—নিরীক্ষণ করিতে করিতে—অপূর্ব্ব—পূর্ণ হয়।

(খ) সময় — দিয়া চলিয়া — তাহা — জানিতে পারি না।

পূরণার্থ পদ—(ক) শোভা, মন, আনন্দে।

(খ) কোথা, যায়, আমরা।

(৪) এমন এক — ছিল — চণ্ডালও — আসিলে গৃহস্থ — দেবতার — ভক্তি করিত।

পূরণার্থ পদ—সময়, যখন, গৃহে, তাহাকে, ন্যায়।

(৫) অসময়ে — বপন করিলে শস্য ভাল হয় না। ভাল ছেলেকে — না দিলে তাহার পড়ায় উৎসাহ হয় না। বিনয় মনুষ্যের — স্বরূপ। অভাবে

লোকের—নষ্ট হয়। ক্রোধ মনুষ্যের প্রধান—। পলাশ ফুল দেখিতে—, কিন্তু—না থাকাতে কেহ তাহার—করে না।

পূরণার্থ পদ—বীজ, পারিতোষিক, ভূষণ, স্বভাব, শত্রু, সুন্দর, সৌরভ, আদর।

(৬) সে যতই ক্রুদ্ধ হইতে লাগিল, আমি—তাহাকে মিষ্ট কথা—লাগিলাম। আমি কিছুতেই—শান্ত করিতে পারিলাম না। বারংবার—করিয়াও যখন বিফল হইলাম, তখন আমি রাগিয়া উঠিলাম। আশ্চর্য্যের—এই যে আমার রাগ দেখিয়া সে—পাইল। তাহার সুর নামিল।

পূরণার্থ পদ—ততই, বলিতে, তাহাকে, চেষ্টা, বিষয়, ভয়।

(৭) প্রতি বৎসরই পরীক্ষায়—হইয়া তিনি—পাইতেন। এই সকল কার্য্যে—পরিশ্রম করাতে তাঁহার শরীর ক্রমশঃ—হইয়া পড়িল এবং তিনি ৪১ বৎসর বয়সে মানবলীলা—করিলেন। তাঁহার বুদ্ধির—দর্শনে বিদ্যাসাগর মহাশয় চমৎকৃত হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগরের—আলাপ—পর হইতে তাঁহার সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি প্রগাঢ়—জন্মিয়াছিল।

পূরণার্থ পদ—উত্তীর্ণ, পুরস্কার, অতিরিক্ত, অসুস্থ, সংবরণ, প্রখরতা, সহিত, হওয়ার, অনুরাগ।

(৮) (ক) তোমার—আমি কথায়—উঠিতে পারিব না।

(খ) তোমার হৃদয়ে যদি একটুকুও—থাকিত, তবে তুমি এই পাখীটাকে—করিতে পারিতে না।

পূরণার্থ পদ—(ক) সহিত, আঁটিয়া। (খ) দয়া, বধ।

(৯) একদিন সন্ধ্যায় নদীর—বেড়াইতে গিয়া দেখিলাম,—গুলি বাতাসে দুলিয়া দুলিয়া চলিয়াছে। মাঝিরা—আঘাতে সেইগুলিকে ভাঙ্গিয়া শত—করিয়া ফেলিতেছে, যেন একখণ্ড কাচ শতধা হইয়া যাইতেছে।

পূরণার্থ পদ—তীরে, তরঙ্গ, দাঁড়ের, ঢেউ, খণ্ড।

(১০) সন্ধ্যার ছায়া সেই—উপত্যকায়—হইতে লাগিল। দুই ভ্রাতা অনেক দিনের অপহৃত—ফিরিয়া পাইলেন। প্রতাপ বলিলেন, "ভাই, আজি পরাজয়ের

দিন নহে, আজি—দিন ; যেন আমরা পূর্ব্বের—বিস্মৃত হই ; ভাইয়ে ভাইয়ে—হইয়া স্বদেশ—করিব, বিদেশীয় শত্রুকে—করিব না।"

পূরণার্থ পদ—নির্জ্জন, গাঢ়, সম্পদ, বিজয়ের, শত্রুতা, মিলিত, উদ্ধার, ভয়।

(১১) তোমার—পালন করিতে কবে আমি—হইয়াছি ? তুমি আমার প্রতি যে সকল—আনয়ন করিয়াছ, তাহা সর্ব্বৈব—। তুমি আমাকে—রূপ জানিয়াও যে এরূপ—ধারণা করিতে পারিয়াছ, তাহা বড়ই—বিষয়।

পূরণার্থ পদ—আদেশ, পশ্চাৎপদ, অভিযোগ, মিথ্যা, বিশেষ, অদ্ভুত, পরিতাপের।

(১২) তুমি—আমাকে যেরূপ স্নেহ করিতে, এখনও কি সেইরূপ—কর ? তোমার—দেখিয়া আমার কিন্তু—হয়। তুমি সত্য বলত আমার—সংবাদ শুনিয়া তোমার—কি ভাবের—হইয়াছিল ?

পূরণার্থ পদ—পূর্ব্বে, স্নেহ, রকম, সন্দেহ, অসুখের, মনে, উদয়।

(১৩) তাহার কথার উপর তুমি—স্থাপন করিলে কেন ? সে চিরকাল—ভঙ্গ করিয়া আসিয়াছে। তাহার উপর এরূপ—কাজের ভার দেওয়া তোমার—হয় নাই। এখন যদি শেষ মুহূর্ত্তে তাহাকে না—যায়, তবে বল কাহাকে দিয়া—সমাধা করিবে ? এই ভাবে একজন—প্রকৃতির লোকের কথায় নির্ভর করিয়া তুমি—কাজ করিয়াছ।

পূরণার্থ পদ—আস্থা, বিশ্বাস, দরকারী, ঠিক, পাওয়া, কার্য্য, চঞ্চল, কাঁচা।

(১৪) মধ্যাহ্ন রৌদ্রে দৌড়াদৌড়ি করিলে—হইতে পারে। সুতরাং—খেলাধূলা না করিয়া অপরাহ্ণেই—উচিত। শরীর—ভাল—থাকে, তখন শ্রম—কখনই উচিত—।

পূরণার্থ পদ—অসুখ, মধ্যাহ্নে, করা, যখন, না, করা, নহে।

অনুশীলনী

অনুক্ত স্থানগুলিতে এক একটি করিয়া শব্দ বসাও ঃ—

(ক) সীতা—ছিলেন। তিনি সুখে সংবর্দ্ধিতা ও—লালিতা—কাননচারিণী, পতিকর্ত্তৃক—হইয়াও পরাপহৃতা, শেষে—অযোধ্যার অধীশ্বরী হইয়াও মহর্ষির শান্তরসাস্পদ—অধিবাসিনী ব্রহ্মচারিণী।

(খ) আমি—সরলহৃদয়া শুদ্ধচারিণী—কামিনী—নিরপরাধা জানিয়াও—পরিত্যাগ করিতে—হইয়াছি; তখন আমা অপেক্ষা—আর কে আছে? রাজা শুনিয়া কহিতে লাগিলেন, ইহাদের সম্মুখে—হইবার—সুযোগ ঘটিয়াছে।

(গ) আপন গৃহই—গঠনের স্থান। প্রকৃত মনুষ্যত্বের—রোপিত, অঙ্কুরিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়। সদুপদেশ ও সদনুষ্ঠান এতদুভয়ে—প্রভেদ, বিদ্যালয় উপদেশ—উপযুক্ত ক্ষেত্র বটে, কিন্তু সদনুষ্ঠানে অভ্যস্ত হওয়ার উপযুক্ত - গৃহ।

(ঘ) ব্যাঘ্রের সম্মুখের—থাবায় পাঁচটি—এবং পশ্চাতের—থাবায় চারিটি—ধারাল—শক্ত নখযুক্ত—আছে। চলিবার—মাটিতে ঘসিয়া পাছে নখ—হইয়া—, এই—ব্যাঘ্র তাহার—লুকাইয়া—।

(ঙ) পূর্ব্বে পূজার—আমোদ—এবং—আন্তরিকতা—এখন—তাহা নাই, তথাপি দুঃখ-দৈন্য-ক্লিষ্ট বঙ্গবাসী—সময় যে—পায়, তাহা আর—পায় না। ওই পূজার অনুষ্ঠানে—মৃতকল্প জাতি—সঞ্জীবিত হইয়া উঠে।

(চ) বিপদে—হওয়া উচিত নহে। —মানুষের - লোপ পায় এবং কার্য্য করিবার—থাকে না। অতএব ধৈর্য্য—করা উচিত।

(ছ) একদা—শান্তনু—যমুনাতীরবর্ত্তী এক—ভ্রমণ করিতে করিতে অকস্মাৎ—আঘ্রাণ পাইলেন। কিন্তু কোথা হইতে সেই—সঞ্চারিত হইতেছে, তাহা—না জানিতে পারিয়া—অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

(জ) চিতা—হইল। সীতা রামচন্দ্রের—প্রণামপূর্ব্বক চিতা—করিলেন। তারপর তিনি—অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সকলে এই—দর্শন করিয়া হাহাকার—উঠিলেন।

(ঝ) নক্ষত্ররায়কে সঙ্গে লইয়া মহারাজ—অরণ্যের দিকে চলিলেন। এখনও সন্ধ্যা হইতে—আছে, কিন্তু মেঘের অন্ধকারে সন্ধ্যা বলিয়া—হইতেছে। দুই ভাই যখন বনের মধ্যে—করিলেন, তখন নক্ষত্ররায়ের গা—করিতে লাগিল।

পঞ্চম অধ্যায়

বাগ্‌ধারা

প্রত্যেক ভাষার শব্দ বা শব্দসমষ্টির ব্যবহারগত একটা বৈশিষ্ট্য আছে, এই বৈশিষ্ট্যের নাম দেওয়া যাইতে পারে **বাগ্‌ধারা** বা **বাগ্‌বিধি**। ভাষার এই শৈলী বা রীতিই ভাষার প্রাণ। সেইজন্যই কোনও বিদেশীর পক্ষে ভাষার এই বৈশিষ্ট্যের সন্ধান লাভ করা ও উহা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করা প্রায় অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু মাতৃভাষার এই বিশিষ্ট সম্পদ্ সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিলে, মাতৃভাষার শব্দাদির প্রয়োগ-গত অর্থ-বৈচিত্র্য বুঝিতে না পারিলে কেবল শব্দজ্ঞান দ্বারা ভাষাজ্ঞান বা ভাষার উপর আধিপত্য লাভ করা যায় না। প্রত্যেক ভাষাশিক্ষার্থীর পক্ষে এইজন্য বাগ্‌ধারা অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয়। কোন্ নিয়মে, কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া ভাষার এই প্রকাশভঙ্গিমা গড়িয়া উঠে তাহা নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। ব্যাকরণ বা অভিধানের সাহায্যে এই বৈশিষ্ট্য অনেক সময়ই ধরা পড়ে না; বহুকাল ধরিয়া বহু লোকমুখে ব্যবহৃত হইতে হইতে ভাষার বিশিষ্ট বাচনভঙ্গী ক্রমে স্থায়ী হইয়া উঠে।

আমাদের মাতৃভাষা বিশিষ্ট বাগ্‌ধারায় অতি সমৃদ্ধ। এই সমস্ত বিশিষ্ট প্রয়োগের অধিকাংশ এখনও লোকমুখে প্রচলিত হইয়া আছে, ইহার কিয়দংশ-মাত্র অভিধানকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। বাগ্‌ধারার উপযুক্ত ব্যবহারে রচনা হৃদয়গ্রাহী হয়, বিশিষ্টার্থক শব্দ ব্যবহারে অর্থের প্রকাশও স্পষ্ট হয়।

'ছেলেটি মাটি হইয়া গেল' এই কথার পরিবর্ত্তে যদি বলা হয় 'ছেলেটি মৃত্তিকা হইয়া গেল', তাহা হইলে কোনই অর্থ প্রকাশ পায় না। 'মাটি হইয়া যাওয়া' কথাটি বাঙ্গলার বিশিষ্ট বাগ্‌বিধি। 'ফুলবাবু' এই পদটিকে যদি 'পুষ্পবিলাসী' রূপে পরিবর্ত্তিত করা যায়, তবে অর্থেরও অনেক পরিবর্ত্তন হয়।

'ভাতজল', 'দানাপানি', 'যমে-মানুষে', 'টাকাকড়ি' এই সমস্ত শব্দের পরিবর্ত্তে যদি 'জলভাত', 'পানিদানা', 'মানুষে-যমে' বা 'কড়ি-টাকা' বলা হয় তাহা হইলেও অভিলষিত অর্থ প্রকাশিত হয় না।

নিম্নে আমাদের মাতৃভাষার কতকগুলি বাগ্‌বিধির দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল। পূর্ব্বে শব্দপ্রয়োগ অধ্যায়েও বিশেষণ ও ক্রিয়াপদের কতকগুলি বিশিষ্ট ব্যবহার দেওয়া হইয়াছে। সেগুলি ব্যতীত বিশেষ্যপদেরও কতকগুলি বিশিষ্ট প্রয়োগ আছে।

(ক) বিশেষ্য-পদের বিশিষ্ট প্রয়োগ

মাথা

(১) ছেলেটির অঙ্কে খুব ভাল মাথা আছে।

(২) গ্রামের যিনি মাথা, তাঁহার যদি এই আচরণ হয়, তবে সাধারণ লোকের আর দোষ কি?

(৩) রাগের মাথায় কোনও কাজ করা ঠিক নয়।

(৪) মাথা খাও, চিঠি দিতে ভুল কোরো না।

(৫) দু'টি টাকা ধার দিয়ে একেবারে মাথা কিনে ফেলেছ দেখ্‌ছি।

(৬) যে গেল, জন্ম জন্ম মাথা খুঁড়ে মরলেও আর তাকে পাবে না।

(৭) এত লোকের সাম্‌নে তুই আমার মাথা হেঁট করলি।

(৮) ছেলেটি আদর পেয়ে একেবারে মাথায় উঠেছে।

গা

(১) এত ক'রে বলছি তবু গা করছ না কেন?

(২) পাওনাদারের ভয়ে গা ঢাকা দিয়ে ক'দিন থাক্‌বে?

(৩) গায়ে ফুঁ দিয়ে দিব্যি বেড়াচ্ছ, এখন ঝক্কি সাম্‌লাবে কে?

(৪) সেই রাত্রির কথা মনে হ'লে এখনও গায়ে কাঁটা দেয়।

(৫) গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল একসঙ্গে চল্লিশ জন লাঠিয়াল।

মুখ

(১) মুখ সাম্‌লে কথা বল।

(২) তোমার মুখ চেয়ে আজ ওকে ক্ষমা করলাম।

(৩) ভগবান্, মুখ রেখ।

(৪) আর রাগ ক'রে থেকো না, মুখ তুলে চাও।

(৫) নিত্য যার মুখ নাড়া সহ্য করতে হয়, তার কি মুখ ভার করলে চলে ?

(৬) তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।

মন

(১) সর্ব্বদাই মন কেমন করে, কোনও কাজে মন বসে না।

(২) মনের মতন তত্ত্ব হয় নি, দেনা-পাওনা নিয়ে অনেক মন কষাকষি হয়েছে, শাশুড়ীর মন ওঠেনি, ছেলেও মনমরা হয়ে আছে, মেয়ের বাপ কি ক'রে যে বেয়ানের মন পাবেন তাই ভেবে ভেবে কেবল মন খারাপ করছেন।

(৩) মুনির মন টলে, এত রূপ।

চোখ

(১) এতদিনে আমার চোখ ফুটেছে, আমি সব বুঝ্‌তে পেরেছি।

(২) চোখ রাঙাচ্ছ কেন ?

(৩) পা মাড়িয়ে দিলে কেন, চোখের মাথা খেয়েছ বুঝি !

(৪) মনকে চোখ ঠেরে আর কি লাভ ?

(৫) মাঝে মাঝে চোখের দেখা দিও।

(৬) তোমাদের কি চোখের চামড়া পর্য্যন্ত নেই ? এই কি তাগিদ করবার সময় ?

হাত

(১) সাক্ষীটাকে হাত করতে তিনকুড়ি টাকা লেগেছে।

(২) হাত খরচের টাকা ফুরিয়ে গেছে।

(৩) দশ দুয়ারে হাত পেতে তার দিন চলে।

(৪) একবার হাতে পেলে হয়, তখন বুঝিয়ে ছাড়ব।

(৫) হাতে-কলমে কাজ না করলে কাজ শেখা যায় না।

(৬) ডাক্তারবাবুর বিদ্যা আছে, কিন্তু হাতযশ নাই।

বুক

(১) সাহসে বুক বাঁধ।
(২) বুক ফাট্‌ছে তবু মুখ ফুট্‌ছে না।
(৩) পরের জন্য যে বুক পেতে দিতে পারে সেই ত মানুষ ?
(৪) বুক ঠুকে দাঁড়ালে, কিন্তু ওর সঙ্গে পারবে ত !

(খ) যুগ্মশব্দ, দ্বিরুক্তি শব্দ ও ধ্বন্যাত্মক শব্দ

বাঙ্গলা ভাষায় বহু যুগ্ম বা জোড়া শব্দের ব্যবহার আছে। একটি শব্দ উচ্চারণ করিলেই উহার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি শব্দের কথা মনে হয়। যুগ্মশব্দগুলি প্রধানতঃ দুই প্রকারের। কতকগুলি সমার্থবোধক, আবার কতকগুলি বিপরীতার্থবোধক।

(১) সমার্থবোধক যুগ্মশব্দ

অন্ন বস্ত্র	আশা ভরসা
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ	আদর অভ্যর্থনা, আদর যত্ন
অনুনয় বিনয়	উঁকি ঝুঁকি
অনুরোধ উপরোধ	ঔষধ পথ্য
অভাব অভিযোগ	কাঙাল গরীব
আত্মীয় স্বজন	কূল কিনারা
আপদ্‌ বিপদ্‌	কাঠ খড়
আমোদ প্রমোদ	কাজ কর্ম্ম
আহার বিহার	কড়া ক্রান্তি
আকার প্রকার	কটু কাটব্য
আশ্রিত অনুগত	ক্রিয়া কর্ম্ম
আলাপ পরিচয়	ক্ষুধা তৃষ্ণা

খড় কুটা	মাল মসলা
গল্প গুজব	মান মর্য্যাদা
গীত বাদ্য	জ্ঞাতি গোষ্ঠী
ঘটী বাটী	ঠাট্টা তামাসা
ঘর দোর	ছেলে ছোকরা
চাল চলন	ঝড় ঝাপ্‌টা
ডাক হাঁক	লজ্জা সরম
ছাই ভস্ম	সাধু সজ্জন
ছাই পাঁশ	হাট বাজার
চালাক চতুর	মণি মুক্তা
চন্দ্র সূর্য্য	সাধ আহ্লাদ
পাঁজি পুঁথি	যুদ্ধ বিগ্রহ
পোষাক পরিচ্ছদ	হাসি খুসি
জীব জন্তু	হৃষ্ট পুষ্ট
দান ধ্যান	জ্বালা যন্ত্রণা
দয়া দাক্ষিণ্য	জীর্ণ শীর্ণ
দোকান পাট	ভুল ভ্রান্তি
বর কন্যা	বাকী বকেয়া
ধোপা নাপিত	বৃষ্টি বাদল
সৈন্য সামন্ত	সাধন ভজন
রীতি নীতি	বিধি ব্যবস্থা
নাম ধাম	সুখ শান্তি
ধন দৌলত	ভুল চুক্
বল বিক্রম	শান্ত শিষ্ট
বাদ বিসংবাদ	জাঁক জমক
বাধা বিঘ্ন	জোত জমা

তর্ক বিতর্ক	পাহাড় পর্ব্বত
যান বাহন	বস বাস
মাথা মুণ্ড	দয়া মায়া
ভাব গতিক	ঠাকুর দেবতা
শক্তি সামর্থ্য	বলা কওয়া
লোহা লক্কড়	মাপ জোখ
টাকা কড়ি	মুটে মজুর

বিপরীতার্থবোধক যুগ্মশব্দ

আয় ব্যয়	কালাকাল	আগা গোড়া	সত্য মিথ্যা
আকাশ পাতাল	যোগ বিয়োগ	ন্যায় অন্যায়	স্বর্গ নরম
আলো আঁধার	গুণ ভাগ	কেনা বেচা	রোদ বৃষ্টি
আদান প্রদান	ভাল মন্দ	হাসি কান্না	শীত গ্রীষ্ম
আদর অনাদর	দিক্ বিদিক্	সন্ধি বিগ্রহ	জন্ম মৃত্যু
ইতর ভদ্র	মান অপমান	দেনা পাওনা	দিবা রাত্রি
ইচ্ছা অনিচ্ছা	দোষ গুণ	সুখ দুঃখ	প্রভু ভৃত্য

দ্বিরুক্ত শব্দ

দ্বিরুক্ত শব্দ প্রধানতঃ দুই প্রকার। 'বড় বড়', 'কাঁদ কাঁদ', 'পায়ে পায়ে', 'গরম গরম' এই প্রকার শব্দগুলিতে পরপদ অবিকল পূর্ব্বপদের ন্যায়। আর এক জাতীয় শব্দ আছে যেখানে পরের পদটি পূর্ব্ব পদের অনুচররূপে সামান্য বিকৃত হইয়া ব্যবহৃত হয়, যেমন—'পয়সা-টয়সা', 'কাপড়-চোপড়', 'বাসন-কোসন' ইত্যাদি।

উভয় প্রকার শব্দের কতকগুলি দৃষ্টান্ত নিম্নে দেওয়া হইল। এইগুলির অর্থ ও প্রয়োগ শিক্ষা করা প্রয়োজন।

(১) প্রকৃত দ্বিরুক্ত শব্দ

হাতে হাতে	মধ্যে মধ্যে	রাশি রাশি
মুখে মুখে	সময় সময়	ভূরি ভূরি
মনে মনে	ঘরে ঘরে	হাজার হাজার
পেটে পেটে	কথায় কথায়	আশায় আশায়
পায় পায়	কাঠে কাঠে	মুঠো মুঠো
চোখে চোখে	পাশে পাশে	বস্তা বস্তা
মাথায় মাথায়	ঘণ্টায় ঘণ্টায়	বড় বড়
গলায় গলায়	ভিতরে ভিতরে	ছোট ছোট
হাড়ে হাড়ে	তলে তলে	গরম গরম
বুকে বুকে	নিজে নিজে	টাট্‌কা টাট্‌কা

দলে দলে	শীত শীত
একে একে	মেঘ মেঘ
ভাগ্যে ভাগ্যে	ফাঁকা ফাঁকা
মানে মানে	হাসি হাসি
ভালোয় ভালোয়	কাঁদ কাঁদ
কড়া কড়া	ভাসা ভাসা

(২) দ্বিরুক্ত অনুচর শব্দ

অসুখ-বিসুখ	জড়-সড়	মোটা-সোটা
ছেলে-পিলে	বাসন-কোসন	কট-মট
জল-টল	পয়সা-টয়সা	রকম-সকম
চেটে-পুটে	গোল-গাল	রস-কস
চেঁছে-পুছে	দড়া-দড়ি	চোট-পাট

লুটে-পুটে	গোলা-গুলি	অলি-গলি
মেখে-চুখে	গোছ-গাছ	চাষা-ভূষো
বেছে-গুছে	গিন্নি-বান্নি	হাবু-ডুবু
খেয়ে-দেয়ে	কান্না-কাটি	ধূম-ধাম
দিয়ে-থুয়ে	হুড়া-হুড়ি	তাড়া-তাড়ি
চেয়ে-চিন্তে	ফিটু-ফাটু	আশ-পাশ
মেরে-ধ'রে	কাটা-কাটি	রাতা-রাতি
কেঁদে-কেটে	আধা-আধি	ভাগা-ভাগি
কুড়িয়ে-কাড়িয়ে	মার-ধোর	কাছা-কাছি
কুড়িয়ে-বাড়িয়ে	আলু-থালু	আছাড়ি-পিছাড়ি

ধ্বন্যাত্মক শব্দ

প্রত্যেক সুসভ্য জাতির ভাষাতেই বর্ণনাসূচক এক প্রকার ধ্বন্যাত্মক শব্দ আছে, কিন্তু বাঙ্গলা ভাষাতে এই শ্রেণীর শব্দ যত অধিক অন্য কোন ভাষাতে তত নহে। এই সমস্ত শব্দের সাহায্যে যেরূপ স্পষ্টভাবে নানা ভাব প্রকাশ করা যায়, অন্য কোনও শব্দের সাহায্যে তাহা করা যায় না।

শরীরের নানাস্থানে যে ব্যথা বা বেদনা হয় তাহারই কত বিচিত্র রূপ এই ধ্বন্যাত্মক যুগ্মশব্দগুলির সাহায্যে প্রকাশ করা হয়; যেমন, **কন্‌-কন্‌, টন্‌-টন্‌ দপ্‌-দপ্‌, কট্‌-কট, কাট্‌-কাট্‌, চিন্‌-চিন্‌, খচ্‌-খচ্‌, ঝন্‌-ঝন্‌, ঝিন্‌-ঝিন্‌, ভোঁ-ভোঁ, বন্‌-বন্‌, দগ্‌-দগ্‌** ইত্যাদি।

এই রকম আবার হাসির কত প্রকার ভেদ আছে তাহাও ধ্বন্যাত্মক যুগ্মশব্দের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়; যেমন, **হো-হো** করিয়া হাসি, **হি-হি** করিয়া হাসি, **হা-হা** করিয়া হাসি, **খিল্‌-খিল্‌** করিয়া হাসি, **খল্‌-খল্‌** করিয়া হাসি, **ফিক্‌** করিয়া হাসি, **ফিক্‌-ফিক্‌** করিয়া হাসি।

বাঙ্গালী মাত্রেই ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির বিশেষ প্রয়োগ জানেন। আমরা সকলেই জানি—শ্লেষ্মা জমিয়া গলা **ঘড়্‌ ঘড়্‌** করে, চন্দনের ফোঁটা কপালে

শুকাইয়া **চচ্চড়** করে, ভূতের ভয়ে গা **ছম্‌ছম্‌** করে, ভয়ে বুক **টিপ্‌ টিপ্‌** করে, ছেলের অসুখে মায়ের প্রাণ **ধুক্‌ ধুক্‌** করে, আকাশে তারা **মিট্‌ মিট্‌** করে, ঘরে প্রদীপ **টিম্‌ টিম্‌** করে, বিয়ে বাড়ী লোকজনে **গম্‌ গম্‌** করে, মুখখানি **ঢল্‌-ঢল্‌** করে, পেট **ভুট্‌-ভাট্‌** করে, ইন্দুর **কুচ্‌কুচ্‌** করিয়া কাপড় কাটে, ছারপোকা **কুটুস্‌-কাটুস্‌** করিয়া কামড়ায়, প'ড়ো বাড়ী **খাঁ খাঁ** করে, বিশাল মাঠ **ধু-ধু** করে, বর্ষায় খালবিল **থৈ থৈ** করে, মন **হুহু** করে, প্রাণ **আইঢাই** করে, ঘুমে চোখদুটি **ঢুলু ঢুলু** করে, সরোবরের জল **টল্‌ টল্‌** করে, নদীর উপর নৌকা **টল্‌ মল্‌** করে, রাগে সর্ব্বশরীর **রীরী** করে ইত্যাদি।

ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলিকে বিশেষণরূপে ব্যবহার করিবার বিধিও বাঙ্গালায় খুব প্রচলিত। যেমন **কন্‌কনে** শীত, **গন্‌গনে** আগুন, **ফিন্‌ফিনে** ধুতি, **টিংটিঙে** চেহারা, **ফুরফুরে** হাওয়া, **টুকটুকে** লাল, **ধব্‌ধবে** সাদা, **ঘুষ্‌ঘুষে** জ্বর, **ঘুটুঘুটে** অন্ধকার, **স্যাঁৎসেঁতে** ঘর ইত্যাদি।

নিম্নলিখিত ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির প্রয়োগ জানিয়া রাখা উচিত :—

কচ্‌-কচ্‌	কর্‌কর্‌	খুঁতখুঁত
কচাকচ্‌	কল্‌কল্‌	খাঁ-খাঁ
কুচ্‌-কুচ্‌	কিচির-মিচির	খিচি-মিচি
কচর-কচর	কিড়ি-মিড়ি	খিটিমিটি
কট্‌-কট্‌	কিল্‌বিল্‌	খিল্‌-খিল্‌
কটাকট্‌	ক্যাঁচর-ক্যাঁচর	গজ্‌গজ্‌
কুট্‌-কুট্‌	ক্যাঁট্‌-ক্যাঁট্‌	গিজ্‌গিজ্‌
কড়্‌কড়্‌	থক্‌থক্‌	গট্‌গট্‌
কড়্‌মড়্‌	খচ্‌খচ্‌	গুট্‌গুট্‌
কুড়্‌মুড়্‌	খচাখচ্‌	গড়্‌গড়্‌
কন্‌কন্‌	খট্‌খট্‌	গুড়গুড়
কপ্‌কপ্‌	খুট্‌খুট্‌	গপ্‌গপ্‌
কপাকপ্‌	খড়্‌খড়্‌	গপাগপ্‌

গম্‌গম্
গর্‌গর্
গিস্‌গিস্
গুজ্‌গুজ্
গুরুগুরু
ঘর্ঘর
ঘট্‌ঘট্
ঘিন্‌ঘিন্
ঘোঁৎঘোঁৎ
চক্‌চক্
চড়্‌বড়্
চপ্‌চপ্
চিট্‌চিট্
চিড়্‌চিড়্ (চিচ্চিড়)
চিন্‌চিন্
চুক্‌চুক্
চুঁইচুঁই
চুল্‌বুল্
ছট্‌ফট্
ছল্‌ছল্
জম্‌জম্
জবজব
জল্‌জল্
ঝন্‌ঝন্
ঝম্‌ঝম্
ঝর্‌ঝর্
ঝল্‌মল্
ঝিম্‌ঝিম্
ঝুমুর ঝুমুর
টকাটক্
টগ্‌বগ্
টল্‌টল্
টস্‌টস্
টিক্‌টিক্
টিপ্ টিপ্
টিম্‌টিম্
টুপ্‌টুপ্
ট্যাঁস্‌ট্যাঁস্
ঠক্‌ঠক্
ঠুন্‌ঠুন্
ঠুক্‌ঠুক্
ঢক্‌ঢক্
ঢিপঢিপ
ঢুকুঢুকু
ঢিঢিঢিঢি
ঢু-ঢু
তড়্‌বড়্
তুল্‌তুল্
থৈ থৈ
থক্‌থক্
থম্‌থম্
থুক্‌থুক্
দগ্‌দগ্
দপ্‌দপ্
দর্‌দর্
দুড়্‌দুড়্
দুম্‌দাম্
দুরুদুরু
ধক্‌ধক্
ধুক্‌ধুক্
ধিকিধিকি
ধড়্‌ফড়্
ধূ-ধূ
ধেই ধেই
নড়্‌বড়্
নড়্‌চড়্
নিড়্‌বিড়্
নিশ্‌পিশ্
পট্‌পট্
পটাপট্
পিল্‌পিল্
পিট্‌পিট্
প্যান্‌প্যান্
ফড়্‌ফড়্
ফিস্‌ফিস্
ফিট্‌ফাট্
ফ্যাল্‌ফ্যাল্
ফ্যা-ফ্যা

বক্‌বক্	মড়্‌মড়্	সুড়্‌সুড়্
বিড়্‌বিড়্	মিট্‌মিট্	সপ্‌সপ্
ভক্‌ভক্	মিন্‌মিন্	সপাসপ্
ভন্‌ভন্	রুণুরুণু	হড়্‌বড়্
ভুর্‌ভুর্	রুণুঝুণু	হন্‌হন্
ভোঁ ভোঁ	রৈ রৈ	হু-হু
মর্‌মর্	লক্‌লক্	হিড়্ হিড়্
মট্‌মট্	সিড়্‌সিড়্	হুস্‌হুস্

নিম্নলিখিত শব্দগুলি বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে :—

কট্‌কটে	ব্যাঙ্	ঝক্‌ঝকে	পোষাক
কুটকুটে	কম্বল	ঝর্‌ঝরে	ভাত
কুড়্‌মুড়ে	মুড়ি	টুক্‌টুকে	বৌ
করকরে	টাকা	ডব্‌ডবে	চোখ
ক্যাঁট্‌কেঁটে	কথা	ডিগ্‌ডিগে	গড়ন
খট্‌খটে	ঘর	ড্যাব্‌ডেবে	চোখ
খন্‌খনে	গলা	তক্‌তকে	ঘর, পোষাক
খস্‌খসে	গা	থম্‌থমে	মেঘ, মুখ
খিট্‌খিটে	মেজাজ	থুত্থুরে (ড়ে)	বুড়ো
গন্‌গনে	আগুন	ধব্‌ধবে	বিছানা
ঘুট্‌ঘুটে	অন্ধকার	প্যান্‌পেনে	মেয়ে
ঘুষ্‌ঘুষে	জ্বর	ফিন্‌ফিনে	ধুতি
চট্‌চটে	আটা	ফুট্‌ফুটে	ছেলে
চন্‌চনে	রোদ	মিশ্‌মিশে	আঁধার
ছিপ্‌ছিপে	চেহারা	মুচ্‌মুচে	মুড়ি

মিট্‌মিটে	সয়তান, আলো	সপ্‌সপে	কাপড়
রগ্‌রগে	ঝাল, ঘা	হল্‌হলে	জামা
লিক্‌লিকে	বেত	ফুরফুরে	হাওয়া

(গ) বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশের প্রয়োগ

অকূলে কূল পাওয়া—মহাসঙ্কটে উদ্ধার লাভ করা।

সহায়সম্বল আমার কিছুই ছিল না, কেবল দীনেশ বাবুর দয়াতেই এবার অকূলে কূল পাইলাম।

অক্কা পাওয়া—মরিয়া যাওয়া।

বুড়ো মানুষ এক ধাক্কায় একেবারে অক্কা পাইল।

অরণ্যে রোদন—নিষ্ফল আবেদন।

পল্লীসংস্কারের জন্য পল্লীবাসীর সাহায্য-প্রার্থনাই সঙ্গত, বিলাসী নগরবাসিগণের নিকট অর্থভিক্ষা কেবল অরণ্যে রোদন।

অন্ধের যষ্টি—একমাত্র অবলম্বন।

দুঃখিনীর অঞ্চলের নিধি, অন্ধের যষ্টি, এই ছেলেটিকে কেড়ে নিও না ঠাকুর!

আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়া—হঠাৎ মহাবিপদ্ উপস্থিত হওয়া।

রাজনন্দিনী, রাজকুলবধূ সীতা, কিন্তু তাঁহারই মাথায় যেন দুর্ভাগ্যের আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

আমতা আমতা করা—ধরা পড়িয়া হাঁ বা না স্পষ্ট করিয়া না বলা।

ঘড়ির কাচটা কে ভাঙ্গিয়াছে জিজ্ঞাসা করাতে ছেলেটি মুখ নীচু করিয়া আমতা আমতা করিতে লাগিল।

উত্তম মধ্যম—প্রহার।

চোর ডাকাত ধরা পড়িলে গ্রামের লোকে মিলিয়াই উত্তম-মধ্যমের ব্যবস্থা করিত।

কপাল ফেরা—হঠাৎ অবস্থা ভাল হওয়া।

ওরে তোর কপাল ফিরেছে, বড় বাবু তোর সঙ্গে আজ হেসে কথা ব'লেছেন।

কলুর বলদ—স্বাধীন ভাবে যাহার কাজ করিবার শক্তি নাই।

স্বাতন্ত্র্যহীন, বৈচিত্র্য-লেশশূন্য একঘেয়ে বাঙ্গালীর জীবন,আমরা যেন কলুর বলদ, চোখে ঠুলি-বাঁধা অবস্থায় দিনরাত সংসারের ঘানি টেনে চলেছি।

কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করা—স্নেহে যত্নে প্রতিপালন করা।

কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করলাম যাকে, সেই আজ বলে কিনা আমি বিশ্বাসঘাতক!

গা ঢাকা দেওয়া—আত্মগোপন করা।

চার পাঁচ খানা ওয়ারেণ্ট পিছনে পিছনে ঘুরছে, গা ঢাকা দিয়ে কতদিন থাক্‌বে?

গায়ে পড়া—অযাচিতভাবে।

এ সমস্ত গায়ে-পড়া কুটুম্বিতার অর্থ কি বুঝ্‌তে পেরেছ, বাবাজি?

গোকুলের ষাঁড়—কাজকর্ম্মহীন ভবঘুরে।

খায়, দায়, বেড়ায়,—কোন চিন্তা নাই, ভাবনা নাই, ডাক্তার বাবুর ছেলেটি ঠিক যেন গোকুলের ষাঁড়।

গোবর গণেশ—আকাট মূর্খ, নির্ব্বোধ।

লম্বা কোঁচা আর জামার বাহার দেখে ভুলে যেও না, উনি একটি গোবর-গণেশ—পেটে বোমা মারলেও 'রা' বেরুবে না।

চোখে ধূলো দেওয়া—ফাঁকি দেওয়া।

তারিণী ঠাকুর্দ্দা আজ ত্রিশ বৎসর জমিদারের নায়েবী করছেন, তাঁর চোখে ধূলো দেওয়া কি সোজা কথা!

টাকার গরম—ধনবানের অশোভন অহঙ্কার।

খামকা লোকটাকে হাটের মধ্যে অপমান ক'রে বস্‌ল, টাকার গরম ধরেছে কিনা, মেজাজ সব সময় চ'ড়েই আছে।

ডুমুরের ফুল—অদৃশ্য।

ক'মাস ধ'রে তোমার টিকিটি দেখ্‌বার যো নাই, তুমি যে ডুমুরের ফুল হ'য়ে উঠ্‌লে!

ডুবিয়া ডুবিয়া জল খাওয়া—গোপনে কার্য্যসিদ্ধি করা।

বাহিরে ভালো মানুষ সেজে বেড়াও, কিন্তু ভবী ভোল্‌বার নয়; তুমি যে ডুবেডুবে জল খাও, তা আমি টের পেয়েছি।

তাক্ লাগানো—অবাক্ করিয়া দেওয়া।

সে দিনের ছোঁড়া, কিন্তু কি বক্তৃতাটাই করলে, মুখে যেন খৈ ফুট্‌তে লাগ্‌ল, সভাশুদ্ধ লোককে একেবারে তাক্ লাগিয়ে দিয়েছে!

তাল সাম্‌লানো—শেষ রক্ষা করা।

তুমি ত ব'লে খালাস, এখন তাল সাম্‌লায় কে?

তালকানা—পূর্ব্বাপর-বিবেচনাশূন্য, কাণ্ডজ্ঞানহীন।

তোমার মত এমন তালকানা লোক ত আর দেখিনি, যাবে টালায়, আর টালীগঞ্জের ট্রামে চেপেছ!

তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠা—অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠা।

রায় বাড়ীতে সকলেই নিমন্ত্রণ খেতে যাবে শুনেই চক্রবর্ত্তী মহাশয় একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠ্‌লেন।

দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার—লণ্ডভণ্ড কাণ্ড।

ষ্টেজের উপর ড্রপ-সিন্ প'ড়ে যেতেই দর্শকেরা সব লাফিয়ে উঠে চেয়ার ছুঁড়তে লাগ্‌ল, আলো গেল নিভে, অন্ধকারে চারিদিক্ হ'তে কেবল কিল চড়, ঘুষি পড়তে লাগ্‌ল, সে এক দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার!

দক্ষিণ হস্তের ক্রিয়া—ভোজন।

পকেট ত শূন্য, ঘরেও শুন্‌ছি চাল বাড়ন্ত, দক্ষিণ হস্তের ক্রিয়াটা আজ কি ভাবে চল্‌বে ?

ধরাকে সরা জ্ঞান করা—অহঙ্কারে সকলকে তুচ্ছ করা।

পাট-বেচা টাকা পেয়ে হঠাৎ বড়লোক হ'য়ে জগৎ বাবু ধরাকে সরা জ্ঞান করছেন।

ধামাধরা—সমস্ত কথায় সায় দেওয়া, চাটুকারিতা।

তোমার মত এমন ধামাধরা আর দেখিনি ; এতো ত করছ কিন্তু মন পেলে কি ?

ননীর পুতুল—শ্রমবিমুখ বিলাসী অপদার্থ।

আহা, রোদের আঁচ সয় না, যেন ননীর পুতুল।

নাকে তেল দিয়ে ঘুমানো—নিশ্চিন্ত হইয়া থাকা।

আমার উপর যখন কাজের ভার দিয়েছ, তখন কোন চিন্তা নাই, নাকে তেল দিয়ে ঘুমাও।

নাম ডুবানো—গৌরব বিসর্জ্জন দেওয়া।

কিরে পট্‌লা, দু'গণ্ডা ছানাবড়া খেয়েই হাত গুটিয়ে নিচ্ছিস্‌, কৈলাস বাবুর তুই নাম ডোবালি !

পরকাল ঝরঝরে করা—ভবিষ্যৎ নষ্ট করা।

এর মধ্যেই ছেলেটাকে ইস্কুল ছাড়িয়ে দিয়েছ, ওর পরকাল ঝরঝরে না ক'রে তুমি ছাড়বে না।

পরের মুখে ঝাল খাওয়া—অন্যের কথায় আস্থা স্থাপন করা।

রাজা মহারাজারা চিরকাল পরের মুখে ঝাল খেয়ে থাকেন।

পায়া ভারি—উচ্চপদজনিত অহঙ্কার।

চাকরিতে প্রোমোশন পেয়েছ, খুব যে পায়া ভারি হয়েছে দেখ্‌ছি।

বকধার্ম্মিক—ভণ্ড।

গায়ে নামাবলী, কপালে তিলক, আর ঝুলিতে কচ্ছপ, বেশ বকধার্ম্মিক সেজেছ।

বিড়ালতপস্বী—বাহিরে সাধু, কিন্তু অন্তরে স্বার্থান্বেষী।

ধর্ম্মসভায়ও দেখি, আবার শুনি রেস্‌ও খেলে, এ বিড়ালতপস্বীটির মতলব কি জান?

বুকের পাটা—সাহস।

"কালকের ছেলে রমেশ, কিন্তু বুকের পাটা ত বলি এঁকে!"

ভরাডুবি—সর্ব্বনাশ।

এই মোকদ্দমায় হেরে গিয়ে তার যেন ভরাডুবি হয়েছে।

ভস্মে ঘি ঢালা—অপাত্রে দান।

"বামুনদের খাইয়ে দাইয়ে দুটাকা ক'রে দক্ষিণা দেওয়া খুব ভাল কথা, কিন্তু ছোটলোকদের কাপড় দেওয়া আর ভস্মে ঘি ঢালা এক কথা।"

ভূতের বেগার খাটা—লক্ষ্যহীন ভাবে পরিশ্রম করা।

সংসারে সারাজীবনটা কেবল ভূতের বেগার খেটেই ম'লাম।

মাটীর মানুষ—শান্ত শিষ্ট নিরীহ লোক।

রতন বাবু মাটীর মানুষ, সাত চড়েও কথা কন না।

মাণিকজোড়—দুই ব্যক্তির অদ্ভুত মিল। (খারাপ অর্থেই প্রায় ব্যবহৃত হয়)

রতনেই রতন চেনে; আমাদের 'শ্যামদা' আর 'গণ্ডেরীরাম' যেন মাণিক-জোড়।

মাথার ঠাকুর—পরম আদরের বস্তু। (গালিগালাজ অর্থেও ব্যবহৃত হয়)

তুমি বাবু শহরের ছেলে, পাড়া গাঁয়ে কি মন টিক্‌বে? গরীবের কুঁড়ে ঘরে যদি থাক, তবে ত আমরা তোমায় মাথার ঠাকুর ক'রে রাখি।

মাথায় হাত দিয়ে বসা—একেবারে হতাশ হওয়া।

বিয়ের সভা থেকে বর উঠে গেল, মেয়ের বাপ একেবারে মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়লেন।

মুখে চুণকালি দেওয়া—গুরুতর লজ্জা বা অপমানের কারণ হওয়া।

হতভাগাটা শেষে কিনা জেল খাটল, এমন সব মান্য গণ্য আত্মীয়দের মুখে চুণকালি দিয়ে গেল।

রাবণের চিতা—মর্ম্মজ্বালা।

এ শোক আর এ জন্মে নিভবে না। রাবণের চিতা সারাটা জীবন ধূ ধূ ক'রে জ্বলবে।

রাশভারি—গম্ভীর প্রকৃতি।

অটল বাবু খুব রাশভারি লোক, কিন্তু তিনকড়ি দা'র অভিনয় দেখে তাঁর অটল গাম্ভীর্য্যও যেন একটু নড়ে উঠেছিল।

লম্বা দেওয়া—পলায়ন করা।

বড়ই বেগতিক, নিজে বাঁচলে বাপের নাম, এখন লম্বা দেওয়াই ভাল।

লম্বা-চওড়া—বড় বড় আজগুবি কথা।

দেনার দায়ে এদিকে ত ঘটিবাটী নিলামে উঠেছে, কিন্তু এখনও লম্বা-চওড়া কথা ছাড়েন নি।

লেফাফা-দুরস্ত—বাহিরের ঠাট্ বজায় রাখে যে।

অমল বাবু এমনি লেফাফা-দুরস্ত যে দেখলে মনে হয় না ষাট্ টাকার কেরাণী।

সোনায় সোহাগা—যোগ্যের সহিত যোগ্যের মিলন।

এম্-এ পাশ ছেলে, আবার রোজগারও করে, এ যেন সোনায় সোহাগা।

হাড় জুড়ানো—শান্তি লাভ করা।

এ দস্যি ছেলে কবে মরবে, কবে আমার হাড় জুড়োবে?

হাতটান—চুরি।

চাকরটি তোমার খাসা হয়েছে, খায়ও বেশ, ঘুমায়ও খুব, আবার শুনছি একটু আধটু হাতটানও আছে।

হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা—সৌভাগ্যকে উপেক্ষা করা।

এ সম্বন্ধ ভেঙ্গে দেবেন না, হাতের লক্ষ্মী অমন ক'রে পায়ে ঠেলবেন না।

(ঘ) প্রবচন বাক্য

বাঙ্গালী জীবনের দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ অনেক প্রবাদ-বচন আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। ইহার মূলে রহিয়াছে এক একটী ক্ষুদ্র গল্প বা উপকথা। অল্প কথায় ও অনেক সময় খুব সরল কথায় অনেক বহুমূল্য উপদেশ ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায়। অর্থের সহিত কয়েকটি বাঙ্গলা প্রবচন বাক্য নিম্নে দেওয়া হইল।

অতি চালাকের গলায় দড়ি—বেশী চালাকি করিয়া অন্যকে ঠকাইতে গেলে অনেক সময় নিজেকেই ঠকিতে হয়।

অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ—বেশী বাড়াবাড়ি কিছুই ভাল নয়। বাড়াবাড়ি দেখিলেই মনে সন্দেহ হয়, ভিতরে কিছু গুপ্ত মতলব আছে।

অতি লোভে তাঁতী নষ্ট—বেশী লোভ করিতে নাই, বেশী লোভ করিলে যাহা আকাঙ্ক্ষিত তাহা ত পাওয়া যায়ই না, অনেক সময় যাহা আছে তাহাও হারাইতে হয়।

অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট—কাজের ভার দুই একজনের উপর থাকিলেই তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়; কিন্তু কর্ম্মকর্ত্তার সংখ্যা যদি অধিক হইয়া পড়ে, তবে প্রায়ই কাজ পণ্ড হয়।

অনভ্যাসের কোঁটা কপাল চড়্ চড়্ করে—হঠাৎ উন্নততর জীবন যাপন করিতে গেলে অনভ্যস্ত জীবনযাত্রায় সুখ পাওয়া যায় না।

কাজের বেলায় কাজী কাজ ফুরালে পাজী—কার্য্য সাধনের সময় সাধাসাধির অন্ত নাই, কিন্তু কাজ শেষ হইলে তখন আর পূর্ব্বের কথা মনে থাকে না।

গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল—কেহই মানিতে চায় না, অথচ নেতৃত্ব করিবার লোভ আছে।

গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না—গুণীর আদর নিজের দেশে বা নিজের গ্রামে নিজের পরিচিত আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে খুব কম হয়।

চাচা আপন প্রাণ বাঁচা—আগে নিজে রক্ষা পাও, তারপর অন্য কথা।

চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী—কেবলমাত্র উপদেশের দ্বারা পাপীর মতি-পরিবর্ত্তন হয় না।

দশে মিলি করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ—এক উদ্দেশ্য সাধনে সকলে মিলিয়া কাজ করিলে কার্য্যে সফলতা লাভ না করিতে পারিলেও লজ্জার কারণ হয় না।

দশের লাঠি একের বোঝা—একজনের পক্ষে যাহা খুবই কঠিন, সকলে মিলিয়া করিলে তাহা খুবই সহজ বলিয়া মনে হয়।

ধর্ম্মের ঢাক আপনি বাজে—চেষ্টা করিয়াও সত্য গোপন করা যায় না। হঠাৎ একদিন সত্য প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

নাচ্‌তে না জান্‌লে উঠান বাঁকা, হাঁটতে না জান্‌লে উঠানের দোষ—নিজের দোষে কাজ পণ্ড হয়, কিন্তু অপমানের ভয়ে নিজের দোষ ঢাকিবার জন্য অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া বাঁচিতে চায়।

পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়—মন্দ উপায়ে যে ধন অর্জ্জিত হইয়াছে তাহা নিরুপদ্রবে ভোগ করা যায় না।

পেটে খেলে পিঠে সয়—লাভের প্রত্যাশা থাকিলে অনেক কিছুই সহ্য করা যায়।

মোগল পাঠান হদ্দ হ'ল ফারসী পড়ে তাঁতী—বড় বড় লোক যে কাজ করিতে পারিল না, সেই কাজ করিবার জন্য সাধারণ লোক চেষ্টা করে এবং অকৃতকার্য্য হইয়া অপদস্থ হয়। "হাতী ঘোড়া গেল তল ভেড়া বলে কত জল।"

মোল্লার দৌড় মস্‌জিদ পর্য্যন্ত—কোন বিষয়ে বেশী কিছু করিতে না পারা। যাহার যতটুকু ক্ষমতা সে ততটুকু করিয়াই নিশ্চিন্ত হয়।

যত গর্জ্জে তত বর্ষে না—কাজের আড়ম্বরটা প্রথমে অতিরিক্ত হইলে আশানুরূপ ফললাভ হয় না এবং কাজটাও প্রায়ই সুসমাপ্ত হয় না।

যাকে দেখ্‌তে নারি তার চলন বাঁকা—যাহাকে পছন্দ হয় না, তাহার প্রত্যেক কার্য্যে একটা না একটা কাল্পনিক দোষ বাহির করা হয়।

যার জ্বালা সেই জানে—ভুক্তভোগী না হইলে দুঃখের যথার্থ স্বরূপ অন্যে উপলব্ধি করিতে পারে না।

যার ধন তার নয় নেপোয় মারে দৈ—খাটিয়া মরে একজন, আর তার ফল ভোগ করে অন্যে।

যার লাঠি তার মাটি—বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।

যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল—যেমন উৎকট রোগ, তেমনি ভয়ঙ্কর তার ঔষধ। যেমন আঘাত তেমনি তার প্রতিঘাত।

রথ দেখা ও কলা বেচা, এক ঢিলে দুই পাখী মারা—প্রধান একটি উদ্দেশ্য সাধনে কাজ করিতে করিতে যেখানে প্রসঙ্গক্রমে এক সঙ্গে দুইটি কাজ সিদ্ধ হইয়া যায়।

রাখে কৃষ্ণ মারে কে—ভগবান্ যাহাকে রক্ষা করেন, মানুষ তাহার কোনও অনিষ্ট করিতে পারে না।

লাগে টাকা দিবে গৌরীসেন—যদি জবাবদিহি না করিতে হয় তবে অন্যের টাকা সাধ মিটাইয়া খরচ করিতে বাধে না।

শিব গড়তে বাঁদর গড়া—ভাল কাজ করিতে আরম্ভ করিয়া খুব খারাপ ভাবে উহা শেষ করা।

শুঁড়ীর সাক্ষী মাতাল—দুর্জ্জনের সঙ্গীর অভাব হয় না। ইহারা পরস্পরকে সমর্থন করে, কিন্তু ইহাদের কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

সবুরে মেওয়া ফলে—কাজ করিয়া সঙ্গে সঙ্গেই ফললাভের আশা করিতে নাই; অপেক্ষা করিতে হয়, যথা সময়ে ফল পাওয়া যাইবে।

মুখে মধু পেটে বিষ—কথায় সহৃদয়তার অভাব নাই, কিন্তু মনে মনে সর্ব্বনাশের চিন্তা।

সস্তার তিন অবস্থা—লাভের প্রত্যাশায় খুব সস্তায় জিনিষ কিনিলে অবশেষে পস্তাইতে হয়, জিনিষ প্রায়ই খারাপ থাকে।

অনুশীলনী

১। বাক্য রচনা কর ঃ—

হাত কালি করা ; হাত করা ; ঘর করা ; ঘর ভাঙ্গা ; হাতযশ ; হাতের পাঁচ ; বুক ঠোকা ; তাল ঠোকা ; মন ওঠা ; চোখের পলক ; গায়ে হলুদ।

২। নিম্নলিখিত দ্বিরুক্ত শব্দগুলি বাক্যে ব্যবহার কর ঃ—

গলায় গলায়, মাথায় মাথায়, চোখে চোখে, হাতে হাতে, পায়ে পায়ে, মুখে মুখে, পেটে পেটে, তলে তলে, কানে কানে, মানে মানে, ভয়ে ভয়ে।

৩। নিম্নলিখিত বিশেষণগুলির পর বিশেষ্য পদ বসাও ঃ—

খুঁৎখুতে, খিট্‌খিটে, মিস্‌মিসে, ধব্‌ধবে, টুক্‌টুকে, রগ্‌রগে, দগ্‌দগে।

৪। বাক্য রচনা করিয়া অর্থের পার্থক্য নির্দ্দেশ কর ঃ—

বন্ বন্, হন্ হন্, গট্ গট্, চোঁ চোঁ, খাঁ খাঁ, গম্ গম্, খুট্ খুট্।

৫। অর্থ বল ও বাক্যে ব্যবহার কর ঃ—

কড়ায় গণ্ডায়, হাতে কলমে, তাসের ঘর, অর্দ্ধচন্দ্র দান, ঘোড়ার ডিম, শাপে বর, বিদুরের ক্ষুদ, যখের ধন, পরের ধনে পোদ্দারী।

৬। নিম্নলিখিত প্রবচণগুলির অর্থ বিশদভাবে ব্যাখ্যা কর ঃ—

বামুন গেল ঘর ত লাঙ্গল তুলে ধর, মুখে মধু পেটে বিষ, অভাবে স্বভাব নষ্ট, যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই রাত হয়, অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী, সিন্নিও খায় ভরাও ডুবায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অশুদ্ধি-সংশোধন

বানান-ঘটিত

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অকুল	অকূল	উনবিংশতি	ঊনবিংশতি
অজাগর	অজগর	উন্মিলিত	উন্মীলিত
অদ্ভূৎ	অদ্ভুত	উন্মুলিত	উন্মূলিত
অত্যাধিক	অত্যধিক	উৎপাৎ	উৎপাত
অনাটন	অনটন	ঋণগ্রস্থ	ঋণগ্রস্ত
অন্তর্ধ্যান	অন্তর্ধান	এবম্বিধ	এবংবিধ
আকাঙ্খা	আকাঙ্ক্ষা	ঐরাবৎ	ঐরাবত
আপত্য	আপত্তি	ঔষধি	ওষধি, ঔষধ
আমাবস্যা	অমাবস্যা, অমাবাস্যা	কজ্জ্বল	কজ্জল
আর্দ, আদ্র	আর্দ্র	কিরিট	কিরীট
ইয়ত্বা	ইয়ত্তা	কুলিন	কুলীন
ইষৎ	ঈষৎ	কৌলীণ্য	কৌলীন্য
উচিৎ	উচিত	কৌতুহল	কৌতূহল
উচ্ছাস	উচ্ছ্বাস	কোন (angle)	কোণ
উজ্বল	উজ্জ্বল	ক্ষিণ্ন	খিন্ন
উষা*	ঊষা	গর্দ্ধভ	গর্দ্দভ
উচ্ছন্ন	উৎসন্ন	গৃহীতা	গ্রহীতা
উর্দ্ধ	ঊর্দ্ধ, ঊর্ধ্ব	গ্রস্থ	গ্রস্ত

* বাঙ্গলায় সাধারণতঃ 'ঊষা' বানান প্রচলিত হইলেও সংস্কৃতে 'উষা' 'ঊষা' দুই বানানই চলে।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ঘনিষ্ট	ঘনিষ্ঠ	ব্যাবহার	ব্যবহার
চোব্য, চোষ্য	চর্ব্ব্য, চুষ্য	ব্যাবসায়	ব্যবসায়
জ্বলন্ত	জ্বলন্ত	ব্যায়	ব্যয়
জাগ্রত	জাগ্রৎ	ব্যাগ্র	ব্যগ্র
জ্যেষ্ট	জ্যেষ্ঠ	বিকীরণ	বিকিরণ
জাম্বুবান	জাম্ববান্	বিকির্ণ	বিকীর্ণ
জাগরুক	জাগরূক	ভাগবৎ	ভাগবত
ঝঞ্ঝা	ঝঞ্ঝা	ভাগিরথী	ভাগীরথী
তড়িত	তড়িৎ	ভূল	ভুল
তেজ্য	ত্যাজ্য	মহত্ব	মহত্ত্ব
ত্যাক্ত	ত্যক্ত	মঞ্জুরী	মঞ্জরী
দধিচি	দধীচি	মুমুর্ষু	মুমূর্ষু
দির্ঘ	দীর্ঘ	মুহুর্ত্ত	মুহূর্ত্ত
দন্দ	দ্বন্দ্ব	মৃণ্ময়	মৃন্ময়
দোষনীয়	দূষণীয়	যাবদীয়	যাবতীয়
ধংস, ধ্বংশ	ধ্বংস	রামায়ন	রামায়ণ
নিশিথ	নিশীথ	রসায়ণ	রসায়ন
নুপুর	নূপুর	লজ্জাস্কর	লজ্জাকর
নীরিহ	নিরীহ	লক্ষী	লক্ষ্মী
নেয্য	ন্যায্য	শরত	শরৎ
পক্ক	পক্ব	শারিরীক	শারীরিক
পিচাশ	পিশাচ	শুশ্রুষা	শুশ্রূষা
প্রত্যুষ	প্রত্যূষ	শরৎচন্দ্র	শরচ্চন্দ্র
ব্যার্থ	ব্যর্থ	শান্তনা, সান্তনা	সান্ত্বনা
ব্যাথা	ব্যথা	ষড়যন্ত্র	ষড়্‌যন্ত্র

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
সাক্ষাত	সাক্ষাৎ	স্বরস্বতী	সরস্বতী
সাস্থ্য	স্বাস্থ্য	স্থুল	স্থূল
সুস্থ্য	সুস্থ	সারথী	সারথি
সন্মান	সম্মান	সচীব	সচিব
সাহার্য্য	সাহায্য	স্ফুর্ত্তি	স্ফূর্ত্তি
সুরধনী	সুরধুনী	হটাৎ	হঠাৎ
সন্যাসী	সন্ন্যাসী	মধুসুদন	মধুসূদন

ষত্ব-ণত্ব-ঘটিত

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অগ্রহায়ন	অগ্রহায়ণ	চতুস্পার্শ	চতুষ্পার্শ্ব
অক্ষৌহিনী	অক্ষৌহিণী	চাক্ষুস	চাক্ষুষ
অগ্রনী	অগ্রণী	তিরষ্কার	তিরস্কার
অপরাহ্ন	অপরাহ্ণ	দুর্ব্বিসহ	দুর্ব্বিষহ
আনুসঙ্গিক	আনুষঙ্গিক	দুর্ণাম	দুর্নাম
আশীষ	আশিস্	দৈণ্য	দৈন্য
আবিস্কার	আবিষ্কার	নিস্প্রাণ	নিষ্প্রাণ
আহ্নিক	আহ্ণিক	নিস্ফল	নিষ্ফল
আষ্পদ	আস্পদ	নমষ্কার	নমস্কার
কণক	কনক	নিষ্পন্দ	নিস্পন্দ, নিঃস্পন্দ
ফেণ	ফেন	নিষ্পৃহ	নিস্পৃহ, নিঃস্পৃহ
গগণ	গগন	পরিস্কার	পরিষ্কার
গৃহিনী	গৃহিণী	পুরষ্কার	পুরস্কার
গোষ্পদ	গোষ্পদ	পুস্প	পুষ্প
গ্রীস্ম	গ্রীষ্ম	প্রণয়ণ	প্রণয়ন

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
প্রণষ্ট	প্রনষ্ট	ভষ্ম	ভস্ম
প্রাঙ্গন	প্রাঙ্গণ	ভীস্ম	ভীষ্ম
প্রনাশ	প্রণাশ	মৃণ্ময়	মৃন্ময়
প্রদোস	প্রদোষ	মূর্দ্ধণ্য	মূর্দ্ধন্য
প্রার্থণা	প্রার্থনা	রুগ্ন	রুগ্‌ণ
ফাল্গুণ	ফাল্গুন	সর্ব্বণাম	সর্ব্বনাম
বানিজ্য	বাণিজ্য	সুসমা	সুষমা
বারানসী, বানারসী	বারাণসী	সর্সপ	সর্ষপ
বিসন্ন	বিষণ্ণ	সর্ব্বাঙ্গীন	সর্ব্বাঙ্গীণ
বিসম	বিষম	সায়াহ্ন	সায়াহ্ন
বাস্প	বাষ্প	সুস্থুপ্তি	সুষুপ্তি
বহিস্কার	বহিষ্কার	হিরন্ময়	হিরণ্ময়
বৃহস্পতি	বৃহস্পতি	হরিণাম	হরিনাম

লিঙ্গ-ঘটিত

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অনাথিনী	অনাথা	বিহঙ্গিনী	বিহঙ্গী
অপ্সরী	অপ্সরা (অপ্সরাঃ)	চন্দ্রবদনী	চন্দ্রবদনা
অশ্বী	অশ্বা	সুকেশিনী	সুকেশী, সুকেশা
অধীনী	অধীনা	ত্রিনয়নী	ত্রিনয়না
উদাসিনী	উদাসীনা*	ননদিনী	ননদ
কুরঙ্গিনী	কুরঙ্গী	পিশাচিনী	পিশাচী
কৃশাঙ্গিনী	কৃশাঙ্গী, কৃশাঙ্গা	ভয়ঙ্করা	ভয়ঙ্করী
গায়কী	গায়িকা	সুলোচনী	সুলোচনা
চাতকিনী	চাতকী	বামলোচনী	বামলোচনা

* 'উদাসিনী' বাঙ্গলায় খুব প্রচলিত। উদাসিন্ (উদাসী) শব্দ হইতে কোনরূপে নিষ্পন্ন করা চলে।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
শ্বেতাঙ্গিনী	শ্বেতাঙ্গী	রূপসী ‡	রূপবতী
সিংহিনী	সিংহী	নিরপরাধিনী	নিরপরাধা
রজকিনী	রজকী*	ব্যাঘ্রিনী	ব্যাঘ্রী, ব্যাঘ্রা

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
প্রস্তরময় মূর্ত্তি	প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি
ওজস্বী ভাষা	ওজস্বিনী ভাষা
এতাদৃশ রচনা	এতাদৃশী রচনা
শস্যশ্যামলা ভারতবর্ষ	শস্যশ্যামল ভারতবর্ষ, শস্যশ্যামলা ভারতভূমি
সুজলা সুফলা বঙ্গদেশ	সুজলা সুফলা বঙ্গভূমি
মুখরা স্ত্রীলোক	মুখরা স্ত্রী
বিধবা স্ত্রীলোক	বিধবা স্ত্রী, নারী
অদ্বিতীয়া মহিমা	অদ্বিতীয় মহিমা
তাদৃশী গরিমা	তাদৃশ গরিমা
সুন্দরী মহিলাবর্গ	সুন্দরী মহিলারা
বিদুষী রমণীগণ	বিদুষী রমণীরা
শারদীয় পূর্ণিমা	শারদীয়া পূর্ণিমা
মনোহারিণী বাক্য	মনোহর বাক্য, মনোহারিণী বাণী
সুন্দরী চন্দ্রমা	সুন্দর চন্দ্রমা

সন্ধি-ঘটিত

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অত্যান্ত	অত্যন্ত	কিম্বদন্তী	কিংবদন্তী
অত্যাধিক	অত্যধিক	সম্বাদ	সংবাদ
অনুমত্যানুসারে	অনুমত্যনুসারে	বশম্বদ	বশংবদ

* চণ্ডিদাসের পদাবলীতে 'রজকিনী' পদ অমরত্ব লাভ করিয়াছে।

‡ বাঙ্গলায় বিশেষ প্রচলিত, সম্ভবতঃ 'রূপীয়সী' শব্দের অপভ্রংশ।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অদ্যপি	অদ্যাপি	শিরোপরি	শির-উপরি
যদ্যাপি	যদ্যপি	বয়াধিক	বয়োধিক
আদ্যাক্ষর	আদ্যক্ষর	জ্যোতিন্দ্র	জ্যোতিরিন্দ্র
জাত্যাভিমান	জাত্যভিমান	দূরাদৃষ্ট	দূরদৃষ্ট
ভূম্যাধিকারী	ভূম্যধিকারী	দূরাবস্থা	দুরবস্থা
পশ্বাধম	পশ্বধম	মনহর	মনোহর
উপরোক্ত	উপর্যুক্ত	স্রোতবেগ	স্রোতোবেগ
জাগ্রতাবস্থা	জাগ্রদবস্থা	যশরাশি	যশোরাশি
জগবন্ধু	জগদ্বন্ধু	শিরপীড়া	শিরঃপীড়া
ইতিমধ্যে	ইতোমধ্যে	মনোকষ্ট	মনঃকষ্ট
ইতিপূর্ব্বে	ইতঃপূর্ব্বে	মনযোগ	মনোযোগ
পৃথকান্ন	পৃথগন্ন	শিরচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ
পুনরাভিনয়	পুনরভিনয়	শিরমণি	শিরোমণি
রক্ষরাজ	রক্ষোরাজ	বয়বৃদ্ধি	বয়োবৃদ্ধি
অধগতি	অধোগতি	অন্তরেন্দ্রিয়	অন্তরিন্দ্রিয়
নভতল	নভস্তল	সদ্যজাত	সদ্যোজাত
কতকাংশ	কতক অংশ	হাওড়াভিমুখে	হাওড়া অভিমুখে
এমতাবস্থা	এমত অবস্থা	ইহাপেক্ষা	ইহা অপেক্ষা
আপনাপন	আপন আপন	আইনানুসারে	আইন অনুসারে

বিশেষ দ্রষ্টব্য—'ইতিমধ্যে', 'ইতিপূর্ব্বে' বাঙ্গলায় বহু সুলেখকের কৃপা-ভাজন হইয়া আর অপাঙ্‌ক্তেয় নাই। 'চক্ষুরোগ', 'চক্ষুলজ্জা'—এই অশুদ্ধ রূপ দুইটিই চলিতেছে; 'চক্ষূরোগ' ও 'চক্ষুর্লজ্জা' চলিবার কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। "রক্তচ্ছবি" বা "তরুচ্ছায়া" হয়তো চলিতে পারে, কিন্তু তাহাতে 'জলছবি' বা 'ধূপছায়া'র কোনও পরিবর্ত্তন হইবে না।

সমাস-ঘটিত

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
হস্তীদন্ত	হস্তিদন্ত	কুঅর্থ	কদর্থ
নদিতট	নদীতট	কুঅন্ন	কদন্ন
স্থায়ীভাব	স্থায়িভাব, স্থায়ী ভাব	নীরোগী	নীরোগ
কালিমাতা	কালীমাতা	নির্দ্দোষী	নির্দ্দোষ
কালীদাস	কালিদাস	নিরপরাধী	নিরপরাধ
কালিপদ	কালীপদ	নির্ধনী	নির্ধন
গুণীগণ	গুণিগণ	মহারাজা	মহারাজ
পক্ষীশাবক	পক্ষিশাবক	রাজদিগের	রাজাদিগের
শশীশেখর	শশিশেখর	পাখিগুলি	পাখীগুলি
স্বামীপুত্র	স্বামিপুত্র	সানন্দিত	আনন্দিত
প্রাণীহত্যা	প্রাণিহত্যা	সাপরাধী	সাপরাধ, অপরাধী
প্রণয়ীযুগল	প্রণয়িযুগল	সুবুদ্ধিমান্	সুবুদ্ধি
অধিবাসীগণ	অধিবাসিগণ	অহোরাত্রি	অহোরাত্র
মহিমাবর	মহিমবর	দিবারাত্রি	দিবারাত্র
মহিমাময়	মহিমময়	নৈরাশ	নিরাশ
দুরাত্মাগণ	দুরাত্মগণ	ভগবান্ দত্ত	ভগবদ্দত্ত
যুবাগণ	যুবগণ	কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী	কৃষ্ণচতুর্দ্দশী, কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী
সুন্দরিগণ	সুন্দরীগণ		
দাসিপুত্র	দাসীপুত্র	সপ্রণামপূর্ব্বক	প্রণামপূর্ব্বক
রোগীসেবা	রোগিসেবা	পরমাসুন্দরী	পরমসুন্দরী, পরমা সুন্দরী
চণ্ডীদাস	চণ্ডিদাস*		

* 'চণ্ডীদাস' এই বানানও চলে, কিন্তু 'কালীদাস' একেবারে অচল। ইহা প্রয়োগবৈচিত্র্য মাত্র।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
যোদ্ধাগণ	যোদ্ধৃগণ	সাবধানপূর্ব্বক	অবধানপূর্ব্বক, সাবধানে
পিতাহীন	পিতৃহীন	নিরহঙ্কারী	নিরহঙ্কার
পিতৃঠাকুর	পিতাঠাকুর	আকণ্ঠ পর্য্যন্ত	আকণ্ঠ, কণ্ঠ পর্য্যন্ত
মহদুপকার	মহোপকার	ত্রৈবর্ষিক	ত্রৈবার্ষিক, ত্রিবার্ষিক
ক্রেতাগণ	ক্রেতৃগণ	ফণীভূষণ	ফণিভূষণ
যোগীবর	যোগিবর	সবিতাদেব	সবিতৃদেব
ছাগীদুগ্ধ	ছাগদুগ্ধ	দেবিদাস	দেবীদাস
ভ্রাতাগণ	ভ্রাতৃগণ	অভিনেতাগণ	অভিনেতৃগণ
বিধর্ম্মী	বিধর্ম্মা	স্বামীভক্তি	স্বামিভক্তি
সধর্ম্মী	সধর্ম্মা	সাবধানী	সাবধান
সক্ষম	ক্ষম, সমর্থ	বিশ্বমিত্র	বিশ্বামিত্র (মুনি) অন্যত্র বিশ্বমিত্র
সবিনয়পূর্ব্বক	সবিনয়ে, বিনয়পূর্ব্বক	মহাত্মাগণ	মহাত্মগণ
সলজ্জিত	সলজ্জ, লজ্জিত	সন্ন্যাসী-প্রদত্ত	সন্ন্যাসিপ্রদত্ত
সশঙ্কিত	সশঙ্ক, শঙ্কিত	পত্নিপ্রেম	পত্নীপ্রেম
সকৃতজ্ঞ	কৃতজ্ঞ	জাহ্নবিজল	জাহ্নবীজল
নিশ্চিন্তিত	নিশ্চিন্ত	বহুরূপী	বহুরূপ
অল্পজ্ঞানী	অল্পজ্ঞান		

প্রত্যয়-ঘটিত

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অধীনস্থ	অধীন	প্রফুল্লিত	প্রফুল্ল
অসহনীয়	অসহ্য, অসহনীয়	বপিত	উপ্ত
আলস্যতা	আলস্য	বাহ্যিক	বাহ্য
আধিক্যতা	আধিক্য	ভাগ্যমান্	ভাগ্যবান্

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
আবশ্যকীয়	আবশ্যক	সখ্যতা	সখ্য
উৎকর্ষতা	উৎকর্ষ	লাঘবতা	লাঘব, লঘুতা
একত্রিত	একত্র	সৌন্দর্য্যতা	সৌন্দর্য্য
ঐক্যতা	ঐক্য, একতা	নমিত	নত
ঔদাসীন্যতা	উদাসীনতা, ঔদাসীন্য		(নমিত—ণিজন্ত শুদ্ধ)
চাঞ্চল্যতা	চাঞ্চল্য, চঞ্চলতা	বিবরিত	বিবৃত
নৈপুণ্যতা	নৈপুণ্য, নিপুণতা	রাজনৈতিক	রাজনীতিক
প্রসারতা	প্রসার	শ্রেষ্ঠতম	শ্রেষ্ঠ
	পৌরুষ	(শ্রেষ্ঠতম প্রয়োগ সংস্কৃতে প্রচলিত আছে)	
বিশুদ্ধিতা	বিশুদ্ধি	সততা	সত্তা, সাধুতা
বুদ্ধিমানতা	বুদ্ধিমত্তা	সার্ব্বজনীন	সর্ব্বজনীন†
বৈরতা	বৈর, বৈরিতা	অস্তমান	অস্তায়মান
মাধুর্য্যতা	মাধুর্য্য, মধুরতা	গ্রাহ্ণীয়	গ্রাহ্য, গ্রহণীয়
বাহুল্যতা	বাহুল্য, বহুলতা	সুরভিত	সুরভি
সৌজন্যতা	সৌজন্য, সুজনতা	জ্ঞাতার্থে	জ্ঞানার্থে
সৌহৃদ্যতা	সৌহার্দ্দ্য, সৌহৃদ্য, সৌহার্দ্দ	মনমুগ্ধকর	মনোমোহকর
		নিরাপদেষু	নিরাপৎসু
গৌরবত্ব	গুরুতা, গুরুত্ব, গৌরব	নিঃশেষিত	নিঃশেষ
ধৈর্য্যতা	ধৈর্য্য, ধীরতা	সাধ্যায়ত্ত	সাধ্য, আয়ত্ত
মান্যনীয়	মান্য, মাননীয়	সম্ভ্রান্তশালী	সম্ভ্রান্ত, সম্ভ্রমশালী
দাহ্যজনক	দাহজনক	রক্তিমতা	রক্তিমা
কম্পবান্	কম্পমান	ভদ্রস্থতা *	ভদ্রতা
দারিদ্র্যতা	দারিদ্র্য, দরিদ্রতা	আরক্তিম	আরক্ত
দোষনীয়	দূষণীয়	পূজ্যাস্পদ	পূজ্য, পূজাস্পদ

† সার্ব্বজনীন—কোনরূপে রক্ষা করা যায়। * ভদ্রস্থতা—বাঙলায় চলিয়া গিয়াছে।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
নিন্দুক	নিন্দক	সহ্যাতীত	সহনাতীত
নির্দ্দোষিতা	নির্দ্দোষতা	ইচ্ছিত	. ইষ্ট
চোষ্য †	চূষ্য	অজ্ঞানিত	অজ্ঞাত
সিঞ্চন	সেচন	প্রবর্ত্ত	প্রবৃত্ত
ঘূর্ণায়মান	ঘূর্ণ্যমান	দংশিত	দষ্ট
যাবদীয়	যাবতীয়		(দংশিত—ণিজন্ত শুদ্ধ)
বিদ্বান	বিদ্বান্	কথিতব্য	কথয়িতব্য
পার্ব্বতীয়	পার্ব্বত্য, পর্ব্বতীয়	দায়গ্রস্থ	দায়গ্রস্ত

বিবিধ অপপ্রয়োগ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
মনান্তর	মতান্তর	সাক্ষী দেওয়া	সাক্ষ্য দেওয়া
আগতকল্য	আগামী কল্য	প্রবীণ বৃক্ষ	প্রাচীন বৃক্ষ
সন্তোষ হওয়া	সন্তুষ্ট হওয়া	আরোগ্য হওয়া	আরোগ্যলাভ করা
আশ্চর্য্য হওয়া	আশ্চর্য্যান্বিত হওয়া	পক্ষিগণেরা	পক্ষিগণ
বালকবৃন্দেরা	বালকেরা, বালকবৃন্দ	তথাপিও	তথাপি
অদ্যাপিও	অদ্যাপি	সমতুল্য	সম, তুল্য
কেবলমাত্র*	কেবল, মাত্র	ঘোরায় চরা	ঘোড়ায় চড়া
কাপড় পড়া	কাপড় পরা	পরিয়া যাওয়া	পড়িয়া যাওয়া
বই পরা	বই পড়া	ঘোড়ায় আরোহণ	অশ্বারোহণ,
গরুবধ	গোহত্যা, গরু-মারা		ঘোড়ায় চড়া
শবপোড়ান	শবদাহ, মড়া-পোড়ান	পাকা কেশ	পক্ক কেশ, পাকা চুল
ভাত-বস্ত্র	অন্নবস্ত্র, ভাত-কাপড়	ঘর নির্ম্মাণ	গৃহনির্ম্মাণ, ঘর তৈরী
বৃক্ষরাজিসমূহ	বৃক্ষরাজি, বৃক্ষসমূহ	সমুদয় পক্ষিগুলি	সমুদয় পক্ষী, পাখীগুলি
নিজস্ব ধন	নিজস্ব, নিজধন	আয়ত্তাধীন	আয়ত্ত, অধীন

† চোষ্য—কোনরূপে রক্ষা করা যায়। * কেবলমাত্র—বাঙলায় খুব চলিয়া গিয়াছে।

অশুদ্ধ—চন্দ্র উদয় হইল।
শুদ্ধ—চন্দ্র উদিত হইল।

অশুদ্ধ—রোগ বৃদ্ধি হইয়াছে।
শুদ্ধ—রোগ বৃদ্ধি পাইয়াছে বা—রোগের বৃদ্ধি হইয়াছে।

অশুদ্ধ—তিনি সন্তোষ হইলেন।
শুদ্ধ—তিনি সন্তুষ্ট হইলেন।

অশুদ্ধ—সবিনয়পূর্ব্বক নিবেদন।
শুদ্ধ—সবিনয় (বিনয়পূর্ব্বক) নিবেদন।

অশুদ্ধ—সাবধানপূর্ব্বক চলিবে।
শুদ্ধ—সাবধানে চলিবে।

অশুদ্ধ—আমার সাবকাশ নাই।
শুদ্ধ—আমার অবকাশ নাই।

অশুদ্ধ—আমি সাক্ষী দিয়াছি।
শুদ্ধ—আমি সাক্ষ্য দিয়াছি।

অশুদ্ধ—সে এমন রূপসী, যেন অপ্সরী।
শুদ্ধ—সে এমন রূপবতী, যেন অপ্সরা।

অশুদ্ধ—কালীদাস স্বরস্বতীর বরপুত্র।
শুদ্ধ—কালিদাস সরস্বতীর বরপুত্র।

অশুদ্ধ—সদাসর্ব্বদা তোমার উপস্থিত প্রার্থনীয়।
শুদ্ধ—সর্ব্বদা তোমার উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

অশুদ্ধ—তদ্দৃষ্টে সকলেই আনন্দ হইয়াছিল।
শুদ্ধ—তদ্দর্শনে সকলেই আনন্দিত হইয়াছিল।

অশুদ্ধ—নিশ্চয় সংবাদ পাইয়াছ কি ?
শুদ্ধ—নিশ্চিত সংবাদ পাইয়াছ কি ?

অশুদ্ধ—তিনি মৌন হইয়া রহিলেন।
শুদ্ধ—তিনি মৌনী হইয়া রহিলেন।

অশুদ্ধ—সে আজকাল ভয়ানক সুখে আছে।
শুদ্ধ—সে আজকাল খুব সুখে আছে।

অশুদ্ধ—আমার অত্যান্ত কার্য্যবাহুল্যতা ঘটিয়াছে।
শুদ্ধ—আমার অত্যন্ত কার্য্যবাহুল্য ঘটিয়াছে।

অশুদ্ধ—তিনি আরোগ্য হইয়াছেন।
শুদ্ধ—তিনি আরোগ্যলাভ করিয়াছেন।

অশুদ্ধ—আগত শনিবারে তাহারা যাইবে।
শুদ্ধ—আগামী শনিবারে তাহারা যাইবে।

অশুদ্ধ—সে মনোকষ্টে সন্ন্যাসী হইয়াছে।
শুদ্ধ—সে মনঃকষ্টে সন্ন্যাসী হইয়াছে।

অশুদ্ধ—তাঁহার এখন সঙ্কট অবস্থা।
শুদ্ধ—তাঁহার এখন সঙ্কটাপন্ন অবস্থা।

অশুদ্ধ—সহসা দেবতা অন্তর্ধ্যান হইলেন।
শুদ্ধ—সহসা দেবতা অন্তর্হিত হইলেন বা সহসা দেবতার অন্তর্ধান হইল।

অশুদ্ধ—নিরোগী লোক প্রকৃত সুখি।
শুদ্ধ—নীরোগ লোক প্রকৃত সুখী।

অশুদ্ধ—অদ্য একটি সভার মহতী অধিবেশন হইবে।
শুদ্ধ—অদ্য একটি মহতী সভার অধিবেশন হইবে।

অশুদ্ধ—ইহা অতি লজ্জাস্কর ব্যাপার।
শুদ্ধ—ইহা অতি লজ্জাকর ব্যাপার।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

1910. Re-write the following in chaste and elegant Bengali correcting all mistakes in spelling and other inaccuracies :—

আমরা দুই বন্ধুতে নৌকারোহণ হইয়া সদেশাভিমুখে যাত্রা করিলাম। ওদিকে আকাশ ঘনঘটা হইয়া চারিদিকে ভীষণ আকার ধারণ করিল ; মেদিনী ঘোর তিমিরে নিমগ্ন হইল। বৃষ্টি আসিয়া বাতাসের সঙ্গে যোগ করিল এবং শরিরে তীরের ন্যায় বিদ্ধ করিতে লাগিল। আমরা বিষম ভয় পাইয়া চিৎকার করিতে লাগিলাম। মাঝিরা আমাদের আশ্বস্ত করিয়া বলিল, "আপনারা ধৈর্য্য হউন, ভয় করিবেন না।"

Ans. আমরা দুই বন্ধুতে নৌকারোহণ করিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলাম। ওদিকে আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হওয়ায় চারিদিক ভীষণ আকার ধারণ করিল ; মেদিনী ঘোর তিমিরে আবৃত হইল। বৃষ্টিধারা ঝটিকার সহিত মিলিত হইয়া (অথবা বৃষ্টি আসিয়া বাতাসের সহিত যোগ দিল এবং উহা) তীরের ন্যায় শরীরে বিদ্ধ হইতে লাগিল। আমরা অত্যন্ত ভয় পাইয়া চিৎকার করিতে লাগিলাম। মাঝিরা আমাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিল, "আপনারা ধৈর্য্য অবলম্বন করুন, ভয় পাইবেন না।"

1911. Correct the errors in the following passage :—

তিনি সবিনয়পূর্ব্বক রাজার সম্মুখে বলিলেন যেরূপ কার্য্যের বাহুল্যতা ঘটিয়াছে সাবকাশ প্রাপ্ত না হইলে কদাপিও এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না।

Ans. তিনি সবিনয়ে (অথবা বিনয়পূর্ব্বক) রাজার সম্মুখে বলিলেন, যেরূপ কার্য্যের বাহুল্য ঘটিয়াছে, তাহাতে অবকাশ প্রাপ্ত না হইলে তিনি কদাপি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না।

1912. **Re-write two of the following correcting all errors of style, grammar and orthography :—**

(*a*) দেবী তাহাতে ভ্রূখ্যেপ না করিয়া সচকিত হৃদয়ে পার্শ্ববর্ত্তি শ্বরম্য প্রসাদে উপনিত হইলেন ও সকাতরে সেইদিকে চাহিয়া থাকিলেন।

(*b*) তাঁহার বাটির সমিপে যাইতে না যাইতে দেখিলাম, পূর্ব্ব গগণ উষার সহাস্তে হাসিয়া উঠিয়াছে, পক্ষীগণ প্রভাত-সঙ্গিতে বনভূমি মুখরিত করিয়াছে।

(*c*) আমার হাতে দেখিতেছ সে পুঁথিখানি, যাহা দিয়াছিলে কাল রমেশকে তুমি পড়িতে ; পাঠ করিয়া যাহা পারে নাই হাস্য সম্বরণ করিতে রমেশ।

Ans. (*a*) দেবী তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া চকিতহৃদয়ে পার্শ্ববর্ত্তী সুরম্য প্রাসাদে উপনীত হইলেন এবং কাতরভাবে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন।

(*b*) তাঁহার বাটীর সমীপে যাইতে যাইতেই দেখিলাম, পূর্ব্ব গগন উষার হাস্তে হাসিয়া উঠিয়াছে, পক্ষিগণ প্রভাত-সঙ্গীতে বনভূমি মুখরিত করিতেছে।

(*c*) আমার হাতে যে পুস্তকখানি দেখিতেছ, তাহা কল্য রমেশকে পড়িতে দিয়াছিলে ; উহা পাঠ করিয়া রমেশ হাস্য সংবরণ করিতে পারে নাই।

1913. **Re-write the following correcting all errors of style, grammar and orthography :—**

সে মনোকষ্টে সন্ন্যাসী হইয়াছে। দুষ্টু বালকেরা পক্ষীশাবক ধরিয়া যন্ত্রণা দেয়। তাঁহার কিছুমাত্র সৌজন্যতা নাই। কালীদাস অনেক কাব্য রচনা করিয়াছেন।

Ans. সে মনঃকষ্টে সন্ন্যাসী হইয়াছে। দুষ্ট বালকেরা পক্ষিশাবক ধরিয়া যন্ত্রণা দেয়। তাহার কিছুমাত্র সৌজন্য (বা সুজনতা) নাই। কালিদাস অনেক কাব্য রচনা করিয়াছেন।

1914. **Correct the following :—**

(*a*) তিনি প্রত্যহ সন্ধাকালে গৃহের চতুপার্শ্বস্থ পুষ্পোদ্দানের মধ্যে পরিভ্রমন করেন।

(*b*) বাজীকরের অদ্ভুত ক্রিয়া দেখিয়া ছাত্রগণেরা প্রফুল্ল হইল।

(*c*) তাঁহার কিত্রিম ক্রোধে অনেকে ভীত হইয়া সাম্নুনয়পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

Ans. (*a*) তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে গৃহের চতুস্পার্শ্বস্থ পুস্পোদ্যানে পরিভ্রমণ করেন।

(*b*) বাজীকরের অদ্ভুত ক্রীড়া (বা কৌশল) দেখিয়া ছাত্রগণ প্রফুল্ল হইল।

(*c*) তাঁহার কৃত্রিম ক্রোধে অনেকে ভীত হইয়া অনুনয়পূর্ব্বক (বা সানুনয়ে) ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

1915. Re-write the following correcting all orthographical errors :—

যে ব্যক্তি পৃথিবীতে জন্মগ্রহন করিয়া দীন দুঃখির প্রতি করুণা প্রদর্শন করিতে শিখে নাই, তার মানব-জীবন ব্যর্থ হইয়াছে সন্দেহ নাই। যিনি পিরামিডের ন্যায় সুবিশাল কির্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছেন, তদপেক্ষাও যিনি একটি দরিদ্রের দুঃখভার হ্রাস করিয়াছেন, একটি সোকসন্তপ্তকে শান্তনা দিয়াছেন, তিনি দয়াময় ঈশ্বরের প্রিয়তর।

Ans. যে ব্যক্তি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া দীন-দুঃখীর প্রতি করুণা প্রদর্শন করিতে শিখে নাই, তাহার মানব-জীবন ব্যর্থ হইয়াছে সন্দেহ নাই। যিনি পিরামিডের ন্যায় সুবিশাল কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছেন, তদপেক্ষাও যিনি একটি দরিদ্রের দুঃখভার হ্রাস করিয়াছেন, একজন শোকসন্তপ্তকে সান্ত্বনা দিয়াছেন, তিনি দয়াময় ঈশ্বরের (নিকট) প্রিয়তর।

1916. Re-write the following correcting errors, if any :—

(*a*) যদিও বিপুল অর্থলাভ হইল, কিন্তু বুদ্ধির অভাবে তাহা কোন কাজে লাগিল না। (*b*) অর্থের অনাটন বশতঃ এবার লোকে অত্যান্ত কষ্ট পাইতেছে। (*c*) যাহারা পরিশ্রম করিতে সক্ষম, তাহাদিগকে ভিক্ষা দিলে আলস্যতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়। (*d*) তিনি বহুকষ্টে এবার আরোগ্য হইয়াছেন।

Ans. (*a*) যদিও প্রচুর অর্থলাভ হইল, তথাপি বুদ্ধির অভাবে তাহা কোন কাজে লাগিল না।

(*b*) অর্থের অনটনবশতঃ এবার লোকে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে।

(*c*) যাহারা পরিশ্রম করিতে সমর্থ, তাহাদিগকে ভিক্ষা দিলে আলস্যের (বা অলসতার) প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

(*d*) তিনি বহুকষ্টে এবার নীরোগ (বা অরোগ) হইয়াছেন (বা আরোগ্য লাভ করিয়াছেন)।

1917. Correct all errors in the following :—

তিনি দীর্ঘকাল ব্যাধিগ্রস্থ থাকিয়া এখন নীরোগী হইয়াছেন। তিনি তাহার ছেলেটিকে পড়াইবার জন্য বিশেষ শ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু সে শ্রম ফলবতী হয় নাই। আমি অদ্যাপিও তাহার অসাক্ষ্যাতে নিন্দা করি নাই। তিনি কোনরূপেই ধৈর্য্য হইয়া আমার কথা শুনিলেন না। তাহার অকৃতকার্য্যের সংবাদ পাইয়া আমি বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হওয়া অপেক্ষা লজ্জাস্কর কথা আর কি আছে?

Ans. তিনি দীর্ঘকাল ব্যাধিগ্রস্ত থাকিয়া এখন নীরোগ হইয়াছেন। তিনি তাঁহার ছেলেটিকে পড়াইবার জন্য বিশেষ শ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু সে শ্রম ফলবান্ (বা সফল) হয় নাই। আমি কদাপি তাহার অসাক্ষাতে নিন্দা করি নাই। তিনি কোনও রূপেই ধীর হইয়া (বা ধৈর্য্য ধরিয়া) আমার কথা শুনিলেন না। তাহার অকৃতকার্য্যতার সংবাদ পাইয়া আমি বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হওয়া অপেক্ষা লজ্জাকর বিষয় আর কি আছে?

1918. Re-write the following extract correcting all errors :—

তাহার সঙ্গে কথা বলিয়াই বুঝিতে পারিবে, সে অতি পাপিষ্ট ; সে তাহার বৃধ্য পিতামাতার প্রতি যেরূপ ব্যাবহার করে তাহা অতি নিচ তাহার

বন্ধুগণেরা তাহার প্রতি অনুযোগ দিয়া থাকে, কারণ সে তাহাদিগকে অশদ্ভাব করে ও কটু বাক্য বলে।

Ans. তাহার সঙ্গে কথা বলিলেই বুঝিতে পারিবে, সে অতি পাপিষ্ঠ; সে তাহার বৃদ্ধ মাতাপিতার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করে তাহা অতি নীচ; তাহার বন্ধুগণ তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া থাকে, কারণ সে তাহাদিগের সহিত অসদ্ভাব করে ও তাহাদিগকে কটুবাক্য বলে।

1919. Correct all spelling mistakes in the following :—

আমি সেই মুহূর্ত্তে তাহার সাহার্য্যের প্রত্যাসা ছাড়িয়া দিলাম। যদ্যাপি শিশুকাল হইতে আমি সমস্ত ব্যায়ভার বহন করিয়াছি তথাপি তাহার কথায় কৃতগ্যতার কোন চিহ্ন পাইলাম না। সে যে আমার প্রত্যোপকার করিবে তাহা আমার ভরষার অতিত। যাহা হউক আমি তাহার ঈষ্ট ভিন্ন কিছু প্রার্থনা করি না।

Ans. আমি সেই মুহূর্ত্তে তাহার সাহায্যের প্রত্যাশা ছাড়িয়া দিলাম। যদ্যপি শিশুকাল হইতে আমি তাহার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়াছি, তথাপি তাহার কথায় কৃতজ্ঞতার কোন চিহ্ন পাইলাম না। সে যে আমার প্রত্যুপকার করিবে তাহা আমার ভরসার (বা আশার) অতীত। যাহা হউক, আমি তাহার ইষ্ট ভিন্ন আর কিছু প্রার্থনা করি না।

1920. Re-write the following correcting all errors and stating reasons for your correction :—

মলয়ানিল সমীরণে বনকুসুম আন্দোলিত হইতেছিল, শাখার উপর পক্ষীর নীরগুলি সেই পবনে মৃদু মৃদু দুলিতেছিল। আমরা সামান্য পরিচ্ছেদ পড়িয়া বেরাইতে গিয়াছিলাম সুতরাং আমরা যে রাজপ্রসাদে বাস করি এবং রাজ-প্ররিবারের লোক, তাহা কেহই বুঝিতে পারে নাই। আমরা নিশিত কালে প্রমত্ত জ্যোৎস্নাময়ী প্রকৃতির শোভা নিরিক্ষণ করিতাম এবং গৃহে ফিরিয়া দুগ্ধ-ফেণনিভ সজ্জায় শুইয়া কতই না আহ্লাদিত হইতাম।

Ans. মলয়ানিলে (বা মলয় সমীরণে) বনকুসুম আন্দোলিত হইতেছিল ; শাখার উপর নীড়গুলি সেই পবনে মৃদু মৃদু আন্দোলিত হইতেছিল। আমরা সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম, সুতরাং আমরা যে রাজপ্রাসাদে বাস করি এবং রাজপরিবারের লোক, তাহা কেহই বুঝিতে পারে নাই। আমরা নিশীথকালে মনোহারিণী (প্রমুদিতা) জ্যোৎস্নাময়ী প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করিলাম এবং গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া কতই না আহ্লাদিত হইলাম।

1921. Re-write the following correcting all errors :—

পূজার উপলক্ষ্যে আমি আমার পিতার অনুমত্যানুসারে এবার গ্রামে গমন করিয়া দেশের যে শোচনিয় অবস্থা সচক্ষে দর্শন করিলাম, তাহাতে আমি মর্ম্মাহত হইয়া আসিয়াছি, তাহা আর আপনাকে কি নিবেদন করিব। অনেকের দুই সন্ধা আঁহার জুটিতেছে না এবং বহুলোক রোগ হইয়া শয্যাশায়ী হইয়া আছে।

Ans. পূজোপলক্ষে (বা পূজা উপলক্ষে) আমি আমার পিতার অনুমত্য-নুসারে (বা অনুমতি অনুসারে) এবার গ্রামে গমন করিয়া দেশের যে শোচনীয় অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিলাম, তাহাতে আমি যেরূপ মর্ম্মাহত হইয়া আসিয়াছি, তাহা আর আপনাকে কি নিবেদন করিব। অনেকের দুই সন্ধ্যা আহার জুটিতেছে না, এবং বহুলোক রোগাক্রান্ত হইয়া (বা রোগে) শয্যাশায়ী হইয়া আছে।

1922. Re-write the following correcting all errors of grammar, idiom and spelling :—

তিনি বেশ সুখে সচ্ছন্দে আছেন, কিন্তু তাঁহার বন্ধু টমাস যুদ্ধে আহত হইয়া আসিয়াছে, মস্তকে আঘাত লাগাতে তাঁহার ধৃতশক্তি একেবারে ভোঁতা-হইয়া গিয়াছে। এইজন্যই যেন ভয়ানক যুদ্ধ শীঘ্র করিয়া দিয়াচে। যদিও সে আমার প্রতি বিরক্ত কিন্তু সে আমার কোন অনিষ্টাচরণ করে না। আমার

জ্বর হইয়া চিকীৎসার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলাম, কিন্তু ঐ স্থানের আবহাওয়ায় আমাদের সাস্থোন্নতি হইল না, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে।

Ans. তিনি বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছেন, কিন্তু তাঁহার বন্ধু টমাস যুদ্ধে আহত হইয়া আসিয়াছেন। মস্তকে আঘাত লাগাতে তাঁহার ধৃতিশক্তি একেবারে ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। এইজন্যই যেন এই ভয়ানক যুদ্ধ শীঘ্র শেষ হইয়া গিয়াছে। যদিও সে আমার প্রতি বিরক্ত তথাপি সে আমার কোন অনিষ্টাচরণ করে না। আমার জ্বর হওয়াতে (বা হওয়ায়) চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলাম, কিন্তু এ স্থানের জল-বায়ুতে আমার স্বাস্থ্যোন্নতি না হইয়া (বা স্বাস্থ্যোন্নতি হয় নাই), বরং পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে।

1923. Crrrect the errors in the following passages :—

তোমার কথা আমার স্মরন নাই, এটা তোমার নিতান্ত ভুল ধারনা। আমি পীড়া হইয়া বাড়ি গিয়াছিলাম, এজন্য তোমার সম্বাদ লইতে পারি নাই, তথাপিও আমার ছোট ভাই রমেশকে দিয়া তোমার খোজ লইয়াছিলাম। সে কি তোমাকে এ সম্বন্ধে কিছু বলে নাই ? আমি এখনও ভালরূপ আরোগ্য হই নাই! তুমি যদি আমার প্রতি ক্রোধ হও ; তবে আমি নিতান্ত ব্যাথিত হইব।

Ans. তোমার কথা আমার স্মরণ নাই, এটি তোমার নিতান্ত ভ্রান্ত ধারণা। আমি পীড়িত হইয়া বাড়ী গিয়াছিলাম, এজন্য তোমার সংবাদ লইতে পারি নাই ; তথাপি আমার ছোট ভাই রমেশকে দিয়া তোমার খোঁজ লইয়াছিলাম। সে কি তোমাকে এ সম্বন্ধে কিছুই বলে নাই ? আমি এখনও ভালরূপ নীরোগ হই নাই (বা আরোগ্য লাভ কবি নাই)। তুমি যদি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হও (বা ক্রোধ কর), তবে আমি নিতান্ত ব্যথিত হইব।

1924. Correct the errors in the following extracts :--

(*a*) গাছেরা বড় হইলে ছায়া দিতে থাকে। (*b*) সেখানকার বাড়ীর বিস্তর ছাদগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। (*c*) যাহা বলিব তাহা অন্যথা হইবে না। (*d*) প্রত্যেক মনুষ্যই নিজের কর্ম্মের জন্য নিজে দায়ী, তাহারা অন্যের অপরাধির

জন্য দোষী হইতে পারে না। (*e*) আমি সাবকাশ পাইলেই আফিসে যাইব। (*f*) ছুটির পর হইতেই অত্যান্ত কার্য্যবাহুল্যতা ঘটিয়াছে।

Ans. (*a*) গাছ বড় হইলে ছায়া দিতে থাকে। (*b*) সেখানকার বাড়ীর বিস্তর ছাদ (বা ছাদগুলি) ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। (*c*) যাহা বলিব তাহার অন্যথা হইবে না। (*d*) প্রত্যেক মনুষ্যই নিজের কর্ম্মের জন্য নিজে দায়ী, কোন ব্যক্তিই অন্যের অপরাধের জন্য দোষী হইতে পারে না। (*e*) আমি অবকাশ পাইলেই অফিসে যাইব। (*f*) ছুটির পব হইতে অত্যন্ত কার্য্যবাহুল্য (বা কার্য্যবহুলতা) ঘটিয়াছে।

1925. Correct the errors in the spelling of any five of the following words :—

সন্মান, দুর্ণাম, সন্ন্যাসী, অধ্যায়ন, পুরষ্কার, আনুসঙ্গিক and কিম্বা।

Ans. সম্মান, দুর্নাম, সন্ন্যাসী, অধ্যয়ন, পুরস্কার, আনুষঙ্গিক and কিংবা।

1926. Re-write the following in chaste and elegant Bengali correcting all errors :—

নদীর ঘাটে যাইয়া আমরা মড়া-দাহ দেখ্‌তে লাগিলাম। চিতার ধোঁয়া সমস্ত জায়গাটা সমাচ্ছন্ন হইয়া এরূপ আঁধার ক'রে তুলিয়াছিল যে, আমাদের নিশ্বাস আটকাইয়া যাইতেছিল। আমরা নদীর তীরে দাঁড়াইয়া জীবনের নশ্বর ও ক্ষনভঙ্গুর বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলাম।

Ans. নদীর ঘাটে যাইয়া আমরা শবদাহ দেখিতে লাগিলাম। চিতাধূমে সমস্ত স্থান সমাচ্ছন্ন হইয়া (বা হওয়ায়) এরূপ অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল যে আমাদের নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। আমরা নদীর তীরে দাঁড়াইয়া জীবনের নশ্বরতা ও ক্ষণভঙ্গুরতার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম।

1927. Correct :—

আমি অত্যান্ত পীড়িত হইয়া পড়াতে তোমার সঙ্গেতে যাইতে পাড়ি নাই। বিশেষ আমি যে ধুতিখানি পড়িয়াছিলাম, তাহা এত ময়লা ছিল যে আমি

তাহা লইয়া যাইতে সাহসী হই নাই। কিন্তু তারপড়ে তুমিতো আমার খোজই নিলে না। শুনিলাম সেদিন পুলিস বহু লোকদিগকে ধড় পাকড় করিয়াছিল।

Ans. আমি অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়ায় তোমার সঙ্গে যাইতে পারি নাই; বিশেষতঃ আমি যে ধুতিখানি পরিয়াছিলাম, তাহা এত ময়লা ছিল যে, আমি তাহা লইয়া বাহির হইতে সাহসী হই নাই। কিন্তু তারপরে তুমি তো আমার কোন খোঁজই লইলে না। শুনিলাম, সেদিন পুলিশ বহু লোককে ধরপাকড় করিয়াছিল।

1929. Are the following words correctly spelt? If not, correct them :—

দুস্‌প্রবেশ, ভ্রূকুটী, লখ্য, উর্দ্ধ, পরিপক্ক, মহত্য, সাস্তনা, ভল্লুক, উজ্জল, পুরষ্কার, পুস্করিণী, ব্যাথা, আয়ুষ্মান, বাল্মিকী।

Ans. দুষ্প্রবেশ, ভ্রূকুটি (ভ্রুকুটি, ভ্রুকুটী), লক্ষ্য, উর্দ্ধ, পরিপক্ব, মহত্ত্ব, সান্ত্বনা, ভল্লূক, উজ্জ্বল, পুরস্কার, পুষ্করিণী, ব্যথা, আয়ুষ্মান্, বাল্মীকি।

1930. Re-write the following passages, correcting all errors in it :—

সে উর্দ্ধে তাকাইয়া ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া নীরব হইল, মনে হইল, একটি বীণা বাজিতে বাজিতে যেন থামিয়া গেল। তাহার করুণ বিলাপ কাহিনী শুনিয়া আমার মন জমাট হইয়া গেল। কিন্তু তাহাকে সাহায্য করিবার এমন ক্ষেমতা বা সমর্থ ছিল না, আমি মনে সাতিশয় ব্যাথা বোধ করিতে লাগিলাম।

Ans. সে উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া নীরব হইল। মনে হইল, যেন একটি বীণা বাজিতে বাজিতে থামিয়া গেল। তাহার করুণ কাহিনী শ্রবণ করিয়া আমার মন দ্রবীভূত হইয়া গেল। কিন্তু তাহাকে সাহায্য করিবার মত শক্তি বা সামর্থ্য আমার ছিল না, সেজন্য আমি মনে অতিশয় ব্যথা অনুভব করিতে লাগিলাম।

1931. Correct all errors in the following :—

তখন আষাঢ়মাস বাগানে কুন্দকুসুমগুলি ধীরে ধীরে সৌরভ বিকাশ করিতেছে, বৃষ্টিধারায় দলগুলি আর্দ্র হওয়াতে মনে হইতেছিল কোন সুন্দরী স্বীয় মুখখানি শীতল জলে ধুইয়া যেন উদ্যানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আকাশের গায় মেঘগুলি কখনও পশুমুণ্ডের ন্যায়, কখনও পাহাড় খণ্ডের, কখনও বা শুভ্রমাল্যের ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে চালিত হইয়া উপবিষ্ট হইতেছিল। অদূরে গঙ্গাতরঙ্গ ঢেউ সহকারে বেগে ছুটিতেছিল ও সান্ধ্য বায়ু দুলিতে দুলিতে পবনের সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছিল।

Ans. তখন আষাঢ় মাস, উদ্যানে যুথিকাকুসুমগুলি ধীরে ধীরে সৌরভ বিস্তার করিতেছে, বৃষ্টিধারায় দলগুলি সিক্ত হওয়াতে মনে হইতেছিল, যেন কোন সুন্দরী স্বীয় বদনমণ্ডল শীতল সলিলে ধৌত করিয়া উদ্যানে আসিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। আকাশগাত্রে মেঘরাশি সমীরসঞ্চালিত হইয়া কখনও পশুমস্তকের ন্যায়, কখনও প্রস্তরখণ্ডের ন্যায়, কখনও বা শুভ্র পুষ্পমাল্যের ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে সন্নিবেশিত হইতেছিল। অদূরে গঙ্গা তরঙ্গসহকারে (বা তরঙ্গভঙ্গে) বেগে প্রবাহিত হইতেছিল ও সান্ধ্য পবন দুলিতে দুলিতে তরঙ্গের সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছিল।

[**N. B.** আষাঢ় মাসে কুন্দকুসুম প্রস্ফুটিত হয় না—বরং যুথিকাকুসুম বলিলে সঙ্গত হয়।]

1932. Re-write the following correcting all errors and defects :—

সে দৌড়াতে দৌড়াতে উছট খাইয়া পড়িয়া গেল, আকস্মিক ভাবে একটি খানার ভিতরে। এই পতিতের ফলে ভাঙ্গিয়া গেল তাহার একখানি পা এবং সাতমাস শয্যাশায়ী হইয়া রহিল। পূর্ব্বে যে সকল বন্ধুসমূহ তাহার কাতরের সংবাদ শুনিয়া তাহাকে দেখিতে আসিত, তাহাদের দীর্ঘশ্বাস আহা উহু শুনিলে মনে স্বাভাবিক হইত যে তাহারা সত্যই তাহাকে খুব ভাল বাসিয়াছিল কিন্তু তাহার এই পতন ঘটিত দুরাবস্থার সময় অর্থের কম্‌তি পড়াতে তাহাকে কেহ সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল না।

Ans. সে দৌড়াইতে দৌড়াইতে উছট (হোঁচট) খাইয়া অকস্মাৎ একটি খানার মধ্যে পড়িয়া গেল। এই পতনের ফলে উহার একখানি পা ভাঙ্গিয়া গেল এবং উহাতে সে সাত মাস শয্যাশায়ী হইয়া রহিল। পূর্ব্বে যে সকল বন্ধু তাহার বিপদের সংবাদ শুনিয়া তাহাকে দেখিতে আসিত, তাহাদের দীর্ঘশ্বাস এবং হাহুতাশ শুনিয়া স্বভাবতঃ মনে হইত যে, তাহারা সত্যই তাহাকে খুব ভালবাসে; কিন্তু তাহার এই পতনঘটিত দুরবস্থায় অর্থের অভাব ঘটায় তাহাকে কেহই সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল না।

1933. Re-write the following correcting errors :—

আমি তোমার জন্য বড়ই সুচিন্তিত আছি। পত্রপাঠ তোমার মঙ্গল চাই। গত পরশ্বদিন শামলালের চিঠি পাইব, তখন তাহার অন্তঃকরণের ভাব বুঝিতে পারিব। সে যাহা লিখিবে, তুমি যথাসময়ে তাহা অবিদিত থাকিবে। সে নিতান্ত দীর্ঘসূত্র ঠিক সময়ে কাজ না করায় শেষে চোখের একেবারে হলুদ ফুল দেখে। যদ্যপি রামবাবু আমার ছেলেটিকে একটা বিষয় কর্ম্ম করিয়া দিবেন বলিয়াছেন, কিন্তু আজ কাল যে দিন পড়িয়াছে, তাহাতে তাহার কথার সম্পূর্ণ-ভাবে নির্ভরসা করিতে পারি না। তুমি প্রত্যুত্তর দিতে গৌণ করিও না।

Ans. আমি তোমার জন্য বড়ই চিন্তিত আছি। এই পত্র পাঠ করিয়াই তোমার মঙ্গল সংবাদ লিখিবে। আগামী পরশ্ব শ্যামলালের পত্র পাইব, তখন তাহার অন্তঃকরণের ভাব বুঝিতে পারিব। সে যাহা লিখিবে, তুমি যথাসময়ে তাহা বিদিত হইবে। সে অত্যন্ত দীর্ঘসূত্রী, যথাসময়ে কাজ না করায় শেষে সে চক্ষুতে সরিষার ফুল দেখিয়া থাকে। যদিও রামবাবু আমার ছোট ছেলেটিকে একটা কর্ম্ম করিয়া দিবেন বলিয়াছেন, কিন্তু আজকাল যে দিন পড়িয়াছে, তাহাতে তাঁহার কথায় সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে পারি না। তুমি উত্তর দিতে বিলম্ব করিও না।

1934. Correctly spell the following words :—

চিরজিবি, ব্যাথা, সাস্থ্য, শারিরিক, লক্ষী, উজ্বল, মুমুর্ষু।

Ans. চিরজীবী, ব্যথা, স্বাস্থ্য, শারীরিক, লক্ষ্মী, উজ্জ্বল, মুমূর্ষু।

1935. Correct :—

পরীক্ষার পর পরিতে পারা যায় না। তার চেয়ে পুষ্পোদ্যানে ভ্রমণ করিয়া সাস্থ্য লাভ করা ভাল। সকলে বিদ্বান হইবে এমন কোন কথা নাই। সৌজন্যতাই বেশী আবশ্যকীয় নয় কি ?

Ans. পরীক্ষার পর পড়িতে পারা যায় না। তাহা অপেক্ষা পুষ্পোদ্যানে একটু ভ্রমণ করিয়া স্বাস্থ্যলাভ করা ভাল। সকলেই বিদ্বান্ হইবে এমন কোন কথা নাই। সৌজন্যই অধিক আবশ্যক নহে কি ?

1936. Correct the following :—

তাহার দুরাবস্থা দেখিলে দুঃখ হয়। তাহার মুখে সে উজ্জল হাসি নাই। বিষয় সম্পত্তি সব উচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে! সে এতই ঋণ-গ্রস্থ যে সংসারের নিতান্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির জন্য তাহাকে ভিক্ষা করিতে হয়। কাহারও সহিত তাহার ঐক্যতা নাই। এ অবস্থার জন্য সে নির্দ্দোষী ইহা বলিতে পারি না। তাহার দুর্ণাম রটিয়াছে অনেক। তাহার সম্মুখে যাইতে সলজ্জিত বোধ করি। সে শশঙ্কিত চিত্তে দিন যাপন করে।

Ans. তাহার দুরবস্থা দেখিয়া দুঃখ হয়। তাহার মুখে সে উজ্জ্বল হাসি নাই। বিষয়-সম্পত্তি সব উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে। সে এতই ঋণগ্রস্ত যে, সংসারে নিতান্ত আবশ্যক দ্রব্যাদির জন্যও তাহাকে ভিক্ষা করিতে হয়। কাহারও সহিত তাহার ঐক্য নাই। এই অবস্থার জন্য যে সে নির্দ্দোষ ইহা বলিতে পারি না। তাহার দুর্নাম রটিয়াছে অনেক। তাহার সম্মুখে যাইতে লজ্জা বোধ করি। সেও শঙ্কিতচিত্তে দিন যাপন করে।

অনুশীলনী

১। অশুদ্ধি সংশোধন কর :—

(ক) ধনী কি নির্ধনী নগরবাসীগণ মাত্রই তাহার অত্যাচারে সদাসর্ব্বদা শশঙ্কিত থাকিত।

(খ) সবিনয়পুর্ব্বক নিবেদন এই যে আপনার ঔষধ ব্যভার করিয়া আমি আরাম হইয়াছি।

(গ) নীরোগী এবং নিশ্চিন্তাহীন ব্যক্তিগণই সংসারে দীর্ঘজীবন লাভ করিতে সক্ষম হয়।

(ঘ) আমাদের শোচনিয় অবস্তাদৃষ্টে তাহার হৃদয়াকাশে কারুণ্যতার উৎস ঝরিতে লাগিল।

(ঙ) আগতকল্য কালিদাস সভার মহতী অধিবেশনের পর জ্ঞানমান্ লোকেরা অকারনে কাহারও মানের লাঘবতা করেন না! এই বিষয় প্রমাণ করিবেন।

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলির অশুদ্ধি সংশোধন করিয়া পুনরায় লিখ ঃ—

দুস্প্রবেশ, ভ্রূকুটী, পরিপক্ক, পুরষ্কার, ব্যাথা, জগবন্ধু, মনোচোর, আসমুদ্রপর্য্যন্ত, অপ্সরী, অদ্যাপিও, দারিদ্রতা, একত্রিত, বিদ্যুতালোক, জাগ্রত এবং সবিনয়পূর্ব্বক।

৩। সংশোধন কর ঃ—

উত্তর পষ্ট হওয়া আবশ্যকীয়। তিনি রূপে কুবের, গুণে রতিপতি ও ঐশ্বর্য্যে বৃহস্পতির সমতুল্য ছিলেন এবং পরুষবচনপ্রযুক্ত প্রাণান্তেও অন্যের মনোপীড়া উৎপত্তি করেন নাই।

শদেসীযুগের শ্রেষ্ঠ নেতা সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র ভবশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এই হালে মারা গেছেন।

ঋণগ্রস্থ হওয়ায় তাহার সমস্ত সম্পত্তি উচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। দুরাবস্থার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাহার মুখের উজ্জল হাসি বিলোপসাধন হইয়াছে। নির্দ্দোষী বলিয়া এখনও তাহার দুর্ণাম রটে নাই, তথাপি সে সশঙ্কিতচিত্তে দিন যাপিত করিতেছে।

আমরা পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর বক্ষ হইতে বাংলার দিগন্তচওড়া শষ্যশ্যামল প্রান্তর দেখিয়া ভীষণ আনন্দিত হইলাম। কিন্তু শীঘ্র মধ্যে জলধীজালে গগণমণ্ডল আচ্ছন্ন হইল, আমরা কূলে অবতরণ করিলাম।

জগবন্ধুবাবুকে পীড়িত দেখিয়া তিনি সশঙ্কিত হইলেন। তখন রোগি প্রলাপ জপ করিতেছিলেন। পীড়িতবস্থায় ঋণগ্রস্থ হইয়া এই মান্যনীয় ব্যক্তিকে সম্পত্তি আবধ্য রাখিতে হইবে।

৪। অশুদ্ধি সংশোধন কর ঃ—

(ক) অত্যাধিক অধ্যায়নের ফলে বালকটি অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িল। গিরিশচন্দ্র সেই নিশিথকালে সেখানে উপস্থিত। তাঁহার শুশ্রূষাগুণে মুমুর্ষু বালক মুহূর্ত্তের মধ্যে আরোগ্য হইল। এই সংবাদে আমি আনন্দসাগরে পুলকিত হইলাম ও তাহার সদয়পূর্ণ ব্যবহারে কৃতার্থ হইয়া অবশেষে ধন্যবাদ দিলাম।

(খ) দুরবস্থার বিষয় চিন্তা করিতে তাহার মুখের উজ্জল হাসি বিলুপ্ত হইয়াছে। এখন নিতান্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে হইলে তাহাকে ভিক্ষা করিতে হয়। তুমি মৌন হইয়া আছ কেন; আমি তো তোমাকে অপমান করি নাই? ঋণগ্রস্থ হওয়ায় প্রচুর সম্পত্তিসমূহ উচ্ছন্ন গিয়াছে।

(গ) বয়োজেষ্ট গুরুজনসমূহ এবং সজাতির উচ্চবর্ণপদস্থদিগের প্রতি হতাদর আমাদের অবগতির প্রকৃিষ্ট কারণ, বিদ্দেশবুদ্ধি ছাড়িয়া সসম্প্রদায়ভুক্ত মনিষীগণের সম্মান করিতে শেখ। সজাতির অনুষ্ঠিত জ্ঞানধরমের অনুশিলন কর—দেখিবে উন্নতি করায়ত্ব হইয়াছে।

(ঘ) আমি কৃষিজীবি লোকদিগের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া অবগত হইয়াছি তাহারা জমিদারের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে সম্মত নহে। দারিদ্রই তাহার কারণ ; তাহারা বলে—প্রবল জমিদার কোপিত হইলে তাহাদের আর ভদ্রস্থতা থাকিবে না ; সদাসর্বদাই সশঙ্কিত হইয়া বাস করিতে হইবে।

(ঙ) নদীর ঘাটে যাইয়া আমরা মড়াদাহ দেখিতে লাগিলাম, চিতার ধোঁয়ায় সমস্ত জায়গাটা সমাচ্ছন্ন হইয়া এরূপ আধার ক'রে তুলেছিল যে আমাদের নিশ্বাস আটকাইয়া যাইতেছিল। আমরা নদীর শৈকতে দাঁড়াইয়া জীবনের নাশ্বর্য্য ও ক্ষণভাঙ্গুর্য্য চিন্তা করিতে লাগিলাম।

(চ) বাঙ্গালা দেশের সকল পল্লীগুলিই অদ্যাপি জঙ্গলাকীর্ণ, পানায় দীঘি পুষ্করণী পূর্ণ, ম্যালেরিয়া-ক্রান্ত হইয়া মৃত্যুর করাল কবলে দলে দলে লোকসকল পতিত হইতেছে, তাহাদের গৃহ পুলকহীন, গোধন হাড্ডিসার—ভাগাড়াভিমুখী অথচ নাছোড়বান্দা ভূম্যাধিকারীর রাজস্ব করা ক্রান্তিতে দেওয়া চাই। দেশের দুরাবস্থা অবর্ণয়িতব্য।

(ছ) ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বহুকাল পর্য্যন্ত সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয়ের জন্য সচেষ্টিত আছেন, কিন্তু তথাপিও উহা নিঃসংশয়ে নির্ণয় হয় নাই। ইতিপূর্ব্বে পৃথিবীর সমুদায় সভ্যজাতি এই বিষয়ে অনুশীলন করিতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছেন, কেহই কৃতকার্য্যতা হইতে পারেন নাই।

সপ্তম অধ্যায়

বঙ্গানুবাদ

ভাষা শিক্ষার পক্ষে অনুবাদ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। একটি ভাষার বক্তব্য বিষয়টিকে যথাযথভাবে আর একটি ভাষার মধ্য দিয়া প্রকাশিত করা বিশেষ অনায়াসসাধ্য নহে। প্রত্যেক ভাষার ভাবপ্রকাশের স্বতন্ত্র রীতি আছে, বাক্য-গঠনের বিশিষ্ট ভঙ্গী আছে এবং বিশেষ বিশেষ শব্দ ও বাক্যাংশের বিশিষ্ট অর্থ আছে। অনুবাদ যথাযথ হইবে, অথচ ভাষা আড়ষ্ট হইবে না—প্রাঞ্জল ও সুন্দর হইবে, মূলের ভাষার ঝঙ্কার ও ভাব অনুবাদে যথাসম্ভব রক্ষিত হইবে—এরূপ-ভাবে অনুবাদ করা সত্যই কঠিন। প্রায়ই দেখা যায়, অনুবাদ যথাযথ করিতে গিয়া ভাষা অস্পষ্ট, দুর্ব্বোধ্য ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, আবার ভাষার দিকে মনোযোগ দিলে মূলের অনেক কথা অনুবাদে বাদ পড়িয়া যায়। অনুবাদকের সর্ব্বাপেক্ষা বড় কৃতিত্ব এই যে, অনুবাদ পড়িয়া মনে হইবে যেন মৌলিক রচনাই পড়া হইতেছে। অনুবাদের ভাষা যে ভাষায় অনুবাদ করা হইতেছে সেই ভাষার রীতি-অনুসারে সম্পূর্ণরূপে গঠিত হইবে।

অনুবাদ করিবার সময় শিক্ষার্থিগণের নিকট যাহা খুব বড় সমস্যা বলিয়া মনে হয় তাহা এই—অনুবাদ যথাযথ হইবে, না অনুবাদকালে অনুবাদক মূলের একেবারে অবিকল আক্ষরিক অনুবাদ না করিয়া ভাবানুবাদ করিবে। আমাদের মনে হয় ভাষার রীতি, সঙ্গতি ও সৌন্দর্য্য বিসর্জ্জন না দিয়া অনুবাদ যতটা সম্ভব যথাযথ করিতে পারা যায় ততই ভাল। যে ইংরেজী অনুচ্ছেদটির অনুবাদ করিতে হইবে তাহার মূল কথাগুলি বাঙ্গলায় যাহাতে বাদ না পড়ে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

কয়েকটি ইংরেজী বাক্যকে একটি বাঙ্গলা বাক্যে বা একটি ইংরেজী বাক্যকে একাধিক বাঙ্গলা বাক্যে—প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্ত্তিত করিতে

হইবে। বাঙ্গলা বাক্যে অনেক সময় ক্রিয়াপদ দেওয়ার কোন প্রয়োজন হয় না, এ কথাও মনে রাখিতে হইবে। বাঙ্গলায় অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার খুবই অধিক। আবার পর পর কতকগুলি অসমাপিকা ক্রিয়া থাকিলে রচনা শ্রুতিকটু হয়—এ সব কথাও ভুলিলে চলিবে না। জটিল বাক্যকে সরল বা যৌগিক বাক্যে এবং সরল বাক্যকে জটিল বা যৌগিক বাক্যে, যখন যেমন প্রয়োজন তখন সেইরূপভাবে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে।

নিম্নে কয়েকটি আদর্শ ও প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর দেওয়া হইল। এইগুলি একটু যত্নসহকারে দেখিলে ও একটু আয়াস স্বীকার করিয়া নিজ নিজ অনুবাদের চেষ্টা করিলে চলনসই অনুবাদ প্রায় সকলেই শিক্ষা করিতে পারে।

The crow is one of the birds that I know best in India. Crows are of two kinds. The larger crow is all black. The smaller one has black feathers in its wings and tail but its neck is grey. The larger crow has a very strong beak. It can kill and carry off small animals like young rabbits. Two or three together will sometimes attack larger animals. The smaller crow is not so strong but it is very bold, quick and clever. It can pick up food with its beak while flying. It does not need to stop and stand on the ground.

ভারতবর্ষে যে সকল পাখী সম্বন্ধে আমরা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী জানি তাহাদের মধ্যে কাক একটি। দুই প্রকারের কাক দেখা যায়। অপেক্ষাকৃত বড় কাক সম্পূর্ণ কাল। ছোট কাকের ডানায় ও লেজে কাল পালক আছে কিন্তু ইহার গলা ধূসর বর্ণ। বড় কাকের খুব শক্ত ঠোঁট আছে। ছোট খরগোসের ন্যায় ছোট ছোট জন্তুকে ইহারা মারিয়া ফেলিতে ও বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে। দুই তিনটি একত্রে মিলিয়া কোন কোন সময় বড় বড় জন্তুকেও আক্রমণ করে। ছোট কাকের এত শক্তি নাই বটে, কিন্তু ইহারা অত্যন্ত সাহসী, ক্ষিপ্র ও চতুর। উড়িতে উড়িতে ইহারা খাদ্য কুড়াইয়া লইতে পারে; থামিবার ও মাটিতে দাঁড়াইবার দরকার হয় না।

If a man is walking with a basket of fruit or other food on his head, the crow will even fly down and steal some small thing

from the basket. If you throw a small piece of bread high into the air, a crow will often catch it. The crow eats almost anything, lizards and frogs, very small birds, fruit, corn and bread. It often steals eggs from other birds' nests. It can often carry off eggs as big as those of hens and ducks. With its beak it can make a whole in the shell of the egg and so can take hold of the shell with its beak.

যদি কোন লোক মাথায় করিয়া ফলের বা অন্য কোন খাদ্যের ঝুড়ি লইয়া চলিতে থাকে, কাক অমনি উড়িয়া নীচে যাইবে ও ঝুড়ি হইতে কোন জিনিষ চুরি করিয়া লইয়া যাইবে। যদি তুমি আকাশে এক টুকরা রুটি ছুঁড়িয়া দাও কাক উহা ধরিয়া ফেলিবে। কাক প্রায় সব জিনিষই খায়—টিকটিকি ও ব্যাঙ্‌, ছোট ছোট পাখী, ফল, শস্য, রুটি। উহারা প্রায়ই অন্য পাখীর বাসা হইতে ডিম চুরি করে। এমন কি মুরগী ও পাতিহাঁসের ডিমের ন্যায় বড় ডিম ইহারা বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে। ইহারা ঠোঁট দিয়া ডিমের খোলায় গর্ত্ত করে এবং এইরূপে ঠোঁট দিয়া খোলাটিকে ধরিতে পারে।

Crows rob the nests of other birds so often that they are afraid for their own. They make their nest high up in tall trees and one bird always stays in the nest to watch over the eggs. Crows will always eat the flesh of dead animals. As soon as an animal dies in the fields, crows can be seen flying near the body. They will even eat bad food that has been thrown away. So they are very useful in helping to keep our towns and villages clean.

কাকেরা এত বেশী অন্য পাখীর বাসা হইতে চুরি করে যে উহারা নিজেদের বাসার জন্য সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকে। ইহারা লম্বা লম্বা গাছের উঁচু জায়গায় নিজেদের বাসা বাঁধে এবং ডিম পাহারা দিবার জন্য সর্ব্বদা একটি পাখী বাসায় থাকে। কাক মৃত প্রাণীর মাংসও খায়। মাঠে কোন প্রাণী মরিলেই দেখা যায় মৃতদেহের নিকট কাক উড়িতেছে। যে খারাপ খাদ্য ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে ইহারা তাহাও খায়। এইভাবে ইহারা আমাদের শহর ও গ্রাম পরিষ্কার রাখিবার কাজে সহায়তা করিয়া বড় উপকার করে।

In a great forest a jackal once found the body of a dead elephant. But he could not bite through the skin to get at the flesh; for, as you know, an elephant has a very hard, thick skin. So he sat down and thought for a time and then he said to himself, "Some big animal will come soon and with his strong teeth will bite a hole in the skin. Then I shall perhaps get some of the flesh afterwards."

একটি বড় বনে কোন এক সময়ে এক শৃগাল একটি মৃত হস্তীর দেহ দেখিতে পাইয়াছিল। কিন্তু মাংস পাইবার জন্য চামড়া কামড়াইয়া সে ছেদন করিতে পারে নাই। তোমরা জান যে হাতীর চামড়া অত্যন্ত শক্ত ও পুরু। সুতরাং সে বসিয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিল, তারপর আপন মনে বলিল—'কোন বড় জন্তু শীঘ্রই আসিবে ও শক্ত দাঁত দিয়া কামড়াইয়া চামড়ায় ছিদ্র করিবে। তাহা হইলে হয়ত আমি পরে কিছু মাংস পাইব।

So he waited near the body for some time, and before long a lion came there. The jackal said to the lion, "My lord King, I have been guarding this elephant's body for you. Will you not take your meal?" He hoped there would be plenty of meat left for him afterwards. "The lion cannot eat it all" he said to himself. The lion replied "My good friend, I myself always kill the animals that I have for my food. I never eat any other. Do you not know that? You may keep the elephat for yourself." The lion went away but not long afterwards a leopard came. The jackal said to himself "Here is a leopard. He has sharp teeth, almost as strong as a lion's. He can bite through the hard, thick skin for me."

সুতরাং সে হস্তীর দেহের নিকট কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিল এবং অল্পক্ষণ পরেই একটি সিংহ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। শৃগাল সিংহকে বলিল—'মহারাজ, আপনার জন্য আমি এই হাতীর দেহ পাহারা দিতেছি। আপনি কি আহার করিবেন না?' শৃগাল আশা করিয়াছিল যে পরে তাহার জন্য প্রচুর মাংস পড়িয়া থাকিবে। সে নিজে নিজে বলিল,—'সিংহ একা সমস্ত খাইয়া উঠিতে পারিবে না।' সিংহ উত্তর করিল,—'প্রিয় বন্ধু, আমার নিজের খাদ্যের জন্য আমি নিজেই প্রাণিবধ করিয়া থাকি। আমি অন্য কিছু খাই না। তুমি কি তাহা জান না? হাতীটি তুমি তোমার নিজের জন্য রাখিতে পার।'

সিংহ চলিয়া গেল, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই একটি চিতাবাঘ আসিল। শৃগাল মনে মনে বলিল—'এই যে একটি চিতাবাঘ! ইহার দাঁতও প্রায় সিংহের দাঁতের মত শক্ত। ও আমার জন্য শক্ত পুরু চামড়া কামড়াইয়া ছিঁড়িতে পারে।'

So he said to the leopard, "Good day, sir, you have come at the right time. My master the lion has killed this elephant and I am guarding the body for him. But, if you like, you may eat some of the flesh. I will watch and tell you when the lion is coming back." The leopard was very hungry and began to bite at the skin with his strong, sharp teeth. Before long he made a big hole and was eating the flesh. Then the jackal called out "Quick, Quick, run away. The lion is coming." The leopard ran away, and the jackal then made a good meal from the elephant's flesh.

সুতরাং সে চিতাবাঘকে বলিল, "মহাশয়, নমস্কার। আপনি উপযুক্ত সময়েই আসিয়াছেন। আমার মনিব সিংহ এই হাতীটিকে মারিয়াছেন, আমি তাঁহার জন্য এই দেহটি পাহারা দিতেছি। কিন্তু আপনি ইচ্ছা করিলে কিছু মাংস খাইতে পারেন। আমি পাহারা দিব এবং কখন সিংহটি ফিরিয়া আসে আপনাকে বলিয়া দিব।" চিতাবাঘটি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত ছিল এবং শক্ত তীক্ষ্ণ দাঁত দিয়া চামড়া কামড়াইতে আরম্ভ করিল। খানিকক্ষণের মধ্যেই সে একটি বড় গর্ত্ত করিয়া ফেলিল ও মাংস খাইতে লাগিল। তখন শৃগাল চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি, পালাও, পালাও, সিংহ আসিতেছে।" চিতাবাঘটি দৌড়াইয়া পলাইল, তখন শৃগাল পেট ভরিয়া হাতীর মাংস খাইল।

The ship I was on was overtaken by a heavy storm and I and the rest of those on board were obliged to try and save ourselves in a small boat. We worked hard at the oars though with heavy hearts. After we had rowed or rather been driven about a league and a half, a raging wave mountain-high came rolling astern. Before we had time even to call upon God, it overset the boat and we were all swallowed up in a moment.

Nothing can describe what I felt when I sank into water. Though I was a good swimmer I could not free myself from the waves so as to draw breath till another wave carried me right

on to the shore and left me upon the land almost dry but half dead with the water I had swallowed.

যে জাহাজে আমি ছিলাম তাহা ভীষণ ঝড়ে পড়িল। আমি ও জাহাজের অন্যান্য লোক প্রাণরক্ষার জন্য ছোট একখানি নৌকাতে চড়িতে বাধ্য হইলাম। প্রাণপণে দাঁড় টানিতে লাগিলাম কিন্তু মন দমিয়া যাইতে লাগিল। আমরা দেড় 'লিগ' পর্য্যন্ত দাঁড় টানিয়া অগ্রসর হইয়াছি—অগ্রসর হইয়াছি বলিলে ভুল হইবে, ঢেউয়ের ধাক্কায় আমরা চালিত হইয়াছি—পর্ব্বতপ্রমাণ একটা তরঙ্গ পিছন হইতে ধাক্কা দিল। ভগবানের নাম লইবার পূর্ব্বেই নৌকা উল্‌টাইয়া গেল এবং মুহূর্ত্তের মধ্যেই আমরা জলে পড়িলাম।

যখন জলে ডুবিয়া গেলাম তখন আমার মনে কি হইতেছিল তাহা বর্ণনা করা যায় না। আমি খুব ভাল সাঁতার জানিতাম, কিন্তু তবুও নিশ্বাস লইবার জন্য তরঙ্গের গ্রাস হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছিলাম না। এমন সময় একটা ঢেউ আমাকে লইয়া সোজা তীরে ফেলিয়া দিল। স্থলভূমিতে প্রায় শুষ্ক অবস্থায় পৌঁছিলাম বটে, কিন্তু অত্যধিক জলখাওয়ার জন্য প্রায় অর্দ্ধমৃতের মত পড়িয়া রহিলাম।

Before I had time to recover myself another huge wave came, carried me back towards the sea and buried me twenty or thirty feet deep in its own body. I held my breath and helped myself to swim forward with all my might, I was ready to burst withholding my breath when I felt myself rising up. I struck forward and felt ground beneath my feet.

This happened over and over again, until I got hold of a piece of rock and at last, after one or two runs reached the dry land. Then I clambered up the cliffs of the shore and sat me down upon the grass, free from danger and quite out of the reach of the water.

প্রকৃতিস্থ হইবার পূর্ব্বেই আর একটি প্রবল তরঙ্গ আমাকে সমুদ্রের দিকে লইয়া চলিল এবং বিশ ত্রিশ ফুট জলের নীচে ফেলিয়া দিল। নিশ্বাস বন্ধ করিয়া সম্মুখের দিকে প্রাণপণে সাঁতার দিতে লাগিলাম। দম ফাটিয়া মরিবার উপক্রম হইতেছে এমন সময় মনে হইল আমি উপরে উঠিতেছি। সম্মুখের দিকে সাঁতার দিতে লাগিলাম ও বোধ হইল পায়ের তলায় মাটি ঠেকিল।

এইরূপ বারবার ঘটিতে লাগিল। একখণ্ড পাথর ধরিয়া ফেলিলাম, অবশেষে দুই একবার ঢেউয়ের ধাক্কা খাইয়া শুক্‌না মাটি পাইলাম। পাথর বাহিয়া উপরে উঠিলাম এবং ঘাসের উপর বসিলাম। এতক্ষণ পরে আমি জলের নাগালের বাহিরে যাইয়া সম্পূর্ণ নিরাপদ বোধ করিলাম।

The first thing I did was to thank God for saving my life. It is hard to express the joy of the soul when it is saved, as I may say, out of the very grave. I walked about on the shore lifting up my hands to God for sparing me and thinking of all my comrades who were no doubt drowned. I never saw any sign of them, except three of their hats.

After a while I began to look about me to see what kind of place I was in and what was next to be done. Although it had not been my fate to die with my shipmates, yet I was in a sad plight, for I was wet and had no dry clothes into which I could change. Neither had I any food to eat nor water to drink. I saw no prospect before me but that of perishing with hunger, or being devoured by wild beasts.

প্রথমেই জীবন রক্ষা করিবার জন্য ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিলাম। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে জীবন রক্ষা পাওয়াতে যে প্রাণের আনন্দ হয় তাহা বর্ণনা করা কঠিন। আমাকে রক্ষা করার জন্য ঊর্দ্ধে ভগবানের উদ্দেশে দুই হাত তুলিয়া তীরের উপর আমি বেড়াইতে লাগিলাম। আমার সহচরদের কথা মনে হইতে লাগিল। তাহারা নিশ্চয়ই সকলে মরিয়াছে। তিনটি টুপি ছাড়া তাহাদের কোন চিহ্ন আর দেখিতে পাই নাই।

কিছুক্ষণ পরে আমি কিরূপ স্থানে আসিয়া পড়িয়াছি এবং ইহার পর কি করিতে হইবে দেখিবার জন্য চারিদিকে তাকাইতে লাগিলাম। জাহাজের সহচরদের সঙ্গে মরিবার দুর্ভাগ্য আমার হয় নাই বটে, কিন্তু দুর্গতি আমারও বড় কম নয়। সমস্ত দেহ সিক্ত, সিক্ত বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিবার উপায় নাই, খাদ্য নাই, পানীয় নাই। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মৃত্যু অথবা বন্য জন্তুর কবলে পড়িয়া প্রাণ-নাশ—ইহা ছাড়া আমার সম্মুখে আর কোন উপায় দেখিতে পাইলাম না।

Long long ago on a bare and lonely island far away in the sea, there lived three people—Prospero, a wise and learned man,

Miranda, his beautiful and lovely daughter and Caliban, a creature so ugly that he hardly looked a man. This Caliban was employed as a slave by Prospero for his evil nature. He was the son of a wicked witch named Sycorax who once lived in that island and who had imprisoned many good spirits in the bodies of large trees by the power of her magic. These gentle spirits were ever obedient to the will of Prospero and one of them, Ariel, was the chief.

বহুকাল পূর্ব্বে সাগরবক্ষে একটি বৃক্ষাদিশূন্য নির্জ্জন দ্বীপে তিনটি প্রাণী বাস করিতেন। প্রস্‌পারো—একজন জ্ঞানী ও মহাপণ্ডিত ব্যক্তি—তাঁহার সুন্দরী ও লাবণ্যবতী কন্যা মিরাণ্ডা এবং ক্যালিব্যান—এতই সে কুৎসিত ছিল যে তাহাকে মানুষ বলিয়া বোধ হইত না। প্রস্‌পারো এই ক্যালিব্যানকে তাহার ক্রূর প্রকৃতির জন্য ক্রীতদাস নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সে ছিল পাপমতি কুহকিনী সাইকোরাক্সের পুত্র! এই কুহকিনী এক সময় এই দ্বীপেই বাস করিত এবং তাহার যাদুবিদ্যার সাহায্যে বড় বড় বৃক্ষের কাণ্ডে অনেকগুলি শান্তপ্রকৃতির আত্মাকে আবদ্ধ করিয়াছিল।

এই শান্তস্বভাব আত্মাগুলি সর্ব্বদাই প্রস্‌পারোর ইচ্ছার বাধ্য ছিল এবং তাহাদের মধ্যে প্রধান ছিল এরিয়েল।

Once a year in the middle of January Rahaman, the Cabuliwallah, was in the habit of returning to his county, and as the time approached he would be very busy, going from house to house collecting his debts. This year, however, he could always find time to come and see Mini. It would have seemed to an outsider that there was some conspiracy between the two, for when he could not come in the morning he would appear in the evening. Even to me it was a little startling now and then in the corner of a dark room, suddenly to surprise this tall, loose-garmented man ; but when Mini would run in shouting with her "Oh Cabuliwallah, Cabuliwallah !" And the two friends, so far apart in age, would subside into their old laughter and their old jokes, I felt reassured.

বৎসরে একবার করিয়া জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি রহমন্ কাবুলিওয়ালা স্বদেশে ফিরিয়া যাইত এবং যতই তাহার যাইবার সময় নিকটবর্ত্তী হইত

ততই তাহাকে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া পাওনা আদায় করিবার কাজে ব্যস্ত থাকিতে হইত। এ বৎসর মিনিকে আসিয়া দেখিবার তাহার সময় হইত। বাহিরের কোন লোক ইহাতে মনে করিতে পারিত যে উভয়ের মধ্যে যেন একটা ষড়্‌যন্ত্র চলিতেছে, কারণ যেদিন সে সকালে আসিতে পারিত না, সেদিন সন্ধ্যায় আসিত। এইরূপে যখন তখন অন্ধকার ঘরের এক কোণে এই লম্বা ঢিলে পোষাক-পরিহিত লোকটিকে হঠাৎ দেখিতে পাওয়া আমারও একটা ভয়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু যখনই মিনি হাসিমুখে "কাবুলিওয়ালা ও কাবুলিওয়ালা!" বলিয়া ছুটিয়া আসিত এবং বয়সের বহু তারতম্য থাকা সত্ত্বেও যখন দুই বন্ধুতে পুরাতন হাসি ও পরিহাসে মস্‌গুল হইয়া যাইত, তখন আমি পুনরায় আশ্বস্ত হইতাম।

প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

1925

At length, wearied with longing for a sight of the most beautiful woman in India, the proud Alauddin sent word to Rana Bhim Singh that he would withdraw his troops if he might be permitted a sight of Padmini. He was willing to satisfy his desire by gazing on her reflection in a mirror. This seemed so humble a request that the Rana readily assented to it. To disarm all suspicion, Alauddin entered Chitor with only a few guards. He was able by a treacherous act to make the Rana his captive. He then sent a letter to Padmini, in which he informed her that if she desired to obtain her husband's release she would have to see the Sultan personally at his camp,

অবশেষে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী রমণীর দর্শনাভিলাষে একান্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া গর্ব্বিত আলাউদ্দিন রাণা ভীমসিংহকে সংবাদ দিলেন যে, যদি পদ্মিনীকে একবার দেখিবার অনুমতি পান, তবে তিনি সৈন্যসম্ভার ফিরাইয়া লইবেন। তিনি দর্পণে তাঁহার প্রতিবিম্ব দেখিয়াই আশা চরিতার্থ করিতে স্বীকৃত হইলেন। এই অনুরোধটি এতই সামান্য মনে হইল যে, রাণা তৎক্ষণাৎ উহা পূর্ণ করিতে সম্মত হইলেন। সকল সন্দেহ নিরসনার্থ আলাউদ্দিন অল্পসংখ্যক সৈন্যসহ

চিতোরে প্রবেশ করিলেন। তিনি বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা রাণাকে বন্দী করিতে সমর্থ হইলেন। তাহার পর তিনি পদ্মিনীকে পত্র দিলেন যে, যদি তিনি স্বামীর মুক্তি কামনা করেন, তবে তাঁহাকে স্বয়ং সুলতানের শিবিরে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে।

1926

'Remember your oath', she cried. 'Where will you fly but into the midst of the enemy? Your honour is at stake, and should you fail me now, who will sing your bravery! See, we are women, but we are not afraid of death'. Zora arrived at the field. The brave woman sprang forward, and waving her naked sword above head, cried in a loud firm voice. 'To war my people, who amogst you love your motherland? Better death than infamy. Even if we die, we may meet ere night in paradise of the brave.'

তিনি (সুলতানা) উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "শপথ স্মরণ কর; তোমরা শত্রু-পক্ষের সৈন্যমধ্য ব্যতীত আর কোন্‌দিকেই বা যাইবে? তোমাদের সম্মান নষ্ট হইতে বসিয়াছে এবং যদি এখন আমার অনুবর্ত্তনে পরাঙ্মুখ হও, তবে কে তোমাদের বীরত্বগান করিবে? দেখ, আমরা স্ত্রীলোক, কিন্তু তাহা বলিয়া মৃত্যুকে ভয় করি না।" জোরা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। বীরহৃদয়া রমণী সম্মুখে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন এবং মস্তকোপরি উন্মুক্ত তরবারি সঞ্চালিত করিয়া দৃঢ় উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "আমার প্রজাবৃন্দ, যুদ্ধ করিতে চল; তোমাদিগের মধ্যে কে জন্মভূমিকে ভালবাস? (তোমাদিগের মধ্যে যে যে জন্মভূমিকে ভালবাস, সেই সেই যুদ্ধে চল।) দুর্নাম অপেক্ষা মৃত্যুও শ্রেয়ঃ। যদি আমরা মৃত্যুমুখেও পতিত হই, তবে রাত্রির পূর্ব্বেই স্বর্গে বীরগণের সহিত মিলিত হইব।"

1927

Rama said to Lakshmana—"My step-mother Kaikeyi has all along loved me even as my own mother Kausalya has done. Our esteemed father has ever been full of affection for me. It is

strange that the punishment of exile has come from my own beloved parents, who are my best well-wishers on the earth. Lakshmana, don't you see in this unusual event the hand of God ? I take it to be divine dispensation, over which no one has any hand, and as such I am bound to go to the forest."

Lakshmana replied in a firm tone—"If it were God's dispensation it would not be possibe for us to change the course of events. But permit me to use my arms, and you will see that I shall conquer the kingdom by force, and instal you on the throne of Ayodhya in no time. When we can get over our present trouble by our own power, why should we act like cowards and suffer this wrong by accusing Providence ?"

রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন—"আমার বিমাতা কৈকেয়ী, আমার গর্ভধারিণী কৌশল্যার ন্যায় আমাকে এতকাল ভালবাসিয়াছেন। আমাদের পূজনীয় পিতৃদেবও আমাকে চিরদিন স্নেহ করিয়া আসিয়াছেন। এ জগতে আমার সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ও প্রিয় জনক-জননী হইতে যে এই বনবাস-দণ্ডাজ্ঞা আসিয়াছে ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় ! লক্ষ্মণ, তুমি কি এই অসম্ভব ব্যাপারে ভগবানের ইঙ্গিত উপলব্ধি কর না ? আমি ত ইহাকে ভগবানের দান বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। ইহার উপর কাহারও হাত নাই ; সুতরাং আমি বনে যাইতে বাধ্য।"

লক্ষ্মণ দৃঢ়স্বরে প্রত্যুত্তর করিলেন—"যদি ভগবানের এই বিধান হয়, তবে আমাদিগের পক্ষে এই ঘটনাস্রোতের পরিবর্ত্তন সাধন করা অসম্ভব। কিন্তু অস্ত্রচালনে আমায় আদেশ দিন এবং আপনি দেখিবেন যে বাহুবলে আমি রাজ্য জয় করিব এবং অচিরেই আপনাকে অযোধ্যার সিংহাসনে অভিষিক্ত করিব। যখন আমরা আত্মশক্তিতে এই বিপদ্ অতিক্রম করিতে পারি, তখন কেন ভীরুর ন্যায় কার্য্য করিব, আর বিধাতাকে দোষী করিয়া এই অন্যায় সহ্য করিব ?"

1928

To the north of Benares between the Himalayas and the Ganges, stretches the country now known as Oudh, whose name long ago was Kosala. In the whole world perhaps can be few

other lands so beautiful as was this ; for it abounded in corn, in cattle, and in forests and all its people were prosperous and in peace. Kosala had great rivers, fair places of pilgrimage and noble cities. Though she was surrounded on every side by powerful kings, she was the jewel among those kingdoms.

That night, when darkness had descended, and the soldiers lay chatting round the tiny fire on which they had cooked their evening meal, Bhishma was startled to see the curtain of his tent-door lifted noiselessly. His heart was glad at the sight of the five brothers whom he loved as his own sons. He waited for them to speak, and at last Yudhishthira said, 'Grand-father, it is impossible for us to achieve victory so long as thou remainest leader of the Kauravas ; Yama himself, as all men know, cannot draw near to thee without first obtaining thy consent.'

বারাণসীর উত্তরে হিমালয় ও গঙ্গার মধ্যে যে দেশ অবস্থিত তাহা বর্ত্তমানে অযোধ্যা নামে অভিহিত। বহু পূর্ব্বে এ দেশের নাম ছিল কোশল। সমগ্র পৃথিবীতে এরূপ সুন্দর দেশ খুব কমই দেখা যায় ; কারণ, ইহাতে শস্য, গো-মহিষাদি জন্তু, বনানী প্রভৃতি বহুল পরিমাণে ছিল এবং লোক সুখ-সম্পদে ও শান্তিতে বাস করিত। কোশল দেশে বড় বড় নদী ছিল, সুরম্য তীর্থস্থান ছিল এবং বড় বড় নগর ছিল। যদিও উহা চতুর্দ্দিকে পরাক্রান্ত নৃপতিগণ দ্বারা বেষ্টিত ছিল, তবুও কোশল সে সকল রাজ্যের শিরোমণিস্বরূপ ছিল।

সে রাত্রে যখন অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল এবং সৈন্যগণ যে স্তিমিত অগ্নিতে আপনাদের আহার্য্য রন্ধন করিয়াছিল, সেই অগ্নির পার্শ্বে শুইয়া পরস্পর কথা বলিতেছিল, তখন ভীষ্ম নিঃশব্দে তাঁহার শিবিরদ্বার উদ্ঘাটিত (তাঁবুর পর্দ্দা উত্থিত) হইতে দেখিয়া চমকিত হইলেন। তিনি যে পঞ্চ ভ্রাতাকে পুত্রের ন্যায় ভালবাসিতেন, তাহাদিগকে দেখিয়া অন্তরে অতীব প্রীত হইলেন। তিনি তাহাদিগের কথা বলার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, অবশেষে যুধিষ্ঠির বলিলেন, "পিতামহ, আপনি যতদিন কৌরবের সেনাপতিত্ব করিবেন, ততদিন আমাদের জয়ের আশা নাই। ইহা সর্ব্বত্র বিদিত যে, স্বয়ং যমও আপনার সম্মতি ব্যতীত আপনার নিকট অগ্রসর হইতে পারেন না।"

1929

There is an incident which occurred at the examination during my first year at school which is worth recording. The Educational Inspector, Mr. Giles, had come on a visit of inspection. He had set us five words to write as spelling exercise. I had mis-spelt one of the words. Teacher tried to prompt me with the point of his boot, but I would not be prompted. It was beyond me to see that he wanted me to copy the spelling from my neighbour's slate for I had thought that teacher was there to supervise us against copying.

The result was that all the boys except myself were found to have spelt each word correctly. They went about saying—'Gandhi only is stupid.' The teacher tried to bring this stupidity home to me but without effect. I could not learn the art of 'copying.' Yet the incident did not in the least diminish my respect for my teacher. I was by nature blind to the faults of elders. Later, I came to know of many other failings of this teacher, but my regard for him remained the same. I had learnt to carry out the order of elders, not to scan their action.

আমার স্কুলজীবনের প্রথম বৎসরে পরীক্ষার সময় একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। শিক্ষাবিভাগের পরিদর্শক মিষ্টার গাইল্‌স পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন। তিনি বানান পরীক্ষার জন্য আমাদিগকে পাঁচটি শব্দ লিখিতে দিলেন। আমি একটা শব্দের বানান ভুল করিয়াছিলাম। শিক্ষক মহাশয় তাঁহার জুতার অগ্রভাগ দিয়া আমাকে ইঙ্গিতে সাহায্য করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু আমি সে ইঙ্গিত বুঝিতে পারি (চাহি) নাই। তিনি যে আমাকে দিয়া আমার পার্শ্ববর্ত্তী ছেলের শ্লেট হইতে বানান নকল করাইতে চাহিতেছিলেন তাহা আমার ধারণাতীত ছিল; কারণ আমার ধারণা ছিল যে তিনি আমাদের নকল-করায় বাধা দিবার জন্যই তত্ত্বাবধায়করূপে সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

ফলতঃ, আমি ব্যতীত সমস্ত ছাত্রই প্রত্যেক শব্দ শুদ্ধ করিয়া বানান করিয়াছিল। তাহারা বলিতে লাগিল—'কেবল গান্ধীই বোকা!' শিক্ষক মহাশয়ও পরে আমাকে আমার এই নির্ব্বুদ্ধিতা উপলব্ধি করাইবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হয় নাই। আমি কখনই নকল-করা বিদ্যায় অভ্যস্ত হইতে পারি নাই। তথাপি এই ঘটনাতে শিক্ষকমহাশয়ের

প্রতি আমার বিন্দুমাত্রও শ্রদ্ধার ন্যূনতা ঘটে নাই। আমি স্বভাবতঃই বয়োজ্যেষ্ঠদিগের দোষ দেখিতাম না। পরে আমি এই শিক্ষক মহাশয়ের আরও বহু ত্রুটির কথা জানিতে পারিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার প্রতি সম্মান আমার পূর্ব্ববৎ অটুট ছিল। আমি আমার বয়োজ্যেষ্ঠদের আদেশ পালন করিতেই শিক্ষা পাইয়াছিলাম, তাঁহাদের কার্য্যের সমালোচনা করিতে শিখি নাই।

1930

The most memorable names in American history are those of George Washington and Abraham Lincoln. They are great in true sense of the word. They loved their country purely and passionately, better than themselves and gave their lives to its service. They thought nothing of their own glory ; to the last they were simple and true. Americans may well be proud of two such patriots. From them every one may learn what greatness means. Their work has made America what it is.

আমেরিকার ইতিহাসে জর্জ্জ ওয়াশিংটন এবং আব্রাহাম লিন্‌কনের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা যথার্থই 'মহৎ'-পদবাচ্য ছিলেন। তাঁহারা নিজ প্রাণাপেক্ষাও স্বদেশকে অকৃত্রিম অনুরাগের সহিত ভালবাসিতেন এবং উহারই সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। আত্মগৌরবের কোন চিন্তাই তাঁহাদের ছিল না। তাঁহারা চিরদিন সরল ও অকপট ছিলেন। এইরূপ দুইজন স্বদেশপ্রেমিকের জন্য আমেরিকাবাসী যথার্থই গর্ব্ব অনুভব করিতে পারেন। তাঁহাদেরই নিকট হইতে প্রকৃত মহত্ত্ব কাহাকে বলে তাহা প্রত্যেকেই শিক্ষা করিতে পারেন। তাঁহাদের কাজের ফলেই আমেরিকা আজ এত উন্নত (আমেরিকা আজ এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছে)।

1931

Chaitanya was born on the 18th of April, 1485. His father Jagannath Misra was originally a native of Sylhet. He had married Sachi Devi—daughter of Nilambar Misra. Later he came to Nadia to prosecute his studies in Nadia *tol* and settled

there. Jagannath was a pious man who yearned not for wealth. He lived an austere life following a high spiritual standard. People who were not as erudite and capable as Jagannath followed lucrative avocations and hoarded wealth. Sachi Devi, his wife, once told him to follow their example and amass a fortune. Jagannath in reply pointed to the birds of the sky and said, "These birds are perfectly happy, they sow not, nor do they reap. They depend on their Heavenly Father who supplies them with food. Learn the lesson, O wife, of sweet resignation. Earthly riches will not give that contentment which one gets by leading a life of spotless honesty and absolute reliance on the Lord." Sachi was pleased with the answer, for she, too had an ascetic temperament and valued faith and renunciation above everything else. Chaitanya was born of such noble parents.

১৪৮৫ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল তারিখে শ্রীচৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা জগন্নাথ মিশ্রের আদি নিবাস শ্রীহট্ট। তিনি নীলাম্বর মিশ্রের কন্যা শচীদেবীকে বিবাহ করেন। পরে তিনি নদীয়ার টোলে পড়িতে আসিয়া সেখানেই বসবাস করেন। জগন্নাথ ধার্ম্মিক ব্যক্তি ছিলেন, অর্থের প্রতি তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। তিনি উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শে কঠোর তপস্বি-জীবন যাপন করিতেন। যে সকল লোক বিদ্যা ও দক্ষতায় জগন্নাথের সমকক্ষ ছিলেন না, তাঁহারাও লাভজনক ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া যথেষ্ট ধন সঞ্চয় করিতেন। তাঁহার পত্নী শচীদেবী এক সময় ঐ সকল লোকের আদর্শ অনুসরণ করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিবার জন্য তাঁহাকে বলেন। প্রত্যুত্তরে জগন্নাথ আকাশের পক্ষিগণকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, "পক্ষিগণই যথার্থ সুখী, উহারা বীজ বপনও করে না, শস্য কর্ত্তন করিয়া সংগ্রহও করে না। তাহারা ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া থাকে—তিনিই উহাদের খাদ্য যোগান। প্রিয়ে, তুমি অমৃতময় ত্যাগধর্ম্ম শিক্ষা কর। ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া নিষ্কলঙ্ক সাধুজীবন যাপন করিয়া যে শান্তি লাভ করা যায়, পার্থিব ঐশ্বর্য্য সে তৃপ্তি দান করিতে পারে না। এই উত্তর শুনিয়া শচীদেবী প্রসন্ন হইলেন; কারণ তিনিও ত্যাগশীলা ছিলেন। বিশ্বাস ও আত্মত্যাগ তিনি সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ বলিয়া মনে করিতেন। এইরূপ সাধুপ্রকৃতির জনক-জননী হইতে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম।

1932

Gokhale gave me an affectionate welcome and his manners immediately won my heart. This was my first meeting with him and yet it seemed as though we were renewing an old friendship. Pheroje Shah Mehta had seemed to me like the Himalaya and Tilak like the Ocean, but Gokhale as the Ganges. The Himalaya was unscalable and one could not easily launch forth on the sea, but the Ganges invited one to its bosom. It is a joy to be on it with a boat and an oar.

গোখেল আমাকে আন্তরিকভাবে অভ্যর্থনা করিলেন, তাঁহার আচরণে আমি নিমেষে মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম। তাঁহার সহিত আমার এই প্রথম সাক্ষাৎ, কিন্তু মনে হইল যেন আমাদের পুরাতন বন্ধুত্বই নূতন হইয়া উঠিতেছে। আমার নিকট ফেরোজ সা মেটা হিমালয় এবং তিলক সমুদ্র বলিয়া মনে হইয়াছিল। কিন্তু গোখেল যেন জাহ্নবীধারা। হিমালয় দুর্লঙ্ঘ্য এবং সমুদ্র-বক্ষেও কেহ সহজে নামিতে সাহস পায় না; কিন্তু ভাগীরথী সকলকেই তাঁহার বক্ষে আহ্বান করেন। একখানি তরণী ও একটি মাত্র হাল (দাঁড়) লইয়া তাহার উপর আনন্দে ভ্রমণ করা যায়।

1933

An artist once solicited permission to paint a portrait of the queen. The favour was granted and the favour was great, for it would have made the fortune of the man. A place was fixed and a time. At the appointed time and place the queen appeared; but the artist was late. When he did arrive, message was communicated to him that the queen had been there, and had left and would not return.

A person who is unpunctual wastes not only his own but other people's time. Late-comers at school delay the lesson, distracting and wasting the time of the teacher and the scholars.

Time lost is lost for ever. It cannot be regained. Time and tide wait for no man.

কোন সময়ে একজন চিত্রকর মহারাণীর একখানি প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তাঁহার আবেদন মঞ্জুর হইল। ইহাই যথেষ্ট

অনুগ্রহ; কারণ ইহাতেই হয়ত ঐ ব্যক্তির অদৃষ্ট ফিরিয়া যাইত। স্থান ও সময় নির্দ্দিষ্ট হইল। যথাকালে মহারাণী নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু চিত্রকরের আসিতে বিলম্ব ঘটিল। যখন তিনি আসিয়া পড়িলেন, তাঁহাকে জানাইয়া দেওয়া হইল, মহারাণী সেখানে আসিয়া চলিয়া গিয়াছেন, আর ফিরিবেন না।

যাহারা সময়ানুবর্ত্তী নহে তাহারা কেবল নিজের নহে অপরের সময়ও নষ্ট করিয়া থাকে। যাহারা দেরী করিয়া স্কুলে যায়, তাহারা শিক্ষক ও মেধাবী ছাত্রগণের চিত্ত বিক্ষিপ্ত করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করে ও পাঠাভ্যাসে বিলম্ব ঘটায়।

সময় একবার চলিয়া গেলে উহা চিরদিনের জন্যই বৃথায় যায়। উহা আর ফিরাইয়া পাওয়া যায় না। কালের গতি ও নদীর প্রবাহ কাহারও প্রতীক্ষায় থাকে না।

1934

Ramsaran ran off with breathless speed to inform his master of what had happened. It was a holiday and several players had gathered together at Kedar Babu's house. The game was in full swing when Ramsaran burst in upon them. "Babu, Babu", he cried out, "Come home at once." Mahendra Babu got frightened and asked, "What's the matter ? Any one taken ill ?" Ramsaran replied, "A robber has come to the house. He has brought a gun with him and says, I am the Babu's son-in-law." Upon this there was a general outbrust of laughter.

রামশরণ রুদ্ধশ্বাসে মনিবকে ঘটনার সংবাদ দিতে ছুটিল। ছুটির দিনে কেদার বাবুর বাড়ীতে বহু খেলোয়াড় জুটিয়াছেন। পুরাদমে খেলা চলিতেছে। এমন সময় রামশরণ সেখানে উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল, "বাবু বাবু, শীঘ্র বাড়ী আসুন।" মহেন্দ্রবাবু ভয় পাইয়া কহিলেন, "কি হ'ল রে? কারো অসুখ করেনি ত?" রামশরণ কহিল, "বাড়ীতে ডাকাত পড়েছে, তার হাতে একটা বন্দুক আছে, আর সে বলিতেছে—আমি বাবুর জামাই।" এই কথায় সেখানে হাসির ধূম পড়িয়া গেল।

1935

Presently when the procession reached the burning ghat, it became clear that the performance of the rite of *sati* was to take place. A woman was standing near the corpse, who was evidently the wife of the dead man. She was waiting to be burned with him on the funeral pyre. The Emperor Akbar was strongly opposed to this cruel rite and did all he could to prevent it. He ordered that no wife was to be sacrificed except of her own free will. Abbas Khan immediately determined to see with his own eyes that imperial order was not disobeyed in this particular case.

অচিরে যখন সেই শোভাযাত্রা শ্মশানঘাটে আসিয়া পৌঁছিল, তখন ইহা কোন সতীদাহের অনুষ্ঠান বলিয়া স্পষ্ট বুঝা গেল। শবদেহের নিকটে একটি রমণী দণ্ডায়মান ছিলেন, আর তিনি যে মৃতব্যক্তির পত্নী, তাহাতে কোন সন্দেহ ছিল না; তাহারই সহিত এক চিতায় দগ্ধ হইবার জন্য স্ত্রীলোকটি প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সম্রাট্ আকবর এই নিষ্ঠুর অনুষ্ঠানের একান্ত বিরোধী ছিলেন এবং ইহা নিবারণ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন যে, নিজের স্বাধীন ইচ্ছা ব্যতীত কোন স্ত্রীকে এরূপে বলি দেওয়া চলিবে না। আব্বাস খাঁ তৎক্ষণাৎ সঙ্কল্প করিলেন, যাহাতে এ ক্ষেত্রে সম্রাটের আদেশ লঙ্ঘিত না হয়, তাহা তিনি স্বচক্ষে পরিদর্শন করিবেন।

1936

Rising very early in the morning, Sujata milked the best cows of the herd, and taking the milk boiled some fine rice in it. Having cooked and sweetened the rice-milk with greatest care, she poured it into a priceless golden vessel and carrying it on her head went out to make her offering. As she approached the tree which was, as she believed, the dwelling of the god, she noticed the figure of a man seated beneath its shade. So glorious and so gracious he seemed in the golden light of the morn, that Sujata took him for the god who had answered her prayers.

অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া সুজাতা গোষ্ঠের উৎকৃষ্ট গাভীগুলি দোহন করিলেন এবং ঐ দুগ্ধে কিছু উত্তম তণ্ডুল পাক করিলেন। পরম যত্নে শর্করা-

সংযোগে চরু রন্ধন করিয়া উহা একটি বহুমূল্য স্বর্ণপাত্রে রক্ষা করিলেন এবং উহা দেবোদ্দেশে নিবেদন করিবার জন্য মস্তকে ধারণ করিয়া যাত্রা করিলেন। যে বৃক্ষে দেবতা বাস করিতেন বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল, সেই বৃক্ষসমীপে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিলেন—বৃক্ষতলে ছায়ায় উপবিষ্ট একটি মনুষ্যমূর্ত্তি। প্রাতঃসূর্য্যের সুবর্ণালোকে সেই মূর্ত্তিটি এরূপ মনোহর ও সমুজ্জ্বল দেখাইতেছিল যে, সুজাতা তাঁহাকেই তাঁহার প্রার্থনা-পূর্ণকারী ইষ্টদেবতা বলিয়া মনে করিলেন।

1937

I had not got three steps in but I was almost as much frightened as I was before. I heard a very loud sigh, like that of a man in some pain. It was followed by a broken noise, as words half expressed. I stepped back and was struck with such surprise that it put me into a cold sweat. With a great effort I stepped forward again and held up the light over my head. I saw lying on the ground a most frightful old he-goat dying of old age. I stirred him a little, but he was so ill that he could not raise himself.

তিন পা যাইতে না যাইতেই আমি প্রায় পূর্ব্বের ন্যায় ভয় পাইলাম। মানুষ কোনরূপ যন্ত্রণায় যেরূপ দীর্ঘশ্বাস ফেলে, আমি সেইরূপ একটি দীর্ঘশ্বাস শুনিতে পাইলাম। ইহার পরই অর্দ্ধোচ্চারিত বাক্যের মত একটি ভাঙ্গা ভাঙ্গা আওয়াজ শোনা গেল। আমি হটিয়া আসিলাম। ইহাতে আমি এতই বিস্মিত হইয়াছিলাম যে, শরীরে কালঘাম ছুটিতে লাগিল। বিশেষ চেষ্টা করিয়া আমি আবার আগাইয়া গেলাম; আলোটি মাথার উপর তুলিয়া ধরিতেই দেখিলাম একটি অতি ভীষণ আকৃতির বুড়ো ছাগল খুব বেশি বয়স হওয়ার জন্য মুমূর্ষু অবস্থায় পড়িয়া আছে। আমি উহাকে একটু খোঁচা দিলাম, কিন্তু সে অত্যন্ত পীড়িত বলিয়া উঠিতে পারিল না।

1938

The people at the stalls ran away as fast as they could. The poor woman left her stall and ran too. But she forgot, in her fright, that her little child was sitting on the ground, close by the

stall. It was just in the elephant's way, and you would think it must have been trampled to death. But the elephant knew the child and knew that this was the stall where he had been fed with fruit. Though he was in a passion, he stopped. He looked at the child and picked it up with his trunk.

দোকান ছাড়িয়া দোকানের লোকগুলি যত জোরে পারে ছুটিতে লাগিল। স্ত্রীলোকটিও তাহার দোকান ছাড়িয়া ছুটিল। কিন্তু ভয়ে সে ভুলিয়া গিয়াছিল যে তাহার ছোট ছেলেটি দোকানের কাছেই মাটিতে বসিয়াছিল। হাতীর চলিবার পথের উপরই ঐ স্থানটি পড়ে—এবং তোমরা হয়ত ভাবিতেছ তবে ছেলেটি নিশ্চয়ই (হাতীর পায়ের তলায় পড়িয়া) পিষিয়া মরিয়াছিল। কিন্তু হাতীটি ছেলেটিকে চিনিত এবং সেই দোকান হইতে যে তাহাকে ফল খাওয়ান হইত তাহাও জানিত। মত্ত অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও সে আসিয়া থম্‌কাইয়া দাঁড়াইল এবং ছেলেটিকে ভাল করিয়া দেখিয়া শুঁড় দিয়া উঁচু করিয়া তুলিয়া লইল।

1939

So a ship was fitted out, and we started on our voyage. For twelve days all went well. Then a hurricane of wind arose and carried us wherever it would. We drifted helplessly. Then the ship began to leak, and we gave up all hope. Very soon we struck a sandbank, and in a moment the sea broke over us. We lowered a small boat, but a raging wave overset us, and we were swept into the sea. A great billow carried me with mighty force towards the land. At last I reached the shore, breathless but safe, and out of reach of the sea.

জাহাজ সজ্জিত হইল এবং আমরা যাত্রা করিলাম। বার দিন পর্যন্ত সব ভালভাবেই চলিল। তারপর একদিন প্রবল ঝড় উঠিল ও আমাদিগকে যে দিকে খুসী লইয়া চলিল। অসহায়ভাবে আমারা ভাসিয়া চলিতে লাগিলাম; আমাদের জাহাজের তলা ফুটা হইয়া জল উঠিতে লাগিল—আমাদের সব আশা শেষ হইল। কিছু পরেই বালির চড়ায় আমাদের জাহাজের ধাক্কা লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই সমুদ্র যেন একেবারে আমাদের উপর ভাঙ্গিয়া পড়িল। ছোট

একখানা নৌকা আমরা জলে নামাইয়া দিলাম, কিন্তু একটা প্রকাণ্ড ঢেউ আমাদিগকে উল্টাইয়া দিল এবং আমরা সমুদ্রে ভাসিতে লাগিলাম। একটি বিপুল তরঙ্গ আমাকে প্রবলবেগে তীরের দিকে লইয়া চলিল। অবশেষে আমি সমুদ্রের কবলমুক্ত হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে নিরাপদ্ অবস্থায় তীরে পৌছিলাম।

1940

(*a*) The fight went on. A wind swept over the plain and raised a storm of dust and sand, which hid the pair of warriors from the sight of the armies. And the two fought on in gloom, while round them the sun shone upon the sand and the broad Oxus stream sparkled in the sunlight. Rustum struck the shield which Shorab held out stiff in his left arm. Then Shorab smote with all his might and Rustum had to bow his head. But Shorab's blade was shivered to pieces against the steel helmet of his foe. Now the turn had come for Rustum. He shook his menacing spear on high and, before charging, gave one mighty shout—'*Rustum*'. And at the name Shorab shrank amazed; and as the shield dropped from his hand, the spear pierced his side and he fell.

(*b*) People living on the plains have strange ideas about the Himalayas. They think that a mountain is just a huge cone-shaped mound of rock, or earth, or stone, mostly stone, and that the Himalayas are just a big type of this sort of mountain. The Himalayas are not one peak, or mass, or even a cluster of peaks or masses but a whole vast chain, range or series of mountains. If India can be conceived as a house, the Himalayas are like a boundary-wall for this house, a vast snow-capped boundary, glittering like silver. Of the 1100 peaks of the Himalayas, only two have been successfully scaled up till now. Man has shown great courage and heroism in his attempt to conquer these stupendous mountains. But in this conflict between man and nature, man has failed.

(*a*) যুদ্ধ চলিতে লাগিল। প্রান্তরের উপর দিয়া ধূলা বালি উড়াইয়া একটা দমকা বাতাস বহিয়া গেল, যোদ্ধা দুইজনকে সৈন্যেরা দেখিতে পাইল না। এই ধূলির অন্ধকারে দুইজনের যুদ্ধ চলিতে লাগিল—অদূরে বালির উপর

সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হইতেছিল এবং প্রশস্ত অক্সাস্ (বক্ষু) নদের বক্ষঃ সূর্য্যরশ্মিপাতে ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল। শোহ্‌রাব বাঁ হাতে যে ঢালটি শক্ত করিয়া ধরিয়াছিল, রোস্তম তাহার উপর আঘাত করিলেন। এবার শোহ্‌রাব প্রাণপণে আঘাত করিল, রোস্তমকে মাথা নত করিতে হইল; কিন্তু রোস্তমের মাথায় যে লোহার শিরস্ত্রাণ ছিল তাহার সহিত আঘাত লাগিয়া শোহ্‌রাবের তরবারি খানখান হইয়া গেল। এইবার রোস্তমের পালা। তাঁহার ভীষণ বর্শা তিনি ঊর্দ্ধে তুলিলেন এবং নিক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে 'রোস্তম' বলিয়া হাঁক দিলেন। এই নাম শুনিয়া শোহ্‌রাব বিস্মিত, বিচলিত হইল, তাহার হাত হইতে ঢাল পড়িয়া গেল; ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বর্শাটি আসিয়া তাহার পাঁজরায় বিঁধিল—শোহ্‌রাব ভূপতিত হইল।

(*b*) সমতল ভূমির অধিবাসীদের হিমালয় পর্ব্বত সম্বন্ধে অদ্ভুত অদ্ভুত ধারণা আছে। তাহারা মনে করে যে খুব বড় পাহাড়, মাটী অথবা পাথরের ঢিপি,—বেশীর ভাগ পাথরই,—যাহার অগ্রভাগ কোণের মত ক্রমশঃ সূক্ষ্ম, তাহাই বুঝি পর্ব্বত এবং হিমালয়ও ঠিক এই রকমেরই একটা বৃহৎ পর্ব্বত। হিমালয় একটি চূড়া বা শিখর নয়, কতকগুলি চূড়ার সমষ্টিও নয়, হিমালয় বলিতে সুবিশাল কতকগুলি পর্ব্বতমালা বুঝায়। ভারতবর্ষকে যদি একটি বাড়ী মনে করা যায়, তবে হিমালয় সেই বাড়ীর একদিকের সীমানায় প্রাচীর, বরফে ঢাকা, রূপার মত ঝক্‌ঝকে একটা সীমারেখা। হিমালয়ের ১১০০ চূড়া; উহার মধ্যে এখনও পর্য্যন্ত মাত্র দুইটি চূড়ায় মানুষ উঠিতে পারিয়াছে। এই বিরাটকায় পর্ব্বতে আরোহণ করিবার জন্য মানুষ যথেষ্ট সাহস ও বীরত্ব দেখাইয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু মানুষ ও প্রকৃতির এই যুদ্ধে মানুষই পরাজিত হইয়াছে।

1941

(*a*) For a moment I stood thunderstruck; I looked at the foot-print. There it was; I could see the mark of the toes, heel and all. How it came there I could not imagine. Full of terror, hardly knowing what I did, I fled home, mistaking every bush and tree for some one chasing me. I could not sleep nor dared

I stir out of my castle for days, lest some savage should capture me. However, I gained a little courage and went with much dread do make sure that the foot-print was not my own. Mine was not nearly so large. A stranger, may be a savage, must have been on shore and fear again filled my heart.

(*b*) It was one of Napoleon's principal characteristics to regard nothing as impossible. "Impossible", said he, "is a word to be found only in the dictionary of the fools!" When told that the Alps stood in the way of his armies, he replied, "There shall be no Alps." Again, at the battle of Marango which had gone against the French during the first half of the day, Napoleon looked at his watch and said, "The battle is completely lost; but it is only two o' clock and we shall have time to gain another." He then made his famous cavalry charge and won the field. Washington lost more battles than he won, but he organised victory out of defeat and triumphed in the end. "Impossible", echoed the elder Pitt, "I triumph upon impossiblities."

(*a*) কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত আমি বজ্রাহতের মত দাঁড়াইয়া রহিলাম। পদচিহ্নের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম—ঐ তো সম্মুখে পদচিহ্ন পড়িয়া আছে—পায়ের বুড়ো আঙ্গুল, গোড়ালির দাগ স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। কি করিয়া যে এখানে এ চিহ্ন আসিল কল্পনা করিতেও পারিলাম না। আতঙ্কিত হইয়া, কি করিতেছি সে জ্ঞানও তখন ছিল না, আমি বাড়ীর দিকে দৌড়াইলাম—প্রত্যেকটি গাছ ও ঝোপঝাড় দেখিয়া মনে হইল কে বুঝি আমাকে অনুসরণ করিতেছে। আমি ঘুমাইতে পারিলাম না, এবং সুরক্ষিত গৃহ হইতে কয়েক দিন বাহির হইলাম না। ভয় হইল কোন অসভ্য বুঝি আমাকে ধরিয়া ফেলে। পরে খানিকটা সাহসে ভর করিয়া ভয়ে ভয়ে দেখিতে গেলাম—পায়ের দাগটা আমার কি না? আমার পায়ের দাগ তো এত বড় নয়। কোন অপরিচিত আগন্তুক, বোধ হয় কোন অসভ্য তীরে আসিয়াছে; মনে মনে অত্যন্ত ভয় হইল।

(*b*) কোন কিছুকেই অসম্ভব মনে না করা নেপলিয়নের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি বলিতেন, 'অসম্ভব' শব্দটি কেবল মূর্খের অভিধানেই দেখিতে পাওয়া যায়।

তাঁহার সৈন্যের অগ্রগতির পথে আল্পস্ পর্ব্বত পড়ে—এই কথা তাঁহাকে বলা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন—'আল্পস্ থাকিবে না।' ম্যারেঙ্গোর যুদ্ধে দিনের প্রথম ভাগে যুদ্ধের গতি ফরাসীদের প্রতিকূলে চলিতেছিল—নেপলিয়ন তাঁহার ঘড়ির দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'আমরা সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়াছি। কিন্তু এখন বেলা মাত্র দুইটা—আরও একটি যুদ্ধ জিতিবার সময় এখনও আছে।' অবিলম্বে তিনি তাঁহার বিখ্যাত অশ্বারোহী বাহিনী লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িলেন ও জয়লাভ করিলেন। ওয়াশিংটন যত যুদ্ধ জয় করিয়াছেন তাহার চেয়ে বেশী যুদ্ধে হারিয়াছেন। কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে পরাজয়ের মধ্য হইতেই জয় লাভের সুযোগ তিনি পাইয়াছেন। পিট (বড়) বলিতেন—'অসম্ভব ! আমি অসম্ভবকে জয় করিয়াছি।'

অনুশীলনী

১

Translate into Bengali :—

(1) A man in the East lived alone having renounced the world. There rats began to trouble him, so he kept a cat. In order to feed the cat with milk, a cow had to be kept. Then came a cowboy, then a maid to look after his house; and soon other men coming as their companions the forest was turned into a town.

(2) A miser having lost a bag containing one hundred pounds, promised ten pounds reward for its recovery. This was claimed by a poor man who found the treasure and returned it honestly; but the mean miser wanted to cheat him out of the reward by saying that the bag really contained one hundred and ten pounds when he lost it. The poor man appealed to the judge and the matter came up for trial. By the state of the seal it was seen that the bag had not been opened. Now it was opened and the money counted out in the Court.

"You say", said the judge, "that the bag you lost contained one hundred and ten pounds ?" "Yes your honour", replied the miser. "Then as this one only contains one hundred pounds, it cannot be yours. This honest fellow must keep it until the real owner appears."

(3) We reached Gauri Kunda at about 8 a.m. Here is a temple of Gauri. There is a very hot spring at this place. This is a great relief; for the water of the Mandakini which flows by is very cold, carrying as it does melted snow. From here the climb to Kedarnath begins. Higher up cold increases from more to more. So, many people make Gaurikund, a halting station on their way up and down. In the afternoon we went to Rambara—three miles below Kedarnath. Scenery all around was beautiful but the step ascent made us pretty exhausted. Rambara is a very cold place. Rambara to Kedarnath is a very difficult journey. Though the distance is only three miles, the climb is very steep.

(4) Nemai grew up a wild boy. He mixed with the bad boys of the village and carried on little depradations in the neighbouring houses and orchards in their company. The pious Brahmins after their bath used to close their eyes in prayerful attitude before small figures of gods on the banks of the Ganges. The little thief would come stealthily along and carry away their images. Sometimes when a Brahmin's chadar was left on the banks, while he bathed, Nemai would take it away and conceal it under a bush for the sake of fun.

(5) Sir William Jones, an eminent lawyer, poet and scholar, was the son of an able mathematician and was only three years of age when his father died. His mother was a woman of uncommon intelligence. Few have enjoyed the inestimable advantage of such a mother. She guided her son's early thoughts and feelings with great care and sagacity. He used to relate that when he was only three or four years of age, if he asked her for information on any subject, her constant answer to him was 'Read and you will know.' He thus acquired a passion for books which only grew in strength with increasing years.

(6) The problem of primary education has been the burning topic of the day. The total population of Bengal is over 45 millions of whom only 9½ per cent is literate. Again the system of education is very imperfect and the result is that many persons who have received primary education fall back into illiteracy within a few years. What is needed in Bengal is the introduction of free primary education. People are very poor and have no means to spend anything for the education of their children. It is happy to note that the Bengal legislative council has passed a Bill which provides for free primary and compulsory education for boys and girls of school-going age. But mere passing of Bills

will not do. For the spread of education free primary schools should be established where the poor boys and girls may get their training easily and coveniently.

(7) A traveller hired an ass to convey him to a distant place. The day being intensely hot, the traveller stopped to rest, and sought shelter from the heat under the shade of the ass. As this afforded protection only for one and as the Muslim traveller and the Hindu owner both claimed it, a violent dispute arose between them as to which of them had the right to it. The traveller assented that he had, with the hire of the ass, hired his shadow also. The owner maintained that he let the ass only and not his shadow. The quarrel proceeded from words to blows, and while men fought the ass galloped off. In quarrelling about the shadow we often lose the substance.

(8) The post-master took up his duties first in the village of Ulapur. Though the village was small, there was an indigo factory near it and the proprietor, an Englishman, had managed to put a post-office established. Our post-master belonged to Calcutta. He felt like a fish out of water in this remote village. His office and living room were in a dark thatched shade, not far from a green slimy pond surrounded on all sides by a dense growth.

The men employed in the indigo factory had no leisure; moreover, they were hardly desirable companions for decent folk. Nor is a Calcutta boy an adept in the art of associating with others. Among strangers he appears either proud or ill at ease. At any rate the post-masters had but little company nor had he much work to do. At times he tried his hand at writing verse. That the movement of the leaves and the clouds of the sky were enough to fill life with joy—such were the sentiments to which he sought to give expression.

(9) "Proof ! what other proof is required than the words of a dying man ?" said Sohrab. At this the great hero Rustum gazed and gazed, and stood speechless for a while and then uttered one sharp cry. And then his voice choked, a cloud passed before his eyes, and his head swam. And now the sun set ; and the two armies, awe-struck, retired to their tents. But over beyond, upon the sandy beach of Oxus, Shorab lay dead, bleeding no more ; and by him upon the ground broken with sorrow and vain remorse, lay the mighty man, his father, By and by the moon rose, and all the night was still.

(10) No matter what happened, he never lost heart. When after his victory over the Sultan of Delhi, he marched in triumph to the royal palace of Agra, he found himself in a deserted city, for the people had fled in terror and hidden themselves, no one knows where. The scorching rays of the summer sun fell on closed houses and empty shops, on stagnant and rotting refuse. There was little food to be got, his men were hungry and thirsty too, and so terrible was the heat that first one and then another fell by way-side never to rise again. But still Babar, the chief, never lost heart. "Those who like to leave me and to go back to their own land, can do so," he said; but very few went. Then Babar thought out ways and means to improve matters. His courage and cheerfulness and his great generosity encouraged the people who used to live in the city to return.

(11) It was the month of July. The rivers were full and turbulent, and the roads slippery and muddy. Undaunted, he set on foot; but he had to halt for the night at a village twenty-six miles from his home. Next morning he got up very early and proceeded on his way. Coming to the river Damodor he found the ferry boat on the opposite side. Such was his longing to see his mother that he would not wait, but plunged into the river, and succeeded by God's grace, in swiming across. It was growing dark. He had no food all day. The district was infested with robbers. But Iswar Chandra, full of the thought of his mother, quickening his pace went on fearlessly, and reached home at nine o'clock at night.

(12) Mahatama Gandhi lives the life of an ascetic, eating the simplest fruits of the earth, sleeping on a plank of bed in the open air even in the midst of winter, and caring nothing for personal appearance. He has reduced himself to a condition of voluntary poverty, and acknowledges no binding ties of kin or custom, but only of religious obligation. With him religion is everything, the world and its opinion nothing. He does not know how to distinguish Hindu from Mahomedan, Christian from infidel. To him all alike are brothers, fragments of the Divine, fellow-spirits struggling for expression. All he has he gives. With him, self-surrender and absolute sacrifices are demands of his very nature. His deep spirituality influences all around, so that no man dares to commit evil in his presence.

(13) Asoka issued instructions for the guidance of the state-officials, who supervised the adminstration of towns, districts and provinces. They were enjoined to regard all men as the

emperor's children whose happiness in this world and the next was his highest desire. They were warned to be careful in their conduct, for those who neglected their duty would gain neither the favour of Heaven nor of the emperor.

(14) Few ever lived to a great age, and fewer still ever became distinguished, who were not in the habit of early rising. You rise late, and of course get about your business at a late hour and everything goes wrong all day. Franklin says that he who rises late may trot all day and not have overtaken his business at night. Dean Swift says that he never knew a man come to greatness and eminence who lay in bed of a morning.

(15) Another robbery was committed in the house of a merchant who was a resident of that town. The merchant was mercilessly beaten by the robbers, who carried away all they could lay their hands on. A feeling of unrest prevails in the locality owing to the successive robberies committed within a period of a month and a half and will not be allayed until the culprits are arrested and brought to justice.

(16) Diligence, industry, and proper employment of time, are material duties of the young. In youth, the habits of industry are most easily acquired. In youth the motives to it are strongest, from ambition and from industry, from emulation and hope, and from all the prospects which the beginning of life affords.

Industry is not only the instrument of improvement, but the foundation of pleasure. Nothing is so opposite to the true enjoyment of life, as the feeble state of an indolent mind. He who is a stranger to industry, may possess, but cannot enjoy ; for it is labour only which gives the relish to pleasure.

(17) Akbar was the real founder of the Moghul empire and is regarded as the greatest of the Mussalman sovereigns of India. Literary education he had but little, but he was naturally endowed with a genius of the very highest order. His physical strength and power of endurance were equally wonderful. Though a great warrior and captain, he had no passion for war and was averse to unnecessary bloodshed. His tender heart led him to discourage capital punishment and the use of animal food.

(18) Just at the last moment a man joined the ranks. Though very lame, he was armed and eager to fight for his country. As he limped along in the rear, the new-comer was the object of a good deal of laughter on the part of his comrades. He bore their

merriment for a time, but overhearing some remark about his lameness, he retorted, "I came to fight, not to fly."

(19) William Tell was instantly seized and taken before the Governor who determined to take a cruel revenge. Turning to the captive, he said, "I have heard that you are a famous archer, you can now prove your skill." Placing an apple upon the head of Tell's little son, he ordered the father to shoot the apple from his son's head. Tell turned pale with fear, but the lad himself called out, "Shoot father ! I am not afraid, for I know you will not miss." The child's brave words gave Tell confidence. He took two arrows, and fitted one to his bow. While those around stood silent and anxious, he carefully raised his bow, shot, and the arrow, flying straight and true to its mark, cut the apple into two.

(20) The love of a mother is never exhausted. It never changes, it never tires. A father may turn his back on child ; brothers and sisters may become deadly enemies ; husbands may desert their wives ; wives their husbands. But a mother's love endures through all, in good repute, in the face of the world's condemnation, a mother stills loves on, and still hopes that her child may yet turn from his evil ways and repent. Still she remembers the infant's smile that filled her bosom with rapture, the joyful shout of the childhood ; and she can never be brought to think him all unworthy.

(21) The chief business of war is to destroy human life, to batter down and burn cities, to turn fruitful fields into deserts, to scourge nations with famine, to multiply widows and orphans. Are those honourable deed ? Grant that a necessity for them may exist ; yet it is a dreadful necessity, such as a good man must recoil from ; and though it may exempt them from guilt, it cannot turn them into glory. We have thought that it was honourable to heal, to save, to mitigate pain, to snatch the sick from the jaws of death. We have placed among the revered benefactors of the human race, the discoverers of arts which alleviate human sufferings, which prolong, comfort, adorn, and cheer human life ; and if these arts are honourable, where is the glory of multiplying and aggravating tortures and death ?

(22) It must be a marvel to you, how, after having five times met shipwreck and unheard-of perils, I could again risk fresh touble. I am even surprised myself when I look back, but evidently it was my fate to travel, and after a year of repose I pre-

pared to make a sixth voyage, regardless of the entreaties of my friends and relations, who did all they could to keep me at home. Instead of going by the Persian Gulf, I travelled a considerable way overland, and finally embarked for a distant Indian port with a captain who meant to make a long voyage.

(23) India cannot be killed. Deathless she stands, and will stand, so long as her people do not give up the God of India, so long as they do not believe in materialism, so long as they do not abandon spirituality. Beggars they may remain, low and poverty-stricken ; dirt and squalor may surround them perhaps throughout all time ; but let them not forget that they are the children of the sages. Just as every one in the West, even the man in the street, wants to trace his descent from some robber-baron of the Middle Ages, so in India even an Emperor on throne seeks to trace his descent from some beggar-sage in the forest—from one who wore for clothing the bark of a tree, lived upon the wild fruits of the forest, and communicated with God. That is the type of descent to which we aspire ; and so long as her pride of birth takes such a form, India cannot die.

(24) Without an ideal, the happiness and progress of life would be impossible. The traveller who has no fixed destination is slow in motion, his heart losing that warm enthusiasm which alone can prompt his energies. An aimless life is always dull and burdensome. It may well be compared to a straw drifting with the current. Both are alike sports of favourable or adverse circumstances. He who has a high aim in life looks upon the world as a happy field of action and sets about his work with untiring energy till he is crowned with success. The very effort for the realization of a high aim is a source of pleasure. He who does not aim high cannot enjoy a happy life.

(25) Death is a greatter mystery than life. That all our activities, bodily or mental, should cease at a moment's notice ; that all our wishes and hopes, all efforts and endeavours should melt away and vanish into nothing ; that we should be no better than mere blocks of stone is really a wonder of wonders. To-day we see Caesar lording it over the whole world at the head of a mighty empire ; tomorrow he is no better than a mere handful of dust. Yet death is a law of nature, and is the inevitable sequence of life. From the microscopic atom that dances like a mote on the sunbeam to the vast boundless system itself, every object must come under the process of dissolution or death. A law which is so universal cannot be an evil.

(26) Pratap Singh became the Rana of Mewar after his father's death, but he had no capital, and was without any means. His kindred and clans were disspirited by defeats after defeats, but they yet possessed their noble spirit. Pratap was single-handed, he had to oppose the combined efforts of the empire. Therefore he had to flee from rock to rock, and feed his family with the fruits of his native hills, and bring up his son, Amar Singh, in the midst of savage beasts. In the face of the difficulties, he was undaunted and did not swerve from his firm resolution.

(27) The submerged classes have felt today the touch of a ray of hope, and are lifting up their bowed heads. They are claiming with more and more definiteness, their place in the household of the mother. Some movements have been created by themselves, while some have originated in the higher castes. These have been stirring in them a sense of self-respect. The Brahmans have awakened to a sense of their long-neglected duty, and are doing much to help them. Thus the prospect of their future brightens year by year.

(28) From age to age the question has arisen in the minds of men which way lies redemption, wherein lies the fulfilment of the soul's yearning for self-expansion. And prophets, sages and seers have appeared to furnish answer to that eternal enquiry. In India when the inspiration dawned upon the people to rise from degradation to a higher scale, there came a prophet to promulgate the message of Service and Sacrifice—service, whole-hearted and self-forgetting, sanctified by the sacrifice of every material possession.

(29) Children should learn to be honest, sincere and open-hearted to their parents. An artful, hypocritical child is one of the most unpromising characters in the world. You should have no secret which you are unwilling to disclose to your parents. If you have done wrong, you should openly confess it, and ask that forgiveness which a parent's heart is ready to bestow. If you wish to undertake anything, ask their consent. Never begin anything in the hopes that you can conceal your design. If you once strive to impose on your parents, you will be led on, from one step to another, to invent falsehood, to practise artifice till you become contemptible and hateful. You will soon be detected, and then none will trust you.

(30) O Lord of the religions of the world, come down again to the earth that needs Thee and help the nations that are longing for Thy presence. Speak the word of Peace which shall make the people cease from their quarrellings; speak the word of Brotherhood whereby the warring classes and castes shall know themselves as one. Come with the might of Thy love, come in the splendour of Thy power, and save the world which is longing for Thy coming, O Thou who art the Teacher alike of angels and of men.

বিবিধ প্রশ্নাবলী

প্রথম পত্র

1. Translate into Bengali the following passages :—

(*a*) "Listen to me", said the fakir. "This is a magic horn. Blow three blasts on it, and then wish, and your wish will at once be granted." The farmer eagerly snatched the horn from the hand of the fakir and put it to his lips. But he could get no sound from it, though he blew, and blew, and blew, until his cheeks nearly burst. The fakir smiled and said, "You are too hasty, my friend."

(*b*) Ages ago there was a young Greek prince named Perseus. One day he went for a walk in a wood. When he was tired of walking, he lay down on the grass and fell asleep. In his sleep he had a strange dream. He dreamed that a tall fair lady with large grey eyes came to him. She was the Goddes of Wisdom. See looked at the young prince kindly and then spoke to him.

2. Substitute a single word for each, and illustrate by a sentence :—

যে নারী সূর্য্যকে কখনও দেখে না ; যাহার পরলোকে বিশ্বাস নাই ; কোনও বিষয়ে যাহার ভয় নাই ; যাহারা আকাশে বিঃরণ করে ; যাহার বর্ণ দেখা যায় না ; যাহার অনেক দেখা আছে।

3. Rewrite correcting all errors :—

দুরাবস্থায় পড়িয়া লোকটা আমার নিকট গিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে সে ইহা দেখে নাই। আমার কথায় সে সম্মত হইয়াছে। কাহাকেও মনোকষ্ট দেওয়া উচিৎ নহে। ইহাপেক্ষা লজ্জাস্কর বিষয় আর কি আছে ? বারম্বার তোমাকে সংবাদ পাঠাইয়াও উত্তর পাইলাম না। ভূম্যাধিকারী এই সম্পত্তি দিয়াছেন। অধীনস্থ লোকদিগের উপর তাহার দয়া নাই। নিরপরাধীকে শাস্তি দিও না। বধূ ননদিনীর চুল বাঁধিয়া দিতেছে।

4. Rewrite the following in chaste and elegant Bengali :—

রাজা পাণ্ডু ছেলেদের খুব অল্প বয়সেই মারা যান। কাজেই ধৃতরাষ্ট্র তাদিকে নিজের ছেলেদের সাথে মানুষ করেন। দুর্য্যোধন ও তাঁর ভাই দুঃশাসনের খুব সাহস আর বল ছিল। কিন্তু তাদের মন বড় ছোট ছিল। তারা পাণ্ডবদিগকে একই সময়ে হিংসা ও ভয় করিতেন।

5. Fill up the gaps in the following :—

তাঁহার মন এত —— ছিল যে পরের দুঃখ দেখিলে সহজেই —— যাইত। — মত তিনি দুঃখীর —— নিবারণে —— করিতেন না।

6. Name the suffixes that are added to the following words :—
চালাকি, ধারাল, ভণ্ডামি, ধোঁয়াটে, মিতালি, বাবুয়ানা, ঘুমন্ত, ডুবুরি, ছাক্‌নি, ঢালাই।

7. Frame sentences to distinguish the meaning of the following pairs of words :—

সাতপাঁচ, পাঁচসাত ; বাধা, বাঁধা ; লক্ষ্মণ, লক্ষণ ; পরা, পড়া ; কুল, কূল ; গা, গাঁ ; রং, রঙ্গ ; বান, বাণ।

8. Construct sentences so as to fully express their meaning :—

পাঁচ আঙুলে ঘি ; সোনায় সোহাগা ; এচড়ে পাকা, বুকের পাটা ; আকাশ পাতাল ; যমের রুচি ; বাগে পাওয়া ; তিলকে তাল করা।

9. Expound and name the Samasas in :—

জন্মান্ধ ; পঞ্চভূত ; গরমিল ; পীতাম্বর ; সিংহাসন ; পুরুষসিংহ ; শোকসিন্ধু ; ধামাধরা।

10. Change the genders in :—

কর্ত্তা, সম্পাদক, সাহেব, ঔপন্যাসিক, দেবর, বন্ধু, মৎস্য, যশস্বী, হিতকর, বর।

দ্বিতীয় পত্র

1. Translate into Bengali :—

Perhaps your father is an old man now with bent form, white hair, slow step, wrinkled face and broken voice. Forget not what history there is behind all these marks. The soul writes its story on the body. The soldier's scars tell of heroism and sacrifices. You look at your father and see signs of toil, of pain, of self-denial and of care. Do you know what they reveal ? They tell the story of his life. He has passed through struggles and conflicts. Is there nothing in the bent form, in the faded hands, the lines of care that tell you of his deep love for you and of sufferings endured, sacrifices made and of toils and anxieties for your sake ?

2. Rewrite the following in chaste and elegant Bengali :—

যখন তাদের বাড়ীর সুমুখ দরজায় পৌঁছুলম, তখন রোদ্দুর ঝাঁঝা কচ্ছিল, মনে হল যেন আগুনের ফুল্‌কি ঠিক্‌রে এসে গায়ে পোড়ে ছুঁচ ফুটিয়ে দিচ্ছে। তেষ্টায় তো ছাতি ফেটে যাবার

যোগাড় হচ্ছিল। দোরে খুব খানিকটা ঘা মারলুম, কিন্তু কারো সাড়াশব্দ নেই, শেষটায় চেঁচিয়ে বল্লুম, "ওগো, তোমরা কে বাড়ীর ভেতর আছে গো, শীগ্‌গির দোর খোল, নইলে মরে গেলুম।"

3. (*a*) Form sentences with adjectives derived from each of the following :—

আঘাত, ধ্যান, সমুদ্র, ঋষি, আরোহণ, বিদ্যুৎ, কৌতূহল and প্রশ্ন।

(*b*) Substitute single words for the following :—

নৌদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে যে। যাহার পূর্ব্বজন্মের কথা মনে আছে। এক গুরুর শিষ্য যাহারা। যে কৌতুক ভালবাসে। শক্তি অতিক্রম না করিয়া। অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছা।

4. Fill up the gaps in the following passage :—

যেখানে———জনে সমবেত হইয়া———কার্য্য———পরামর্শ করিতেছেন, সেখানে ———প্রবেশ করিও না। অগ্রে———করিয়া দেখিবে, তাঁহারা তোমার উপস্থিতি হেতু সন্তুষ্ট কি——হইবেন।

5. Substitute a single or a compound word for each of the following expressions :—

শূদ্রজাতীয় স্ত্রী ; উপকার করিবার ইচ্ছা ; যাহা পঞ্চভূত দ্বারা গঠিত ; যাহা ভস্ম ছিল না, পরে ভস্ম হইয়াছে ; যাহা পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই ; যিনি দারপরিগ্রহ করেন নাই।

6. Correct the errors in the following passage :—

তাহার সংগে কথা বলিলেই বুঝিতে পারিবে, সে অতি পাপীষ্ঠ। সে তাহার বৃধ্য পিতামাতার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করে তাহা অতি নিচ। তাহার বন্ধুগণেরা তাহার প্রতি অনুযোগ দিয়া থাকে কারণ সে তাহাদিগকে অসদ্ভাব করে ও কটুবাক্য বলে।

7. Express in the indirect form of speech :—

দিগম্বরী বলিলেন, "ফেলে দেবে! ও কেন দেবে, আমি নিজেই দেব।"

নারায়ণী বলিলেন, "না, মা, ওকাজ ক'রোনা, তোমাকে বলছি, ওকে চেননা। আমি ছাড়া ওর বড় ভাইও ছুঁতে সাহস ক'রবে না, মা। আজকের দিনটা যাক।"

8. Punctuate the following correctly :—

মঙ্গলাচার্য্য গম্ভীরস্বরে বলিলেন হইবে কিন্তু সময় সিংহ কিন্তু শুনিয়া বিষাদে ও বিস্ময়ে গুরুদেবের কথা শেষ হইতে না হইতে বলিলেন এবারও কিন্তু হায় আমি এত কি পাপ করিয়াছি যে আমার বংশধর কেহ সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারিবে না।

9. Derive the following words and give the meaning in each case :—

ফুলদানী, একলা, পাঁচই, ঢাকাই, কাবুলি, চলতি, বাড়ন্ত, পোড়া।

10. Construct sentences with :—

আকাশকুসুম, বালির বাঁধ, মাছের মা, মুখ রাখা, হরিষে বিষাদ, গোলক ধাঁধা, পুকুর চুরি, ঠোঁটকাটা।

তৃতীয় পত্র

1. Give one word for each of the following :—

(*a*) মাথা পাতিয়া লওয়ার যোগ্য, (*b*) যাহা নিবারণ করা যায় না, (*c*) যে স্বচক্ষে দেখিয়াছে, (*d*) যে পরে জন্মিয়াছে, (*e*) যাহা ঘটিবেই ঘটিবে, (*f*) যে সহ্য করিতে পারে, (*g*) যে দুইবার জন্মগ্রহণ করে, (*h*) যাহার পুত্র হয় নাই, (*i*) যাহার ঋণ নাই, (*j*) যিনি দিবসে একবার আহার করেন।

2. Shorten the following sentences by using simple word for each of the underlined expressions :—

(1) বহুজনের সমাগম দেখিয়া রাজা বিস্মিত হইলেন।

(2) যাঁর মন উদার, তুমি কি সেই ব্যক্তির কথা বলিতেছ ?

(3) আমি জানি তিনি প্রশংসার উপযুক্ত পাত্র।

(4) সিন্ধুর বারিরাশি হইতে যে লবণ উৎপন্ন হয়, নৈষ্ঠিক হিন্দুরা সেই লবণ ব্যবহার করেন।

3. Correct the following :—

আমি সবিনয় পূর্ব্বক নিবেদন করিলাম, বাবা কত উপদেশ দিলেন, মা কত বুঝাইলেন, কিন্তু দাদার হৃদয়-মন্দিরে বৈরাগ্যতার বীজ এমন রোপিত হইয়াছিল যে, সে কাহারও কথা শুনিলেন না। একদিন নিশিথে কাহাকেও কিছু না বলিয়া পতিপ্রাণ পত্নী ও স্নেহের আঁধার শৈশব পুত্র পরিত্যাক্ত করিয়া কোথাও চলিয়া গেলেন। আমাদের অধোপতনের কারণ ঐক্যতার অভাব। কিন্তু নিরাশা হইতে কারণ নাই। উর্দ্ধবর্ণ হিন্দুর যদি জাত্যাভিমান ত্যাগ করিয়া সর্ব্বসাফল্যের সহিত মেষামেষি করেন, সে হইলেই প্রীতিকার হয়।

4. Translate into English :—

A person went to a certain Scribe and said to him, "Write a letter for me." He said, "There is a pain in my foot." The man said, "I do not wish to send you anywhere, why do you make such a stupid excuse ?" The Scribe replied, "You are speaking the truth, but when I write a letter for any person then I am always sent for to read it, for nobody else is able to read my handwriting."

5. Fill up the gaps in :—

তুমি ভেব——বিপ্র। নারায়ণ তোমার——পূর্ণ করবেন। আমি নর্ম্মদায়——চল্‌লাম। তোমরা——থাক্‌লে আমিও——থাক্‌ব।

6. Give the feminine forms of the following :—

মেসো, বিধাতা, প্রভু, দেবর, বৃহৎ, কর্ম্মী, গৃহস্বামী, মাষ্টার, খ্যাতনামা, বন্ধু।

7. Rewrite in chaste Bengali :—

ঘরে ভাত নাই, পরনে ছেঁড়া কাপড়, ঘরের চাল ফুটো, ব্যামো হলে দাওয়াই জোটে না, এই তো হলো চাষীদের হাল। মজুররা রোজ আনে রোজ খায়, যেদিন কাজ পায় না সেদিন উপোষ দেয়। গাঁয়ের ছুতোর, কামার, কাঁসারি, স্যাক্‌রা,- এদের পেটেও দুবেলা দুমুঠো যায় না।

8. Bring out the meaning of the word যেন in the following sentences :—

আমার কথা যেন কথাই নহে। আমার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত পড়িল। পুস্তকখানি যেন তোমাকে দিয়াছিলাম। কুকুরটি যেন বাঘ। আমি যেন তোমাকে পাঁচটি টাকা দিলাম, তাহাতেই কি তোমার চলিয়া যাইবে?

9. Construct one simple sentence :—

দূরে দূরে শিবির। দুই একটি শিবিরে দীপশিখা জ্বলিতেছিল। ঐ দীপশিখা অতি ক্ষীণ। অন্ধকার অতি সূচীভেদ্য ছিল। তাহাতে দীপশিখা শ্মশানের নির্ব্বাপিত চিতানলের ন্যায় জ্বলিতেছিল।

10. Complete the following sentences :—

(a) আজ যদি বৃষ্টি না হয় —।

(b) যার কথা বিশ্বাস করা যায় না——।

(c) কেবল খাইলেই হয় না— ।

(d) জোর যার——।

চতুর্থ পত্র

1. Rewrite the following after correcting all errors :—

(a) গাছে গাছে পত্ররাজি বায়ুভরে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

(b) আসমুদ্র হিমাচল পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতভূমি তাঁহার কির্ত্তী বক্ষে ধারণ করিয়া গৌরবান্বিত।

(c) আমাদের অধোপতনের মূল কারণ ঐক্যতার অভাব।

(d) পুত্রের নীরস বদনমন্ডল ও তেজহীন নয়নযুগলদ্বয় দেখিয়া জননীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল।

(e) সে সন্ন্যাসী প্রদত্ত ঔষধ জগবন্ধু দিয়াছে।

2. Substitute a single word for each of the following :—

যাহার অন্য উপায় নাই। কি করিতে হইবে তাহা যে না বুঝে। যাহার জন্ম আগে হইয়াছে। সমান পতি যাহার। পঙ্‌ক্তিতে ঠাঁই পাইবার উপযুক্ত। যাহাতে আয়ু বাড়ে। যেখানে মাছিটি পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে না। যাহার দুই হাত চলে। তিনটি ফলের সমাহার। আপনার রঙ্‌ যে লুকায়।

3. Comment grammatically on each of the following :—

অজানিত, অকাট্য, বে-আক্রুতা, শ্রেষ্টতম, আঘ্রাণ, অপরূপ, মঞ্জরিল, চক্ষুলজ্জা, লোক-লৌকিকতা, বৈবাহিকা, পিতৃব্যাণী, পর্য্যটক, গোপিনী, সচকিত, সশঙ্কিত।

4. Fill up the blanks in the following passage :—

এই——ভরত পুনর্ব্বার রামের——প্রণত হইলে রাম——ভ্রাতঃ পিতৃআজ্ঞা———করা আমার পক্ষে কোন মতেই কর্ত্তব্য নয়। আমি তোমার——কিছুমাত্র দোষারোপ——না।

5. Rewrite in chaste and elegant Bengali :—

অনেক ছেলে প্রথম যে সময় কলকতার স্কুলে ভর্ত্তি হয় সে সময়ে মনে হয় ম্যাট্রিকে ভাল result করবে কিন্তু শেষে দেখা যায় গেজেটে তাদের নাম নাই। এর কারণ আর কিছুই নয়, তারা কোনদিন মন দিয়ে পড়ে না, কেবল থিয়েটার, বায়স্কোপ, টকি দেখে আর সাইকেলে চড়ে টাউনময় ঘুরে বেড়ায়। এইরূপ কল্লে কি Examineএ কেউ ভাল marks পায়?

6. Translate into Bengali :—

Dishonest men may seem to prosper and go undetected, but only for a short time. Dishonesty is sure to be detected in the long run and then follow punishment and disgrace. Honesty is therefore the best policy. I do not mean to say that you should avoid dishonesty, because it may bring you into troubles, or that you should be honest, because it may bring you success; but because honesty is the right principle on which to shape your actions in this life; and it is a virtue which all of you should strive to possess.

7. Write short sentences with each of the following words :—

অপলাপ, দুরদৃষ্ট, অসৌষ্ঠব, অভ্র, সুষমা, সর্ব্বজনীন।

8. Make adjectives from :—

ফল, অগ্র, রং, নগর, জল।

9. Use in short sentences the words উপর and পশ্চাৎ as অব্যয়, ক্রিয়াবিশেষণ, and বিশেষণ।

10. Turn into indirect form of speech :—

রাজা কহিলেন, "ওরে দুর্ব্বুদ্ধি, এখনও শত্রুস্তুতি হইতে নিবৃত্ত হও। ঘোর মূর্খ হইও না। আমি তোমাকে অভয় দিতেছি।" প্রহ্লাদ কহিলেন, "যাঁহার স্মরণে সর্ব্বভয় দূর হয়, তিনি আমার হৃদয়ে থাকিতে আবার ভয় কি?"

পঞ্চম পত্র

1. Fill up the gaps in the following :—

(*a*) পরস্পর—উভয় পক্ষই পরস্পরের—জন্য বিশেষ—হইলেন, কিন্তু কেহই—পরিচয় জিজ্ঞাসার—স্বীকার করিতে সহসা—হইলেন না।

(*b*) সে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়াই ময়ূরের—, অশ্বের—, গজের—, সিংহব্যাঘ্রের—, কোকিলের—, এবং—স্বন্ স্বন্ ইত্যাদি শুনিতে পাইলাম।

2. Derive nouns from the following :—

স্থির, গম্ভীর, দরিদ্র, জড়, চেতন, মহৎ সুজন, বৃদ্ধ সহায়, সুন্দর, সুস্থ, গুরু।

3. Correct the following :—

শান্তনা, পক্ষীশাবক দুর্ণাম, ঋণগ্রস্থ, উর্দ্ধ, মুমুর্ষ, শারিরিক, লক্ষী, ব্যাথা, পূর্ব্বাহ্ন, বৃহস্পতি, অন্ত্যেষ্ঠি and ভাগীরথি।

4. Break up the following sentences into six simple sentences :—

সীতা নিদ্রাভিভূতা হইলে রঘুবংশাবতংস রামচন্দ্র পার্শ্বচরগণ সমভিব্যাহারে অত্যুচ্চ প্রাসাদ-শিখরে অধিরোহণ করিয়া আনন্দকোলাহলপূর্ণ অযোধ্যানগরীর অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।

5. Change the narration of the following :—

রাজেন্দ্রবাবু বলিলেন, "ছি, ছি! এমন কাজও কি করিতে হয়! দেবানন্দ, তোমার নিন্দা যে দেশময় রাষ্ট্র হইয়া গেল! ইহার পরে তুমি মুখ দেখাইবে কিরূপে? অন্য লোক হইলে লজ্জায় মরিয়া যাইত! তুমি আবার হাসিতেছ?"

6. Rewrite the following correctly :—

(i) ঋণগ্রস্থ হওয়ায় তাহার সমস্ত সম্পত্যি উচ্ছন্ন গিয়াছে। (ii) সে বন্ধুবান্ধবের নিকটে যাইতে সলজ্জিত হইতেছে। (iii) এখন নিদানের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে হইলে তাহাকে ভিক্ষা করিতে হয়। (iv) সে নির্দ্দোষী বলিয়া এখনও তাহার দুর্ণাম রটে নাই। তথাপি সে সশঙ্কিতচিত্তে দিন যাপন করিতেছে।

7. Construct sentences with the following :—

পীযূষধারা, সৈকতবিহারী, ব্যূহমুখে and বিশ্লেষণ।

8. Translate the following into Bengali :—

It is an exception to find a Burman who cannot read and write. The education is not very deep,—reading Burmese and writing; simple, very simple arithmetic; a knowledge of the days and months, and a little geography perhaps, and history.

But of their religion, they learn a great deal. They have to get by heart great portions of the sacred books, stories and teachings. It is one of the most beautiful sights imaginable to see monks and children kneeling on bare ground, singing while the dawn comes. The education of religion is very good, very thorough, not only in precept, but in practice; for in the monastery you must live a holy life as the monks live, even if you are but a schoolboy.

9. Punctuate the following passage :—

আমি যখন নিকটবর্ত্তী হইলাম তখন স্ত্রীলোকেরা নিরস্ত হইয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইল বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করায় যুবা সদর্পে বলিল আমি বাঘ মারিতে যাইতেছি এই মাত্র আমার গরুকে বাঘে মারিয়াছে আমি ব্রাহ্মণসন্তান সে বাঘ না মারিয়া কোন্ মুখে জলগ্রহণ করিব কি তেজস্বী এই যুবক

10. Give Bengali equivalents for the following :—

Centenary ; journalist ; majority ; five year plan ; secretery ; talkie ; international ; laboratory ; culture ; disarmament.

ষষ্ঠ পত্র

1. Are the following words correctly spelt ? If not, correct them :—

ভ্রূকুটী, মমত্ব, কৌতূহল, নুপুর, মনুষ্যত্ব, স্বত্ব, মহীয়সী, আনুষঙ্গিক, পরিবেশন and মনিষী।

2. Substitute one word for each of the following :—

(i) যে অপর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে। (ii) অরিকে যে দমন করে। (iii) যাহার স্পৃহা দূর হইয়াছে। (iv) যাহার কীর্ত্তির কথা সারা বিশ্বের লোক শুনিয়াছে। (v) যাহা দেখা যাইতেছে।

3. Combine the following separate sentences into a single sentence :—

অকস্মাৎ বসন্তের আবির্ভাব হইল। সমস্ত বনভূমি রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তরুলতা কুসুমাভরণে সজ্জিত হইল। তিনি তাহা নিরীক্ষণ করিলেন। উহাতে তাঁহার আনন্দ হইল।

4. Correct the following :—

অত্যাধিক অধ্যয়নের ফলে বালকটী অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। নিরপরাধীকে ক্লেশ দেওয়া অনুচিত। কালীদাস অনেক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। অর্থের অনাটনবশতঃ এবার লোকে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে। ভাই শশীভূষণ! শুনিয়া আশ্চয্য হইবে যে আমার ভ্রাতাগণ

বয়োপ্রাপ্ত হইয়া পৃথকান্ন হইয়াছে। বর্ত্তমানে আমি ঋণগ্রস্থ ও দুরাদৃষ্টবশতঃ সমর্থহীন। এ সময়ে আমাকে সাহায্য করিতে ভুলিও না। তোমার পত্রের প্রতিক্ষায় রহিলাম।

5. Rewrite the following in elegant Bengali using compounds where possible :—

ব্রাহ্মণ চোখ মুছে ধ্যানে বসলেন। হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেন,—"ব্রাহ্মণ, চোখ খোল আমি এসেছি।" ব্রাহ্মণ চোখ খুলে দেখলেন—তাঁর চোখের সামনে একটি মেয়ে,—চাঁপাফুলের বরণের মত তার বরণ, হরিণের চোখের মত চোখ, ভ্রমরের মত কালো চুল। ব্রাহ্মণের মুখে আর কথা নেই। তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

6. Translate into Beugali :—

So long the object of eager hope and busy imagination, Jerusalem stood before me at length in actual reality, the city of David, the chosen seat of God, the death-place of his son, the object of the world's pilgrimage for two thousand years. All its history, so strangely blended with holiness and crime, with prosperity and desolation, with triumph and despair, and a thousand associations came thronging into recollection, peopling its towers and surrounding plains with the scenes and actors of eventful years.

7. Fill up the gaps of the following :—

উন্মুক্ত—আম্রকুঞ্জের উদারনীলাকাশ—দেখিয়া যে পল্লীসন্তানের—হইয়া গিয়াছে, হঠাৎ তাঁহাকে দ্রোণগুরু—চক্রব্যূহের মধ্যে—ফেলিলে তাহার—কি চলিতে পারে ?

8. Make sentences with each of the following :—

গলদ্‌ঘর্ম্ম, উপকণ্ঠ, অনুযোগ, ব্যবধান, জীবন্মৃত and বন্ধুর।

9. Frame sentences with each of the following idiomatic expressions to bring out their meanings clearly :—

আই ঢাই করা। গা করা। টক্কর দেওয়া। হতভম্ব হওয়া।

10. Construct sentences with brief explanatory notes added to each of the following expressions :—

(i) হাড়ে বাতাস লাগা (ii) ডুমুরের ফুল (iii) মাথা খাওয়া
(iv) কোণ ঠাসা করা (v) গোবর-গণেশ (vi) আকাশ-কুসুম

সপ্তম পত্র

1. Rewrite the following passages into chaste Bengali correcting all errors in orthography, grammar, idom and other faults of style :—

(*a*) আমার সঙ্গে বহুদিনের সৌখ্য থাকা সত্বেও তিনি আমার শত্রুগণের সাপক্ষে থাকিয়া আমার অতিব অহিত সাধন করিয়াছিলেন। তদ্বারা আমার যে ক্ষতি হইয়াছিল, দুরাদৃষ্ট বশতঃ আমি তাহা সংশোধন করিতে পারিলাম না। তাঁহার বন্ধুত্ব আকাশকুসুমবৎ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। আমার হৃদয়-মন্দিরে তাঁহার মৈত্রতার বীজ রোপণ করিতে গিয়াছিলাম, তাহা সক্ষম হইলাম না।

(*b*) তুমি আমার উন্নতির মূলে এমনভাবে কণ্টকতরু রোপিত করিয়াছ যে আমি একেবারেই নিরাশা হইয়া পড়িয়াছি। এখন দিবানিশি কেবল এই কথাই ভাবিতেছি, কেন তুমি আমায় এরূপ মনোপিড়া দিলে। আমার হৃদয়ক্ষেত্রে তোমার যে মহিমা মূর্ত্তী স্থাপন করিয়াছিলাম, আজ তাহা অস্তগত হইয়াছে।

2. Substitute single words for the following :—

(i) এইমাত্র যিনি স্নান করিয়াছেন। (ii) যত্ন ব্যতীত উৎপন্ন।
(iii) যাহার প্রমাণের আবশ্যকতা নাই। (iv) বিগত হইয়াছে সংজ্ঞা যাহার।

3. Fill up the blanks in :—

পরদিন শুনা—হারাণ মাষ্টার নন্দীপুর - করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তথায় স্কুলটি হইয়া গেল। গোসাইগঞ্জের ব্রজ মাষ্টার অপ্রতিহত—মাষ্টারি এবং অপত্যনির্ব্বিশেষে গ্রামস্থ সকলের ক্ষীর, ননী, ছানা—করিতে লাগিলেন।

4. Frame sentences to illustrate the idiomatic use of the following :—

(i) অরণ্যে রোদন, (ii) এঁচড়ে পাকা, (iii) দু'মুখো সাপ, (iv) চিনির বলদ।

5. Construct sentences showing the difference in meaning between the following pairs of words :—

অবহিত and অবিহিত ; নিশিত and নিশীথ ; সুর and শূর ; প্রকৃত and প্রাকৃত ; দেবত্ব and দেবত্র ; বসন and ব্যসন।

6. Write short sentences with each of the following words :—

অনবধানতা, কনক-কিরণ, অবতারণা, সশ্রদ্ধ, বিনিময়।

7. Translate into Bengali :—

One of the pleasantest things in the world is going on a journey but I like to go by myself. I can enjoy society in a room but out

of doors, nature is company enough for me. I cannot see the wit of walking and talking at the same time. When I am in the country I wish to vegetate. I go out of town in order to forget the town and all that is in it. There are those who for this purpose go to watering places and carry the metropolis with them. I like solitude when I give myself up to it for the sake of solitude.

8. Parse the words underlined in the following sentences :—

কি হে রমেন, আজ কি কি পড়লে? তাই না কি সব পড়ে ফেলেছ! কি বল্লে? আমি কি পড়েছি? আর কি বলব ভাই, আমার কিছুই নাই। চেষ্টার কি ত্রুটি করছি! দেখা যাক কি হয়!

9. Make adjectives from the following words and construct short sentences with words so formed :—

শ্রবণ, দরশন, প্রবেশ, মোহ, পেষণ, হর্ষ।

10. Turn into indirect form of speech :—

রাম কাছে আসিতেই নারায়ণী তাহাকে কোলে করিয়া বলিল—
"মঙ্গলবারে কি অশথ গাছ পুঁত্‌তে আছে রে?"
রাম বলিল "কেন, কি হয়?"
"তা হলে বাড়ীর বড় বউ মরে যায় যে।"
"যাঃ, মিছে কথা।"
"নারে, মিছে কথা নয়; পাঁজিতে লেখা আছে।"
"কই পাঁজি দেখি?"

"তুই কি ছেলে রে! মঙ্গলবার পাঁজির নাম করতে নেই—তুই দেখ্‌বি কি রে! ও কথা যে ভোলাও জানে। আচ্ছা ডাক তাকে।"

"এ আমিও জানি। কিন্তু ফেলে দিলে আর দোষ নেই, না বৌদি?"

অষ্টম পত্র

1. Substitute single words for the following :—

(i) যাহা উচ্চারণ করিতে কষ্ট হয়, (ii) যাহার মন প্রশস্ত, (iii) যাহা সহজে দূর করা যায় না; (iv) সাপ ধরিতে যে পটু; (v) যে কুস্তি করে; (vi) যাহা সম্পন্ন করিতে অনেক খরচ; (vii) যাহা হইবে; (viii) দেশকে যিনি ভালবাসেন।

2. Rewrite the following correcting all errors :—

যিনি গুরুদত্ত উপদেশ-বিজ হৃদয়াকাশে বপন করেন এবং স্বীয় সৎকর্ম্ম সলীল সিঞ্চন দ্বারা পুষ্ট করেন, তিনিই কালে সেই বিজোৎপন্ন তরুর ফলভোগে সক্ষম হন।

তিনি যদ্যপিও বিচার মঞ্চের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রতিশ্রুতিপূর্ব্বক স্বীকার হইলেন যে কখনই মিথ্যা সাক্ষী দিবেন না, তথাপি তাঁহার মুখ হইতে অজস্র মিথ্যা কথা শৈলখণ্ডের ন্তায় প্রবাহিত হইতে লাগিল।

3. Write sentences to illustrate the difference in meaning between the words in each of the following groups :—

(i) গিরিশ, গিরীশ ; (ii) সিত, শীত ; (iii) নিরসন, নিরশন :
(iv) বিবৃত্তি, বিবৃতি ; (v) অসিত, অশিত ; (vi) চ্যুত, চ্যুত।

4. Rewrite in chaste Bengali :—

যখন রাত্তিরে চাঁদের আলো দেখে আমি এগিয়ে এলাম তখন সাম্‌নে একটি মরা সাপ দেখে আমার গায়ে কাঁটা দিল। কয়েক পা পিছিয়ে এলাম এবং চেঁচিয়ে উঠিলাম।

5. Frame short sentences with adjectives derived from the following words :—

আদেশ, ক্ষমা, ঋষি, অরণ্য, কেন্দ্র।

6. Write sentences with each of the following explaining the meaning in each :—

শাক দিয়ে মাছ ঢাকা, ঘাড়ে ভূত চাপা, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়া, কথা বেচিয়া খাওয়া, বুক বাঁধা, আকাশ ভেঙে মাথায় পড়া।

7. Translate into Bengali :—

There was no need of further introduction. The two heroic monarchs, for such they both were, threw themselves at once from horseback and the troops halting and the music suddenly ceasing, they advanced to meet each other in profound silence, and after a courteous inclination on either side they embraced as brethern and equals. The pomp and display upon both sides attracted no further notice—no one saw aught save Richard and Saladin, and they too beheld nothing but each other. The Sultan was the first to break the silence.

8. Construct sentences to illustrate the use of the following words :—

প্রগতিশীল, অনন্যসাধারণ, মনীষাসম্পন্ন, জলদগম্ভীর, রোরুদ্যমান, বিশ্ববিশ্রুত।

9. Distinguish between কৃৎ and তদ্ধিত suffixes ; name the pratyayas in the following words and say to which of the two classes each pratyaya belongs :—

বিলাতি, পোড়ো, ঝরণা, চলতি, ক্ষেপাটে, বাবুয়ানা, বাছাই।

10. Analyse the following sentence :—

নবমালিকা বিকশিত নবকুসুম সুশোভিত হইয়াছে আর সহকার ফলভারে নত হইয়াছে।

নবম পত্র

1. Construct sentences with adjectives derived from *each* of the following :—

ভ্রম, বিচ্ছেদ, উৎকর্ষ and অভ্যাস।

2. Punctuate the following extract after necessary correction :—

কি সর্ব্বনাশ যে কথাটি প্রাণপণে গুপ্ত করিব ভাবিয়াছি ঠিক সেই কথাটিই সর্ব্বাগ্রে প্রকাশ করিল কে আমিও সঙ্গী লোকের সকলের দিগেই একবার নেত্র পতন করিয়া লইলাম সঙ্গি রামজিবন সিংহের দিগে চক্ষু দিতেই তাহার দৃষ্টি অবনতি হইয়া পড়িল।

3. Substitute one compound or single word for each of the following :—

(1) দশরথের পুত্র, (2) ঘুষিতে ঘুষিতে মারামারি, (3) যাহা অবশ্য ঘটিবে, (4) স্ত্রীর বশীভূত, (5) স্ত্রীর সহিত, (6) উপকার করিবার ইচ্ছা, (7) কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, (8) মাল্যধারণ করিয়া আছে যে।

4. Distinguish between উপাদান and উপাধান, কোন and কোণ, দ্যুত and দূত, সুত and সূত।

5. Translate the following into Bengali :—

Shylock, the Jew, lived at Venice; he was a usurer who had amassed an immense fortune by lending money at great interest to Christian merchants. Shylock being a hard-hearted man, exacted the payment of the money he lent with such severity that he was much disliked by all good men, and particularly by Antonio, a young merchant of Venice, and Shylock as much hated Antonio, because he used to lend to people in distress, and would never take any interest for the money he lent. Whenever Antonio met Shylock he used to reproach him with his usuries and hard dealings, which the Jew would bear with seeming patience, while he secretly meditated revenge.

6. Use the following in sentences of your own :—

তিরোভাব, কষ্ট-কল্পিত, নখদর্পণ।

7. Fill up the blanks :—

"আমার নয়নের তারা, আমার প্রাণের—" বলিয়া লক্ষ্মীন্দর বেহুলাকে—আসিতে বলিল।

সমস্ত রাত্রির—ও শ্রমে বেহুলার ক্লান্তি আসিয়াছিল। —কালনাগিনী লক্ষ্মীন্দরের পদের সন্নিহিত হইল।

—চন্দ্রোদয় হইয়াছে, চন্দ্রধর ভাবিতেছেন বিপদ্ হইয়াছে।

8. Correct the errors in :—

তাঁহার ব্যবহারে কৃতার্থ হইয়া আমরা সকৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপিত করিয়া কহিলাম,—"আপনি অতি সদাশয়।"

তিনি ভ্রূকুটী করিয়া বলিলেন, নীরিহ হইলেই কিছু মহত্ব প্রদর্শন হয় না। পিপাসীতকে পুষ্করীনি দেখাইয়া দিয়া নিজে উজ্জ্বল আলোকে বসিয়া থাকা পরিপক্ক বুদ্ধির পরিচয় বটে।

9. Frame sentences with the antonyms of the following :—

সাবালক, বিশ্লেষণ, ঊর্দ্ধতন, সাফল্য, আনুকূল্য, সহযোগী, উত্তমর্ণ, ঘাত, আকর্ষণ, বাহাল, আবির্ভাব and উৎকর্ষ।

10. Form sentences with each of the following groups of words so as to distinguish the differences of meanings :—

দূত, দ্যূত ; চির, চীর ; সিত, স্মিত ; শম, সম ; কৃত, ক্রীত।

দশম পত্র

1. Rewrite the following in a corrected form :—

শ্রোতৃমণ্ডলীকে সমবেত দেখিয়া শশীশেখর পুলকিত হইলেন এবং সলজ্জিত হাস্যে দর্শকবৃন্দের দিকে চাহিয়া কহিলেন—আমি আপনাদের অনুমত্যানুসারে বক্তৃতা করিতে আসিয়াছি ; কিন্তু মনোকষ্টে আছি, তাই অত্যধিক কিছুই বলিব না।

সভাতে অনেক বিদুষী স্ত্রীলোক উপস্থিত ছিলেন। তাহার মধ্যে একজনকে সভাপতি মননীত করা হইল। তিনি গাত্রোত্থান করতঃ বলিলেন, আপনারা যে আমার প্রতি এই গুরুতর কার্য্যের ভার অর্পণ করিলেন ইহা আপনাদের সৌজন্যতার পরিচয় মাত্র। আমার শক্তি সাধ্যে যাহা সম্ভব তাহাতে ত্রুটী করিব না, কিন্তু কৃতকার্য্যতা আমার আয়ত্তাধীন নহে, উহা আপনাদের সানুগ্রহ সাপেক্ষ।

2. Give single words for *each* of the following :—

(i) যাহার মমতা নাই। (ii) যাহা সম্পন্ন করিতে অনেক খরচ পড়ে।
(iii) যাহা অতিকষ্টে অতিক্রম করা যায়। (iv) যে আপনাকে কৃতার্থ মনে করে।

3. Fill up the blanks :—

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের চরিত্র—মত কঠোর এবং—মত মৃদু। এই যুগে চারিদিকে লতিকাসুলভ—, হেয় ও ছলনাময়—, অপমানসহনে নিশ্চেষ্ট—বাঙ্গালী-চরিত্রের লক্ষণে দাঁড়াইয়াছে।

4. Substitute *one* word for each of the following :—

(i) যাহা উড়িয়া যাইতেছে। (ii) যে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে উদ্যত।
(iii) যাহার অভিমান নাই। (iv) যাহা চিন্তা করা যায় না।

5. Make sentences with the antonyms of each of the following :—

তাপ, বিরাগ, উপকার, হ্রয়।

6. Translate the following into Bengali :—

The position of women in the ancient Aryan civilisation was a very noble one. The great majority married becoming, as Manu said, the Light of the Home. Some took up the ascetic life and

sought the knowledge of Brahman. The story of Rani Damayanti, to whom her husband's minister's came when they were troubled by Raja Nala's gambling; that of Gandhari in the council of Kings and warrior-chiefs, remonstrating with her head-strong son Duryodhana; in later days those of Padmavati of Chitore, of Chand Bibi of Ahmednagar, of Ahalya Bai of Indore—all these and countless others are sufficient proofs of the greatness of Indian women.

7. Correct if necessary :—

হরীশচন্দ্র, জগতীন্দ্র, জগবন্ধু, কালিকিঙ্কর, গ্যাসালোক, পুরষ্কার, সন্ন্যাসী, উর্দ্ধ।

8. (*a*) Give the feminine forms of each of the following and frame short sentences with them :—

মাতা, সেবক, অভাগা, ঠাকুরদাদা, বাদশাহ্।

9. Form adjectives from each of the following nouns and make sentences with them :—

সোনা, পাথর, রেশম, তেজ, বুদ্ধি।

10. Turn into indirect speech :—

হরবল্লভ তাহাকে বলিলেন, "আমার সঙ্গে সিপাহী দিউন। আমি দেবী চৌধুরাণীকে ধরাইয়া দিব। ধরাইয়া দিতে পারিলে আমায় কি পুরস্কার দিবেন, বলুন।"

একাদশ পত্র

1. Rewrite the following colloquial passage in a more dignified and learned form :—

পুরুষটি কতকাল ধরিয়া যে ঐ গাছের তলায় বসিয়া আছেন, তাহা বলা যায় না। উহার বুক পর্য্যন্ত একটি মাটির ঢিপ্ উঠিয়াছে। চুলগুলিতে তেল নাই, বড় রুক্ষ, জটা ধরিয়াছে। দুই কাঁধের উপর পাখীরা বাসা তৈয়ারী করিয়াছে। গলায় লতা জড়াইয়া ধরিয়াছে। লোকটির দেহ নড়ে না চড়ে না—চোখদুটি সূর্য্যের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে। একটা মরা সাপ গলা হইতে পৈতার মত ঝুলিয়া পড়িয়াছে।

2. Use each of the following words in a sentence of your own :—

আয়ত, আয়ত্ত; দীপ্ত, দৃপ্ত; সত্ব, স্বত্ব; অর্দ্ধাশন, অর্দ্ধাসন।

3. Rewrite correctly :—

(i) রঞ্জিৎ,—তুমি উন্মাদ—গোপন কথা ব্যক্ত করিয়া প্রকাশ করা তোমার উচিত নয়—তুমি মৌন হও। (ii) দানে দাতাগণেরই চিত্তোন্নত হয়,—গৃহীতার তাহাতে মনোন্নতি হয় কী? (iii) মহতাশ্রমের দিগেন্দ্র তর্কবাগিশ ত্রৈলক্ষ্য শিরমণির বৈমাত্র সহদোর।

4. Make sentences with adjectives derived from each of the following :—

ধ্যান; শুষ্ক; তন্দ্রা; প্রতিঘাত; স্ব; তড়িৎ; অগ্র।

5. Give the antonyms of :—

প্রাচীন, ম্লান, আদেশ, আবির্ভাব and মূঢ় ।

6. Frame sentences to distinguish between each of the following pairs of words :—

সলিল and সলীল ; জাম and যাম ; সার্থ and স্বার্থ ; চন্দ্রমা and চন্দ্রিকা ।

7. Give chaste words for :—

একশত জায়গায় ছেঁড়া, টাটকা ফোটা, ছাইয়ের গাদা, খাওয়ার পরে যা পড়ে থাকে ।

8. Frame sentences with each of the following idiomatic expressions :—

শাঁখের করাত, ষাঁড়ের গোবর, জিলিপির প্যাঁচ, কেঁচে গণ্ডূষ করা, খুঁড়িয়ে বড় হওয়া, হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গা ।

9. Rewrite in one simple sentence :—

ভক্ত যাহা বাঞ্ছা করে, সেই ফল যিনি প্রদান করেন, সেই হরিকে পাইবার জন্য তিনি কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন ।

10. Translate into Bengali :—

I have faith in my country and specially in the youth of my country. The youth of Bengal have the greatest of all tasks that have ever been placed on the shoulder of youngmen. I have travelled for the last ten years or so, over the whole of India and my conviction is that from the youth of Bengal will come those heroes who will march from one corner of the earth to the other preaching and teaching the eternal spiritual truths of our forefathers ; from them will come the power that will raise India once more to her proper place of spiritualism. Be not afraid of anything. It is fear that is the great cause of misery and it is fearlessness that brings heaven even in a moment.

দ্বাদশ পত্র

1. Construct short sentences to illustrate the use of the following words :—

সাধারণতন্ত্র, বিসদৃশ, পরিস্থিতি, প্রচেষ্টা, প্রগতি, সৌষ্ঠব, সামঞ্জস্য, প্রত্যবায় ।

2. Correct the errors in the following passages :—

সম্ভূ বাবু বিজ্ঞান বেক্তি । তাঁর চরিত্তিরও মাধুর্য্যতাপূর্ণ । তিনি সম্মান লাভের জোগ্যপাত্র । কিন্ত তাঁর দুরাদৃষ্ট ক্রমে তাঁর গুণের পরিচয় কেহ পাইল না, তাঁর দুরবস্থারও অবশান হইল না ।

3. Translate into Bengali :—

Where life is, there is war. So it has been from the beginning, and so it will be always. In the world of animals there is

incessant blood-shed; they prey upon one another, and the end of every wild creature's life is a tragedy. They fight for their mates, for their young, for their food, they die, every year millions of them, wounded or starved out. Everywhere it is war; every hawk is an aeroplane, every spider's web is a wire-entanglement. Every seed in the ground, each blade of glass, each separate bud must stand up for itself, to get all that it needs of light and air and nourishment. There is no peace where Life is.

4. Fill up the gaps in the following :—

ফেরদৌসীর—চতুর্দ্দিকে—হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার নবজাত—কাননের সুরভিত—দেশ-দেশান্তরে—হইয়া সকলকে – করিতেছে। দীনের—, রাজার—ফেরদৌসী সমভাবে—।

5. Rewrite the following in elegant Bengali correcting all the errors :—

নদীর ঘাটে যাইয়া আমরা মড়াদাহ দেখিতে লাগিলাম, চিতার ধোঁয়ায় সমস্ত জায়গাটা সমাচ্ছন্ন হইয়া এরূপ আঁধার ক'রে তুলেছিল যে আমাদের নিশ্বাস আট্‌কাইয়া যাইতেছিল। আমরা নদীর শৈকতে দাঁড়াইয়া জীবনের নাশ্বর্য্য ও ক্ষণভাঙ্গুর্য্য চিন্তা করিতে লাগিলাম।

6. Combine the following sentences into a single sentence :—

প্রসন্নকুমার মিত্র ইন্‌ষ্টিটিউশনে প্রথম শ্রেণীতে পড়ে। সে বুদ্ধিমান্। তাহার চরিত্র ভাল। প্রধান পণ্ডিত মহাশয় তাহাকে আদেশ করিলেন। সে ব্যাকরণ পড়িতে বসিল। তাহার বন্ধুর নাম সতীশচন্দ্র। সে প্রসন্নকুমারকে নিমন্ত্রণ করিল। সে তাহাকে বাসায় লইয়া গেল।

7. Contract the portions underlined in the following sentences into single words :—

যাহাতে হৃদয় বিদীর্ণ হয় এমন দৃশ্য দেখিয়াও তিনি বিচলিত হইলেন না। যেখানে অতিকষ্টে যাওয়া যায় এমন বনে তিনি প্রবেশ করিলেন। তিনি ঈশ্বর আছেন এ কথা স্বীকার করেন। পরের অন্নে যে জীবন ধারণ করে তাহার জীবন বিড়ম্বনা।

8. Split up the following into short and simple explanatory sentences :—

ছাত্র যতই স্থূলবুদ্ধি হউক না কেন এবং প্রথম অবস্থায় পাঠের বিষয়টি যতই দুরূহ প্রতীয়মান হউক না কেন, পরিশেষে তাহা সহজ বা কঠিন হইবে ছাত্রের অধ্যবসায় ও অমনোযোগিতা অনুসারে।

9. Compose a simple sentence with the following :—

(i) তাঁহার একটী ছেলে ছিল। (ii) তার নাম রাম। (iii) সেটি তাঁর সবে মাত্র ছেলে। (iv) তার বয়স মাত্র এগার। (v) সে দেখ্‌তে শুন্‌তে ভাল। (vi) কাজে খুব ছিল সে পটু। (vii) তাহার মুখখানি ছিল চাঁদের মত। (viii) সে এবার চিত্রবিদ্যা শিখ্‌তে প্যারিসে গিয়াছে।

10. Give examples of :—

(a) কর্ত্তায় ৭মী বিভক্তি।

(*b*) ক্রিয়াবিশেষণে ৭মী বিভক্তি।
(*c*) ভিন্নার্থক শব্দযোগে ২য়া বিভক্তি।

ত্রয়োদশ পত্র

1. Fill up the gaps in the following :—

তাঁহার সহিত—করিয়া বুঝিলাম, তিনি অতিশয় চতুর।—তাঁহার শাস্ত্রে—পাণ্ডিত্য এবং বুদ্ধি অতীব—। বহুলোক একত্র হইয়াও তাঁহার সঙ্গে—উঠিতে পারেন না। তিনি যখন কোন বিষয়ে · বলিতে থাকেন, তখন—বর্গ বিস্ময়—ও মুগ্ধ—তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকে।

2. Frame sentences illustrating the correct use of the following :—

আনুপূর্ব্বিক, যৎপরোনাস্তি, অকিঞ্চিৎকর, প্রতিহত and অনূদিত।

3. Substitute single words for the following expressions :—

(*a*) যিনি সকলই সহেন ; (*b*) যে সময়ে অত্যন্ত দুঃখে ভিক্ষা পাওয়া যায় ; (*c*) অন্য ভাষায় পরিণত ; (*d*) পথে অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনা।

4. Translate the following passage into Bengali :—

When he returned to England, he was sitting by the fire one day, and began to smoke. In the middle of his smoking the door opened, and in came his man-servant. Now this man had never in his life seen anyone smoke, and did not know that there was such a plant as tobacco. So when he saw the smoke coming from his master's mouth he thought he was on fire. He cried out in alarm, and ran to fetch a bucket of water to put the fire out ; and Sir Walter was deluged before he had time to explain what he was really doing.

5. Give elegant synonyms for :—

(*a*) ধেনো জমি, (*b*) বুনো মুরগী, (*c*) খই ছড়ানো, (*d*) রুক্ষ চুল, (*e*) তাঁবু, (*f*) এঁটো পাতা।

6. Correct the following :—

তিনি যেরূপ হৃদয়গ্রাহিনী বাক্যে বক্তৃতা করিলেন, তাহাতে আমার মানসক্ষেত্রে তাঁহার উপদেশসমূহ অঙ্কিত হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, এদেশের লোক স্বভাবতঃই ধর্ম্মভীরু, চিত্ত সরল এবং রাজভক্ত। ইহারা জীবনের ক্ষণস্থায়ী বিষয়ে অভিজ্ঞসম্পন্ন এবং ঈশ্বরে নির্ভর আছে। ইহারা যেরূপ কষ্টসহিষ্ণু তেমনই নিস্পৃহপূর্ণ।

7. Change the narration of the following :—

নারায়ণী হাত যোড় করিয়া কহিলেন, "কার ওপর রাগ ক'রে যাচ্ছ, মা? আমরা কি কোন অপরাধ ক'রেছি?"

দিগম্বরীর ক্রন্দন অধিকতর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, নাকিসুরে বলিলেন, "আমি কচি খুকী নই নারাণি, সব বুঝি। তোর ইসারা না থাকলে কি ওর কখনও অত সাহস হয়? আমি ডাইনী?

আঁ্যা, আমাকে দূর ক'রে দাও! আচ্ছা, তাই যাচ্ছি। আমরা তোদের আপদ্ বালাই—গলগ্রহ! পথ ছাড়্, ব'লছি।"

8. Frame sentences with each of the following adjectives adding suitable nouns after them :—

লঘু, অবিসংবাদিত, অভিজাত, ঝানু, বেজায়, বাহ্য, চিমড়া, অবহিত।

9. Frame sentences to illustrate the uses of the following words :—

তচ্‌নচ্ ; হাতেনাতে ; আকণ্ঠ ; মতিচ্ছন্ন ; শরণ ; এঁচড়ে পাকা।

10. Give the meaning of the following words and explain their formation :—

বড়াই, ডুবুরী, সেবাইত, রাখালি, মেয়েলি, গেঁয়ো, আধুলি, নীলিমা।

চতুর্দ্দশ পত্র

1. Turn the following into indirect form of speech :—

আনসারী কহিলেন—"বন্ধো! আমরা তিন জনেই রাজকবি; কবি ব্যতীত আমরা অন্য কাহারও সহবাস ভালবাসি না।" পথিক তখন বিনীতভাবে বলিল—"মহাত্মন্, এ দীন ব্যক্তিও একজন কবিতার উপাসক।" আনসারীর বিস্ময় হইল, বলিলেন,—"বেশ, আমরা তিন বন্ধু তিনটি চরণ বলিব, আপনি যদি তাহার চতুর্থ পাদ পূরণ করিতে পারেন, তবে বুঝিব আপনি কবি।"

2. Fill up the blanks in the following sentence :—

কিছুকাল পরে আর একদিন এই—গাছ আমার—পড়িয়াছিল, তখন—বৃক্ষটি বড়—, ইহার নিকট—পাষাণেরও—নাই।

3. Render into Bengali :—

National progress is the sum of individual industry, energy and uprightness, as national decay is of individual idleness, selfishness and vice. What we are accustomed to decay as great social evils, will, for the most part, be found to be only the outgrowth of our own perverted life ; and though we may endeavour to cut them down and extirpate them by means of law, they will only spring up again with fresh luxuriance in some other form, unless the conditions of human life and character are readily improved. If this view be correct, it follows that the highest patriotism and philanthrophy consists not so much in altering laws and modifying institutions, as in helping and stimulating men to elevate and improve themselves by their own free and independent action.

4. Correct the following :—

তাহার দুরাবস্থা দেখিলে দুঃখ হয়। কাহারও সহিত ঐক্যতা নাই বলিয়া নিজেকে নির্দ্দোষী প্রমাণ করিতে সে সকলের সম্মুখে যাইতে সলজ্জিত ও সশঙ্কিত বোধ করিল।

5. Frame sentences with any five of the following words :—

দুরূহ, অবিভক্ত, গন্ধবাসিত, পর্য্যুসিত, অবতারিত, বিশ্বজনীন, সমন্বয়।

6. Make a complex sentence, combining the following simple sentences :—

কোন কোন রাজারা স্বেচ্ছাচারী। তাহারা কেবল প্রজাগণের ভয়াবহ হইতেই যত্নবান হয়। তাহারা অত্যাচার দ্বারা প্রজাদিগকে নম্রতা শিক্ষা করাইবার চেষ্টা পায়। এরূপ রাজারা মানবজাতির পক্ষে দৈবনিগ্রহস্বরূপ।

7. Make sentences with :—

অন্ধের যষ্টি, তাসের ঘর, শাপে বর, আকাশকুসুম, সাতখুন মাপ, মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়া।

8. Expound and name the samasas in :—

সবিনয়, গরহাজির, পাশ-করা, প্রেমঘন, শীতার্ত্ত।

9. Give the antonyms of :—

স্থূল, সন্ধি যুক্ত, নিরাকার, প্রাচ্য।

10. Give the feminine forms of :—

নবাব, গুরু, কর্ত্তা, বর, রজক, বেহান, অগ্নি।

পঞ্চদশ পত্র

1. Explain the formation of the following words :—

জ'লো, ন্যাকামো, হিংসুক, তৈলিক, ফুটন্ত, পূজারি, পারানি।

2. Substitute simple words for :—

তিন মোহানার মিলন যেখানে। আট মাসে জন্মিয়াছে যে। কড়ি নাই যাহার। ভাবের অভাব। শতবর্ষের সমাহার। খাওয়ার নিমিত্ত খরচ।

3. Frame sentences with :—

অরণ্যে রোদন, গোবর গণেশ, দুমুখো সাপ, চিনির বলদ।

4. Name and expound the samasas in :—

বিলাতফেরৎ, নেতৃহীন, গাছপাকা, মনমরা, মিশ্‌ কালো, আলুনি, মোটাসোটা।

5. Distinguish between the following pairs of words :—

নিশিত and নিশীথ ; স্মরণ and শরণ ; ব্যতীত and ব্যথিত ; অমার and আমার।

6. Write sentences with :—

চূণকালি, বেমালুম, দেঁতোহাসি, অজবুক, ধনুর্দ্ধর।

7. Give autonyms of :—

আর্জ্জব, অনুকূল, উদারতা, আধিভৌতিক, গৌরব, কর্ম্মঠ।

8. Fill up the gaps in :—

তাজমহল স্থাপত্য শিল্পের —— আদর্শ। জগতের কুত্রাপি —— আর একটি স্মৃতিমন্দির —— হয় না। ——— ভারতাকাশের একটি উজ্জ্বল —— স্বরূপ। প্রত্যেক ভারতবাসী এই সৌধটি লইয়া —— করিতে পারেন।

9. Rewrite the following words correctly giving reasons :—

সশঙ্কিত, ভূম্যাধিকারী, বিদ্বানগণ, জ্যোতীন্দ্র, দুরাবস্থা, সম্মিলিত।

10. Translate the following passage into your own vernacular :—

Some of you have heart already of the Greeks ; and all of you, as you grow up, will hear more and more of them Those of you who are boys will, perhaps, spend a great deal of time in reading Greek books ; and the girls, though they may not learn Greek, will be sure to come across a great many stories taken from Greek history, and to see, I may say everyday, things which we should not have had if it had not been for these old Greeks. You can hardly find a well-written book which has not in it Greek names, and words and proverbs ; you cannot walk through a great town without passing Greek buildings ; you cannot go into a well-furnished room without seeing Greek statue and ornaments, even Greek patterns of furniture : so strangely have those old Greeks left their mark behind them upon this modern world in which we now live.

DACCA SCHOOL BOARD

MATRICULATION PAPERS

1924

1. Derive adjectives from any four of the following words :—

শ্রম, পল্লব, যশঃ, পাহাড়, লীলা, দন্ত।

2. Rewrite the following in elegant Bengali :—

শরতের আবির্ভাব—ত্রিযামা অবসান——বৃন্দাবনের কিবা শোভা! চারিদিকে তাল, তমাল, শাল, পিয়াল, বকুল আদি নানা জাতি বৃক্ষ—তদুপরি সহস্র সহস্র পাখী নানা রবে গান কচ্ছে—বায়ু মন্দ মন্দ বহিছে—ব্রজবালক ও ব্রজবালিকারা কুঞ্জে কুঞ্জে পথে পথে বীণা বাজাইয়া

ভজন গাইতেছে। নিশাবসানে দেবালয় সকলে সহস্র সহস্র শঙ্খঘণ্টার ধ্বনি হইতেছে। বৃক্ষের উপর লক্ষ লক্ষ বানর উল্লম্ফন-প্রলম্ফন করিতেছে—কখন ল্যাজ জড়ায়—কখন বিকট দন্ত প্রদর্শন-পূর্ব্বক ঝুপ করে পড়ে লোকের খাদ্যসামগ্রী কেড়ে লয়।

1925

1. Break up the following into as many simple sentences as you can :—

মনুষ্যের এই এক বিচিত্র সৌভাগ্য যে সর্ব্বধ্বংসী তুফান যেমন কোন স্থানেই বহুকাল তিষ্ঠিয়া থাকে না, তাইমারলেনের মত মৃত্যুর চলন্ত বিগ্রহস্বরূপ সর্ব্বধ্বংসী মনুষ্যেরাও তেমন পৃথিবীর কোন স্থানেই বহুদিন তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারে না।

2. Give one word for each of the following :—

(*a*) গাছ কাটা যায় যাহা দ্বারা (অস্ত্র)।
(*b*) পূতিগন্ধ যাহাতে (স্থান)।
(*c*) হিসাব নাই যাহার (লোক)।
(*d*) শূদ্রজাতীয় স্ত্রী।
(*e*) শুভ্র দন্ত যাহার (স্ত্রী)।

3, Rewrite following in elegant Bengali :—

লোকে তদ্ব্যক্তিকেই সাধু কহেন যাঁহা থেকে সংসারের প্রভূততম মঙ্গলবিধান নিশ্চিত। তা না হলে যাকে তাকে সাধু বলে কেন রসনা কলুষিত করবে? আমি প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছি লোকে যা খুসী তাই বলুক, তাও স্বীকার, তবু প্রকৃষ্টতম পরিচয় না পাওয়া ব্যতিরেকে কাহারও সমক্ষে মানবোত্তম বলিয়া মাথা অবনত করিব না।

1926

1. Derive adjectives from three of the following words and frame sentences with them :—

পশু ; মায়া ; মুখ ; বিধি ; সূর্য্য।

2. Give one word for the portion underlined in three of the following sentences :—

(i) যে আপনাকে হত্যা করে সে মহাপাপী!
(ii) যাহার সাধারণ বুদ্ধি নাই এমন ব্যক্তি জীবনে সফলতা লাভ করিতে পারে না।
(iii) যিনি সর্ব্বদা নীতি অবলম্বন করিয়া চলেন তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন।
(iv) যে আত্মরক্ষার জন্য আসে তাহাকে পালন করা কর্ত্তব্য।
(v) যে বস্তু পাইতে ইচ্ছা করা যায় সে বস্তু সকল সময় পাওয়া যায় না।

3. Correct the mistakes in the following :—

সে যখন শুনিল যে ভূম্যাধিকারী তাহার প্রস্তাবে সম্মত হন নাই তখন তাহার নির্ব্বাপিতপ্রায় শোকসিন্ধু আবার প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল এবং সে ধৈর্য্যতাবিহীন হইয়া এই বলিয়া প্রলাপ করিতে লাগিল—যে, হায়, আমার কী দুরদৃষ্ট ! যদিও আমি সর্ব্বাপেক্ষা নির্দ্দোষ তথাপি শত্রুরা নানাবিধ লোকদিগের দ্বারা আমাকে প্রহারিত করিয়া তাহাদের আকাঙ্কার শান্তি করিয়া লইল, অথচ ইহার কোন সদ্বিচার হইল না ।

1927

1. Write any three of the following sentences in shorter form. :—

(a) যে সকল জন্তু তৃণ ভোজন করে সে সকল জন্তুর সংখ্যা করা যায় না ।

(b) উপরে যে সকল দোষের উল্লেখ করিলাম সে সকল দোষ, যে পুস্তক আলোচনা করিব সেই পুস্তকে দৃষ্ট হয় না ।

(c) সে লেখাপড়া শিখিয়াছে সত্য কিন্তু ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারে নাই ।

(d) রাম কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া লোকে যাহা পূর্ব্বে দেখে নাই বা পূর্ব্বে শোনে নাই এরূপ নিন্দার যোগ্য আচরণ করিলেন ।

2. Make sentences with :—

(a) the antonym (বিপরীতার্থবোধক শব্দ) of তিরোভাব, বৃদ্ধি, অলস ।

(b) adjectival form of গান, আসন, ভয় ।

3. Rewrite in simple but elegant Bengali :—

তাঁহার উৎকৃষ্ট রথ বায়ুগতিতে যাইতেছে, তাঁহার হৃদয়ের আবেগে তিনি ভাবিতেছেন, রথ বেশী চলিতেছে না, তিনি সারথিকে ত্বরান্বিত করিতেছেন । কত কুসুমপুঞ্জ পরিশোভিত বনরাজির মধ্য দিয়া, কত বৃক্ষনিচয় সমাকীর্ণ, মনোহর কুরঙ্গ ও কলকণ্ঠে বিহঙ্গে পরিপূরিত পার্ব্বতীয় দেশের মধ্য দিয়া গমন করিতেছেন, কত কল-কল-নাদিনী তরঙ্গিণী নৌকাযোগে উত্তীর্ণ হইতেছেন, কত নির্ঝরের মুক্তাফলবৎ অনন্ত বারিবিন্দু নিপতিত হইয়া রথ্যাকে মুক্তাময় করিতেছে, কিন্তু এই চিত্তাকর্ষক শোভাসম্ভারে তাঁহাকে প্রীতি ও শান্তি প্রদান করিতেছে না ।

1928

1. Rewrite the following in chaste and elegant Bengali :—

পুরুষটি কতকাল ধরিয়া যে ঐ গাছের তলায় বসিয়াছেন, তাহা বলা যায় না । উহার বুক পর্য্যন্ত একটি মাটির ঢিপ উঠিয়াছে । চুলগুলিতে তেল নাই, বড় রুক্ষ জটা বাঁধিয়াছে । দুই কাঁধের উপর পাখীরা বাসা তৈয়ারী করিয়াছে । গলায় লতা জড়াইয়া ধরিয়াছে । লোকটির দেহ

নড়ে না চড়ে না, চোখ দুটি সূর্য্যের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে। একটা মরা সাপ গলা হইতে পৈতার মত ঝুলিয়া রহিয়াছে।

Or

Rewrite the following in plain conversational language :—

অস্মদাদির সর্ব্বজ্ঞতা নাই। সুতরাং আমাদের দুজ্ঞেয় সর্ব্বজ্ঞের পক্ষে ধর্ম্মতত্ত্ব সুবিজ্ঞেয় হইলেও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহাদের নিকট হইতে ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত হওয়া বর্ত্তমান সময়ে সম্ভবপর নহে। তথাপি দয়ালু মহর্ষিগণ লোক-হিতার্থে যে সকল অমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, গুরুশিষ্য-পরম্পরাক্রমে ঐ সকল উপদেশ আমরা অবগত হইতেছি।

2. Supply appropriate adjectives to three of the following words :—জটা, কণ্ঠ, আর্য্য, শস্য, পদ, শতাব্দী।

(b) Frame short sentences with adjectives formed from :—

আদেশ, ক্ষমা, ঋষি, and অরণ্য।

3. (a) Substitute single compound words for the following :—

(i) খরচ কর্‌তে নারাজ। (ii) অনেক খরচ করার দরুণ নানান্ দেনায় জড়ান। (iii) খুব বেঁটে নয়। (iv) খেটে খেটে হয়রাণ।

(b) Explain and illustrate tho difference between :—

পক্ষ, পক্ষ্ম; বলি, বলী; শঙ্কর, সঙ্কর; সার্থ, স্বার্থ।

1929

1. Correct the following :—

(a) শিশুকাল হইতে আমার ভ্রাতপুত্রের সমস্ত ব্যয়ভার আমি বহন করিয়াছি; কিন্তু তাহার কথায় কৃতগ্যতার কোন চিহ্নমাত্র নাই। তাহার নিকট আমি প্রত্যুপুকারের প্রত্যাশা করি না। যাহা হউক, তাহার ঈষ্ট হইলেই আমি পরম সন্তোষ।

(b) জনৈক দরিদ্র বেক্তি শিরোপিড়ায় কষ্ট পাইয়া তাঁহার নিকট আত্মিয় এক ভুম্যাধিকারীর সহিত চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আগমন করেন।

2. (a) Express each of the following in one word, and construct sentences with newly-formed words :—

মিষ্ট ভাষা বলে যে। যুদ্ধ করে যে। ঈশ্বরে যাহার বিশ্বাস নাই। এক গুরুর শিষ্য যাহারা।

(b) Explain and illustrate the difference between :—

আপন, আপণ; প্রকৃত, প্রাকৃত; ভাষণ, ভাসন; শকল, সকল।

3. Rewrite the following in chaste and elegant Bengali :—

এক অবীরা স্ত্রীলোকের ভদ্রাসনে এক পনস বৃক্ষ ছিল তাহার এক ফল চোরে অপহরণ করিয়াছিল তাহাতে ঐ স্ত্রীলোক অতি দুঃখিতা হইয়া রাজার নিকট অভিযোগ করিলেক। রাজা অতি দুঃখিনী দেখিয়া ঐ গ্রামস্থ সকল লোককে আনয়ন করিয়া প্রত্যেকে জিজ্ঞাসা করিলেন

কেহ স্বীকার করিলেক না। পরে রাজা পংক্তির স্থায় সকল লোককে দণ্ডায়মান করাইয়া ঐ স্ত্রীলোককে কহিলেন তোমার পনস যে চুরি করিয়াছে তাহার মস্তকে পনসের অঙ্কুর হইয়াছে এই কহিবামাত্র চোর মস্তকে হস্ত প্রদান করিল। রাজা ইহা দেখিয়া চোর নিশ্চয় করিলেন। পরে ঐ চোর হইতে শাস্তিপূর্ব্বক ফল লইয়া ঐ স্ত্রীলোককে তুষ্ট করিয়া গৃহে প্রস্থান করাইলেন। অতএব পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন বুদ্ধি যাহার বল তাহার।

1930

1. Give some additional point or impressiveness to the following sentences by a change of order :—

(*a*) কালো পাড় টানিয়া দিল সোনার অঞ্চলে সন্ধ্যা-বধূর অবিচ্ছিন্ন মসীলেখার তীরের বনরাজি। সূর্য্যাস্তদীপ্তির মধ্য দিয়া ওপারের তরুশূন্য বালুচরে গ্রামান্তরের মধ্যে সমস্ত দিন চরিয়া বন্য হংসের দল আকাশের ম্লানায়মান নিভৃত জলাশয়গুলিতে রাত্রিযাপনের জন্য চলিয়াছে।

(*b*) শুধু ফাঁকা আওয়াজ নাই আমাদের তথাকথিত যুব-আন্দোলনের মত চীনের যুব অভ্যুত্থানের মধ্যে। আমি দেখিতেছি যে নবজাগরণের ইতিহাস আলোচনা করিয়া চীনের। শুনিতেছি দেশে যুবশক্তি উদ্বোধন হইয়াছে চারিদিকেই আজ। আর দেরী নাই উন্নতির দেশের যুবকেরা জাগিয়াছে।

2. (*a*) Form sentences to illustrate the difference in meaning between the following antonyms :—

নির্জীব, জীব ; পরুষ, কোমল ; লঘু, গুরু।

(*b*) Correct the following :—

কুহেলিকা কাটিয়া গিয়াছে। বহুদুরবেপি মরুময় বালুভূমিকে জুৎস্নায় বিদবার স্বত্রবষণের মত আচ্চন্ন করীয়াচে।

3. (*a*) Explain and illustrate the difference between :—

চ্যুত, চূত ; উপাদান, উপাধান ; আহুতি, আহূতি।

(*b*) Express the following phrases in one word, and construct sentences with the newly-formed wards :—

ইতিহাস লেখে যে। ঈশ্বরে যাহার বিশ্বাস আছে। যে সত্য কথা বলে না। দেশকে যে ভালবাসে।

4. Re-write the following in standard elegant Bengali :—

রাতে আসন্ন পরীক্ষার বিভীষিকা উপেক্ষা ক'রে তাড়াতাড়ি গেলুম শুতে, ভাল ঘুম না হ'লে অসুখ-বিসুখ হ'য়ে যেতে পারে এই ভয় ছিল। ঘুম যে গভীর হ'য়েই এসেছিল সেটা অস্বীকার করবার জো নেই। কিন্তু অনেক রাত্তিরে হঠাৎ কি ক'রে ঘুম ভেঙ্গে গেল। সারা হোষ্টেলটা তখন নিথর নিস্তব্ধ, আলো সব নিবে গেছে, তন্দ্রালস রাতের একটা একটানা ঝিম ঝিম শব্দ শোনা যাচ্ছে।

1931

1. Re-write the following so accurately that there will be nothing to correct when this is reprinted exactly as it stands :—

সে এই কথায় অত্যন্ত দুখ হইয়া বলিল যে আপনি রাগ করিবেন,না , এ জীবনে আপনার ঋণ পরিশোধীয় নহে , দুরাদৃষ্ট বশত যদ্যপিও ঈশ্বর আমাকে আপনার কোনও উপকার করাইতে সক্ষম করে নাই, কিন্তু যখনই আমি আপনার কথা স্মরণ করি তখনই আমার মন কৃতজ্ঞতা সাগরে উড়িতে থাকে , আমি যখন শৈশবে মাতাকে হারা হইয়া রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতাম তখন আপনি সদয়বান হইয়া আমাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন , আমার পিতাদেব আমার জন্মাবার পূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন , আপনার স্নেহ না পাইলে আমি নিশ্চয়ই বিনাশ পাইতাম , এ কারন এখন আপনার স্বস্থ সম্বাদের জন্য ব্যাকুল থাকি ।

2. Substitute one word conveying the same sense for each of the following and use each in a sentence :—

মৃত্যু পর্য্যন্ত ব্যাপী ; যাহার শোভা নাই ; যাহা খুব দীর্ঘ নহে ; কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ; যাহা সহজে ভাঙ্গিয়া যায় ।

3. Combine the following sentences into one simple sentence ;—

(i) কার্থেজ নগরে এণ্ড্রোক্লিস নামে এক ক্রীতদাস ছিল। (ii) তাহার প্রভু তাহার প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিতেন। (iii) সে তাঁহার নিকট হইতে পলায়নে কৃতসঙ্কল্প হইল। (iv) সে গোপনে প্রভু-গৃহ পরিত্যাগ করিল। (v) নগর হইতে কয়েক মাইল দূরে এক অরণ্য ছিল, (vi) সে তথায় লুকায়িত রহিল।

Or

(*a*) How many kinds of Samasas are there ? Give examples of each.

(*b*) Is 'সম্বন্ধ' a কারক ? State reasons for your answer.

1932

1. Use the adjectives derived from any three of the following words in three short sentences :—

পর্ব্বত, বিষয়, নিশা, বায়ু, সূর্য্য ।

Or

Frame sentences to distinguish between :—

শীত and সিত ; নীড় and নীর ; দ্বিপ and দ্বীপ ।

2. Rewrite the following avoiding all errors :—

সেদিন বৃহস্পতিবার, মধ্যাহ্ন-তপনের অসহ্যনীয় কিরনে পথচলা দুর্ব্বহ হইয়াছিল। তথাপ্পিও অগ্রসর হইতেছিলাম, কারণ, শুনিয়াছিলাম, সত্তরই নদীকুলে উপনীত হইতে পারিব। অকস্মাৎ প্রবল সমিরন প্রবাহ আরম্ভ হইল অথচ ধুলিজালে আমাদের পরিচ্ছেদ প্লাবিত হইয়া গেল, উষর মরুভূমির প্রান্তে অনতিদুরে জলস্রোত মরিচিকামত প্রতিভাত হইল।

3. Substitute a single word for each portion underlined in any four of the following sentences :—

(a) আমার এ আনন্দ বাক্যে প্রকাশ করা যায় না।
(b) অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছা না থাকিলে জ্ঞানার্জ্জন অসম্ভব।
(c) নেপোলিয়নের অপরিমিত জয়ের অভিলাষ য়ুরোপে আতঙ্ক সঞ্চার করিয়াছিল।
(d) মানুষের মৃত্যু ঘটিবেই ঘটিবে।
(e) যাহা যুক্তিসঙ্গত নয়, এমন কথা বলা অসঙ্গত।
(f) উপত্যকাভূমি কোথাও নত কোথাও উন্নত।

1933

1. Frame three short sentences with the antonyms (বিপরীতার্থ-শব্দ) of any three of the following words.

তিরোভাব, সরস, খরচ, বেঁটে, নিন্দা, দান, কৃশকায়।

2. Fill up the ellipses in the following :—

বিশাল সমুদ্রের তীরে স্তব্ধ——দাঁড়াইয়া রহিলাম। তরঙ্গের——ও বাতাসের——দূরাগত কোকিলের——এবং ময়ূরের——সহিত——এক——ঐকতানের——করিতেছিল। সুদূর——সূর্য্য——যাইতেছে তাহার——কিরণে সাগরবক্ষ——হইয়া উঠিয়াছে।

3. Use any three of the following words in three short sentences :—

সর্ব্ববাদিসম্মত, অভূতপূর্ব্ব, যুগপৎ, নিরবচ্ছিন্ন, বরং, অথচ, সুতরাং।

4. Derive adjectives from any four of the following :—

বিধি, হেম, ক্ষণ, ফেণ, হেমন্ত, সূর্য্য, স্ত্রী, যশঃ, বস্তু।

1934

1. (a) Give the feminine forms, if any, of any five of the following ;—

অশ্ব, কর্ত্তা, সম্রাট্, সাধু, বাদশাহ, গোশালা, ঘোড়া, ছোট।

(*b*) Derives adjectives from any five of the following :—

লোম, অনুবাদ, চন্দ্র, সমুদ্র, ধাতু, স্বর্ণ, কাঠ, লতা।

2. Clearly distinguish between বহুব্রীহি and কর্ম্মধারয় Samasas.

Or

Frame sentences to illustrate different kinds of অব্যয়।

3. Correct or justify any five of the following sentences :—

(*a*) তাহারা ছুড়ি নিয়া মারামারি করিতে লাগিল।
(*b*) প্রজ্জ্বলিত আগুনে প্রবেশ করিতে পারেন কোন্ ব্যক্তি ?
(*c*) সমস্ত বিদ্যানগণের মতে বিপদে ধৈর্য্যতা দৈন্যতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।
(*d*) অভাববশত চোরি করাও অতীব দোষনীয়।
(*e*) এই উর্ব্বরা জমিতে অনেকের সত্ত্ব স্বামীত্ব ছিল।
(*f*) এই বঙ্গদেশ সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা।
(*g*) যে দারিদ্রতায় জন্য অন্যেরে ঘৃণা করে, সে পশ্বাধম।
(*h*) পৈতৃক ধনের গর্ব করা অত্যন্ত লজ্জাস্কর।

4. Frame five sentences using any five of the following words :—

শ্রেয়ঃ, পারদর্শী, বিশ্বজনীন, অন্যতম, ন্যূন, মাহাত্ম্য, টইটুম্বুর, ফাল্‌তো, র'সো।

1935

1. Compose sentences to illustrate the use of the feminine forms of any six of the following :—

বাঘ, নাপিত, দাদা, আচার্য্য, গুরু, ডাক্তার, মহারাজ, বিদ্বান্, যুবা, রজক, পাচক।

2. Give one word for any eight of the following :—

(*a*) যাহা ভাঙ্গিয়া যায়, (*b*) যাহার অন্য উপায় নাই ; (*c*) যাহার পত্নী মারা গিয়াছে ; (*d*) যাহার মেজাজ খারাপ ; (*e*) যাহার চুল পাকিয়াছে ; (*f*) যে বিবেচনা করিয়া কাজ করে না ; (*g*) যাহার বন্ধুবান্ধব নাই ; (*h*) যাহা সহজে পাওয়া যায় না ; (*i*) যাহা পুর্ব্বে হয় নাই ; (*j*) যাহা জয় করা হইয়াছে ; (*k*) কাতর না হইয়া ; (*l*) যাহার রস আছে।

3. Rewrite correcting all errors :—

(*a*) সুনিতি বন্দোপাধায়ের সাস্থ ভাল নয় বলিয়া তিনি রাত্রিকালে পড়িতে পারিতেন না।
(*b*) তাহার দুরাবস্থার কথা শুনিলে তুমি অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারিবে না।
(*c*) ভগবানের মাহাত্ত্য কির্ত্তন করিলে মন বিশুদ্ধ হয় ও পুণ্যলাভ হয়।
(*d*) যাহারা শারিরীক পরিশ্রমে কাতর তাহারা জিবিকা উপার্জ্জন করিতে সক্ষম নহে।

(e) সীতাকে নিরপরাধিনী জানিয়াও শ্রীরামচন্দ্র তাহাকে বাল্মিকি মুনির তপবনে বনবাসিনী করিয়াছিলেন।

1936

1. Give the feminine of any six of the following :—

শূদ্র, মাতঙ্গ, হাঁস, মৎস্য, বাদশাহ্, ঘোড়া, কাণা, গোলাম, ষাঁড়, শুক।

2. Give one idiomatic word for any eight of the following ;—

(*a*) যাহা কথনও নষ্ট হয় না ; (*b*) পদ্মের গন্ধ যাহাতে ; (*c*) রাবণের পুত্র ; (*d*) যে রাতে দেখে না ; (*e*) যাহার স্ত্রী মারা গিয়াছে ; (*f*) যাহা জলে ও স্থলে চরে ; (*g*) যাহার তাল বোধ নাই ; (*h*) যাহাতে কোন ভেজাল নাই ; (*i*) পৃথিবী-সম্বন্ধীয় ; (*j*) কম বয়স যাহার ; (*k*) যে নিজেকে বড় মনে করে ; (*l*) পিতার পিতামহ।

3. Write correctly :—

(*a*) তুমি এত বেবুজ হইলে স্ববুদ্ধিমান হইয়াও ? (*b*) নিরাকাঙ্খ লোক কদাপিও উন্নতি করিতে পারে না। (*c*) নিরাশা মনের সুখ ও সচ্ছন্দ দুরিভূত করে। (*d*) তরাতরির কাজে ও ধৈর্য্যতার কাজে অনেক তফাৎ। (*e*) রুহিনীকুমার বন্দোপাধ্যায় অত্যন্ত সম্মানের পাত্র।

1937

1. Frame sentences to illustrate the difference in meaning between the words in any two of the following pairs of words :—

নীড়, নীর। লক্ষ, লক্ষ্য। পানি, পাণি। দার, দ্বার। অংশ, অংস।

Or

Use the adjective forms of any four of the following words in in four sentences :—

শরীর, সূর্য্য, পৃথিবী, মেয়ে, নবাব, মাঠ, রেশম।

2. Rewrite the following, correcting errors :—

গভীর অরণ্যের মধ্যে অন্ধকার নিশীতে পথ হারিয়ে আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে বিপদের আসঙ্কা করিতেছিলাম। হঠাৎ দুইটা উজ্জল আলো অদূরে দেখা গেল.—দেখেই বুঝিলাম, কোনও জানোয়ারের চোখ। ভয়ে প্রাণপণে ছুটিতে লাগিলাম, কিন্তু দ্রুতবেগে চলা অসম্ভব হইল। আমাদের সে শোচনীয় দুরাবস্থার কথা জিবনে ভুলিতে পারিব না।

3. Give the antonyms (বিপরীতার্থক শব্দ) of any four of the following words :—

স্থাবর, কুটিল, অনুগ্রহ, তরল, মিলন, লোভী, বিনীত, প্রত্যক্ষ।

1938

1. Select any four of the following and substitute a single word for each of them :—

(i) যাহার অভিমান নাই। (ii) যাহা পূর্ব্বে ছিল না। (iii) সমুদ্র হইতে হিমাচল পর্য্যন্ত। (iv) যিনি ব্যাকরণ ভাল জানেন। (v) যাহার অন্য উপায় নাই। (vi) যাহা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না।

2. Frame three sentences with nouns from any three of the following adjectives :—

নীল, স্নিগ্ধ, প্রিয়, চালাক, বাবু, দুরন্ত।

3. Fill up the ellipses in the following passages :—

মানুষ ভগবানের——যে সকল গুণ লাভ করিয়া——হইয়াছে,——প্রকৃত——উপর মানব-জীবনের——নির্ভর——। প্রতিভা ভগবানের দান, কিন্তু তাহার——সম্পূর্ণরূপে——সাধনা—। সাধনার——বহু প্রতিভা——বিনষ্ট——যায়।

Or

Rewrite the following in short sentences, avoiding compounds as far as possible :—

একদা মধুমাসের সমাগমে কলবন বিকশিত হইলে, চূতকলিকা অঙ্কুরিত হইলে, মলয় মারুতের মন্দ মন্দ হিল্লোলে আহ্লাদিত হইয়া কোকিল সহকারশাখায় উপবেশনপূর্ব্বক সুস্বরে কুহুরব করিলে অশোক কিংশুক প্রস্ফুটিত, বকুল-মুকুল উদ্গত এবং ভ্রমরের ঝঙ্কারে চতুর্দ্দিক প্রতিশব্দিত হইলে, আমি মাতার সহিত এই অচ্ছোদ সরোবরে স্নান করিতে আসিয়াছিলাম।

4. Use any two of the following words in two sentences :—

বরং, নতুবা, তথাপি, কথঞ্চিৎ, পুরঃসর।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

নব-প্রবেশিকা

রচনা ও অনুবাদ

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রবন্ধ-রচনা

কোনও বিষয় সম্বন্ধে আমরা যাহা চিন্তা করি, সেইগুলি সুশৃঙ্খল ভাবে সাজাইয়া লিখিয়া গেলেই প্রবন্ধ রচনার প্রাথমিক কাজটি করা হইল। উপদেশ দিয়া প্রবন্ধ রচনা শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে—ইহা আমরা মনে করি না। কি করিয়া গল্প লিখিতে হয়, কি করিয়া কবিতা লিখিতে হয়, তাহা যেমন উপদেশ দিয়া বুঝান যায় না,—কি করিয়া প্রবন্ধ রচনা করিতে হয়, সে সম্বন্ধে শুষ্ক উপদেশ বিতরণ করিলেও সেইরূপ ফল কিছুই হয় না।

রচনার প্রধান উপকরণ দুইটি—বিষয়-বস্তু ও ভাষা। পরীক্ষার্থী ছাত্রগণের নিকট হইতে রচনার মৌলিকতা কেহই আশা করে না, নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সকল বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করাও সম্ভব হয় না। বিষয়-বস্তুর দিক্ হইতে আমরা দেখিতে পাই—অধিকাংশ ছাত্রের রচনাতেই ভাবের দৈন্য বড় বেশী ধরা পড়ে। কি ভাবে লিখিতে হইবে তাহা ত দূরের কথা, কি লিখিতে হইবে সে সম্বন্ধেও অধিকাংশ ছাত্রের বিশেষ কোনও ধারণাই নাই। প্রবন্ধ লিখিতে বসিলেই হাত ও মাথা একেবারে আড়ষ্ট হইয়া পড়ে। অনেক চিন্তা-ভাবনা-গবেষণার পর, অনেক কাটাকুটি করিয়া কেহ হয় তো লিখিলেন, অতি সামান্যভাবে অতি তুচ্ছ দুই একটি কথা। অপ্রাসঙ্গিক বা অবান্তর কথা কিছু লিখিয়া, একই ভাবের দুই তিনবার পুনরাবৃত্তি করিয়া হঠাৎ একস্থানে এক রকম জোর করিয়া রচনার শেষ করিলেন।

রচনা লিখিতে বসিয়া কি লিখিতে হইবে ও কি কি আলোচনা করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে ছাত্রগণের স্পষ্ট ধারণা হয় না কেন? ইহার মূল কারণ অবশ্য চিন্তাশক্তির দীনতা। বর্ত্তমান সময়ে সাধারণ ছাত্রগণের মুখস্থ করিবার শক্তি যে পরিমাণে বাড়িতেছে, সেই অনুপাতে নিজের চিন্তা করিবার ক্ষমতা লোপ পাইতেছে। স্বাধীনভাবে নিজের মনের কথা প্রকাশ করিতে যেন ভয় হয়। মনে হয়, যে কথা বলিতে চাহিতেছি, তাহা তো কোন রচনার পুস্তকে কেহ এ পর্য্যন্ত লেখেন নাই। সুতরাং যাহা কোন পুস্তকে লেখা নাই বা যাহার কোন নজীর নাই, সেইরূপ কথা বুঝি লেখা যায় না।

চিন্তাশক্তির এ দৈন্য দূর হইবে কিসে? রচনা লিখিতে গিয়া আমরা কি লিখিব? কোন্ কোন্ স্থান হইতে আমাদিগকে উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে?

বিশেষ একটি পরিবারে, কোন গ্রামে বা শহরে একটি বিশেষ আবহাওয়ার মধ্যে আমাদের জীবন কাটিতেছে। পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের স্নেহ-ভালবাসা আমরা পাইয়াছি। অনেক সাধু-সজ্জন আমরা দেখিয়াছি, আবার স্বার্থপর কুটিল লোকও আমাদের অজ্ঞাত নাই। আমাদের সমাজের বা দেশের বিশেষ বিশেষ উৎসব ও ঘটনা আমরা জানি। দেশের লোকের আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি সুখ-দুঃখ কতকটা স্বচক্ষেই দেখি। কতকটা গল্পে আলোচনায় বা বই পড়িয়া জানিতে পারি। আমাদের পরিচিত জগতের বাহিরে যে বৃহত্তর জগৎ রহিয়াছে তাহার প্রাকৃতিক শোভা-সৌন্দর্য্য, তাহার জীবকুলের বিচিত্র জীবনযাত্রা খানিকটা চাক্ষুষ দেখি, খানিকটা বই পড়িয়া জানি, খানিকটা ছবি, সিনেমা প্রভৃতির দ্বারা পরোক্ষভাবে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। স্বদেশের বা স্বদেশের বাহিরের ক্ষণজন্মা মহাপুরুষগণের জীবনকথাও আমাদের অজ্ঞাত নহে। এই যে এতকাল ধরিয়া আমরা যাহা কিছু দেখিয়াছি, শুনিয়াছি, পড়িয়াছি ও ভাবিয়াছি তাহা আমাদের মনে অভিজ্ঞতার আকারে স্তরে স্তরে সজ্জিত

হইয়া রহিয়াছে। এই অভিজ্ঞতা হইতে প্রবন্ধ রচনার যথেষ্ট উপকরণ সংগ্রহ করা যায়।

অধ্যয়ন, চিন্তা ও পর্য্যবেক্ষণের ফলে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয় তাহা যেমন বিভিন্ন লোকের পক্ষে বিভিন্ন প্রকারের, সেইরূপ নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন লেখক যে রচনা লিখিবেন তাহাও বিভিন্ন প্রকারের হইবে। শ্রেষ্ঠ রচনার নিদর্শন নিজস্ব ভঙ্গী (personal touch)—কেবল ভাষাগত বৈশিষ্ট্য নয়, ভাবগত বা উপকরণ-বিন্যাসের বৈশিষ্ট্য। এই নিজস্ব 'ছাপ'টি না থাকিলেই রচনা গতানুগতিক ও শ্রীহীন হইয়া পড়ে, আলোচনা পূর্ণাঙ্গ হইলেও তাহা কাহারও হৃদয় স্পর্শ করে না। সুতরাং শিক্ষার্থিগণের উচিত—নিজস্ব অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা হইতেই রচনার উপকরণ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করা।

সকলের সকল বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকে না, আবার অনেক সময়েই আমাদের পূর্ব্বসঞ্চিত অভিজ্ঞতা কালক্রমে মলিন ও অস্পষ্ট হইয়া পড়ে। এইখানে প্রয়োজন হয় কল্পনাশক্তির। কল্পনার অর্থ অসীম আকাশে একেবারে উধাও হইয়া উড়িয়া যাওয়া নয়—আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া যাহা চক্ষুর অন্তরালে আছে তাহা দৃষ্টির বিষয়ীভূত করিয়া তোলা। একটা গল্পের খানিকটা পড়িয়া উহার শেষটা আমরা অনুমান করিয়া লইতে পারি যে কল্পনাবলে, একটা চিত্র বা ছবি অস্পষ্ট বা ঝাপ্‌সা দেখা গেলে ছবিখানির পূর্ণ রূপটি মনে করিতে পারি যে কল্পনাবলে, প্রবন্ধ রচনা করিবার সময় অনেক ক্ষেত্রেই সেই কল্পনার সাহায্য লইতে হয়। কল্পনাশক্তি না থাকিলে কেহ সুলেখক হইতে পারে না।

যে কোন বিষয়েই হউক প্রবন্ধ রচনা করিতে যাইয়া ভয় পাইবার কোন কারণ নাই। প্রবন্ধের বিষয়টি লইয়া কিছুক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলেই মোটামুটি কতকগুলি ভাব মনে আসিয়া থাকে। তখন কি ভাবে প্রবন্ধ আরম্ভ করিতে হইবে ও কি ভাবে শেষ করিতে হইবে, তাহাও ঐ সঙ্গে স্থির করিয়া লওয়া প্রয়োজন। পর পর যে ভাবগুলি মনে আসে সেগুলি একস্থানে লিখিয়া

যে কথার পর যে কথা বসিলে ভাল হয়, সেইভাবে সাজাইতে হইবে। তারপর লিখিতে বসিলেই যে সমস্ত কথা লেখা হয় নাই বা পূর্ব্বে চিন্তা করা হয় নাই, এইরূপ অনেক কথা মনে পড়িবে। নূতন কথাগুলি বাদ দিবার কোন প্রয়োজন নাই, এগুলিকেও যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিতে হইবে।

জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবনের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়; অধ্যয়ন, চিন্তা ও পর্য্যবেক্ষণের ফলে মনে নানা ভাব সঞ্চিত হইতে থাকে। লিখিবার সময় একটু স্থির হইয়া চিন্তা করিলেই চলনসই প্রবন্ধের উপযুক্ত ভাবের অভাব হয় না।

প্রবন্ধের সৌষ্ঠব সম্পাদনের জন্য ভাষার মাধুর্য্য অতি প্রয়োজনীয়। কথাগুলি কেবল মামুলী ধরণে বলিয়া গেলে পাঠকের নিকট হৃদয়গ্রাহী হয় না, গতানুগতিকভাবে লেখা প্রবন্ধ মানুষের বিরক্তিকরই হইয়া থাকে। সুতরাং ভাষা হৃদয়গ্রাহী ও শ্রুতিমধুর করিতে সকলেরই যত্নবান্ হওয়া উচিত।

কি উপায়ে ভাষার সৌন্দর্য্য-বিধান করা যায়—এ সম্বন্ধে কোন উপদেশ বা সহজ সঙ্কেত দেওয়া চলে না। অনেক সময় ছাত্রেরা শিক্ষকগণকে জিজ্ঞাসা করেন,—'কি রকম styleএ লিখ্‌বো Sir, বঙ্কিমবাবুর না রবিবাবুর?' এইরূপ কথা শুনিতে শুনিতে আমরা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি বলিয়া এই ধরণের কথা শুনিয়া এখন আর আশ্চর্য্য হই না। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ এই উভয়ের রীতিই যেন সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা হইয়াছে—এখন যে কোন একটা রীতিতে লিখিলেই হয়! বঙ্কিমচন্দ্রের রীতি তাঁহারই নিজস্ব, রবীন্দ্রনাথের রীতিও তাঁহার নিজস্ব, ইচ্ছা করিবামাত্রই ইহার যে কোন একটা রীতিতে লেখা চলে না। শিক্ষার্থীদিগের প্রতি অনুরোধ তাঁহারা যেন প্রত্যেকেই নিজস্ব রীতিতে প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রত্যেকেরই কথা বলিবার যেমন একটা বিশেষ ভঙ্গী আছে, তেমনি লিখিবারও একটা বিশেষ রীতি আছে। চিন্তার সঙ্গে ভাষার রীতির একটা সম্বন্ধ আছে, চিন্তা ও ভাষায় সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিলেই রচনা সুন্দর হয়।

কোন বিষয়ে চিন্তা করিতে বসিলেই আমরা বুঝিতে পারি, কতকগুলি

বিষয় আমাদের অনুভূতিকে অত্যন্ত গভীরভাবে স্পর্শ করে। এই সমস্ত গভীর উপলব্ধির বিষয় ভাষায় প্রকাশ করিতে গেলে ভাষা হাল্‌কা করিলে চলে না। ভাবের গাম্ভীর্য্য থাকিলে ভাষাও গম্ভীর হওয়া প্রয়োজন। আবার নিতান্ত পরিচিত সাধারণ ভাব প্রকাশের জন্য আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য সাধারণ ভাষাই উপযোগী। ভাব লঘু হইলে ভাষাও হাল্‌কা হইবে।

প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়া আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করা দরকার। সাধারণতঃ পরীক্ষার্থীদিগকে তিন-চারিটি বিষয় হইতে একটি বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া প্রবন্ধ লিখিতে হয়। যে কোন একটি বিষয়ের আলোচনা লঘুভাবেও করা যায়, আবার গম্ভীরভাবেও করা যায়। যখন প্রবন্ধ লিখিতেছি, তখন আমার মনের গতি বা ভাব কিরূপ তাহা লক্ষ্য করা বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের মন অনেক সময় চঞ্চল ও নানাবিষয়ে বিক্ষিপ্ত থাকে। আবার প্রবন্ধের বিষয়টি লইয়া চিন্তা করিতে বসিলে মনঃসংযোগের ফলে নানা কথা মনে আসে, সমস্ত মন-প্রাণ যেন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতে থাকে, ভাবের পর ভাব, কথার পর কথা যেন অনায়াসে উৎসারিত হইতে থাকে। মনের এই অবস্থায় গম্ভীর ভাষায় অনেক কথা বলা যায়। কিন্তু মনের চঞ্চল অবস্থায় সহস্র চেষ্টাতেও চিত্ত স্থির হয় না, কোন বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করিবার ক্ষমতাই যেন তখন আর থাকে না। মনের এই অবস্থায় যদি প্রকাণ্ড ভূমিকা ফাঁদিয়া গম্ভীরভাবে রচন আরম্ভ করা যায়, তবে শেষ পর্য্যন্ত রচনায় ভাষা ও ভাবের গাম্ভীর্য্য ও সামঞ্জস্য রক্ষা করা সম্ভবপর হয় না। সুতরাং এই সময়ে হাল্‌কা ভাবে রচনা আরম্ভ করাই ভাল।

প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকগুলিতে প্রবন্ধের বিষয়গুলিকে বর্ণনামূলক, বিবৃতিমূলক ও চিন্তামূলক এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। এই রকম শ্রেণীবিভাগ অনেক সময়ই শিক্ষার্থিগণের সহায়ক না হইয়া প্রবন্ধরচনার পক্ষে বিঘ্নস্বরূপই হইয়া দাঁড়ায়। সমস্ত প্রবন্ধই মূলতঃ চিন্তামূলক, আবার সমস্ত প্রবন্ধেই বর্ণনা এবং বিবৃতিরও একটা অবসর আছে। 'হজরত মহম্মদের জীবন', 'তাজমহল', বা 'ব্রতচারী আন্দোলন'—এই বিষয়গুলির যে কোন একটির সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে

হইলে কেবল বিবরণ দিলেই চলিবে, চিন্তার কোন প্রয়োজন নাই—এমন কথা কেহই বলিবেন না। চিন্তা আছে বলিয়াই দশজনের লিখিত দশটি প্রবন্ধ দশ রকমের হয়।

এই পুস্তকে কতকগুলি রচনা দেওয়া হইল। প্রত্যেকটি রচনা পড়িবার পূর্ব্বে রচনার বিষয়টি লইয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিলে কতকগুলি ভাব মনে পড়িবে। সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাবগুলি কি ভাবে প্রকাশ করিতে হইবে, সে সম্বন্ধেও একটা নিজস্ব পদ্ধতি নিজের মনের কাছে ধরা পড়িবে। নিজের কাছে ভাব ও ভাষার দিক্ দিয়া প্রবন্ধের বিষয়টি যখন স্পষ্ট হইয়া উঠিবে, তখন প্রবন্ধটি পড়িতে হইবে। পড়িলে দেখা যাইবে হয়ত প্রবন্ধটিতে কতকগুলি নূতন ভাব আছে। কোন কোন প্রবন্ধে যদি নূতন কোন ভাব দেখিতে না পাওয়া যায়, তবুও পরিচিত ভাব প্রকাশের অন্ততঃ একটা নূতন পদ্ধতির সন্ধান মিলিবে। আমাদের বিশ্বাস, বিভিন্ন বিষয়ের এই শতাধিক প্রবন্ধ পড়িলে ও সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা করিলে প্রবন্ধরচনার কৌশল আয়ত্ত হইবে এবং যে কোনও বিষয়ে চলনসই একটা প্রবন্ধ লিখিবার ক্ষমতা জন্মিবে।

ঘড়ি

বিংশ শতাব্দীর ব্যস্ততাময় কর্ম্মক্ষেত্রে ঘড়ি না হইলে এক দণ্ড চলে না। বিশেষতঃ নাগরিক জীবনে ঘড়ি একটি অপরিহার্য্য প্রধান উপকরণে পরিণত হইয়াছে। যেখানে প্রত্যেক কার্য্য ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া নিরূপিত, নিয়ন্ত্রিত ও নির্দ্ধারিত হয়—এক মিনিট এদিক ওদিক হইলেই সমস্ত পণ্ড হয়, সেখানে ঘড়ি না হইলে অসুবিধার অন্ত থাকে না। এই অতিসতর্ক সময়ানুবর্ত্তিতার প্রভাবে এ যুগের নর-নারীও যেন কতকটা যন্ত্রে পরিণত হইয়াছে।

ভোর পাঁচটায় কলের বাঁশী বাজিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে শহরের নিস্তব্ধ ঘুমন্ত পুরী সহসা কল-কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠে, পথে পথে কলের বাবু, কলের কুলি-মজুর পিপীলিকার মত পিল্ পিল্ করিয়া সারি বাঁধিয়া ছুটিয়া

চলে। সাড়ে পাঁচটায় গেট বন্ধ—এক সেকেণ্ড লেট্ হইলেই সর্ব্বনাশ! এদিকে গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী, বাসায় বাসায় ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া ঠিকা ঝি আসিল, উনানে উনানে আগুন জ্বলিল, হাঁড়ি চড়িল। অফিস, স্কুলের ভাত,—গৃহিণী ঘন ঘন ঘড়ির দিকে চাহিতেছেন। ঘরে ঘরে ঘড়ির টিক্ টিক্। দেয়ালে দেয়ালে ক্লকের কাঁটা ঘুরিতেছে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় পেটা ঘড়ির শব্দ শহর কাঁপাইতেছে। ঘড়ি খুলিয়া শিক্ষক পড়াইতেছেন, ঘড়ি দেখিয়া পুরোহিত চলিয়াছেন যজমান বাড়ীর কাজ করিতে, খুঁটির পেরেকে ঘড়ি ঝুলাইয়া বিড়িওয়ালা বিড়ি বাঁধিতেছে। দেখিলে মনে হয়, এটা যেন ঘড়িরই রাজত্ব। এই সার্ব্বভৌম মহাসম্রাটের কাঁটা-কটাক্ষে দুনিয়া চলিতেছে।

প্রাচীনকালে যখন সাগর পার হইতে ঘড়ির আবির্ভাব হয় নাই, তখন এদেশের অধিবাসিগণ আকাশের দিকে চাহিয়া চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থিতি বুঝিয়া ও ছায় দেখিয়া আন্দাজে সময় নিরূপণ করিত। ক্রমে সূর্য্য-ঘড়ি, জল-ঘড়ি, বালুকা-ঘড়ির সৃষ্টি হইল। দণ্ড, পল, অনুপল, বিপলে সময়ের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইল। সূর্য্য-ঘড়িতে বিশেষভাবে সংযুক্ত লৌহ-ফলকের ছায়া দেখিয়া ঋতু অনুসারে বিচার করিয়া সময় ঠিক করা হইত। একটি গোলাকার কাচের পাত্রে সময়-জ্ঞাপক চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া উহা জলপূর্ণ করা হইত এবং নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে পাত্রটি জলশূন্য হয় এরূপভাবে উহার তলদেশে ছিদ্র রাখা হইত। পরে নির্গত জলের পরিমাণ অনুসারে সময় বুঝা যাইত। বালুকা-ঘড়িরও পদ্ধতি ঐরূপ ছিল।

আধুনিক ঘড়ি পাশ্চাত্ত্য দেশ হইতে আমদানী হইয়াছে। ইহার অভ্যন্তর নানা চক্র ও কল-কব্জায় পূর্ণ। উহার মধ্যে স্প্রীং নামক বস্তুটি ঘটিকাদেহের হৃৎপিণ্ড-স্বরূপ। অতি সূক্ষ্ম ইস্পাতের পাতে নির্ম্মিত এই কুণ্ডলীকৃত বস্তুটি অতিমাত্রায় স্থিতিস্থাপক। খুব সহজে ইহাতে গতিসঞ্চার করা যায় এবং সেই গতিবেগও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। সেই গতিবেগ ঘড়ির অভ্যন্তরস্থিত সমুদয় চক্র ও কল-কব্জাকে ক্রিয়াশীল করিয়া রাখে। আধুনিক ঘড়ি ঠিক কবে নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা বলা কঠিন। দ্বাদশ শতাব্দী হইতে ইউরোপের বড়

বড় গীর্জ্জায় একরকম কাঁটাশূন্য ঘড়ির ব্যবহার দেখা যায়, উপাসনার সময় হইলেই সেগুলি ঢং ঢং করিয়া বাজিত। বোধ হয় প্রথম হাল্‌কা ঘড়ি তৈয়ার হইয়াছিল জার্ম্মানীতে ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে। বর্ত্তমান সময়ে আমেরিকা, ইংলণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, জাপানে সমস্ত প্রকার ঘড়িই প্রস্তুত হইতেছে।

বর্ত্তমানে যে কত বিভিন্ন আকার ও বিভিন্ন প্রকারের ঘড়ি আছে তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না। অঙ্গুরীতে ধারণোপযোগী অতিক্ষুদ্র ঘড়ি হইতে আরম্ভ করিয়া শতাধিক ফুট উচ্চ ও বিরাট ব্যাসযুক্ত ঘড়িও আছে। আবার নাম-মাত্র মূল্যের ঘড়ি হইতে লক্ষাধিক মুদ্রার ঘড়িও বিক্রীত হইয়া থাকে।

অশ্ব

স্মরণাতীত কাল হইতে অশ্বজাতি বিশ্ববাসীর নিকট সুপরিচিত। এমন সুদর্শন, শক্তিশালী ও অশেষগুণ-সম্পন্ন পশু জগতে অদ্বিতীয়। দীর্ঘ সমুন্নত সু-বঙ্কিম গ্রীবাভঙ্গী, কেশর-বিলম্বিত স্কন্ধদেশ, চিক্কণ রোমাঞ্চিত গাত্র, সুগঠিত পদচতুষ্টয়, সদাচকিত চক্ষু-কর্ণ, স্ফীত লোমশ পুচ্ছ অশ্বের মূর্ত্তিকে চিরমহিমময় করিয়া রাখিয়াছে।

গৃহপালিত গবাদি পশুর ন্যায় অশ্ব কেবল মনুষ্যের কর্ম্ম-জীবনের সহায় নহে, গাড়ী টানিয়া, ভার বহিয়া, ভূমিকর্ষণ করিয়া একদিকে অশ্ব যেমন মানুষের ক্ষুধার অন্ন যোগায়, উপার্জ্জনের পথ প্রশস্ত করে, অন্যদিকে হিংস্র বন্যপশু সংহারে প্রধান অবলম্বন রূপে, যুদ্ধক্ষেত্রে নির্ভীক সহচর ও সহায় রূপে, অশ্ব মনুষ্যসমাজকে বীরত্ব-গৌরবে বিমণ্ডিত করিয়াছে—সভ্যতার পথে, মনুষ্যত্বের পথে মানুষকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে।

অশ্ব মানবের দৈহিক ও মানসিক শক্তির বিকাশে তুল্যরূপে সাহায্য করিয়াছে। অশ্বের সমুন্নত পৃষ্ঠে যেমন মানবের সুখাসন স্থাপিত, সেইরূপ এই উদ্দাম পশুশক্তির উপর আদি মানব-সভ্যতার স্বর্ণ-সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। যেদিন মানুষ স্বীয় বুদ্ধিকৌশলে এই বন্যপশুকে বশীভূত করিতে সমর্থ

হইয়াছে, সেইদিন হইতে মানব-সভ্যতার জয়যাত্রার সূত্রপাত। অশ্ব মানবের পরম বন্ধু। ইহার প্রভুভক্তির খ্যাতি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। হল্‌দিঘাটার ভীষণ যুদ্ধে মহাবীর রাণাপ্রতাপের অতুলনীয় বীরত্ব-গৌরবের সহিত প্রভুভক্ত চৈতকের কৃতিত্ব ও জীবনবিসর্জ্জন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরদিন সমভাবে সমুজ্জ্বল থাকিবে। শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দী আরবসৈনিককে শত্রুর শিবির হইতে অদ্ভুত উপায়ে উদ্ধারের অপূর্ব্ব কাহিনী অশ্বের প্রভুভক্তির উজ্জ্বল সাক্ষ্য। রণক্ষেত্রে অশ্বের অসীম সাহস, অবিচলিত ধৈর্য্য, অদ্ভুত রণনৈপুণ্যের বিষয় চিন্তা করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। প্রচণ্ড রণ-তাণ্ডবের মধ্যেও অশ্ব যেরূপ শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া শত্রু-সৈন্যের সম্মুখীন হয়, অপূর্ব্ব তৎপরতার সহিত আক্রমণ করে, আশ্চর্য্য কৌশলে প্রভুর জীবন রক্ষা করে, উহা দেখিলে মনে হয়, যুদ্ধ বিদ্যায় অশ্বজাতি মানবের শিক্ষক স্থানীয়। এই বৈজ্ঞানিক যুগেও যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্বের আবশ্যকতা একেবারে লোপ পায় নাই।

পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদেও অশ্বের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে অশ্ব মনুষ্যসমাজের অন্যতম সম্পদরূপে পরিগণিত হইত। প্রাগৈতিহাসিক যুগের চিত্রেও দেখিতে পাওয়া যায় অশ্ব মানুষের সহচর। মিশর, ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশের ইতিহাসে অশ্বের ব্যবহার সুপ্রচলিত দেখা যায়। অশ্ববাহিত রথে আরোহণ করিয়া প্রাচীনযুগে সকল দেশের বীরগণই যুদ্ধ করিতেন।

রেলপথ, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পূর্ব্বে দ্রুতবার্ত্তা বহনে অশ্বই মানুষের একমাত্র অবলম্বন ছিল। ঘোড়ার ডাকের সাহায্যে তৎকালে পোষ্টাফিসের কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। বর্ত্তমানে ঘোড়দৌড়, সার্কাস, পোলো খেলা প্রভৃতি ক্রীড়া-কৌতুকে অশ্ব অদ্ভুত কলা-কৌশল দেখাইয়া মানবের চিত্তরঞ্জন করিতেছে। ঘোড়দৌড় বা সার্কাসের একটি সুশিক্ষিত ঘোড়ার মূল্য দুই লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত হয়। সমস্ত সভ্যদেশেই ভাল জাতের ঘোড়ার সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় করা হয়।

পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র অশ্ব দেখিতে পাওয়া যায়। পার্ব্বত্য বনভূমিই অশ্বের প্রিয় বাসস্থান। আফ্রিকার প্রান্তরে, স্পেন, স্কটল্যাণ্ড ও রাশিয়ার তৃণভূমিতে, বহু অশ্বের বাস। আরব দেশের অশ্ব সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও দ্রুতগামী। ভারতবর্ষে সিন্ধু ও ব্রহ্মদেশে উৎকৃষ্ট অশ্ব পাওয়া যায়। অষ্ট্রেলিয়ার অশ্ব আকারে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং স্কটল্যাণ্ডের অশ্ব সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র।

অশ্ব স্তন্যপায়ী ও তৃণভোজী। ইহার পরমায়ু সাধারণতঃ চল্লিশ বৎসর। আট বৎসর বয়সে অশ্ব পূর্ণযৌবন লাভ করে। অশ্বের বর্ণ শ্বেত, কৃষ্ণ, লোহিত, পিঙ্গল নানা প্রকার হইয়া থাকে। অশ্বিনী একাদশ মাস গর্ভ ধারণ করিয়া সন্তান প্রসব করে। অশ্বের খুর অখণ্ড। অশ্বের ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত তীব্র। ইহারা শান্তস্বভাব, বুদ্ধিমান্, কষ্টসহিষ্ণু ও নির্ভীক। অশ্বের নিদ্রা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। ইহারা কদাচিৎ মৃত্তিকায় শয়ন করিয়া নিদ্রা যায়।

কাগজ

কাগজ অভাবে কিরূপে এক মুহূর্ত্তও চলিতে পারে, বর্ত্তমান বিরাট কর্ম্ম-জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া উহা কেহ এখন কল্পনা করিতেও পারে না। অথচ আজকালকার এই একান্ত অপরিহার্য্য বস্তুটির অভাবেও আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ পরম নিশ্চিন্তে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছেন, সম্রাটের সাম্রাজ্য চলিয়াছে, মহাবীরগণ দিগ্বিজয় করিয়া বেড়াইয়াছেন।

জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই মানব-শিশু আপনার অন্তরের ইচ্ছা অপরের নিকট প্রকাশ করিয়া বলিতে ব্যাকুল হইয়া উঠে। মানব-সভ্যতার উষালোকে যেদিন মানবের প্রথম জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল, সেই দিন হইতে তাহার সত্যানুভূতি, তাহার সমস্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দূরের লোককে জানাইবার জন্য, ভবিষ্যৎ বংশধরগণের উদ্দেশ্যে সঞ্চিত করিয়া রাখিবার জন্য তাহার আকুলি-বিকুলির অন্ত ছিল না। অক্ষর আবিষ্কারের পূর্ব্বে মানুষ

চিত্রলিপি সাহায্যে মনের ভাব ব্যক্ত করিতে শিখিল, তখন হইতে সে প্রস্তর-ফলক বা ধাতুখণ্ডের উপর ঐগুলি খোদিত করিয়া রাখিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগের ঐরূপ বহু চিত্রাঙ্কিত প্রস্তরফলক বর্ত্তমানে নানা দেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ উহার অন্তর্গত অর্থও আবিষ্কার করিতেছেন।

চিত্রলিপি হইতে ক্রমশঃ বর্ণমালার সৃষ্টি হইল। তখন লিখিবার উপকরণ ও লিখনপত্র আবিষ্কারের চেষ্টা চলিতে লাগিল। ভারতবর্ষে প্রথমে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি পুরুষপরম্পরায় কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিবার চেষ্টা হয়। ব্যাবিলনের অধিবাসী মাটির টালির উপর অক্ষরগুলি খোদিত করিয়া উহা পুড়াইয়া লইত। এইরূপে লক্ষ লক্ষ ইটের স্তূপে গ্রন্থাগার পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত। উহার পরে ভারতবর্ষে ভূর্জ্জপত্রে ও তালপত্রে হস্তলিখিত পুঁথি রচিত হইল। ক্রমে মিশরীয়েরা শরগাছের শাঁস দিয়া এক প্রকার কাগজ-জাতীয় বস্তু প্রস্তুত করিতে শিখিল। ইউরোপের সর্ব্বত্র শরগাছ জন্মে না। তাহারা মেষের চর্ম্মের উপর গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিত। খৃষ্টানেরা তাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেল মেষের চর্ম্মে লিখিয়া দেশ-বিদেশে প্রচার করিত।

সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষে ও চীনে কাগজের জন্ম হয়। তূলা দিয়া এই কাগজ প্রস্তুত হইত বলিয়া উহাকে তূলোট কাগজ বলা হইত। এদেশের লোক অতি সহজে ঐ কাগজ হাতে প্রস্তুত করিত এবং বহুকাল ধরিয়া এদেশে তূলোট কাগজে হস্তলিখিত পুঁথির প্রচলন ছিল। এখনও তালপাতায় ও তূলোট কাগজে লিখিত চণ্ডী, গীতা প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। যতদিন মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কৃত হয় নাই ততদিন হস্তলিখিত গ্রন্থ বাজারে বিক্রীত হইত। উহার মূল্য খুব বেশী ছিল। আঁখরিয়া নামে অভিহিত লেখক-সম্প্রদায় এই বিষয়ে সবিশেষ দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহারা মুক্তার ন্যায় হস্তাক্ষরে বড় বড় গ্রন্থ লিখিতেন এবং নানা মনোহর চিত্রে উহা সুশোভিত করিতেন। কাঠের মলাট দিয়া ও কীট-নাশক দ্রব্য দ্বারা ঐ গ্রন্থগুলি সুরক্ষিত হইত। মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের পর প্রভূত কাগজের প্রয়োজন হইল। তখন আর হস্ত-নির্ম্মিত তূলোট কাগজে কাজ চলিতে পারিল না। ক্রমে ঘাস, বাঁশ, কাঠের মণ্ড

হইতে কাগজ প্রস্তুতের প্রণালী আবিষ্কৃত হইল। সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় কাগজের কলও স্থাপিত হইতে লাগিল। বনজ বৃক্ষ কলে চূর্ণ করিয়া উহার সহিত একপ্রকার আঠালো পদার্থ মিশ্রিত করিয়া মণ্ড প্রস্তুত হয়, সেই মণ্ড কলের চাপে পাতলা কাগজে পরিণত হয়। মণ্ডের সহিত ভিন্ন ভিন্ন রং মিশ্রিত করিয়া রঙিন কাগজ প্রস্তুত করা হয়। এই যান্ত্রিক যুগেও বহু দেশে হস্ত-নির্ম্মিত কাগজ বিলুপ্ত হয় নাই। চট্টগ্রাম অঞ্চলে এখনও বহু শিল্পী ন্যাকড়া, তুলা ও আখের ছোবড়া দিয়া পার্চ্চমেণ্ট পেপারের তুল্য অতি উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত করে।

উষ্ট্র

কুব্জপৃষ্ঠ ন্যুব্জদেহ সারি সারি উট
চালকের ইঙ্গিতমাত্রেই দেয় ছুট।

পশুর মধ্যে উষ্ট্র একটি অদ্ভুত জীব—বিশ্ববিধাতার এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। যাঁহারা বাহ্য সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী তাঁহারা এই কদাকার পশুটিকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ এরূপ বিসদৃশ অঙ্গগঠন, কুৎসিত আকৃতি, অসঙ্গত কুব্জপৃষ্ঠ জন্তু জগতে আর দ্বিতীয় নাই। কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই জানেন, মানব-সভ্যতা বিস্তারে উষ্ট্রের উপযোগিতা, উষ্ট্রের দান অতুলনীয়। প্রকৃতির রাজ্যে যে সমুদয় সুদুস্তর ও সুবিস্তীর্ণ মরুপ্রদেশ অনল-সমুদ্রের ন্যায় তরঙ্গ বিস্তার করিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিকে চিরদিন পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছিল, অক্লান্তকর্ম্মা উষ্ট্রজাতি অদাহ্য অর্ণব-যানের ন্যায় যাত্রিগণকে অ বরাম পারাপার করিয়া তাহাদের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করিয়াছে।

কোন ভাবগ্রাহী কবি উষ্ট্রকে মহাতেজা অগস্ত্যের তপস্যা-সৃষ্ট অদ্ভুত-কর্ম্মা জীব বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। তিনি যেমন সমুদ্র শোষণ করিয়া, বিন্ধ্যগিরি লঙ্ঘন করিয়া মানব-সমাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন, মানব-সভ্যতা বিস্তার

করিয়াছিলেন, উষ্ট্রজাতি তাঁহার মূর্ত্তিমান্ তপঃশক্তিরূপে অসহায় মরুপ্রান্তরবাসীকে রক্ষা করিতেছে। উহার তপস্যা-ক্লিষ্ট দেহ জীর্ণ-শীর্ণ মনে হইলেও উহা অসীম শক্তির আধার। উষ্ট্রের পৃষ্ঠদেশে যে কুব্জ উহার কলঙ্করূপে প্রতিভাত হয়, উহারই অন্তর্দেশে উষ্ট্রের প্রাণশক্তি সঞ্চিত থাকে। উক্ত ককুদের মধ্যে সঞ্চিত বসা বা চর্ব্বি সকল অভাবের মধ্যেও উহার সর্ব্বাঙ্গ ক্রিয়াশীল করিয়া রাখে। এই বসার প্রভাবেই উষ্ট্র মরুভূমির দুর্ব্বিষহ উত্তাপ অনায়াসে সহ্য করে। উহা আবশ্যকমত উষ্ট্রদেহের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইয়া খাদ্যের অভাব পূর্ণ করে, দৈহিক ক্ষয় পূর্ণ করে, অবিরাম পরিশ্রমের ক্লান্তি দূরীভূত করে। অন্যদিকে উষ্ট্রের পাকস্থলীস্থিত একটি স্বতন্ত্র কোষে উষ্ট্রের পানীয় জল সুরক্ষিত রাখিবার ব্যবস্থা আছে। মরু-যাত্রার পূর্ব্বে সুচতুর উষ্ট্র ঐ কক্ষটি সুশীতল জলে পরিপূর্ণ করিয়া লয়। জলহীন মরুপ্রদেশ অতিক্রম কালে উষ্ট্র আবশ্যকমত সেই সঞ্চিত জলে তৃষ্ণা নিবারণ করে। উষ্ট্রের ঘ্রাণশক্তিও অসাধারণ। বহু দূর দেশ হইতে সে উহার প্রভাবে জলের অবস্থিতি অবগত হইতে পারে। নিদারুণ উত্তাপের সময় বিদ্যুদ্বেগে সেই জলাশয়ের দিকে ধাবিত হইয়া তৃষ্ণার্ত্ত আরোহীর জীবন রক্ষা করে।

মরুপথে শঙ্কা-সঙ্কটের অন্ত নাই। উষ্ট্রেরাই মরুযাত্রীর একমাত্র সহায় একমাত্র রক্ষক। প্রাণান্তকর মরুঝটিকা প্রবাহিত হইবার পূর্ব্বে উষ্ট্র স্বভাবজাত অনুভূতি-শক্তির বলে উহা অনুমান করিয়া সহসা মাটির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া বালুকার মধ্যে মুখ গুঁজিয়া জীবন রক্ষা করে। উষ্ট্রের ইঙ্গিতে আরোহিগণও আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়। মরুভূমির কোন কোন অংশ হিংস্র জন্তুর আবাসভূমি। যাত্রীরা মাঝে মাঝে ঐ সকল দুর্দ্দান্ত বন্যপশু দ্বারা আক্রান্ত হয়। বিদ্যুদ্‌গতি উষ্ট্র ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়া আরোহিগণকে নিরাপদ স্থানে লইয়া যায়।

উষ্ট্রই মরুদেশের একমাত্র উপযুক্ত অধিবাসী। বিশ্বস্রষ্টার কি অনন্ত মহিমা, তৃণলতাশূন্য বালুময় দেশে অসংখ্য বাব্‌লা ও কাঁটাগাছের সৃষ্টি করিয়া উষ্ট্রের আহারের অভাবমোচন করিয়াছেন। মরুজাত বাব্‌লার ডাল

ও কাঁটাগাছই উষ্ট্রের উপাদেয় খাদ্য। আবার দীর্ঘকাল অনাহারেও উষ্ট্রের বিশেষ কষ্ট হয় না। বিরাট গুরুভার পৃষ্ঠে বহন করিয়া উহারা স্বচ্ছন্দে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে। উহাদের পদতল এরূপ সু-কৌশলে নির্ম্মিত যে, উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর দিয়া উহারা অনায়াসে দ্রুত গমন করে, উহাতে কিছুমাত্র অসুবিধা হয় না, প্রকাণ্ড পদতল বালুকামধ্যে প্রোথিত হয় না। মরুবাসী উষ্ট্রের নিকট অশেষ প্রকারে ঋণী ; উষ্ট্রদুগ্ধ উহাদের উপাদেয় পানীয়, উষ্ট্রমাংস উহাদের বলকর আহার্য্য।

দিয়াশলাই

অতি প্রাচীনকালে যেদিন মানব-শিশুগণ সমুদ্র-সৈকতে পতিত শুষ্ক কাষ্ঠ স্তূপের উপর নৃত্য করিতে করিতে দেখিল প্রবল সংঘর্ষণে সহসা অগ্নি-শিখা প্রজ্জলিত হইয়া উঠিয়াছে, সেদিন তাহাদের আনন্দ ও বিস্ময়ের সীমা ছিল না। তদবধি তাহারা প্রয়োজনমত কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিত। কিন্তু উহা অতিশয় শ্রমসাধ্য ও শক্তি-সাপেক্ষ ব্যাপার। উহার বহু শতাব্দী পরে 'লৌহ-যুগে' চকমকি প্রস্তর ও ইস্পাতখণ্ডের সাহায্যে অগ্নি উৎপাদনের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়।

অতি সহজে কার্য্যোদ্ধারের উপায় আবিষ্কার করা মানুষের স্বভাব। মানুষ যখন দেখিল চকমকি প্রস্তরের উপর লৌহখণ্ডের আঘাত করিবামাত্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তখন ঐ স্ফুলিঙ্গ সাহায্যে কিরূপে অনায়াসে অগ্নি-উৎপাদন করা যায় তাহার সহজ উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। কাষ্ঠাদি দাহ্যপদার্থের মধ্যে শুষ্ক শোলাই সহজে ধরিয়া উঠে। প্রথম প্রথম শোলার উপর চকমকি-নির্গত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পাত করিয়া বহু পরিশ্রমে অগ্নি প্রজ্জালিত করা হইত। যখন গন্ধক আবিষ্কৃত হইল, তখন দেখা গেল অগ্নিসংস্পর্শে উহা সহজেই জ্বলিয়া উঠে। তদবধি শুষ্ক কাঠির অগ্রভাগে গন্ধক লাগাইয়া শোলার আগুনে ঠেকাইয়া অগ্নি জ্বালান হইত। বিলাতি দিয়াশলাই আমদানি

হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই পদ্ধতিই প্রচলিত ছিল। এমন কি এখনও সুদূর পল্লী অঞ্চলে এই উপায়ে আগুন জ্বালান হয়।

বহুদিন পরে সুইডেন দেশবাসী একজন রাসায়নিক সাল্‌ফেট নামক দাহ্য বস্তু আবিষ্কার করেন। উহা হইতেই দীপ-শলাকা বা আধুনিক দিয়াশলাই-এর উৎপত্তি।

পূর্ব্বে এদেশে দিয়াশলাই প্রস্তুত হইত না। স্বদেশী আন্দোলনের পর হইতে এদেশে উহা প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হইতে থাকে। কয়েক বৎসর চেষ্টার পর জাপান হইতে কল-কব্জা আনাইয়া কয়েকটি কোম্পানি এদেশে দিয়াশলাইএর কারখানা খুলেন। প্রথম প্রথম উহার যাবতীয় মাল-মশলা ও কাঠ বিদেশ হইতে ক্রয় করা হইত। তাহার পর ঐ সকল দ্রব্য এদেশে উৎপন্ন করিবার ব্যবস্থা হয়। ইহার ফলে দেশী দিয়াশলাই খুবই সস্তায় বিক্রীত হইত। কিন্তু দুঃখের বিষয় সম্প্রতি দিয়াশলাইএর উপর গুরু করভার স্থাপিত হওয়ায় অনেক দেশী দিয়াশলাই কোম্পানি ফেল হইয়া গিয়াছে।

দিয়াশলাই আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুর অন্যতম। এদেশে প্রতি-বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকার দিয়াশলাই বিক্রীত হয়। ঐ টাকার অধিকাংশ এখন বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। কয়েকটি বিদেশীয় দিয়াশলাইএর কারখানা বর্ত্তমানে এদেশে স্থাপিত হইয়াছে। উহাদের প্রতিযোগিতায় অবশিষ্ট দেশীয় কারখানাগুলি একে একে উঠিয়া যাইতেছে।

ব্যাঘ্র

সিংহ অপেক্ষা বাঙ্গালার রাজকীয় ব্যাঘ্রকে (The Royal Bengal Tiger) অনেকে প্রকৃত পশুরাজ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ প্রাণিতত্ত্ববিদ্ মার্টিন ডান্‌কান বলেন, অরণ্যরাজ্যের রাজসিংহাসনে সিংহ অপেক্ষা ব্যাঘ্রের দাবীই বেশী। একমাত্র এশিয়াখণ্ডেই ব্যাঘ্রের বাস, পৃথিবীর আর কোন স্থানে ব্যাঘ্র দেখা যায় না। চীন, ইন্দোচীন, মালয়,

সুমাত্রা, সিংহল, বালি ও বোর্ণিও প্রভৃতি স্থানে ব্যাঘ্র আছে, কিন্তু বঙ্গদেশের ব্যাঘ্রই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও বলশালী। উষ্ণপ্রধান অঞ্চল ব্যাঘ্রের প্রিয় বাসভূমি হইলেও, মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশেও ব্যাঘ্র বাস করে।

ব্যাঘ্র বিড়াল-জাতীয় জন্তু; উহার অস্থি, মজ্জা, মাংসপেশী, মস্তক এবং শরীরের গঠনপ্রণালী ঠিক বিড়ালের ন্যায়। উহার চোখ, মুখ, নাক, পদ, পাকস্থলী সমস্তই বিড়ালের অনুরূপ। বাঘের চক্ষুর মণি গোল, লাঙ্গুল দীর্ঘ, লাঙ্গুলের প্রান্তভাগ লোমশূন্য। গালে দাড়ি ও জুল্‌ফির মত কড়া লোম আছে। গ্রীবাদেশে কেশর নাই। চিবুক ও ওষ্ঠ রোমযুক্ত। ব্যাঘ্র ক্রুদ্ধ হইলে উহার গোঁফ-দাড়ি খাড়া হইয়া উঠে। পূর্ণবয়স্ক সবলকায় ব্যাঘ্রের বর্ণ অতি মনোহর। উহার লোহিতাভ চর্ম্মে কালো কালো ডোরাকাটা, নিম্নদেশ শ্বেতবর্ণ। জলবায়ুর তারতম্যে ব্যাঘ্রের বর্ণও বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। ভারতীয় ব্যাঘ্রই আকারে ও আয়তনে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। সাধারণতঃ উহারা ৮ হইতে ১১ ফুট লম্বা হয়। ১৫ ফুট লম্বা বাঘও কখন কখন দেখা গিয়াছে।

বাঘ অপেক্ষা বাঘিনীর দেহ ও মস্তক ছোট ও সঙ্কীর্ণ। বাঘিনীর গ্রীবায় ঝুঁটি বা চূড়া নাই। বাঘ অপেক্ষা বাঘিনী অধিকতর হিংস্রপ্রকৃতি। ইহারা ক্রোধপরায়ণা, চতুরা ও জীব-সংহারিণী। বাঘিনী অত্যন্ত সন্তান-বৎসলা। সন্তানের বিন্দুমাত্র বিপদের সম্ভাবনা ঘটিলে বাঘিনী উন্মত্তা হয়, মুহূর্ত্তমধ্যে মহাপ্রলয় সৃষ্টি করে। শিকারের অধিকাংশ দুর্ঘটনা বাঘিনীর দ্বারাই সংঘটিত হয়। বাঘিনী এক এক বারে দুইটি হইতে পাঁচটি শাবক প্রসব করে। জন্মকালে শাবকগুলি খুব ছোট হয়—গৃহ-পালিত বিড়াল অপেক্ষাও ছোট। সন্তানপ্রসবের পর বাঘিনীর স্বভাব ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে। কিন্তু সন্তান-পালনে সে স্নেহশীলা করুণাময়ী জননী। যতদিন শাবকগুলি শক্তিমান্ হইয়া না উঠে, ততদিন বাঘিনী উহাদিগকে বিশেষ সতর্কতার সহিত রক্ষা করে। সমস্ত দিনরাত্রি উহাদের লালন-পালন, রক্ষা ও শিক্ষা লইয়া বাঘিনী ব্যস্ত থাকে।

বাঘিনী পরম যত্নে স্বীয় সন্তানগুলিকে স্বধর্ম্ম শিক্ষা দেয়। যতদিন উহারা সবল ও সুদক্ষ হইয়া না উঠে ততদিন মুহূর্ত্তের জন্যও উহাদিগকে কাছ ছাড়া করে না। দ্বিতীয় বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত সে সর্ব্বদা শাবকগুলির সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ায়। দুধ ছাড়িবার পর, বাঘিনী বাছুর, বাচ্ছা হরিণ, শূকর-ছানার কচি মাংস আনিয়া উহাদিগকে খাওয়ায়। সেই সময় অকারণে অজস্র পশু-হত্যা করিয়া বাঘিনী সন্তানগণকে ভীষণতা শিক্ষা দেয়।

গৃহ-পালিত পশুর মাংসের প্রতি বাঘের প্রবল লালসা। নর-খাদক ব্যাঘ্র আরও ভয়ঙ্কর। উহারা কখন কখন গভীর বন হইতে বাহির হইয়া গ্রামের নিকটবর্ত্তী বন-জঙ্গলে লুকাইয়া থাকে এবং রাত্রিকালে সুবিধামত শিকার ধরিয়া বেড়ায়। একরাত্রির মধ্যে উহারা ৫।৭ টা নদী পার হইয়া ১৪।১৫ ক্রোশ পথ অনায়াসে ঘুরিয়া আসে। বাঘেরা বিড়ালের ন্যায় শিকার লইয়া খেলা করিতে বড় ভালবাসে, দগ্ধিয়া দগ্ধিয়া শিকারের জীবনান্ত করে। সুন্দরবনে অনেক সময় বাঘেরা খাদ্যাভাবে পেট ভরিয়া মাছ খায়। একান্ত দুর্ভিক্ষের সময় সন্তান-বৎসলা বাঘিনী স্বীয় শাবকের মাংস ভক্ষণ করিতেও দ্বিধাবোধ করে না।

ব্যাঘ্রের দৌরাত্ম্যে এদেশের লোক অনেক সময় অস্থির হইয়া উঠে। এজন্য নানা উপায়ে ব্যাঘ্র-শিকার করা হয়। সুন্দরবনে গাছের উপর মাচা করিয়া বাঘ-শিকার করা হয়। হাতী চড়িয়াও বাঘ-শিকারের পদ্ধতি প্রচলিত আছে। ইহা ছাড়া সাঁই ফকিরেরা মন্ত্রবলে বাঘ বিনাশ করেন বলিয়া শুনা যায়। হুড়কা-কলের সাহায্যে অথবা গাছের আঠায় বিষ মিশাইয়া এবং চোরা গর্ত্ত খুঁড়িয়াও বাঘ মারা হয়।

পাট

বঙ্গভূমি কৃষি-প্রধান দেশ। কৃষি-জাত পণ্য দ্রব্যের উপরই এ দেশ-বাসীর সুখ-সম্পদ্ নির্ভর করে। যে সমুদয় পণ্য-দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি

করিয়া এদেশের লোক জাতীয় অর্থ সঞ্চয় করে, সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে, উহার মধ্যে পাটই সর্ব্বপ্রধান।

পাট একমাত্র ভারতবর্ষেই উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে শতকরা ৯৫ ভাগ বঙ্গদেশেই জন্মে এবং বঙ্গদেশের কৃষক-সম্প্রদায় বৎসর বৎসর কোটি কোটি টাকার পাট বিদেশে চালান দেয়। যে বৎসর ভাল ফসল উৎপন্ন হয় এবং পাটের বাজার দর চড়া থাকে সে বৎসর এ দেশের দরিদ্র কৃষকের মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠে। পক্ষান্তরে অজন্মা হইলে, অথবা দর অসম্ভব পড়িয়া গেলে, কৃষক-সম্প্রদায়ের দুঃখের অন্ত থাকে না। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সম্প্রদায়ও যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করে। কারণ এ দেশের সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থ এক-সূত্রে গ্রথিত। ফসল না হইলে, জমিদারের খাজনা আদায় হয় না, সমাজের যে সমুদয় সদনুষ্ঠানের ভার জমিদার সম্প্রদায়ের উপর ন্যস্ত তাহা বন্ধ হইয়া যায়। দেশের লোকের ক্রয়-শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে ব্যবসা-বাণিজ্যেরও যথেষ্ট অবনতি ঘটে। দেশের জনসাধারণের সহিত যে সকল শ্রেণীর জীবিকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তাহাদের যথেষ্ট দুর্দ্দশা ঘটে। উকিল, ডাক্তার, কবিরাজ, শিক্ষক, সেক্‌রা প্রভৃতি সকলেরই উপার্জ্জন বন্ধ হইয়া যায়।

পাট চাষ লাভজনক হইলেও ব্যয়-সাপেক্ষ। এদেশের দীন-দরিদ্র কৃষক অনেক সময় উপযুক্ত অর্থের অভাবে নিয়মিতভাবে চাষ করিতে পারে না। উচ্চ দো-আঁস ভূমিতেই অধিক পরিমাণে পাট জন্মে। প্রচুর বৃষ্টি ও প্রখর রৌদ্রই পাট চাষের প্রধান সহায়। জমিতে উপযুক্ত সার না পড়িলে ফসল ভাল হয় না। সাধারণতঃ দরিদ্র কৃষক গোবর, পাঁক-মাটি, পচা পাতা ইত্যাদি সহজলভ্য সার দিয়া চাষ করিয়া থাকে। রেড়ির খইল, হাড়ের গুঁড়া প্রভৃতি মূল্যবান্ সার সংগ্রহ করা অনেকের পক্ষে সম্ভব হয় না।

পাট উঠিয়া যাওয়ার পরই আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে জমি নরম থাকিতে থাকিতে একবার লাঙ্গল দিয়া জমি ভাঙিয়া রাখিতে হয়। উহার পর বৈশাখ মাসের মধ্যে আরও দুই একবার চাষ দিলে ভাল হয়। পাটের বীজ ছড়াইবার পূর্ব্বে পাটের জমি উত্তমরূপে কর্ষণপূর্ব্বক মই দিয়া চূর্ণ ও সমতল

করিয়া রাখিতে হয়। কালবৈশাখীর প্রথম বারিপাতের পূর্ব্বেই পাটের বীজ ছড়াইতে হয়। চারা বাহির হইলে ক্ষেত্র হইতে ঘাস নিড়াইয়া ফেলিতে হয়। বেশী বৃষ্টি হইলে ক্ষেত্রগুলি শীঘ্র শীঘ্র ঘাসে ভরিয়া যায়, তখন ঘাস নিড়ান অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ হইয়া উঠে।

শ্রাবণ মাসেই সাধারণতঃ পাটগাছ পরিপুষ্ট হইয়া উঠে, উহার পর পাট কাটা আরম্ভ হয়। পাটগাছগুলি কয়েকদিন ক্ষেতে ফেলিয়া রাখিয়া পাতা ঝরিয়া গেলে খাল, বিল বা ডোবার জলে পচাইতে দেওয়া হয়। পাট ঠিকমত পচিলে সুকৌশলে উহার আঁশগুলি ছাড়াইয়া লইতে হয়। ইহার নাম পাট-কাচা। পাটগাছের দণ্ডগুলিকে পাট-কাঠি বা পাকাটি বলা হয়। পাট-কাচার পর, ভারা বাঁধিয়া আঁশগুলি শুষ্ক করা হয়, পরে উহা আড়তে চালান যায়। গ্রাম্য ফড়িয়ারাই কৃষকগণের নিকট হইতে পাট খরিদ করিয়া আড়তে পাঠায়। বড় বড় মহাজন ঐ পাট লইয়া হাইড্রোলিক প্রেসে গাঁইট বাঁধে, উহাকে পাকা গাঁইট বলে। বৈদেশিক বণিকেরা ঐ সমুদয় গাঁইট দেশ-বিদেশে চালান দেয়।

এই কৃষিজাত পণ্য দ্রব্যটি অবলম্বন করিয়া এদেশে কয়েক মাস জোর কাজ-কারবার চলে, উহার দ্বারা বহু লোক নানাভাবে উদরান্নের সংস্থান করিয়া থাকে। পাট বিক্রয় করিয়া বাঙ্গালার কৃষকগণ প্রতি বৎসর প্রায় ৪০ কোটি টাকা পায়। পাটই বাঙ্গালার উল্লেখযোগ্য লাভজনক ফসল।

সিরাজগঞ্জ মোকামের পাটই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহার আঁশগুলি যেমন দীর্ঘ, তেমনিই সূক্ষ্ম ও চিক্কণ এবং রেশমের মত সমুজ্জ্বল। পাট হইতে বিবিধ শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হয়। জার্ম্মাণি প্রভৃতি দেশ হইতে যে সমুদয় শীতবস্ত্র এদেশে আমদানি হয় উহার অধিকাংশই পাট হইতে উৎপন্ন। পাটের থলিয়া শস্যাদি চালান দেওয়ার প্রধান অবলম্বন। বালি-ভরা থলিয়ার সাহায্যে বোমার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে কোটি কোটি পাটের থলিয়া প্রস্তুত করা হয়। পাট হইতে দড়ি, কাছি, ম্যাটিং, আসন প্রভৃতি বহু দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। দৈনন্দিন জীবনে পাটের উপযোগিতা অপরিমেয়।

বেতার-বার্ত্তা

বিংশ শতাব্দীর অসংখ্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মধ্যে 'বেতার' যন্ত্রের উদ্ভাবন মানবের উদ্ভাবনী শক্তির চরম-বিকাশের এক অভাবনীয় বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত। যাহারা জন্মকাল হইতে ঘরে বসিয়া নিত্য বেতারের সংবাদ শ্রবণ করিতছে, তাহাদের নিকট এই অলৌকিক ব্যাপারের অপূর্ব্বতা ও বৈচিত্র্য ধরা নাও পড়িতে পারে, কিন্তু ইহার অদ্ভুত শক্তির বিষয়, মন-বুদ্ধির অতীত কার্য্যকারিতার বিষয় চিন্তা করিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়।

জড়-বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি, ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ইতালীদেশীয় স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক মার্কনি সাহেব তারহীন টেলিগ্রাফির আবিষ্কার করেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে বিনা তারে ইতালি হইতে আমেরিকায় সংবাদ প্রেরিত হয়। উহার পর হইতে ক্রমোন্নতির ফলে বর্ত্তমান বেতার-বার্ত্তার সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব্বে টেলিগ্রাফির সাঙ্কেতিক শব্দের সাহায্যে দেশ-বিদেশে সংবাদ প্রেরিত হইত। উহার দ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি ঘটিত না। বর্ত্তমানে বেতারের কৃপায় পৃথিবীর যে কোন অংশে প্রদত্ত বক্তৃতা, সঙ্গীত, আবৃত্তি, অভিনয় আমরা অনায়াসে ঘরে বসিয়া স্বকর্ণে শুনিতেছি। জগতের শ্রেষ্ঠ গুণবান্ ও জ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণের অমূল্য উপদেশ শ্রবণ করিয়া জনসাধারণ শিক্ষালাভ করিতেছে, আলোকের পথে অগ্রসর হইতেছে। বেতার যন্ত্র আবিষ্কারের পর হইতে রাজ্যশাসন, শিক্ষাবিস্তার, চিত্তবিনোদন, ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ সুগম ও সুদূরপ্রসারী হইয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্রে বেতার যন্ত্রের উপযোগিতা অতুলনীয়। অসীম সমুদ্রবক্ষে বিপন্ন অর্ণবযানের পক্ষে ইহা এখন ত্রাণকর্ত্তা।

বেতারের মূল তত্ত্ব বায়ুমণ্ডলে শব্দতরঙ্গের লীলা। যে কোন শব্দ উত্থিত হইলে উহা বায়ুমণ্ডলে অনুকম্পনের সৃষ্টি করে। সেই অনুকম্পন হইতে শব্দতরঙ্গের উৎপত্তি হয় এবং শব্দের লঘুত্ব ও গুরুত্ব অনুসারে উহা চতুর্দ্দিকে তরঙ্গায়িত ও ধাবিত হয়। ক্রমশঃ যত দূরবর্ত্তী হইতে থাকে ততই শব্দের

পরিমাণ ক্ষীণতর হইয়া আসিলেও উহা একেবারে নিস্তব্ধ হয় না, অবিরাম গতিতে প্রসারিত হইতে থাকে। বেতার যন্ত্রের সাহায্যে শব্দের শক্তিকে ইচ্ছামত বর্দ্ধিত করা যায়। যে যন্ত্রগুলির সাহায্যে শব্দকে বহুগুণ শক্তিশালী করিয়া প্রেরণ করা হয় উহার নাম 'মাইক্রোফোন'। একটি যন্ত্র হইতে প্রেরিত শব্দতরঙ্গ দূরবর্ত্তী অপর একটি যন্ত্রে উপনীত হইলে, সেই যন্ত্র পুনরায় সেই ক্ষীণতর শব্দকে শক্তিশালী করিয়া মৌলিক রূপ দান করে। এইরূপে একটি যন্ত্র হইতে উত্থিত শব্দ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে স্থাপিত যন্ত্রে প্রতিধ্বনিত হইয়া সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়। বেতার যন্ত্রে প্রতিধ্বনিত শব্দকে 'লাউড স্পীকার' এর সাহায্যে মৌলিকরূপে পরিণত করিয়া শ্রোতাদিগের শ্রবণগোচর করা হয়। বায়ুমণ্ডলে 'ইথার' নামে এক সর্ব্বব্যাপী জড়পদার্থের অবিরাম প্রবাহ বিদ্যমান থাকায় বিনা তারে পৃথিবীর সর্ব্বত্র শব্দতরঙ্গ প্রেরণ সম্ভবপর হইয়া থাকে। পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র এখন বেতারযন্ত্রের ষ্টেশন স্থাপিত হইয়াছে। ঐ সমুদয় ষ্টেশনে বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে শব্দতরঙ্গ গৃহীত এবং শক্তিযুক্ত করিয়া অপরাপর ষ্টেশনে প্রেরিত হইতেছে। যে গৃহে শব্দ-গ্রাহক যন্ত্র থাকে উহার ছাদে দুইটি খুঁটির সাহায্যে তার (aerial) টাঙান থাকে। শব্দ-গ্রাহক যন্ত্রের সহিত এই তার সংযুক্ত এবং আর একটি তার ঐ যন্ত্র হইতে মাটির সহিত যুক্ত থাকে। ছাদে লম্বিত তারের সাহায্যে শব্দতরঙ্গ যন্ত্রে আসিয়া উপস্থিত হয়। বিদ্যুতের সাহায্যে ঐ যন্ত্র সেগুলিকে মৌলিক রূপ দান করে।

সর্প

সর্পের সকল বিষয়ই অদ্ভুত ও বিস্ময়কর। এই ভীষণ-দর্শন জীবের সুতীক্ষ্ণ দন্ত কেন যে কালকূটে ভরা সে রহস্য একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তাই জানেন। এই বিষধর প্রাণী কেবল আমাদের দেশের বনজঙ্গলে নহে, আমাদের জাতীয় সাহিত্যেও একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া সগৌরবে বিরাজ করিতেছে। মহারাজ পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ, জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ, সর্পরাজ বাসুকির

সাহায্যে সমুদ্রমন্থন, অনন্তনাগের দেহে নারায়ণের শয্যা ইত্যাদি ঘটনায় এদেশের প্রাচীন পুরাণাদির অঙ্গ পরিপূর্ণ। মনসার ভাসান-গানে বণিক্‌নন্দিনী বেহুলা সতীর করুণকাহিনী সর্পজাতিকে অমরত্ব দান করিয়াছে।

অহিকুলের অত্যাচারে বঙ্গদেশে যে মরণের পথ উন্মুক্ত হইয়াছে, বৎসর বৎসর ন্যূনাধিক পঁচিশ সহস্র হতভাগ্য অধিবাসী সেই পথে যথাসময়ে মহাযাত্রা করে ইহা চিন্তা করিলেও আমাদের চিত্ত অভিভূত হইয়া পড়ে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র বৈজ্ঞানিকগণের প্রভূত গবেষণা সত্বেও, অদ্যাপি সর্পবিষের প্রকৃত ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই। শুনা যায় এবং সাহিত্যেও দেখা যায় প্রাচীনকালে এদেশে বহু ওস্তাদ ওঝা ছিল, তাহারা মন্ত্রবলে ও অব্যর্থ ঔষধের গুণে সর্পদষ্ট ব্যক্তির জীবন রক্ষা করিত। অধুনা উহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এখনকার লোকের মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাস তো নাই, উহার একনিষ্ঠ সাধকেরও অভাব ঘটিয়াছে। বর্ষাকালে পল্লীতে পল্লীতে বিশেষতঃ সুন্দরবন অঞ্চলে কত লোক যে সর্পাঘাতে মারা যায় তাহার ইয়ত্তা নাই।

সর্প সরীসৃপ শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহারা বুকের উপর ভর দিয়া চলে। ইহারা অণ্ডজ ও মেরুদণ্ডী। ইহাদের দেহ রজ্জুর মত আকৃতিবিশিষ্ট—মুখ হইতে লাঙ্গুলের দিকে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম। ইহাদের অধিকাংশ বিষধর, কতকগুলি নির্ব্বিষ। আবার অধিকাংশ বিষধরই ফণাযুক্ত। ক্রুদ্ধ বিষধরের গর্জ্জনও ভয়ঙ্কর। বিষধর সর্পের মুখের ভিতর উপর পাটীর দুইদিকে দুইটি দীর্ঘ বিষদন্ত আছে। বিষদন্ত দুইটি পশ্চাদ্দিকে ঈষৎ বক্র, ফাঁপা এবং অগ্রভাগ হইতে কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত। বিষদন্তের গোড়ায় দুইটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষকোষ, ইহাতে বিষ সঞ্চিত থাকে। ক্রুদ্ধ বিষধর সর্প কাহাকেও দংশন করিলে বিষদন্তস্থিত ছিদ্রপথে ঐ বিষ injection-এর ন্যায় শরীরে প্রবেশ করে। উহা রক্তের সহিত একবার মিশ্রিত হইলে ক্রমশঃ দেহের সমগ্র রক্ত বিষাক্ত হইয়া উঠে। দেহের রক্ত জমাট হইয়া যায়, রক্ত চলাচল বন্ধ হইয়া সর্পদষ্ট ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করে। হস্ত অথবা পদে সর্প দংশন করিলে, তৎক্ষণাৎ দংশনস্থানের কিছু উপরে রজ্জু দ্বারা বাঁধিয়া রক্তের চলাচল বন্ধ করিয়া

রজ্জুর নিম্নস্থ অঙ্গ তীক্ষ্ণ অস্ত্রদ্বারা চিরিয়া ফট্‌কিরি, পটাস পারমাঙ্গানেট একত্রযোগে ক্ষতস্থানে ঘষিয়া বিষাক্ত রক্ত নিষ্কাশিত করিতে পারিলে রোগীর জীবন রক্ষা হয়।

সর্পের কর্ণ নাই, উহারা চক্ষু দিয়া শ্রবণ করে এবং সময় সময় অন্য আহার্য্য ব্যতিরেকে উহারা কেবল বায়ু গ্রহণ করিয়া দীর্ঘকাল বাঁচে; এজন্য উহাদিগকে চক্ষুঃশ্রবা ও বায়ুভুক্‌ নামে অভিহিত করা হয়। মৎস্যের ন্যায় সর্পের রক্ত শীতল, এজন্য উহাদের দেহ তুষার-শীতল। ক্ষুদ্র, বৃহৎ, সূক্ষ্ম ও স্থূল নানা আকারের অসংখ্য জাতীয় সর্প আছে। সূত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম হইতে বৃক্ষকাণ্ডের ন্যায় স্থূল সর্প দেখিতে পাওয়া যায়। বৃহদাকার সর্প সাধারণতঃ নির্ব্বিষ ও ফণাবিহীন।

গ্রীষ্মপ্রধান স্থানই সর্পের প্রিয় বাসভূমি। আয়র্ল্যাণ্ড, আইস্‌ল্যাণ্ড প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে সর্প নাই। আমেরিকার র‍্যাটেল সর্প ভীষণাকার ও ভয়ঙ্কর বিষধর। আফ্রিকার জঙ্গলে বিরাটকায় ও ভীষণাকৃতির অজগর দেখা যায়। উহারা মেষ, ছাগ, হরিণ প্রভৃতি জন্তু অনায়াসে গিলিয়া ফেলে। উহাদের চক্ষুর জ্যোতি এরূপ তীব্র যে জীবগণ উহা দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া আপনারাই উহার মুখগহ্বরে প্রবেশ করে। এদেশে কেউটে, গোক্ষুর, শঙ্খচূড়, বোড়া, দুধরাজ ইত্যাদি বিষধর সর্প এবং হেলে, ঢোঁড়া প্রভৃতি নির্ব্বিষ সর্প যেখানে-সেখানেই দেখিতে পাওয়া যায়।

বাঁশ

বাঁশ আকারে সুদীর্ঘ হইলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে উহা তৃণজাতীয় উদ্ভিদ্‌। লম্বায় উহা পঞ্চাশ ষাট হাত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। বাঁশের অগ্রভাগ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হয়। বাঁশের ভিতর ফাঁপা। সাধারণতঃ একফুট অন্তর একটি করিয়া গ্রন্থি থাকে। ঐ গাঁইটের সংযোগস্থল হইতে পত্রযুক্ত সরু সরু শাখা নির্গত হয়। সেগুলিকে গ্রাম্য ভাষায় কঞ্চি বলে।

পাহাড়ে, বনে, জঙ্গলে, নিম্নভূমিতে সর্ব্বত্রই বাঁশ জন্মে। বঙ্গদেশ, আসাম, ব্রহ্মদেশ ও চীনে নানা জাতীয় বাঁশ দেখিতে পাওয়া যায় এবং প্রচুর উৎপন্নও হয়। পাহাড়ী বাঁশ সরু ও নীরেট। বাঁশ স্বভাবজাত উদ্ভিদ্ হইলেও, নিয়মিত ভাবে চাষ করিলে উহার যথেষ্ট উন্নতি হইতে পারে। শিকড়সমেত বাঁশ উৎপাটিত করিয়া অন্য স্থানে পুঁতিয়া দিলে উহা প্রায়ই বাঁচিয়া উঠে। একস্থানে একটি বাঁশ পুতিলে ক্রমশঃ উহার আশে-পাশে চারা বাহির হইয়া ঝাড় বাঁধে। গোবর বাঁশচাষের পক্ষে উৎকৃষ্ট সার। প্রত্যেক বৎসর বাঁশঝাড়ের তলদেশে সঞ্চিত পত্রের রাশি জ্বালাইয়া দিয়া উহার উপর নূতন তোলা মাটি দিতে পারিলে, শীঘ্রই বাঁশের ঝাড় ঘন ও সতেজ হইয়া উঠে।

পাকা বাঁশ যেমন মজবুত তেমনি দীর্ঘকাল স্থায়ী। পাকা বাঁশের খুঁটি ও চটা কিছুদিন জলে ভিজাইয়া উহার দ্বারা গৃহাদি নির্ম্মাণ করিলে এক পুরুষ স্বচ্ছন্দে কাটিয়া যায়। বর্ত্তমানে এদেশে বাঁশের মণ্ড হইতে কাগজ প্রস্তুত হইতেছে। এজন্য বাঁশের চাহিদা খুবই বাড়িয়া গিয়াছে এবং জেলায় জেলায় বাঁশচাষের প্রভূত চেষ্টা চলিতেছে। কাগজকলের মালিকেরা লোক-শিক্ষার জন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে জেলায় জেলায় প্রেরণ করিয়া দেশের জনসাধারণকে বাঁশের চাষ সম্বন্ধে উপদেশ দান করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বাঁশের উপকারিতা বলিয়া শেষ করা যায় না। বাঁশ হইতে নিত্য ব্যবহার্য্য কত শিল্পদ্রব্য যে প্রস্তুত হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। চিন্তা করিলে মনে হয় এই বস্তুটির অভাবে বাঙ্গালীর সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করা একান্ত দুর্ঘট হইয়া উঠিত। বঙ্গদেশ কৃষিপ্রধান স্থান, এখানে অধিকাংশ দরিদ্র কৃষক কুটীরবাসী। এই কুটীর নির্ম্মাণের প্রধান উপকরণ বাঁশ। বঙ্গদেশে উহা যেমন সহজলভ্য তেমনই সুলভ। বাঁশ কেবল চাষের সহায়রূপে বাঙ্গালীর মুখে অন্ন যোগায় নাই, কুটীরের খুঁটি হইয়া তাহার মাথা রক্ষা করে নাই, বাঁশ বাঙ্গালীর কর্ম্মজীবনের ও ধর্ম্মজীবনের পরম বন্ধু। একদিন এই বাঁশের লাঠি বাঙ্গালীর ধন রাখিয়াছে,

ধান রাখিয়াছে, মান রক্ষা করিয়াছে, প্রাণ বাঁচাইয়াছে। পাকা বাঁশের লাঠি লইয়া একদিন বাঙ্গালী লাঠিয়াল মগ মুঘলের সহিত লড়াই করিয়াছে।

গঙ্গানদী

'ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে' প্রবন্ধে বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র গঙ্গানদীর উৎপত্তিস্থানের একটি বিশদ প্রাণস্পর্শী বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। শিবের জটা হইতে সুর-তরঙ্গিণী ভাগীরথী ভূতলে অবতীর্ণা হইয়াছেন বলিয়া পুরাণে বর্ণিত আছে। ধর্ম্মপ্রাণ জগদীশচন্দ্র বৈজ্ঞানিক যুক্তি দ্বারা এই পৌরাণিক প্রবাদ বচনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ও তথ্য উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি একজন ইংরাজি-শিক্ষিত বিজ্ঞানবিদ্ হইয়াও এই পূতসলিলা স্রোত-স্বতীর উপর দেবত্বের আরোপ করিতে এবং ইহাকে তাঁহার ইহকাল ও পরকালের পরম আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই।

অন্যান্য নদনদীর ন্যায় গঙ্গানদীকে প্রাকৃত জল-প্রবাহ বলিয়া হিন্দুগণ স্বীকার করেন না,—ইঁহাকে কেবল দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী বলিয়াই যে জানেন, তাহা নহে—সাক্ষাৎ দ্রবীভূত বিষ্ণুদেহ বলিয়াই বিশ্বাস করেন। প্রতি অবতারে ভগবান্ স্বয়ং গিরিরাজনন্দিনীর মাহাত্ম্য বর্ণনা ও স্তুতি-বন্দনা করিয়াছেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের গঙ্গাস্তোত্র হিন্দুর আন্তরিক ধর্ম্মভাবকে চিরদিন সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে। ভারতে এমন কোন সাধু সন্ন্যাসী সিদ্ধপুরুষ আসেন নাই, যিনি এই পুণ্যপ্রবাহিনীকে পতিতোদ্ধারিণী বলিয়া বিশ্বাস ও পূজা না করিয়াছেন।

এখনও এই অবিশ্বাসের যুগে কোটি কোটি হিন্দু নর-নারী গঙ্গার পবিত্র সলিলে পুণ্যস্নান করিতে ছুটিয়া আসে, পবিত্র গঙ্গাবারি মস্তকে ধারণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হয়। গঙ্গাজলে, গঙ্গাকূলে তনুত্যাগ হিন্দুর অন্তিম কামনা। আজও আমরা মৃত্যুকালে মুমূর্ষুর কর্ণে গঙ্গা নাম শুনাই। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, গঙ্গা ও গীতা লইয়াই হিন্দুর হিন্দুয়ানী। প্রতি পূজা-পার্ব্বণে হিন্দুগণ পরম শ্রদ্ধায় পবিত্র গঙ্গামৃত্তিকার তিলক ধারণ করিয়া থাকেন।

পক্ষান্তরে গঙ্গা ও গঙ্গাতীরের সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া গঙ্গাতটের শোভা দর্শন করে নাই তাহার জীবন অপূর্ণ।

হিমালয়ের শিখরদেশে নন্দা ও ত্রিশূল নামক গিরিশৃঙ্গদ্বয়ের পাদদেশে প্রসারিত তুষারক্ষেত্র এই স্রোতস্বতীর উৎপত্তিস্থান। ক্ষীণ রজতসূত্রের ন্যায় সেখান হইতে নির্গত হইয়া পর্ব্বত কান্তারের মধ্য দিয়া গোমুখী ভেদ করিয়া ইহা সমতল ক্ষেত্রে পতিত হইয়াছে। কত শত গ্রাম, নগর, জনপদ অতিক্রম করিতে করিতে বঙ্গভূমির বক্ষ সিক্ত করিয়া অবশেষে ইহা বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। গঙ্গানদীর পবিত্র পলিমাটীতে বঙ্গভূমির সৃষ্টি। যে সমুদয় দেশের ভিতর দিয়া এই পুণ্যনদী প্রবাহিত হইয়াছে, ঐ সমুদয় স্থান শস্যসম্পদে ধনে জনে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্গদেশের অধিকাংশ সমৃদ্ধ নগরী ও বাণিজ্য-কেন্দ্র গঙ্গানদীর উভয়তীরে অবস্থিত। গঙ্গাজলের তুল্য সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর পানীয় এদেশে নাই। দীর্ঘকালেও গঙ্গাজল বিকৃত হয় না। নিত্য গঙ্গাস্নান করিয়া ও গঙ্গামাটী অঙ্গে মাখিয়া অনেকে দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

কাচ

অযোগ্যের অসঙ্গত সম্মানের প্রতি কটাক্ষ করিতে, অনেক সময় 'কাঞ্চন ফেলিয়া কাচের আদর' উপমাটি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজনীয়তা ও কার্য্যকরী শক্তির দিক্ দিয়া বিচার করিলে বর্ত্তমান যুগে কাঞ্চন অপেক্ষা কাচের মর্য্যাদা বিশেষ কম বলিয়া মনে হয় না। অর্থের মানদণ্ড হিসাবে কাঞ্চনের মূল্য যত অধিক হউক না কেন পদার্থ হিসাবে কাচের স্থান কাঞ্চনের বহু ঊর্দ্ধে।

আধুনিক যুগে নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তুর মধ্যে কাচ কেবল বিশেষ প্রয়োজনীয় নহে, একান্ত অপরিহার্য্য পদার্থ। কাচের অভাবে বিজলী বাতি বন্ধ হইয়া গৃহপ্রাঙ্গণ শহর নগর হয় অন্ধকারময়, আর চশমা বিহনে বিজ্ঞ প্রবীণের দল

অন্ধ হওয়ায় বিদ্যাচর্চ্চা বন্ধ হইয়া যায়। আজকাল কাচ না হইলে আমাদের দৈনন্দিন কোন কাজই চলে না। পানে কাচের গ্লাস চাই, ভোজনে কাচের বাসন। কাচের আলমারি না হইলে পোষাক-পরিচ্ছদ রাখা যায় না, কাচের টেবিল না হইলে বৈঠকখানা মানায় না। ঘর করিতেও কাচের সার্সি, মুখ দেখিতেও কাচের আর্সি চাই। চিকিৎসার সাজ-সরঞ্জামের মূল উপকরণই কাচ। কাচের শিশি, কাচের বোতল, কাচের টিউব, কাচের নল, অপারেশনের ঘরটি পর্য্যন্ত কাচের তৈয়ারী। সৌখিনতায়ও কাচের আদর কম নহে, কাচের চুড়ি, কাচের ঘড়ি, কাচের কৌচ, কাচের গাড়ী, কাচের পুতুলেরও সংখ্যা নাই। সংসারের যে-দিকে চাওয়া যায় সকল দিকেই নানাবর্ণের পাতলা ও পুরু কাচ চক্‌চক্ করিতেছে। যুদ্ধ ব্যাপারেও কাচ অপরিহার্য্য। দূরবীক্ষণ, অণুবীক্ষণ, ক্যামেরা, স্কেল প্রভৃতি সমুদয় যন্ত্রই কাচের। বোমার ভিতর কাচের কুচা ভরা থাকে। রেলগাড়ী, ট্রামগাড়ী, বাস, মটরগাড়ী সব তাতেই কাচের একান্ত প্রয়োজন। এই যান্ত্রিক যুগে এমন যন্ত্র নাই যাহাতে কাচের যোগসূত্র না আছে। সোনা না হইলে জনসাধারণের বিশেষ ক্ষতি হয় না, কিন্তু কাচের অভাবে মানব-সংসার একেবারেই অচল হইয়া পড়ে।

জগতে যত বড় বড় আবিষ্কারের মূল অতি ক্ষুদ্র। কাচ আবিষ্কারেও উহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। একটি তুচ্ছ ঘটনা অবলম্বন করিয়া একদিন অকস্মাৎ এই পরম প্রয়োজনীয় পদার্থটি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। বহুদিন পূর্ব্বে একদল ফিনিসীয় বণিক্ সমুদ্রপথে বাণিজ্য করিতে বহির্গত হয়। ঘুরিতে ঘুরিতে তাহারা সিরিয়া দেশের উপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা রন্ধনাদি করিবার জন্য শুভক্ষণে সমুদ্রতটে অবতরণ করিল। সাগরসৈকতটি আল্‌কালি নামক ক্ষার পদার্থে পূর্ণ ছিল। নাবিকগণ সেই আলকালি লইয়া চুল্লী প্রস্তুত করিল এবং এক প্রকার কাঠের অগ্নিতে রন্ধনকার্য্য সমাপন করিল। ভোজনান্তে জাহাজে ফিরিবার সময় নির্ব্বাপিত চুল্লীর প্রতি দৃষ্টি পড়ায় তাহারা দেখিল উহা চক্‌চক্ করিতেছে। পরীক্ষাদ্বারা তাহারা বুঝিতে পারিল অগ্নিতাপে আল্‌কালি নামক ক্ষার পদার্থের সহিত বালুকা ও ছাই মিশ্রিত হইয়া একটি

নূতন পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে। এইরূপে জগতে সর্ব্বপ্রথম কাচের আবির্ভাব হইল। ইহার পর কাচ ও কাচশিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এক্ষণে কাচদ্রব্য নির্ম্মাণের বড় বড় কারখানা বসিয়াছে। বর্ত্তমানে বালুকার সহিত ক্ষারদ্রব্য ও চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া কাচ প্রস্তুত করা হয়। কাচ স্বচ্ছ, চিক্কণ ও ভঙ্গুর পদার্থ।

হাডুডু খেলা

বহুকাল হইতে বঙ্গদেশে হাডুডু বা কপাটি নামক গ্রাম্য ক্রীড়া চলিয়া আসিতেছে। অধুনা পাশ্চাত্ত্য দেশের 'ফুটবল' খেলার প্রভাবে এই প্রাচীন খেলাটি এদেশে প্রায় বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। এই দরিদ্র দেশে ব্যয়সাধ্য ক্রীড়া-কৌতুকের সঙ্গতি না থাকায় পল্লীবাসিগণ ব্যয়নিরপেক্ষ ক্রীড়ায় ব্যায়াম ও আনন্দের তৃষ্ণা নিবারণ করিত। অপরাহ্নে বিদ্যালয়ের ছুটির পর এবং পর্ব্বদিনে ছুটি উপলক্ষে আহারের কিছু পূর্ব্বে গ্রাম্য বালকগণ ও যুবক-সম্প্রদায় উন্মুক্ত মাঠে, নদীতীরে, সরোবরতীরে অথবা চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখের প্রাঙ্গণে দলে দলে সমবেত হইত।

সমানসংখ্যক ও সমশক্তিসম্পন্ন দুইটি দলে এই প্রতিযোগিতামূলক খেলা চলে। উভয় দলের খেলোয়াড় নির্ব্বাচনে একটি উৎকৃষ্ট পদ্ধতি অবলম্বিত হয়। প্রথমতঃ দুইদলের দুইজন সর্দ্দার নির্ব্বাচিত হয়। তারপর উভয়ে মিলিত হইয়া সমবেত খেলোয়াড়গণের মধ্য হইতে দুইজন সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী লইয়া এক একটি জোড় স্থির করে। এইরূপে সমস্ত খেলোয়াড়ের জোড়-মিল হইলে, প্রত্যেক জোড় গলা ধরাধরি করিয়া সর্দ্দারদ্বয়ের নিকট হইতে কিছু দূরে গিয়া গোপনে স্ব স্ব সাঙ্কেতিক নাম স্থির করিয়া লয়। যেমন একটি জোড়ের মধ্যে একজন তাহার নামকরণ করিল 'ফুল', অপর জন তাহার নাম রাখিল 'কুল'। এইরূপে সমস্ত জোড়ের নাম ঠিক হইয়া গেলে, এক এক জোড় সর্দ্দারদ্বয়ের নিকটে আসিয়া বলিবে, কে নেবে

'ফুল', কে নেবে 'কুল'। কে 'কুল' এবং কে 'ফুল' দুই সর্দ্দারের কাহারও জানা নাই, সুতরাং আন্দাজের উপর নির্ভর করিয়া প্রথম সর্দ্দার একটি নাম ডাকিল। সেই নামের বালক তাহার দিকে গেল, অপর বালক দ্বিতীয় সর্দ্দারের দিকে গেল। দ্বিতীয় জোড় আসিলে দ্বিতীয় সর্দ্দার প্রথম ডাকিলেন। এইরূপে খেলোয়াড়দিগকে দুই দলে সমান ভাগে ভাগ করা হয়।

তারপর খেলার মাঠের ঠিক মাঝ দিয়া একটি রেখা টানিয়া মাঠটিকে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। দুই দিকে দুই দল দাঁড়াইলে, উভয় দলের সর্দ্দার নিজ নিজ খেলোয়াড়গণকে সাজাইয়া লয়। দুর্ব্বল খেলোয়াড়-গণকে মাঝে দাঁড় করাইয়া পাকা খেলোয়াড়দিগকে দুই পাশে রাখা হয়। স্বয়ং সর্দ্দারদ্বয় স্ব স্ব দলের দক্ষিণদিকের শেষ প্রান্তে দাঁড়ায়। এই বার একটা খোলা উপরে ছুড়িয়া দেওয়া হয়,—যে দলের পিঠ উপরে থাকিবে সেই দল প্রথম 'চু' টানিবে। এইরূপে খেলা আরম্ভ হয়। যে 'চু' টানিয়া বিপক্ষদলের গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করিল, তাহার যতক্ষণ দম থাকিবে সেই সময়ের মধ্যে বিপক্ষদলের কাহাকেও ছুঁইয়া সে নিজের গণ্ডীর মধ্যে ফিরিয়া আসিবার চেষ্টা করিবে। যাহাকে ছুঁইয়া আসিবে সে মোর (মড়া) হইবে। কাহাকেও মারা সম্ভব না হইলে, অমনিই ফিরিয়া আসিবে। বিপক্ষদল যথাসাধ্য তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিবে। যদি ধরিতে পারে ও তাহাদের গণ্ডীর মধ্যে দম্ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত ধরিয়া রাখিতে পারে তবে সেই মোর হইবে। আর যদি ধৃত ব্যক্তি দম্ থাকিতে থাকিতে মাঝের রেখা স্পর্শ করিতে পারে, তবে কেহই মোর হইবে না। পূর্ব্বোক্ত খেলোয়াড়কে পুনরায় 'চু' টানিয়া বিপক্ষদলের মধ্যে যাইতে হইবে।

এক দলে যত জন খেলোয়াড় মোর হউক না কেন, বিপক্ষদলের এক এক জনকে মারিতে পারিলে, নিজ দলের এক এক জন বাঁচিয়া উঠিবে। এইরূপে যখন এক দলের সমস্ত খেলোয়াড় মারা পড়ে তখন বিপক্ষদল এক কোটে জয়ী হয়। ইহার পর উভয় দল কোট বদল করিয়া পুনরায় খেলা আরম্ভ করে। একজন বাদে দলের সমস্ত খেলোয়াড় মারা পড়িলে, অবশিষ্ট খেলোয়াড়টি

'হাফ' দিয়া অর্থাৎ মুখ বুজাইয়া (চু না টানিয়া) বিপক্ষদলে প্রবেশ করিবার অধিকার পায় ও যতক্ষণ সামর্থ্য এক জনকে মারিয়া আসিবার চেষ্টা করিতে পারে। তাহাকে ধরিয়া তাহার দাঁত বাহির করাইতে পারিলে তবে সে মোর হইবে। খেলার শেষে কোন্ দল কয় 'কোট' দিয়াছে উহা হিসাব করিয়া জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়।

নদী

বিরাট প্রকৃতির বুকে যে অদৃশ্য মহাচক্র অবিরাম আবর্ত্তিত হইয়া সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কার্য্য সাধন করিতেছে, নদী উহারই এক পরিদৃশ্যমান অংশ।

নদীর উৎপত্তি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ বলেন, প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণে উত্তপ্ত সমুদ্রবক্ষ হইতে অদৃশ্য বাষ্পরাশি অবিশ্রাম শূন্যমার্গে সমুত্থিত হইতেছে। আকাশ-মণ্ডলস্থিত বায়ুপ্রবাহে সেই বাষ্পরাশি ভূখণ্ড অভিমুখে চালিত হয়, এই যাত্রাপথে সহসা শীতলতার সংস্পর্শে উহার কিয়দংশ বৃষ্টিরূপে পৃথিবীবক্ষে পতিত হয়, অবশিষ্ট ভাগ পথিমধ্যস্থিত সু-উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গে প্রতিহত হয় এবং গিরিচূড়ার শৈত্য সংস্পর্শে উহা ধূমপুঞ্জের সৃষ্টি করে। ঐ ধূমরাশি হইতে নীহারকণা ঝরিয়া ঝরিয়া নিকটবর্ত্তী গিরিগাত্রে পতিত হয় এবং ফাটল ও ছিদ্রপথে পর্ব্বতের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া স্থানে স্থানে সঞ্চিত হইতে থাকে। পরে অত্যধিক শৈত্যে উহা তুষারে পরিণত হইয়া গিরিগাত্র বিদীর্ণ করে, উহার ফলে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড ভূমিতলে পতিত হয়। ক্রমে সেই তুষাররাশি গলিয়া ধারায় ধারায় পর্ব্বতের পাদদেশে নামিয়া স্রোতের আকার ধারণ করে এবং ভীমবেগে ভূপতিত শৈলখণ্ডগুলি বহন করিয়া নিম্নাভিমুখে ধাবিত হয়। পথে ঐরূপ অন্যান্য প্রবাহ আসিয়া উহার সহিত মিলিত হওয়ায় উহার গতিবেগ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

এইরূপে বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে করিতে জলপ্রবাহ যতই অগ্রসর হইতে থাকে, ততই উহা আকারে বর্দ্ধিত হয় এবং বেগও প্রচণ্ড হইয়া উঠে।

এইরূপ বহু পার্ব্বত্য স্রোতোধারার মিলনে এক একটি বেগবতী নদীর সৃষ্টি হয়। ক্রমে ঐ নদীগুলি পাহাড়-পর্ব্বত ভেদ করিয়া, বন-জঙ্গল অতিক্রম করিয়া, সমতল ভূমির বুকের উপর দিয়া সমুদ্রবক্ষে পতিত হয়। পর্ব্বত হইতে নীচে নামিবার সময় নদী যে উপলখণ্ড, পার্ব্বত্য খনিজপদার্থ ও মৃত্তিকা বহন করিয়া আনে, উহার চূর্ণ হইতে নূতন নূতন সমতল ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। সেই পলিমাটীর সংযোগে নদীর উভয় পার্শ্বস্থিত তটভূমি উর্ব্বরতা লাভ করে। অন্যদিকে নদীসকল যে আবর্জ্জনাস্তূপ ও উপলখণ্ড সমুদ্রগর্ভে বহন করিয়া আনে, উহা লোকচক্ষুর অন্তরালে সঞ্চিত হইয়া নূতন নূতন ভূখণ্ড গড়িয়া তোলে।

সমুদ্রগর্ভে পতিত হইয়াও বারিরাশির বিশ্রাম নাই। উহা পুনরায় বাষ্পাকারে শূন্যপথে উত্থিত হয়। এই প্রকারে পৃথিবীর বুকে অবিরাম সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কার্য্য চলিতেছে। নদী এই মহান্ সৃষ্টি-লীলার নিত্য সহচরী ও প্রধানা কর্ম্মকর্ত্রী। এই পুণ্যময়ী অমৃতধারাগুলি, পৃথিবীকে ফলফুলে সুশোভিত করে, ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ করে। ধরাবাসীর ক্ষুধায় অন্ন, তৃষ্ণায় জল প্রদান করিয়া তাহাদের জীবন রক্ষা করে।

নদীই বাণিজ্যের প্রধান অবলম্বন। শত শত বাণিজ্য-তরী নদীবক্ষ বাহিয়া অবিরাম দেশ-বিদেশে গমনাগমন করিতেছে। বণিক্‌সম্প্রদায় স্বদেশের দ্রব্যজাত বিদেশে রপ্তানি:করিয়া এবং বিদেশের পণ্য-সম্ভার স্বদেশে আমদানি করিয়া দেশের সম্পদ্ বৃদ্ধি করেন, দেশবাসীর অভাব মোচন করেন।

লৌহ

.লৌহ নামক ধাতব পদার্থের আবিষ্কারের পর মানব-সমাজে সর্ব্ব-বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। সেইজন্য এই কালকে লৌহ-যুগ নামে অভিহিত করা হয়। জলবায়ুর ন্যায় লৌহও মানবের জীবন-ধারণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়াই বোধ হয়। করুণাময় ভগবান্ এই খনিজ পদার্থে

ভূগর্ভ পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। এইজন্য লৌহ মানবের পরম সম্পদ্ হইলেও এত সুলভ।

আমরা যে লৌহ ব্যবহার করি ভূগর্ভে তাহা ঠিক ঐ অবস্থায় থাকে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহকণা ভূগর্ভে গন্ধক, মাটী প্রভৃতি পদার্থের সহিত মিশ্রিত থাকে। খনি হইতে ঐ মিশ্রিত পদার্থ উত্তোলন করিয়া নানা বৈজ্ঞানিক উপায়ে উহা হইতে বিশুদ্ধ লৌহ নিষ্কাশিত করা হয়।

লৌহ ওজনে জল অপেক্ষা সাড়ে সাতগুণ ভারি। বিশুদ্ধ লৌহের বর্ণ রৌপ্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল, কিন্তু জল-বাতাসের সংস্পর্শে আসিলে উহা অতি সত্বর মলিনত্ব প্রাপ্ত হয়। ভারতবর্ষ, ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মানি, রাশিয়া, সুইডেন ও আমেরিকায় প্রচুর লৌহ পাওয়া যায়।

পূর্ব্বে এদেশে খনিজ লৌহকে নিম্নোক্ত প্রকারে ব্যবহারোপযোগী করিয়া লওয়া হইত। বড় বড় চুল্লীর উপর সুবৃহৎ তাম্র কটাহ বসাইয়া উহাতে খনি হইতে উত্থিত মিশ্রিত লৌহ জ্বাল দেওয়া হইত। প্রবল অগ্নির উত্তাপে উহা দ্রবীভূত হইলে লৌহ-অংশ আপনা হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে। ঐ লৌহকে 'ঢালা লোহা' বলা হয়। কিন্তু তখনও উহাতে কিয়ৎপরিমাণ অন্যান্য দ্রব্য মিশ্রিত থাকায় উহা ঘাতসহ হয় না। এজন্য ঢালাই লোহার দ্রব্যাদি সহজে ভাঙিয়া যায়। ঢালাই লোহাকে পুনরায় অগ্নির উত্তাপে দ্রবীভূত করার পর যখন উহা ক্রমশঃ শক্ত হইয়া আসে তখন উহাকে নেহাইয়ের উপর রাখিয়া হাতুড়ির আঘাতে পিটাইয়া পিটাইয়া ব্যবহারের উপযোগী করা হইত। উহাকে 'পেটা লোহা' বলে। লৌহ হইতেই ইস্পাত প্রস্তুত হয়। পেটা লোহার সহিত কিছু অঙ্গার মিশ্রিত করিয়া একটি মাটীর পাত্রে পুরিয়া উহার মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইত। তাহার পর অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা করিলে, উহা কোমল ইস্পাতে পরিণত হইত। হঠাৎ জলে ফেলিয়া ঠাণ্ডা করিলে উহা কঠিন ইস্পাতে পরিণত হইত। কোমল ইস্পাত স্থিতিস্থাপক এবং কঠিন ইস্পাত ভঙ্গ-প্রবণ।

অতি প্রাচীনকাল হইতে মনুষ্য-সমাজে লৌহের ব্যবহার চলিয়া

আসিতেছে। বর্ত্তমানে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে লৌহ ব্যবহারের প্রাচুর্য্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখন দেশে দেশে বিরাট লৌহ-কারখানা বসিয়াছে। সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বর্ত্তমানে বিশুদ্ধ লৌহ ও ইস্পাত প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়। প্রয়োজনানুসারে কত বিভিন্ন প্রকার ও বিভিন্ন গুণসম্পন্ন লৌহ যে বর্ত্তমানে প্রস্তুত হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। কল-কব্জা, রেলগাড়ী, ট্রামগাড়ী, জাহাজ, স্তম্ভ ও সেতুর ত কথাই নাই, যুদ্ধ ব্যাপারেও লৌহ একান্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ। ইহা ছাড়া লৌহ হইতে নানাবিধ ঔষধও প্রস্তুত হয়। মানব-দেহের উপর লৌহের রাসায়নিক ক্রিয়াও অদ্ভুত।

হাজী মহম্মদ মহ্‌সীন

যে সমুদয় মহামানবের আবির্ভাবে মর্ত্তলোক পবিত্র হইয়াছে, যাঁহারা স্বীয় নিষ্কলঙ্ক চরিত্র প্রভাবে দেবত্বের অধিকারী হইয়াছেন এবং অকাতরে নিজের সর্ব্বস্ব মানবকল্যাণে উৎসর্গ করিয়া জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন, তাঁহাদের মধ্যে মহাপ্রাণ হাজী মহম্মদ মহ্‌সীন অন্যতম। এই সর্ব্বস্বত্যাগী ধর্ম্মবীরের আবির্ভাবে মুসলমান-সমাজ চিরগৌরবান্বিত; অলৌকিক আত্ম-ত্যাগের মহিমায় ইনি স্বজাতির মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন।

১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী হুগলী শহরে মহ্‌সীন জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম হাজী ফৈজুল্লা। বাল্যকাল হইতে স্বধর্ম্মের প্রতি মহ্‌সীনের আন্তরিক অনুরাগ পরিলক্ষিত হইত। ইনি বাল-সুলভ ক্রীড়া-কৌতুক পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা কোরান পাঠ শ্রবণ, ধর্ম্মালোচনা ও নির্জ্জনে আত্মচিন্তা করিতে ভালবাসিতেন। আগা সিরাজী নামক একজন চরিত্রবান্ অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপর ইহার শিক্ষাভার ন্যস্ত হইয়াছিল। অতি অল্প দিনের মধ্যে মেধাবী মহ্‌সীন আরবী ও ফারসী ভাষায় সবিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। বাল্যকালেই ইনি ফারসী ভাষায় সুন্দর সুন্দর ধর্ম্মমূলক কবিতা রচনা করিতেন। সঙ্গীতবিদ্যাতেও ইহার যথেষ্ট পারদর্শিতা জন্মিয়াছিল।

মহ্‌সীন শৈশবে মাতৃহীন হইলে, ইহার পূজনীয়া জ্যেষ্ঠা ভগিনী মন্নুজান ইহাকে জননী-স্নেহে প্রতিপালন করেন। সাংসারিক ভোগ-সুখের প্রতি মহম্মদ মহ্‌সীন চির-উদাসীন ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী শত চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে সংসারী করিতে পারেন নাই। তিনি আজীবন কৌমার্য্য-ব্রত পালন করিয়া গিয়াছেন।

১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে গৃহত্যাগ করিয়া সুদীর্ঘ সাতাশ বৎসরকাল ইনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ও আরব, পারস্য, তুর্কিস্থান প্রভৃতি দেশে দরবেশের ন্যায় ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। ইহার ভগিনী বিধবা হইলে বাধ্য হইয়া ইনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। মন্নুজান বিপুল সম্পদের অধিকারিণী ছিলেন। তাঁহার সন্তানসন্ততি না থাকায়, তিনি সমস্ত সম্পত্তি হাজী মহম্মদ মহ্‌সীনের নামে দান-পত্র করিয়া যান। সংসারবিরাগী মহ্‌সীন সেই অতুল সম্পদ্ আতুর অনাথের সেবায় উৎসর্গ করিলেন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, ঐ অর্থ মুক্তহস্তে অকাতরে দীন-দুঃখীকে দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি ছদ্মবেশে দরিদ্রপল্লীতে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। কাহারও কোন অভাব, কোন দুঃখের কথা জানিতে পারিলে তিনি গোপনে গোপনে তাহাদের সকল অভাব মোচন করিতেন। মহাপ্রাণ মহ্‌সীনের পবিত্র জীবনকাহিনী অতীতযুগের দানবীর নরপতিগণের ইতিহাস স্মরণ করাইয়া দেয়। মহ্‌সীনের অলৌকিক দান-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অদ্যাপি বহু গল্প শুনিতে পাওয়া যায়।

মৃত্যুর পূর্ব্বে মহ্‌সীন তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি বিবিধ জন-হিতকর সদনুষ্ঠানে দান করিয়া গিয়াছেন। হুগলীর উপাসনা-মস্‌জিদ্ ইমামবারা হাজী মহম্মদ মহ্‌সীনের অক্ষয়কীর্ত্তি বক্ষে ধারণ করিয়া অদ্যাপি সগৌরবে বিরাজ করিতেছে। এখনও তাঁহার অর্থে কত দীন-দরিদ্র বালক বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে, কত বিদ্যালয়, কত চিকিৎসালয়, কত সদাব্রত এই আত্মত্যাগী মহাপুরুষের দানে পরিপুষ্ট ও পরিচালিত হইতেছে তাহা চিন্তা করিলেও কৃতজ্ঞতায় মস্তক আপনা হইতে অবনত হয়।

ভূমিকম্প

যে সমুদয় আকস্মিক দৈব-দুর্ব্বিপাকে সহসা মানব-সমাজের সর্ব্বনাশ ঘটে, ধ্বংসের হাহাকারে গগন বিদীর্ণ হয়, উহার মধ্যে ভূমিকম্পই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ। জল-প্লাবন, ঝড়-ঝঞ্ঝা, অতিবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপ্লবে মাঝে মাঝে মানুষের চরম দুর্গতি, মহা সর্ব্বনাশ ঘটিলেও উহা হইতে আত্মরক্ষা করিবার তবুও অবসর পাওয়া যায়। ভবিষ্যতে উহার করাল গ্রাস হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায়ও মানুষ আংশিকভাবে করিতে পারে, কিন্তু ভূমিকম্পের ভয়ঙ্করী বিভীষিকা হইতে মুক্তিলাভের কোন উপায়ই আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রকৃতি রাক্ষসীর এই আকস্মিক তাণ্ডবলীলায় মুহূর্ত্তমধ্যে শতাব্দীর রচনা ধূলিসাৎ হইয়া যায়। কত সুন্দরী নগরী, কত সমৃদ্ধ জনপদ, কত চিরশ্যাম শস্যক্ষেত্র যে এই মহারাক্ষসের করাল কবলে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, উহা চিন্তা করিলেও সর্ব্বাঙ্গ শিহরিত হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিহার অঞ্চলে ও বেলুচিস্তানের কোয়েটা শহরে ভূমিকম্পের যে দানবীয় ধ্বংসলীলা প্রকট হইয়াছিল উহার আতঙ্কময় স্মৃতি এখনও এদেশবাসীর চিত্তে সমান জাগরূক রহিয়াছে। সেই মহাকালের করালগ্রাসে কত শত পরিবার যে সবংশে মরিয়াছে, কত অট্টালিকা যে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে আজও বুক কাঁপিয়া উঠে। অথচ এই মহাসঙ্কট হইতে মুক্তিলাভের কোন শক্তিই মানুষের নাই। দাম্ভিক মনুষ্য-সন্তান মহাকালের নিকট যে কত দুর্ব্বল, কত অসহায় উহা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্যই বোধ হয় বিশ্ব-নিয়ন্তা মাঝে মাঝে এইরূপ সংহারমূর্ত্তি ধারণ করেন।

ভূমিকম্পের মূল কারণ এখনও যথার্থরূপে নির্ণীত হয় নাই। ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মধ্যে এ বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, ভূগর্ভ অগ্নিময় তরল পদার্থে পরিপূর্ণ, ভূপৃষ্ঠের শীতল জলধারা কোনরূপে উহাতে প্রবেশ করিলে, সেই উত্তপ্ত তরল পদার্থ সহসা প্রবলবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। উহার ফলে ভূপৃষ্ঠ আলোড়িত হয়।

কাহারও মতে ভূগর্ভে শিলাস্তর উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত আছে, কোন কারণে উহার একটি স্তর ফাটিয়া স্থানচ্যুত হইলে, পার্শ্বস্থিত স্তরগুলি পর পর স্থানচ্যুত হইতে থাকে, সেই কারণে ভূপৃষ্ঠ মুহুর্মুহু কম্পিত হয়। আর এক শ্রেণীর পণ্ডিত বলেন, আগ্নেয়গিরিই ভূকম্পনের মূল কারণ। মাঝে মাঝে ভূগর্ভস্থিত অগ্নিময় তরল পদার্থ আগ্নেয়গিরির ছিদ্রপথে বাহির হইয়া আসিতে চায়। উহা এরূপ প্রচণ্ড তেজে বহির্গত হইবার চেষ্টা করে যে সেই ধাক্কায় পৃথিবীর উপরিভাগ কাঁপিতে থাকে। কারণ যাহাই হউক, ভূমিকম্প নিবারণ করা যে মানুষের সাধ্যাতীত, একথা সকল পণ্ডিতই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন।

মাতাপিতার প্রতি কর্ত্তব্য

বন্য, বর্ব্বর, অসভ্য, সুসভ্য নির্ব্বিশেষে সকল জাতির নৈতিক জীবন আলোচনা করিলে দেখা যায়, মাতাপিতার প্রতি সন্তানের কর্ত্তব্য বিষয়ে প্রত্যেক জাতিই সচেতন। পৃথিবীর যাবতীয় নীতি-শাস্ত্রে এই পবিত্র দায়িত্ব পালন সম্বন্ধে যথেষ্ট উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রে পিতামাতাকে কেবল সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়া বর্ণনা করা হয় নাই, তাঁহাদের নিত্যপূজা ও প্রণাম-মন্ত্রও রচিত হইয়াছে। 'পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ' প্রণাম-মন্ত্রটি আমাদের জাতীয়জীবনকে মহিমান্বিত করিয়া রাখিয়াছে। এমন কোন কবি নাই, সাহিত্যিক নাই, যিনি জনক-জননীর বন্দনা-গান, মহত্ত্ব-বর্ণনা না করিয়াছেন। বেদে-পুরাণে, মহাভারতে-রামায়ণে কত বিচিত্র ভাবে এই পবিত্রতম সম্পর্কটি পরিস্ফুট করিয়া তোলা হইয়াছে যে, উহা চিন্তা করিলেও হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। পিতৃসত্য-পালন উপলক্ষ্য করিয়াই রামায়ণ মহাকাব্যের সৃষ্টি। মাতৃ-আজ্ঞা-পালন করিতে পঞ্চপাণ্ডবের কি অদ্ভুত আচরণ! পিতার মনস্তুষ্টির জন্য শান্তনু-নন্দনের আত্মত্যাগ স্বর্গের দেবতাগণকেও স্তম্ভিত করিয়াছিল। পিতার জন্য পুরুর কুষ্ঠবরণ স্মরণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া

উঠে। এইরূপ অসংখ্য মহিমময় আদর্শে আমাদের জাতীয় সাহিত্য পরিপূর্ণ।

ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ করা আমাদের ভাগ্যে ঘটিতে পারে না, কিন্তু যাঁহারা আমাদের সাক্ষাৎ জন্মদাতা, যাঁহাদিগের অপার করুণায় আমরা দুর্ল্লভ মানব-জন্ম লাভ করিয়াছি, যাঁহারা আমাদের কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছেন—আমাদের ক্ষুধায় অন্ন, তৃষ্ণায় জল, বাল্যে শিক্ষা, দীক্ষা ও আনন্দদানে তিলে তিলে বর্দ্ধিত করিয়াছেন—রোগে, শোকে, অভাবে অত্যাচারে আমাদিগকে বুকে ধরিয়া সান্ত্বনা দিয়াছেন, রক্ষা করিয়াছেন—যাঁহাদের স্নেহ-করুণার অভাবে আমরা একদিনও জীবন-রক্ষা করিতে পারিতাম না, সেই পরম স্নেহময় মাতাপিতা যে আমাদের প্রত্যক্ষ দেবতা, আরাধনার বস্তু, তাহাতে আর সন্দেহ কোথায়? আজীবন একান্তচিত্তে, একনিষ্ঠ মনে তাঁহাদের চরণ-সেবা, অকুণ্ঠিতচিত্তে তাঁহাদের আদেশ পালন, প্রাণপণ যত্নে তাঁহাদের মনস্তুষ্টি সাধন যে সন্তানমাত্রেরই অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য, এ কথা কে অস্বীকার করিবে? জগতে এমন নরাধম পাষণ্ড কে আছে যে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা জনক-জননীর প্রাণে ব্যথা দিয়া স্বয়ং ভোগসুখে নিমগ্ন থাকে?

মশক

মশক অতিক্ষুদ্র ও অতিতুচ্ছ প্রাণী হইলেও, বর্ত্তমানে বহু বিশেষজ্ঞ এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসক উহাদের নগণ্য জীবন-ইতিহাসের আলোচনায় নিমগ্ন আছেন। দেশে দেশে মশকের ক্রিয়া-কলাপ ও জন্ম-মৃত্যু সম্বন্ধে গবেষণার অন্ত নাই। মশক-জীবনের ইতিহাস ও মনুষ্যদেহে উহাদের রোগ-সংক্রামণের প্রণালী বড়ই বিচিত্র।

পৃথিবীর যাবতীয় মশক-কুলকে প্রধানতঃ তিনটি জাতিতে বিভক্ত করা হইয়াছে; যথা—অ্যানোফিলিস্, কিউলেক্স্ ও ষ্টেগোমায়া। ষ্টেগোমায়া পীতজ্বর ও ডেঙ্গুজ্বর মনুষ্যদেহে সংক্রামিত করে। সৌভাগ্যক্রমে এই জাতীয় মশক এদেশে খুবই কম। অ্যানোফিলিস্ জাতীয় মশকী এবং কিউলেক্স

জাতীয় মশক যথাক্রমে ম্যালেরিয়া রোগের বীজাণু ও 'ফাইলেরিয়াসিস্' নামক হস্তপদ-স্ফীতি রোগের কীটাণু নিজ নিজ দেহে বহন করে ও মনুষ্যের রক্ত শোষণকালে মনুষ্যদেহে তাহা চালনা করে।

মশকেরা ভিজা স্যাঁতসেঁতে স্থানেই বাস করিতে ভালবাসে। মশকীরা সাধারণতঃ শৈবালপূর্ণ খানা, ডোবা ও ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর স্রোতহীন জলে, ছোট গর্ত্তের জলে, পরিত্যক্ত নারিকেলের মালায়, ভাঙ্গা হাঁড়ি-কলসীর মধ্যে সঞ্চিত বৃষ্টির জলে, নালা-নর্দ্দমার ময়লা জলে ডিম পাড়ে। উহারা একসঙ্গে দেড়শত হইতে আড়াইশত ডিম পাড়ে। কিউলেক্স জাতীয় মশকীর ডিমগুলি একত্র পঞ্চাশ হইতে এক শতটি দানা বাঁধিয়া জলের উপর ভাসিতে থাকে। অ্যানোফিলিসের কতকগুলি করিয়া ডিম একটি সাধারণ কেন্দ্রে এক প্রান্ত সংলগ্ন করিয়া ফোটা ফুলের পাপড়ির মত চারিদিকে ছড়াইয়া অথবা পাশাপাশি গায়ে গায়ে লাগিয়া ভাসিতে থাকে। প্রসূত হইবার দুই তিন দিন পরে ডিমগুলি ফুটিয়া অতিক্ষুদ্র শুঁয়াপোকার ন্যায় এক প্রকার লোমযুক্ত কীট বাহির হয়। ইহাদিগকে শূককীট বলে। ইহারা অনবরত জলের মধ্যে ছুটাছুটি করিয়া খেলা করে এবং মাঝে মাঝে জলের উপর মুখ তুলিয়া শ্বাসবায়ু গ্রহণ করে। ছোট ছোট মৎস্য ও ব্যাঙাচি শূককীটের পরম শত্রু। আট দশ দিন পরে শূককীটগুলি ক্ষুদ্র কাঁকড়া বিছার আকার ধারণ করে। উহাকে মূককীট বলে। ২।৩ দিন পরে মূককীটের খোলস ভেদ করিয়া মশক-শিশু বাহির হইয়া আসে।

পুরুষজাতীয় মশক সাধারণতঃ এক মাস কাল এবং স্ত্রীজাতীয় মশক তিন চারি মাস কাল বাঁচিয়া থাকে। মশকের চক্ষে অসংখ্য তারকা,—সেইজন্য মশকের দৃষ্টিশক্তি খুব প্রখর এবং উহারা একসঙ্গে সকল দিকে দেখিতে পায়। দুই চক্ষুর মাঝখানে মশকের হুল, উহা ছুঁচের মতই তীক্ষ্ণ এবং সহজেই মানুষের গাত্রচর্ম্ম ভেদ করে। ঐ ফাঁপা হুলের সাহায্যে মশক মানুষের রক্ত শোষণ করে। শুঁড়ের পাশে খেজুরছড়ির মত এক জোড়া গোঁফ আছে; ইহার দ্বারা মশকেরা শ্রবণের কাজ চালায়।

সকল জাতীয় পুরুষ মশক নিতান্ত নিরীহ ও নিরামিষ-ভোজী। উহারা জীবদেহ স্পর্শও করে না। একমাত্র স্ত্রী-মশকই মনুষ্যের রক্ত পান করে। ডিম্ব ধারণের সময় উহাদের রক্তপিপাসা প্রবল হইয়া উঠে। একবার পেট পূরিয়া রক্ত পান করিলে, দুই তিন দিন আর আহারের প্রয়োজন হয় না। হুল বসাইবার সময় মশকী তাহার মুখ হইতে দষ্ট স্থানে এক প্রকার লালা ঢালিয়া দেয়। এই উগ্র লালার জন্যই মশার কামড়ে জ্বালা বোধ হয়। লালার সাহায্যে উহারা পানের পূর্ব্বে রক্তকে তরল করিয়া লয়। অ্যানোফিলিস মশক কিউলেক্স মশক অপেক্ষা আকারে একটু ছোট। অ্যানোফিলিসের ডানায় কয়েকটি কালো কালো দাগ থাকে। ইহারা উড়িবার সময় কোন শব্দ হয় না। কিউলেক্সের ডানা দুইটি স্বচ্ছ এবং গায়ে কালো ডোরা কাটা থাকে; ইহারা উড়িবার সময় সোঁ সোঁ শব্দ হয়। অ্যানোফিলিস্ দিনের বেলা বড় একটা বাহির হয় না, রাত্রিকালে আহার অন্বেষণে বাহির হয়। কিউলেক্স দিনের বেলাও স্বচ্ছন্দে উড়িয়া বেড়ায়।

ডাকঘর

ডাক-বিভাগ ইংরাজ-শাসনের এক অপূর্ব্ব দান। এরূপ সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খল কর্ম্মপদ্ধতি ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের আর কোন বিভাগে নাই বলিলেও চলে। ইহা ইংরাজ জাতির কর্ম্মকুশলতা ও নিয়ন্ত্রণ-শক্তির পূর্ণ অভিব্যক্তি। এত সুলভে ও স্বল্প সময়ের মধ্যে দেশ-দেশান্তরে সংবাদের আদান-প্রদান পূর্ব্বকালে মানবের স্বপ্নাতীত ব্যাপার ছিল। সমগ্র ডাকবিভাগের ত কথাই নাই, একমাত্র ডেড্ লেটার অফিসের কার্য্য-প্রণালী পর্য্যালোচনা করিলে, বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। যে সমুদয় চিঠি পত্রের ঠিকানায় ভুল থাকে, অথবা যে সকল মণিঅর্ডার, রেজেষ্ট্রী-পত্র প্রভৃতির মালিকের সন্ধান পাওয়া যায় না ও প্রেরকের ঠিকানাতেও ভুল থাকে, উহার প্রকৃত মালিককে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য এই বিভাগে হাজার হাজার লোক নিযুক্ত রহিয়াছে।

ইহারা সামান্য একখানি পত্রের জন্য কত যে কঠোর পরিশ্রম স্বীকার করে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

প্রত্যেক ডাকঘরের কার্য্য-প্রণালী একরূপ। এমন কি উহার বাহ্যিক আকারেও অদ্ভুত সামঞ্জস্য দেখা যায়। প্রত্যেক লেটার-বক্স (ডাক-বাক্স বা চিঠি ফেলিবার পাত্র) সর্ব্বত্র একরূপ। ডাকঘরের উপর ঝুলান সাইনবোর্ড-খানিও ঠিক একরকম। অফিস ঘরের আসবাব-পত্র, সাজ-সরঞ্জামও এক-প্রকার। অফিস ঘরের ভিতর জিনিস-পত্রও সর্ব্বত্র একই প্রকারে সজ্জিত করিয়া রাখা হয়। প্রত্যেকদিন একই সময়ে ঘড়ি ধরিয়া অফিস খোলা ও বন্ধ করা হয়। ডাক-বিভাগের সামান্য ত্রুটিও অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়। ডাকঘরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে এখন ডাকমাশুল লাগে, পূর্ব্বে লাগিত না। এখন প্রায় গ্রামে গ্রামে ডাকঘর স্থাপিত হইয়াছে। প্রত্যেক ডাকঘরে সাধারণ চিঠি পাঠান, মনি-অর্ডার করা, রেজেষ্ট্রী করা, পার্সেল পাঠান, ইন্‌সিওর প্রভৃতি কাজ হয়। ইহা ছাড়া কোন কোন ডাকঘরে সেভিংস্ ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখা হয় এবং আবশ্যকমত টাকা উঠান হয়। যে সকল ডাকঘরে টেলিগ্রাফ আছে, সেখানে টেলিগ্রামের আদান-প্রদান চলে। ইহা ছাড়া সাধারণের সুবিধার জন্য মফঃস্বলের প্রতি ডাকঘরে বিক্রয়ার্থ কুইনাইন রাখা হয়। শহরের বড় বড় ডাকঘরে বেতার-লাইসেন্স রেজেষ্ট্রী করা হয়। প্রত্যেক গ্রাম্য ডাকঘরে একজন অথবা দুইজন করিয়া পিয়ন থাকে। উহারা প্রত্যহ বাড়ী বাড়ী চিঠি ও মনি-অর্ডার প্রভৃতি বিলি করিয়া বেড়ায়। একজন রানার থাকে, সে নিকটবর্ত্তী রেল-ষ্টেশনে অথবা ষ্টীমার-ঘাটে প্রত্যহ ডাক পৌঁছাইয়া দেয়। পোষ্ট-মাষ্টারবাবু লেখাপড়ার কাজকর্ম্ম করেন। ডাকঘর বড় হইলে, কেরাণী থাকে। প্রধান প্রধান শহরে ডাক-বিভাগের হেড্ অফিস্ স্থাপিত হয়। উহার অধীনে বহু সাব-অফিস থাকে। আবার প্রত্যেক সাব-অফিসের অধীনে কতকগুলি করিয়া ব্রাঞ্চ অফিস থাকে। ব্রাঞ্চ অফিস হইতে ডাক সাব-আফিসে পাঠান হয়। সাব-অফিস উহা হেড্ অফিসে পাঠাইয়া দেয়, হেড্ অফিস হইতে ঐগুলি দেশ-বিদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে।

রেলগাড়ী, ষ্টীমার, বাসযোগে কোথাও বা ঘোড়ার গাড়ীতে ডাক পাঠান হয়। মুসলমান রাজত্বে ঘোড়ার ডাক ছিল বটে, কিন্তু উহার দ্বারা জনসাধারণের কোন সুবিধা হয় নাই। পূর্ব্বকালে সংবাদ পাঠাইতে হইলে লোক মারফৎ উহা পাঠান ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না।

তোমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় গ্রন্থ

যত বই পড়িয়াছি তাহার মধ্যে কোন্‌টি আমার সব চেয়ে ভাল লাগিয়াছিল জিজ্ঞাসা করিলে যে নাম প্রথমেই মনে জাগিয়া উঠে, তাহা অতি পুরাতন। ভারতবর্ষের প্রতিমানবের কণ্ঠে যুগ যুগ ধরিয়া এই নাম ধ্বনিত হইতে হইতে অতি-পরিচিত হইয়া গিয়াছে। তবু বিরাট ভারতবর্ষের বিশাল সভ্যতার সমগ্র রূপটি লইয়া অমর জ্যোতিতে ফুটিয়া রহিয়াছে সেই নাম—'মহাভারত'।

এই কাব্যখানি যেন অনন্ত রসের সাগর,—যতই পড়ি, ততই তাহাতে ডুবিতে থাকি। কোন দিকে সীমা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এইজন্য এই বইখানিকে কোন দিনই পড়িয়া শেষ করিয়া চুকাইয়া দেওয়া যায় না, বার বার পড়িতে ইচ্ছা করে। আর এ ইচ্ছা তো আমার একার নয়; দেখিতেছি ভারতে অতি প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত, রাজার প্রাসাদ হইতে দরিদ্রের পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত, সমান আদর লাভ করিয়া আসিতেছে এই কাব্যখানি। অনন্তকাল ধরিয়া হৃদয়ে হৃদয়ে প্রবাহিত হইয়া আসিয়া ইহার মধ্যে যেন এক নূতনতর রসধারা সঞ্চারিত হইয়াছে। পঞ্চপাণ্ডবের ভাগ্যের উত্থান-পতনের সঙ্গে অসংখ্য ভক্তিমৌন শ্রোতৃবর্গের দীর্ঘনিঃশ্বাস বিজড়িত। ভীষ্মের আত্মত্যাগ, কর্ণের অপূর্ব্ব বীরত্ব, তেজস্বিনী দ্রৌপদীর দুর্দ্দশার মধ্যেও অবিচল মহিমা, গান্ধারীর পতিপ্রাণতা—বর্ত্তমান যুগের কলকারখানার ধূমরাশির ও যন্ত্রের ঘর্ঘরধ্বনির মধ্যে এ সব কাহিনী প্রায় অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয়, কিন্তু এই কাহিনীগুলির মধ্য দিয়া আমাদের দেশের এক গৌরবোজ্জল

যুগের সন্ধান পাই, কল্পনায় ভাসিয়া উঠে আমাদের শাশ্বত সনাতন ভারতবর্ষের গৌরবময় স্বরূপ—আর শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে মন ভরিয়া উঠে।

মহাভারত যেন একটি বিরাট বিচিত্র চরিত্র-চিত্রশালা। এখানে কেবল মহত্ত্ব নয়, মানবহৃদয়ের উদারতা ও গভীরতা নয়, নৃশংস নীচতা কপটতার ছবিও নিপুণ তুলিকায় অঙ্কিত দেখিতে পাই। মানব-চরিত্রে যে কত নিগূঢ় বৈচিত্র্য থাকিতে পারে, তাহা এখানে কবি নিঃশেষে দেখাইয়াছেন। এখানে আসিয়া কান পাতিলে শুনিতে পাওয়া যাইবে কত দিক্ হইতে কত বিচিত্র ধারায় নৃত্য-চঞ্চল অগণিত জীবন-তরঙ্গিণী কলধ্বনি তুলিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। ভাল-মন্দের সংমিশ্রণে নানা বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতে এই কাব্য-কাহিনীর মধ্যে একটি বৈরাগ্যময়, বিষাদময় মহান্ গম্ভীর সুর নিয়ত বাজিতেছে। সমস্ত বৈচিত্র্যের অন্তরালে এই সুরটি মর্ত্ত্যের দুয়ার অতিক্রম করিয়া স্বর্গলোকের অভিমুখে প্রবাহিত। এ-সুরের সহিত মিশিয়াছে কত নূতন ঝঙ্কার, কিন্তু সরল গম্ভীর এই সুরটিকে আড়াল করিতে পারে নাই।

মহাভারতের অনন্ত বৈচিত্র্য ও গভীরতাকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে একটি পরিপূর্ণ অপরিমেয় শান্তি। ইহা না থাকিলে মহাভারতের বৈচিত্র্যময় ঘটনার স্রোত অতিশয় ক্লান্তিকর হইয়া উঠিত। কিন্তু সকল বাহুল্য এবং বৈচিত্র্যকে অতিক্রম করিয়া যে একটি নিতান্ত সরল শান্তিপূর্ণ বৈরাগ্যের ছবি ইহার ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহারই সৌন্দর্য্য যুগ যুগ ধরিয়া কত মানুষকে আকর্ষণ করিয়াছে, তাহার সীমা নাই—সংখ্যা নাই। কর্ম্মের উদ্দীপনা ও জয়ধ্বনি-মুখরিত আবেগ-চঞ্চল জীবনের বিপুল প্রয়াসে উদ্দীপ্ত,—আবার ত্যাগ-বৈরাগ্যের পুণ্য-প্রভায় সমুজ্জ্বল, প্রাচীন ভারতের সর্ব্বাঙ্গীণ সাধনার একটি নিখুঁত চিত্র এই মহাভারত। কোন দেশের মর্ম্মকথাকে কোন কবি বোধ হয় এত সুন্দরভাবে মাত্র একখানি গ্রন্থে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই।

সংসারের খর-তাপে তপ্ত জীবনের জ্বালা জুড়াইবার জন্য, নিয়ত ধাবমান কর্ম্মপ্রবাহ হইতে মুহূর্ত্তের মত অবসর লইবার জন্য, মানুষ এখানে আসিয়া ঐ শান্তির মধ্যে অবগাহন করিয়া শ্রান্ত তৃষিত প্রাণের পিপাসা মিটাইয়া লয়।

তাই দেখিতে পাই, রাজকার্য্যের অবকাশে রাজা উৎকণ্ঠিত মনের উদ্বেগ-শান্তির জন্য পাঠকের মুখে শোনেন মহাভারতের বিচিত্র কাহিনী, আবার মুদির দোকানে মুদি তাহার ভাঙ্গা চশমাটি নাকে লাগাইয়া কাজের ফাঁকে ফাঁকে সুর করিয়া পড়িয়া যায়—"মহাভারতের কথা অমৃত সমান"।

সমস্ত ভারতবর্ষের হৃদয়কে মহাভারত একসুরে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। যুগ যুগ ধরিয়া অসংখ্য পাঠকের হাসি-অশ্রু-বেদনা-বিস্ময়-করুণার স্রোত আসিয়া এই মহাসমুদ্রকে স্ফীত, সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে এবং ইহার মহাবৈচিত্র্যময় সঙ্গীত-ধারার মধ্যে এক অনির্ব্বচনীয় কলতান ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিয়াছে। এই-জন্যই মহাভারত কখনও পুরাতন হয় না। ইহাতে জীবনের শাশ্বত প্রশ্ন ও তাহার সমাধান, বিপরীত স্বার্থ ও আদর্শের সংঘাতের অমোঘ পরিণাম, দুর্ব্বার নিয়তি ও পুরুষকারের সংঘর্ষ আছে বলিয়া মহাভারত চিরকালের সম্পদরূপে পরিগণিত হইবে। সাহিত্যের আদর্শ বা উদ্দেশ্য লইয়া তর্কবিতর্কের অন্ত নাই। কিন্তু মহাভারত চিরকালই রসপিপাসু ও জিজ্ঞাসু মানব-মনের 'রসায়ন' বলিয়াই বিবেচিত হইবে।

মহাভারতের মধ্যে কেবল রসমাধুর্য্য নয়, সুদৃঢ় বলিষ্ঠতারও পরিচয় পাওয়া যায় ইহা ভারতবর্ষের গৃহে গৃহে কল্যাণময় আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, নিরক্ষর অশিক্ষিত দরিদ্র কৃষকের মধ্যেও একটি সুসংযত সরল অনাড়ম্বর ধর্ম্মভাবকে ফুটাইয় তুলিয়াছে, শত দুঃখ-দারিদ্র্য-ঝঞ্ঝাবিপর্য্যয়ের মধ্যেও জনগণের চিত্তে একটি সকরুণ ধৈর্য্যের ভাব জাগাইয়া রাখিয়াছে। কত নরনারী যে এই গ্রন্থ হইতে 'অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। লোকের বিশ্বাস কল্পতরুর নিকট প্রার্থনা করিলে অভীষ্ট বর প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহাভারত ভারত-সন্তানের পক্ষে সেই কল্পতরু। কত অনুতপ্ত হৃদয় ইহা হইতে শান্তিলাভ করিতেছে; কত শোকজীর্ণ প্রাণ ইহা হইতে সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইতেছে; কত স্বদেশবৎসল ইহা হইতে বীরত্ব ও স্বদেশপ্রেম শিক্ষা করিতেছেন এবং কত ভাবুক পুরুষ ইহা হইতে কবিশক্তি পরিপোষণের সহায়তা প্রাপ্ত হইতেছেন'। এক কথায় জীবনের মহাশিক্ষা ভারতবর্ষ লাভ

করিয়াছে এই মহাভারতে। এইজন্য কাব্যরসের ভাণ্ডার হইয়াও মহাভারত ধর্ম্মগ্রন্থের আসন লাভ করিয়াছে এবং ভারতের প্রাচীন আদর্শের প্রতি, উদারতর শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্বের প্রতি মানুষের যতদিন শ্রদ্ধা থাকিবে, মহাভারত ততদিন ভারতবর্ষের গৃহে গৃহে সগৌরবে বিরাজ করিবে।

শ্রমের মর্য্যাদা

এদেশে একটি গল্প প্রচলিত আছে—কোনও নবাব নাকি জুতা ফিরাইয়া দিবার লোক না থাকায় শত্রুহস্তে বন্দী হইয়া প্রাণ দিয়াছিলেন তথাপি শেষ পর্য্যন্ত নিজের জুতায় হস্তক্ষেপ করিয়া আত্মমর্য্যাদা নষ্ট করেন নাই। এইরূপ কোন আসল নবাবের কথা ইতিহাসের পাতায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, কিন্তু সেকালে এইরূপ শত শত ক্ষুদ্র নবাব আমাদের সমাজে বাস করিতেন, যাঁহারা সর্ব্বপ্রকার কায়িক পরিশ্রমকে আত্মমর্য্যাদার হানিকর বলিয়া মনে করিতেন।

নিজের কাজ নিজে করিলে মান থাকে না, কায়িক পরিশ্রমে ভদ্রলোকের মর্য্যাদা নষ্ট হয়—আত্মসম্মানের এমন সর্ব্বনাশকর সংজ্ঞা বোধ হয় পৃথিবীর অন্য কোন জাতি আবিষ্কার করিতে পারে নাই।

কায়িক পরিশ্রম আত্মসম্মানের অণুমাত্র হানিজনক নহে, বরং উহাই মানব-সমাজের উন্নতির প্রধানতম কারণ। সর্ব্ববিধ পার্থিব উন্নতি ও অভ্যুদয় শ্রম-সামর্থ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। মানবজাতির স্থিতি ও পরিপুষ্টির মূলেও রহিয়াছে অপরিহার্য্য শ্রম-শক্তি। জগতের যাবতীয় কার্য্যই শ্রমসাপেক্ষ। কায়িক পরিশ্রমই শিল্পী ও বৈজ্ঞানিকের উদ্ভাবনী শক্তিকে বাস্তব সত্যে পরিণত করিয়া উহা মানবের কল্যাণে নিয়োজিত করে, সার্থক করে। মানসিক শক্তি ও কায়িক পরিশ্রম অঙ্গাঙ্গিভাবে সংযুক্ত। একের অভাবে অপরটি পঙ্গু হইয়া পড়ে। চিন্তা ও চেষ্টা, বুদ্ধি ও শক্তি, অর্থ ও সামর্থ্য—পরস্পর যুক্ত না হইলে এ জগতে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হইতে পারে না।

পাহাড় কাটিয়া, বন্যজন্তু ও প্রতিকূল প্রকৃতির সহিত অবিরাম যুদ্ধ করিয়া যাহারা জীবন রক্ষা করিয়াছে, মরুভূমিতে যাহারা সোনা ফলাইয়াছে, আজও যাহারা বিরাট সভ্যতার ভার নিজ মস্তকে বহন করিতেছে, যাহাদের বাহু-বলের উপর জাগতিক সমস্ত উন্নতি নির্ভর করিতেছে, তাহাদের কাজকে নীচ বা অমর্য্যাদাকর মনে করা যে কতদূর অস্বাভাবিক তাহা আমরা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারি। মানব-সমাজের আদিম অবস্থায় কায়িক শ্রম অমর্য্যাদাকর ছিল না। তখন রাজা-মহারাজাও স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন, সম্ভ্রান্ত পদস্থ ব্যক্তিগণও নানা প্রকার কাজ করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। আদিম সমাজ ক্রমে জটিলতর হইল, কার্য্যের শ্রেণীভেদ ক্রমে পাকাপাকি হইয়া উঠিল, বুদ্ধিজীবী একদল লোকের আবির্ভাব হইল যাঁহারা মাথার জোরে সমাজের নিকট খাতির পাইতে লাগিলেন—কায়িক পরিশ্রম সাধারণ লোকের জন্য থাকিল—যাহারা মাথা খাটাইতে পারে তাহারা কায়িক পরিশ্রমসাধ্য কাজকর্ম্ম ধীরে ধীরে ত্যাগ করিল। যতদিন সামাজিক ব্যবস্থা সরল ছিল, একই লোক বিভিন্ন কাজ করিত, ততদিন কায়িক পরিশ্রম অসম্মানজনক কি না—এ প্রশ্নই উঠে নাই। কার্য্যবিভাগের ফলে যখন পরিশ্রমের কাজ কেবল সাধারণ লোকের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল, বুদ্ধিজীবিগণ মাথা খাটাইয়া সমাজে সম্ভ্রম পাইতে লাগিলেন ও অর্থ-ঐশ্বর্য্য লাভ করিলেন, তখন মানসিক শ্রম ও কায়িক পরিশ্রমের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি হইল। তারপর কলকারখানার সৃষ্টি হওয়াতে অর্থশালী বুদ্ধিমান্ লোক টাকা খাটাইয়া প্রচুর ঐশ্বর্য্যের মালিক হইতে লাগিল—এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমাজের আকৃতি আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। (অর্থহীন বুদ্ধিহীন লোকেই কায়িক পরিশ্রম করে এবং কোনও দেশেই এরকম লোকের অভাব নাই—উদরান্নের বিনিময়ে সমস্ত দিন ধরিয়া মাটী কাটিবার বা পাথর ভাঙ্গিবার লোক যথেষ্ট পাওয়া যায়। সমাজের পক্ষে ইহাদিগের উপযোগিতা যতই থাকুক না কেন, সমাজের চক্ষে উহারা সম্মান পাইল না এবং ক্রমে ইহাদের কাজও অসম্মানজনক বলিয়া পরিগণিত হইল।)

কন্তু আজ আবার বিশ্বের গতিচক্র ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে; জগতের শ্রমিক আজ সংঘবদ্ধ—এক নূতন আত্মচেতনা আজ সকলকে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিয়াছে। জগন্নাথের রথরজ্জু আকর্ষণ করিয়া যাহারা জগতের রথচক্রে গতি আনিয়া দিল, তাহারা কি কেবল চক্রতলে নিষ্পেষিত হইবে?—কায়িক শ্রম যাহারা করে তাহারা আজ বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহাদের শ্রম-সামর্থ্যের উপর জগতের বিপুল সভ্যতাসৌধ দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা আজ জানিয়াছে—শ্রম অসম্মানজনক নয়, তাই তাহারা আজ মাথা নীচু করিয়া অন্যের মুখাপেক্ষী হইয়া অসহায়ভাবে থাকিতে চাহিতেছে না, তাহাদের অস্তিত্ব, তাহাদের অধিকার সদম্ভে ঘোষণা করিয়া রাষ্ট্রপরিচালনায় পর্য্যন্ত তাহাদের দাবী প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছে। শ্রমকে অমর্য্যাদাকর মনে করিয়া শ্রমিককে ঘৃণা করা যে সমাজ-জীবনের নূতন আগন্তুক ব্যাধি, যন্ত্র-সভ্যতার যে ইহা একটি অবশ্যম্ভাবী কুফল—তাহা আজ সকলেই বুঝিতে পারিতেছে।

সকল দেশেই এই নবযুগের হাওয়া বহিতেছে। শ্রমিকগণের জাগরণে শ্রমের মর্য্যাদা আবার নূতন করিয়া স্বীকৃত হইতেছে। অবশ্য সকল দেশেই ভদ্রনামধারী বণিক্‌গণ আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া স্বার্থরক্ষার জন্য কলরব তুলিয়াছেন—সামাল, সামাল! কিন্তু কে কাহাকে সামলাইবে? সকলেই যে আজ বুঝিয়া ফেলিয়াছে—

When Adam delved and Eve span,
Who was then the gentleman?

বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি

বর্ত্তমানে আমরা রেলগাড়ী, উড়োজাহাজ, বিজলীবাতি প্রভৃতি বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলিকে এত সহজভাবে গ্রহণ করিয়াছি যে আমাদের অনেক সময়ে ভুল হইয়া যায় যে, মানব-সমাজ তো অনেক দিনই ইহাদিগকে বাদ দিয়া

চলিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের যে অচিন্ত্যপূর্ব্ব উন্নতির ফলাফল আমরা এখন প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহা কিঞ্চিদধিক একশত বৎসরের ঘটনা। উনবিংশ শতাব্দীতেই বিজ্ঞানের চতুর্দ্দিকব্যাপী উন্নতি ঘটিয়াছে; ইহার পূর্ব্বে মানুষ জলে নৌকাতে এবং স্থলে পশুচালিত যানে যাতায়াত করিয়াছে। কেরোসিন কি রেড়ীর তৈল জ্বালাইয়া ঘর আলোকিত করিয়াছে; আকাশপথে বিচরণের বা তারে বেতারে তড়িৎ শক্তিতে বার্ত্তাবহনের বা রেডিও বায়স্কোপের কল্পনা তো দূরের কথা, সামান্য বিজলীবাতির কল্পনাও কেহ করে নাই। বস্তুতঃ গত শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ইতিহাস আলোচনা করিলেই মনে হয় পৃথিবী যেন হঠাৎ বহুকালের সুষুপ্তি-ভঙ্গে নব নব সত্যের সন্ধানে অবিরাম গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে।

অবশ্য ইহারও পূর্ব্বে জগতের ইতিহাসে কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারই যে হয় নাই এমন নহে। কোন্ আদিম কালে মানুষ নৌকার ব্যবহার শিক্ষা করিয়াছে, কৃষিকার্য্য, পশুচালিত যানের ব্যবহার, বস্ত্রবয়ন প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় বিষয় উদ্ভাবিত করিয়াছে তাহা অনুমান করা যায় না। ইহার অনেক যুগ পরে বারুদের ব্যবহার এবং মুদ্রাযন্ত্র প্রবর্ত্তিত হয়। এখন বলা যাইতে পারে যে বর্ত্তমান সভ্যতা অনেকাংশে বারুদের সংহার-লীলা ও মুদ্রাযন্ত্রের জ্ঞান-প্রচারের উপর প্রতিষ্ঠিত।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগ আরম্ভ হইয়াছে প্রকৃতপক্ষে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ওয়াট-কৃত বাষ্পীয় যন্ত্রের আবিষ্কার হইতে। সেই সঙ্গে ইস্পাত প্রস্তুত করিবার সহজ উপায় আবিষ্কৃত হওয়ায় সর্ব্বত্র বাষ্পযন্ত্র ব্যবহারের কল্পনা আরম্ভ হইল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধেই আটলাণ্টিক মহাসাগরের এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত বাষ্প ও ইস্পাতের জাহাজ চলিল, মহাদেশের প্রত্যন্ত পর্য্যন্ত লৌহবর্ত্মের উপর দিয়া বাষ্প-চালিত রেলগাড়ী ছুটিতে লাগিল। তারপর আসিল বিদ্যুতের যুগ। লৌহের তারকে সম্বল করিয়া বিদ্যুতের কৃপায় দেশ হইতে দেশান্তরে সংবাদ আসিল। আমেরিকার মনস্বী এডিসন বিজলীবাতি, গ্রামোফোন, টেলিফোন প্রভৃতি আবিষ্কার করিলেন। আকাশের বিদ্যুৎ

পৃথিবীর ভৃত্য হইয়া দাঁড়াইল। অবশেষে ইটালীর কাউণ্ট মার্কনি বিনাতারে সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেন ; তাঁহার আবিষ্কারকে ভিত্তি করিয়া অল্প-কালের মধ্যে নূতন নূতন যন্ত্র উদ্ভাবিত হইল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মানুষের বায়ুপথে বিচরণ করার বহুকালের বাসনা পরিপূর্ণ হইল এবং দেখিতে দেখিতে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়োজাহাজ আকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। টেলিভিশন আবিষ্কারে পৃথিবীর ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল। এদিকে বীজাণুতত্ত্ব, রেডিয়ম, রণ্টজেন রশ্মি প্রভৃতি আবিষ্কৃত হওয়ায় চিকিৎসা-বিজ্ঞান অসাধারণ উন্নতি লাভ করিল। বস্তুতঃ বৈজ্ঞানিক অনু-সন্ধিৎসা ও সত্যপিপাসা মানুষের চোখের সামনে সীমাহীন জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিল।

বিজ্ঞানের এই কল্পনাতীত উন্নতিতে পৃথিবীর অশেষবিধ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। ষ্টীমার, রেলগাড়ী, মোটরগাড়ী, উড়োজাহাজের সাহায্যে স্থান হইতে স্থানান্তরে যাতায়াত সুকর হইয়াছে, তার-বেতারে বার্ত্তাপ্রেরণের দ্বারা ভাবের আদান-প্রদান অনায়াসসাধ্য হইয়াছে, প্রকৃতি যাহাদের মধ্যে সাগর প্রান্তর নদী পর্ব্বত স্থাপিত করিয়া পরস্পর বিচ্ছিন্ন রাখিতে চাহিয়াছিল, তাহারাও আজ বিজ্ঞানের সাহায্যে নিজেদের মধ্যে শিক্ষা-সংস্কৃতির যোগসূত্র খুঁজিয়া পাইয়াছে। স্থানের ব্যবধান দূরীভূত হওয়ায় সমগ্র মানবজাতির মধ্যে আত্মীয়তা বোধের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দ্বারা চতুর্দ্দিকে মানুষের সুখ ও সুবিধার বৃদ্ধি হইয়াছে। দৈনন্দিন জীবনে কায়িক পরিশ্রমের প্রয়োজন অনেকটা লঘু হইয়াছে। এখন বিজ্ঞানের ভোগৈশ্বর্য্যের মধ্যে বসিয়া শুধু কলকব্জার উপরে নির্ভর করিয়া মানুষ তাহার অভীষ্ট সাধন করিতে পারে। চিকিৎসা-শাস্ত্রের উন্নতিতে মহামারীর প্রকোপ কমিয়াছে, দেশে দেশে স্বাস্থ্যবিধায়ক নীতির প্রবর্ত্তন হইয়াছে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক সভ্যতার প্রতি বিজ্ঞানের সমগ্র দান এত গভীর ও ব্যাপক যে তাহার বর্ণনা সহজে শেষ হয় না। কিন্তু বিজ্ঞানের কথা

আলোচনা করিবার সময়ে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে এই উন্নতি মানুষের পক্ষে শুধুই সুখ ও শান্তিজনক হয় নাই, নানাবিধ অশান্তি ও কোলাহল বিজ্ঞান তাহার সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে। বিগত মহাযুদ্ধে বিজ্ঞানের ধ্বংসকরী লীলা প্রকাশ পাইয়াছে। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে এই মারণশক্তি আরও ভয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে দেখা যাইতেছে। কিন্তু মানুষ যদি বুদ্ধির দোষে ক্ষমতার অপব্যবহার করে তবে তাহার জন্য বিজ্ঞানকে অপরাধী করা চলে না। ভরসা করা যাইতে পারে যে, ক্রমশঃ কালাগত কুসংস্কার দূর হইলে নবলব্ধ জ্ঞান ও আদর্শের আলোকে মানুষ বিজ্ঞানের অলৌকিক ক্ষমতার যথেষ্ট সদ্ব্যবহার খুঁজিয়া পাইবে।

পল্লীজীবন ও নাগরিক-জীবন

নানা কারণে নাগরিক-জীবন দিন দিন যত প্রয়োজনীয় ও স্পৃহণীয় হইয়া উঠিতেছে, পল্লীগৃহের শান্তিময় জীবনযাত্রার প্রতি আগ্রহ ও উৎসাহ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিত্তে ততই বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে। শহরে শত দুঃখময় প্রবাস-জীবনকে যাহারা একদিন নিদারুণ অভিশাপ বলিয়া মনে করিত, আজ তাহারা সেখানে বাস করার সৌভাগ্যকে ভগবানের আশীর্ব্বাদ বলিয়া বরণ করিয়া লইতেছে। দীর্ঘ দিনের পর প্রবাসী যখন আপনার গৃহে যাত্রা করিত, কারামুক্ত বন্দীর ন্যায় তাহার মন প্রাণ আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিত। দূর হইতে পল্লী-জননীর ছায়া-সুনিবিড় শান্তিময় মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সে আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিত না। সেই স্নিগ্ধ শস্য-শ্যামল পল্লী-প্রান্তর, পিক-মুখরিত আম্রকানন, বনকুসুমের সুমিষ্ট মৃদু গন্ধ প্রবাসী বাঙ্গালীর বিচ্ছেদ-কাতর চিত্তকে অভিনন্দিত করিত। শহরের ইট-পাথরের কঠিন গণ্ডী পার হইয়া পল্লী-জননীর কোমল অঙ্কে বসিয়া পল্লীসন্তানের প্রাণ জুড়াইত। সে যেন নব-জীবন লাভ করিত। আর আজ উৎসব উপলক্ষে দু'দিনের জন্য বাড়ী গিয়াও সে শান্তি পায় না। খাঁচার পাখীর ন্যায় শহরের লোহার

খাঁচায় ফিরিয়া যাইবার জন্য সে ছটফট্ করে। যাহারা বাধ্য হইয়া দেশে বাস করিতেছে তাহারাও তৃপ্তি পায় না, শহরবাসী আত্মীয়ের সৌভাগ্য দেখিয়া তাহাদের দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে। এখন নাগরিক-জীবনের জন্য সকলেই যেন লালায়িত।

কেন এমন হইল? এই গ্রামে-গাঁথা বঙ্গভূমির গৃহপ্রিয় বাঙ্গালীর জীবনে এ আকস্মিক পরিবর্ত্তন কোথা হইতে আসিল? ইহার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই, ভোগবিলাসময় আধুনিক সভ্যতাই ইহার মূল। পাশ্চাত্ত্য সমাজের দুর্ব্বার ভোগবিলাস, আত্মসুখ ও স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তার উত্তাল তরঙ্গ বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের সকল সুখ-শান্তি শুধু গ্রাস করে নাই, তাহাদিগকে উন্মত্ত ও দিশেহারা করিয়া দেশত্যাগী করিয়াছে।

অনাড়ম্বর শান্তিময় পল্লী-জীবন আমাদের চিত্তকে আর পরিতৃপ্ত করিতে পারিতেছে না। যাঁহারা ধনী, যাঁহারা জমিদার—যাঁহারা পল্লীর প্রাণ-শক্তি, তাঁহারা সকলেই আজ নগরবাসী, নগরের নিত্য নূতন ভোগ-বিলাসে তাঁহারা নিমগ্ন হইয়া আছেন।

যাহারা কৃতী, উপার্জ্জনশীল, তাহারা দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনের স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করিয়া সপরিবারে শহরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতেছে, যাহারা অক্ষম, অসহায়, তাহারা পৈতৃক ভিটায় পড়িয়া পরস্পর বিবাদপরায়ণ হইয়া আছে। গ্রামের বিদ্যালয়গুলি উঠিয়া যাইতেছে—ছেলে নাই, দরিদ্র পল্লীবাসীর উপযুক্ত বেতন দিয়া ছেলে পড়াইবার শক্তিও নাই। স্নান-পানের জলাশয়গুলি মজিয়া গিয়াছে—বহু সরিক, পঙ্কোদ্ধারের অর্থ নাই, উপায়ও নাই। গ্রামে অভিজ্ঞ চিকিৎসক নাই—উচ্চ 'ভিজিট' দিয়া ভাল ডাক্তার ডাকিবার অর্থও গ্রামবাসীর নাই। কুটীর-শিল্পগুলি বিলুপ্তপ্রায়—বাজারে ক্রেতা নাই, অধিকাংশ লোক গ্রাম ছাড়িয়া নগরে বাস করিতেছে। যে পল্লী-ভবন একদিন স্বাস্থ্য, স্বচ্ছলতা ও আনন্দের আগার ছিল, সেখানে আজ কলহ, দৈন্য, রোগ-শোকের হাহাকার উঠিতেছে। পল্লী আজ শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। গ্রামবাসীর মধ্যে সদ্ভাব নাই, একতা নাই। জলপথগুলি অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, কেহ উহা

সংস্কারের চেষ্টা পর্য্যন্ত করে না। রাস্তা, ঘাট, বাগান, পুকুর, বন-জঙ্গলে ভরিয়া উঠিয়াছে। ম্যালেরিয়া, মহামারী বঙ্গপল্লীকে নির্জ্জন শ্মশানে পরিণত করিতেছে।

পল্লীগ্রামগুলিই বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের একমাত্র আশ্রয়। উহার উন্নতি অবনতির সহিত আমাদের জাতীয় জীবনের সুখ দুঃখ এক সূত্রে গ্রথিত। উহা ধ্বংস হইলে বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। এজন্য দেশের চিন্তাশীল নেতারা 'go back to village' আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। সভায় সভায় পল্লী-জীবনের সুখ-সম্পদ্ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন। গোলা-ভরা ধান, ক্ষেত-ভরা তরকারী, পুকুর-ভরা মাছ, গোয়াল-ভরা গরুর সুখময় স্মৃতি শহরবাসী পল্লী-সন্তানের চিত্তে জাগরিত করাইবার চেষ্টা করিতেছেন। দুঃখিনী পল্লী-জননীর এই অনায়াসলব্ধ স্নেহের দানে আর আমাদের অভাব ঘোচে না। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার বিশাল ক্ষুধা এই সুধায় পরিতৃপ্ত হয় না। আধুনিক সভ্যতার বাহ্য আড়ম্বর আমাদের সংসার-জীবন দুর্ব্বহ করিয়া তুলিয়াছে। কন্যার বিবাহ, সন্তানের শিক্ষা, চিকিৎসার আড়ম্বর, সামাজিক জীবনের ভদ্রতা, লৌকিকতা ও পৌর-জীবনের অনাবশ্যক চাল-চলন বজায়ের ব্যয় এরূপ অসম্ভব বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, বাড়ী বসিয়া পল্লী-জীবনের নিশ্চিন্ত আনন্দ উপভোগ করিবার পথ বুঝি আর নাই। রোগের মূল কারণ নির্ণয় ও নিবারণ না করিয়া বাহ্য প্রলেপে জাতীয় জীবন রক্ষা করা কখনই সম্ভব হইবে না।

পক্ষান্তরে নাগরিক-জীবনের সুখ-সুবিধাগুলি উত্তেজক ইন্‌জেক্‌সনের ন্যায় মুমূর্ষু বাঙ্গালী জাতিকে সাময়িকভাবে এখনও রক্ষা করিতেছে। এখানে শিক্ষা-সাধনার সুবিধা আছে, সুযোগও আছে। ব্যাবহারিক বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া উপার্জ্জনের অনেক পথও খুঁজিয়া বাহির করিতে পারা যায়। রোগ হইলে চিকিৎসারও ব্যবস্থা আছে, দরিদ্রের জন্য দাতব্য চিকিৎসালয়, হাসপাতাল খোলা রহিয়াছে। শহরে বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র—এখানে বুদ্ধিমান্ ও কর্ম্মক্ষম লোকের প্রায়ই কাজের অভাব হয় না। শহরের আকর্ষণও কম

নহে, বিচিত্র বিলাস-সম্ভারে নগরগুলি পরিপূর্ণ। নাচ, গান, থিয়েটার, বায়স্কোপ শহরবাসীর চিত্তবিনোদন করিতে পারে। কর্ম্মক্লান্ত অবসন্ন মন-প্রাণকে এই সমুদয় আমোদ-আহ্লাদের চাবুক মারিয়া সাময়িকভাবে উত্তেজিত করিতে পারা যায়। শহরের রাস্তা-ঘাট, পুষ্করিণী, পার্ক, উদ্যান, ময়দান মনোহর ও চিত্তাকর্ষক। এইজন্য নাগরিক-জীবন লাভ করিতে সকলেই লালায়িত। কিন্তু হাভাতের সুখ বৈকুণ্ঠেও মিলে না। শহর ধনবানের বিলাসক্ষেত্র হইতে পারে, দরিদ্রের পক্ষে যমালয়। অখাদ্য আহারে, অসংযত ব্যবহারে বদ্ধ গলির বিষাক্ত বাতাসে দিন দিন অকালমৃত্যুর সংখ্যা বাড়িয়াই যাইতেছে। শহরবাসের রকমারি খরচ সঙ্কুলান করিতে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া, দরিদ্র নাগরিক স্ত্রী-পুত্র-পরিবারকে পথে বসাইয়া পরপারে যাত্রা করিতেছে। অধিকাংশ বাঙ্গালীই নাগরিক-জীবন ও পল্লী-জীবনের দোটানার মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে।

সন্তোষ

মানুষের আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই। রাস্তার ধারে যে ভিক্ষুক সামান্য দুইটি পয়সার জন্য প্রতিটি পথিকের নিকট হাত পাতিয়া থাকে সেই আকাঙ্ক্ষিত দুইটি পয়সা পাইলেই তাহার মনে হয় আর দুইটি পয়সা পাইলে যেন ভাল হইত। সেই আশায় আর দুইটি পয়সার জন্য সে আবার নূতন করিয়া পথচারীর বিরক্তি উৎপাদন করিতে থাকে। সুন্দর গাড়ীতে চড়িয়া পেট্রোলের ধোঁয়া ও ধূলিতে নিরীহ পথিককে ব্যতিব্যস্ত করিয়া যে ধনীর দুলাল বায়ু সেবনার্থে বাহির হইয়াছে তাহার মনেও তৃপ্তি নাই। সে হয়তো ভাবিতেছে তাহার মত দুঃখী ত্রিসংসারে কেহ নাই, সে যাহা চাহিয়াছে তাহার কিছুই পায় নাই। আবার নিরীহ পথিক রাস্তার একধারে সরিয়া আসিয়া গাড়ীটির দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে—'আহা, একখানা গাড়ী যদি থাকতো!' তাই কোন দিক্ দিয়া কেহই যেন তৃপ্তি ও শান্তি লাভ করিতে পারিতেছে না।

কেবল ভোগ-ঐশ্বর্য্যের ভিতরে কোন ব্যক্তি চরম পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। ভোগ-ঐশ্বর্য্যের সহস্র উপকরণ মানুষের দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করিতে পারে, কিন্তু অন্তরের তৃপ্তি দিতে পারে না। আকাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মনের অতৃপ্তি বাড়িতে থাকে। আলেকজাণ্ডার পৃথিবীর অধিপতি হইয়াও দুঃখ করিয়াছিলেন—আর কোন পৃথিবী নাই যে তিনি জয় করিতে পারেন।

একটু বিবেচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি, প্রকৃত শান্তি ও তৃপ্তি ভোগ-ঐশ্বর্য্যের উপর নির্ভর করে না—ইহা নির্ভর করে মনের একটি বিশেষ অবস্থার উপর। মনে যদি সর্ব্বদা একটা সন্তোষের ভাব বিরাজমান থাকে তাহা হইলে বাসনা কামনার আগুন আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। অবশ্য ইহা মনে করিলে ভুল হইবে যে আমরা কিছুই কামনা করিব না। কামনাশূন্য হইয়া অরণ্যে বাস করা চলে, সংসারে বাস করা অর্থহীন হইয়া দাঁড়ায়। সংসারে বাস করিতে হইলে জীবনের পূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু লাভে যত্নবান্ হইতে হইবে। কিন্তু সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে, কেবল জাগতিক বস্তু লাভই জীবনের আদর্শ নয়। প্রাত্যহিক জীবনের অভাব অভিযোগ দূর করিয়া যাহাতে একনিষ্ঠভাবে সমাজের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করা যায় সেইভাবে জীবনকে গঠন করিতে হইবে।

মনে যদি শান্তি বা তৃপ্তি না থাকে তাহা হইলে কেবল যে নিজের জীবনই বিষময় হইবে তাহা নহে, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনও অশান্তিময় হইয়া উঠিবে। এজন্য প্রয়োজন সর্ব্বদা মনে মনে পরিতৃপ্ত থাকা। যে ব্যক্তি নিজের স্বার্থ ব্যতীত আর কিছুই জানে না, তাহার পক্ষে মনের সন্তোষ বজায় রাখা কঠিন। নিজের দুঃখে মগ্ন না থাকিয়া সংসারের দিকে চাহিলে দেখা যাইবে আমাদের অপেক্ষা দুঃখী লোকের সংখ্যা কত অধিক। তাহাদের সহিত নিজের তুলনা করিলে ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ সামান্য বলিয়া বোধ হইবে। মানসিক শান্তির জন্যই যে এই সন্তোষ প্রয়োজন তাহা নহে, জীবন-যুদ্ধে জয়লাভ করিতে হইলে এমনি একটা সন্তোষের ভাব না থাকিলে প্রতিপদে

ভাঙিয়া পড়িতে হয়। কেননা দুঃখে অত্যধিক কাতর হইলে অগ্রসর হইবার ক্ষমতা লোপ পায়। অতৃপ্তি ও অশান্তি প্রতিমুহূর্ত্তে উৎসাহ উদ্যম বিনষ্ট করে। 'আমার মত দুঃখী বুঝি কেহ নাই' এই চিন্তা লইয়া থাকিলে পথের ধারে বসিয়া কেবল হাহাকার করিয়া জীবন কাটাইতে হইবে।

উপযুক্ত শিক্ষা ও সংযম না থাকিলে মনের সন্তোষ বজায় রাখা সম্ভব নহে। নিজের ক্ষমতা বিচার করিয়া কাম্যবস্তু নির্ণয় ও তাহা লাভে প্রবৃত্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এইভাবে যাহা লাভ করিলাম তাহা লইয়া সন্তুষ্ট থাকা এবং যাহা পাইলাম না তাহার জন্য হাহাকার না করা—ইহাই শিক্ষা করিতে হইবে, নতুবা পরশ্রীকাতরতা, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি মানুষকে পশুর মত করিয়া তুলিবে। এই শিক্ষা লাভ করিতে হইলে দৃষ্টিভঙ্গী বদ্‌লাইতে হইবে এবং চিত্তবৃত্তিগুলিকে সংযত রাখিতে হইবে।

অবশ্য অনেকে বলেন মানুষের দুর্জ্জয় কামনা বাসনা না থাকিলে সভ্যতার উৎকর্ষ সাধিত হয় না। মানুষের প্রতিদিনের অভাব বাড়িতেছে, মানুষ কিছুতেই তৃপ্ত হইতে পারিতেছে না বলিয়াই বর্ত্তমান সভ্যতার বিজয়-সৌধ গগন স্পর্শ করিয়াছে। বর্ত্তমান সভ্যতায় মানুষের ভোগ-ঐশ্বর্য্যের উপকরণ প্রতিদিন বাড়িতেছে, অনেক দিক্ দিয়া আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আসিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু শান্তি কোথায়? বর্ত্তমান সভ্যতার শ্রেষ্ঠ লীলাভূমি আমেরিকা, সেখানকার স্কাইস্ক্রেপার হইতে লাফাইয়া পড়িয়া মানুষ আত্মহত্যা করিতেছে, চারিদিকে অশান্তি উদ্বেগ এইরূপে বাড়িয়াই চলিয়াছে। বর্ত্তমান পৃথিবীর দিকে চাহিলে এই কথা মনে হয়, মানুষ যেন নিজের কামনা বাসনার আগুনে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে। যে শিক্ষা ও সংযম থাকিলে তাহার জীবনে গভীর শান্তি আসিতে পারে সে আজ তাহা হারাইয়াছে। প্রত্যেকের জীবনে সেই শিক্ষা ও সংযমের প্রয়োজন, যাহা শত দুঃখ-কষ্টের ভিতরেও তাহাকে ধীর, সংযত ও সন্তুষ্ট রাখিবে, যাহা শত দুঃখ-কষ্টের পঙ্কিল আবর্ত্ত হইতে তাহাকে উদ্ধার করিবে।

নিয়মানুবর্ত্তিতা

বাহির হইতে চাহিয়া দেখিলে মনে হয় পৃথিবী অনন্ত সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ; কিন্তু একটু ভাবিলেই বুঝা যায়, এই সৌন্দর্য্যের মধ্যে একটা কঠিন নিয়মের বন্ধন রহিয়াছে। গ্রহতারা নিয়মে ঘুরিতেছে, ঋতুচক্র নিয়মে আবর্ত্তিত হইতেছে, আকাশের সূর্য্যকিরণরাশি হইতে আরম্ভ করিয়া সদ্য উদ্‌গত তৃণখণ্ডটুকু—সকলের মধ্যেই একটা নিয়ম রহিয়াছে। বিশ্বপ্রকৃতিতে কোন জিনিষই এলোমেলো খাপছাড়া বিশৃঙ্খল নয়।

"ছন্দে উঠিছে চন্দ্রমা, ছন্দে কনক রবি উদিছে
ছন্দে জগ-মঙ্গল চলিছে।"

বস্তুতঃ ইহারই প্রয়োজন ছিল। এত কঠিন নিয়মে ছন্দোবদ্ধ না হইলে এমন অসীম সৌন্দর্য্য ধরিত না। বিশ্বজগতের মত আমাদের জীবনেও একটা নিয়ম শৃঙ্খলা মানিয়া চলিবার প্রয়োজন আছে। অন্যকে পিষিয়া মারিবার জন্য নয়, জীবনের আনন্দ সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিবার জন্যই চরিত্রের মধ্যে একটা দৃঢ়, অপ্রমত্ত সংযমের প্রয়োজন। শিথিলপ্রকৃতি যে, তাহার হাত হইতে আনন্দের উপকরণ সহজেই এলাইয়া খসিয়া পড়ে, ভোগ করিবে সে কেমন করিয়া?

কেবল ভোগের জন্য নহে—মনুষ্যত্বের একটা পরিচয় পাই সংযমের শক্তিতে। মানুষের মধ্যে প্রকৃতি কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তি রহিয়াছে। প্রবৃত্তিগুলি যে মানুষ রাশ টানিয়া বশে রাখিতে পারে, সেই প্রকৃত মনুষ্যত্বের আদর্শ লাভ করিয়াছে। প্রবৃত্তির বশে যে ছুটাছুটি করিয়া মত্ত হইয়া বেড়ায়, পশুর সঙ্গে তাহার স্বভাবগত বিশেষ কোনো পার্থক্য নাই। কতকগুলি নিয়মের কতকগুলি সংযমের সাধনা এইজন্যই মনুষ্যত্ব লাভের পথে একটি প্রধান সহায়।

নিয়ম শৃঙ্খলা না থাকিলে সমাজ গড়িয়া উঠিত না। আজ যে আমরা শান্ত শিষ্ট হইয়া সমাজে বাস করিতেছি, আমাদের ধনপ্রাণ নিরাপদ আছে, বন্ধুর

সহিত বন্ধু নিশ্চিন্তচিত্তে বিশ্রম্ভালাপ করিয়া আনন্দ পাইতেছে, ইহার তলে তলে সুকঠোর নিয়মজাল প্রসারিত থাকিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিতেছে।

ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনে নিয়মের প্রয়োজন যে খুব বেশী, তাহা আমাদের দেশের শাস্ত্রকারগণ বুঝিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা আহারে, বিহারে, কাজে কর্ম্মে, চালচলনে সর্ব্বত্রই এত কঠিন শৃঙ্খলার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। অল্পবয়সে নিয়মশিক্ষা করিলে যে উপযুক্ত ফল দর্শে, তাহা বুঝিয়া, তাঁহারা বাল্য হইতেই কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালনের বিধি দিয়াছেন। এই সমস্ত কঠোরতার মূলে সংস্কারকের হৃদয়হীনতা নয়, অতি দূরপ্রসারিত কল্যাণদৃষ্টি, সামাজিক শুভবুদ্ধি রহিয়াছে। শিষ্যকে জীবনের পথে অগ্রসর করিয়া দিবার, তাহাকে বলবীর্য্যশালী করিয়া তুলিবার প্রচেষ্টা রহিয়াছে। আমরা মনে করি, আর্য্য বালকেরা বল্কল পরিয়া, হরিতকী খাইয়া বেদাধ্যয়নে শুষ্কভাবে দিন যাপন করিত। উহাতে জীবনের সরসতা নষ্ট হওয়ায় কেবল দুর্ব্বাসা মুনিই বুঝি তৈয়ারী হইত। কিন্তু আমরা ভুলিয়া যাই যে, স্বাস্থ্যপূর্ণ আনন্দোজ্জ্বল জীবন লাভের জন্য এইরূপ নিয়মানুবর্ত্তিতার প্রয়োজন ছিল, তাহা শুধু শুষ্কতার তপস্যা নহে। ইহার ফলে প্রাচীন ভারতবর্ষ জ্ঞানে গুণে চরিত্রে যে আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছে, আজও তাহার মূল্য কিছুমাত্র কমে নাই।

নিয়মানুবর্ত্তিতা শিক্ষা করিবার প্রকৃত সময় ছাত্রজীবন। এই সময়টিতে এই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিলে ইহা সহজেই চরিত্রের সম্পদ্ হইয়া দাঁড়ায়। গুরুজনের প্রতি বাধ্যতা, বিনয়, সময় সম্বন্ধে শৃঙ্খলা-রক্ষা—সমস্তই ঐ বিশেষ গুণটির অন্তর্ভুক্ত। আর এই সকল বিষয়ে লক্ষ্য রাখা ছাত্রের স্বাধীনতা বিকাশের পরিপন্থী নহে। জলপ্রবাহ যখন কূলের বাঁধন মানিয়া বহিয়া চলে তখনই তাহা কল্যাণময়ী নদীরূপা। কত শ্যামল শস্যক্ষেত্রে সোনা ফলাইয়া সাগরের অভিমুখে মহাসার্থকতার পথে তাহার যাত্রা। আর যখন উন্মত্ত তরঙ্গাঘাতে দুই তীর ছাপাইয়া জলস্রোত বন্যার মূর্ত্তি ধারণ করে, তখন তাহা কেবল বিনাশ সাধনেই তৎপর। প্রকৃত স্বাধীনতা সমস্ত নিয়মকে মানিয়া চলে, নিয়মের বন্ধনের মধ্যে সমস্ত খেয়ালকে সংযত রাখিয়া

নিজের এবং অপরের কল্যাণার্থে নিজের ইচ্ছাকে বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় না।

প্রাচীনকালের স্পার্টার দেশনায়কগণ ইহা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা ছিল, দেশের প্রত্যেকটি মানুষকে যথার্থ মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে। তাই তাঁহারা সুকঠোর নিয়মের মধ্যে রাখিয়া যে সকল মানুষ গড়িয়াছিলেন তাহাদের বীর্য্য, চরিত্রবল, শরীরের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য আজ পর্য্যন্ত জগতের বিস্ময়ের বস্তু হইয়া রহিয়াছে।

পারিবারিক বা সামাজিক জীবনে, জেলে, হাসপাতালে, ফ্যাক্টরীতে, কারখানায়—সর্ব্বত্রই শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া চলিবার প্রয়োজনীয়তা অসীম। নিয়ম ও শৃঙ্খলা না থাকিলে কোন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে পারে না, শৃঙ্খলার অভাবে বহুদিনের সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানও ভাঙ্গিয়া পড়ে। যুদ্ধক্ষেত্রে শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভব করা যায়। জীবনের সকল ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা রক্ষার অভ্যাস আয়ত্ত করিতে না পারিলে কোন দিন কোন জাতিই বড় হইতে পারে না।

একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা

সে-কালের তুলনায় এদেশের আর্থিক অবস্থা বর্ত্তমানে অপেক্ষাকৃত উন্নত হইলেও, হিন্দু গৃহস্থের সংসার-জীবন দিন দিন অশান্তিময় হইয়া উঠিতেছে, শান্তিময় ও আনন্দময় ভাবটি যে ক্রমশঃই হিন্দু-সমাজ হইতে বিলুপ্ত হইতেছে তাহাতে তিলমাত্র সন্দেহ নাই। হিন্দু-চরিত্রের স্বাভাবিক উদারতা, আতিথেয়তা, ধর্ম্মপরায়ণতা ও স্বজন-বাৎসল্য ক্রমশঃ বিরল হইয়া আসিতেছে, একথা দূরদর্শী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। যে যে কারণে হিন্দুর সংসারজীবনে এই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথার বিলোপ উহার অন্যতম। যাঁহারা পাশ্চাত্ত্য আদর্শের অনুরাগী তাঁহারা হিন্দু-সমাজের এই প্রাচীন প্রথাটির বিরুদ্ধে অনেক অনুযোগ করিয়া থাকেন।

তাঁহাদের অভিমতগুলিও অসার বা অযৌক্তিক নহে। পাশ্চাত্ত্য সমাজের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু একটি ঔষধ কোন এক বিশিষ্ট রোগীর পক্ষে যতই মূল্যবান্, উপকারী ও শক্তিশালী হউক না কেন, উহা সর্ব্বক্ষেত্রে সমান কার্য্যকরী হইতে পারে না। যে প্রথায় পাশ্চাত্ত্য সমাজের কল্যাণ সাধিত হইয়াছে, উহা হিন্দু-সমাজের পক্ষেও কল্যাণকর কিনা তাহা সর্ব্বপ্রথমে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। যে কল্যাণকর প্রেরণা হইতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ পাশ্চাত্ত্য সমাজে সমুদ্ভূত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই ভাবটির সহিত হিন্দুর জাতীয়-জীবনের ভাবধারার কতদুর সামঞ্জস্য, ঐ প্রেরণাটি হিন্দু-সমাজের উপযোগী কিনা, প্রথমে উহাই চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে।

রামায়ণ আমাদের জাতীয় মহাকাব্য। এই মহামূল্য গ্রন্থখানির মধ্যে হিন্দুর সংসার-জীবনের প্রকৃত আদর্শ অমরত্ব লাভ করিয়াছে। রামায়ণে বর্ণিত পিতৃভক্তি, মাতৃ-স্নেহ, ভ্রাতৃ-অনুরাগ, পত্নী-প্রেম, প্রিয়জনের প্রণয়-প্রীতির আদর্শই হিন্দু-হৃদয়ের পবিত্র ভাবধারা। জাতি যদি বাঁচে, এই প্রেম-নির্ঝরিণীর অমৃতবারি পান করিয়াই বাঁচিবে। আমরা বণিক্‌জাতির সংশ্রবে আসিয়া কেবল লাভ-লোকসানের সূক্ষ্ম হিসাব সুনিপুণভাবে শিক্ষা করিয়াছি, একান্নবর্ত্তী পরিবারের ব্যক্তিগত আর্থিক ক্ষতিটাই খুব বড় করিয়া দেখিতে শিখিয়াছি। সহোদরকে গলগ্রহ বলিয়া, অক্ষম আত্মীয়-স্বজনের প্রীতির আশ্রয়ের সহিত 'পরের মাথায় কাঁঠাল' রাখার তুলনা দিয়া আনন্দানুভব করি। রাম-লক্ষ্মণের দেশে এই নির্ম্মম মন্তব্যগুলি কত অসার, কত মর্ম্মভেদী—হিন্দু-গৃহীর স্বাভাবিক হৃদয়-বৃত্তি যাঁহার মধ্যে এখনও বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট আছে, যিনি এখনও ভিতরে বাহিরে পুরা সাহেব হইয়া উঠিতে পারেন নাই, তিনিই তাহা বুঝিতে পারেন।

ক্ষতিবৃদ্ধি তুচ্ছ কথা—এই পরম কল্যাণকর প্রথাটির বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-গৃহীর সকল সাধনা যে একেবারে ব্যর্থ হইয়া গেল, ধর্ম্ম-কর্ম্ম, জীবনের লক্ষ্য যে রসাতলে গেল, সে কথা কেহ একবার চিন্তা করিয়াও দেখেন না।

ইংরাজের ন্যায় ঐহিক সুখ ভোগ করাই আমাদের একমাত্র কাম্য নহে। আমরা গৃহী হইয়া 'সংসার-ধর্ম্ম' পালন করিতাম। এই প্রথাটিকে অবলম্বন করিয়া, গৃহদেবতার নিত্যপূজা, অতিথিসেবা, আত্মীয়-কুটুম্বের আদর অভ্যর্থনা, লোক-লৌকিকতা প্রভৃতি জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক পুণ্যময় অনুষ্ঠানগুলি নিয়মিতভাবে সুসম্পন্ন হইত। বার মাসে তের পার্ব্বণ, পারিবারিক উৎসব অনুষ্ঠান সুবৃহৎ যৌথপরিবারের জীবনকে আনন্দময় করিয়া রাখিত। এই প্রীতি ও আনন্দের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়া শিশু-চরিত্র আপনা হইতে সুগঠিত হইয়া উঠিত। ধর্ম্ম, নীতি, জ্ঞান, নিষ্ঠা, সদাচার, ভদ্রতা তাহাদের মনে আপনা হইতেই সঞ্চারিত হইতে পারিত।

আর আজ আমরা স্ব স্ব স্ত্রী-পুত্র লইয়া শহরে শহরে বেদেদের ন্যায় টোল ফেলিয়া বেড়াইতেছি। আমাদের ধর্ম্ম-কর্ম্মহীন বাসাড়ে জীবন আত্মসুখ ভোগ ও আহার-বিহারে পর্য্যবসিত হইয়াছে। যে আর্থিক ক্ষতি রোধ করিতে অসহায় আত্মীয়-পরিজনকে একমুষ্টি শাকান্ন হইতে বঞ্চিত করিয়া আমরা সোনার সংসার ছারখার করিলাম, এখন তাহা বাড়ীভাড়ায়, উড়ে ঠাকুরে, নেপালী চাকরে লুটিয়া খাইতেছে। যিনি যাহাই উপার্জ্জন করুন না কেন, কোথায় উড়িয়া যাইতেছে, এক কপর্দ্দকও কেহ বড় সঞ্চয় করিতে পারেন না। বরং অনেকে দেনার জ্বালায় অস্থির হইয়া, অসহায় স্ত্রী-পুত্রকে পথে বসাইয়া হতাশ-চিত্তে পরলোকযাত্রা করিতেছেন। অথচ একান্নবর্ত্তিতার ন্যায় এত বড় সুচিন্তিত ও সুনিশ্চিত জীবনযাত্রা-প্রণালী পৃথিবীর অন্য কোন জাতি কল্পনা করিতে পারে নাই। একদিন এই আত্মীয়-পালনের অপব্যয়ের ভিতর দিয়াও আমরা বাস্তভিটা করিয়াছি, পুকুর কাটিয়াছি, বাগান করিয়াছি, দু'দশ বিঘা জমিজমাও কিনিয়াছি, বাড়ীতে দোল-দুর্গোৎসবও হইয়াছে, মৃত্যুকালে স্ত্রীপুত্রকে উপযুক্ত অভিভাবকের হস্তে অর্পণ করিয়া পরম শান্তিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছি। সেকালের এত অল্প আয় ও তথাকথিত অপব্যয়েও গৃহস্থ-সংসারে মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের অভাব কোন দিন ঘটে নাই। অসহায় শিশু মানুষ হইয়া

আবার সংসারের ভার মাথায় করিয়া লইয়াছে। অকালমৃত্যু, আকস্মিক বিপদ্ কখনও একান্নবর্ত্তী পরিবারকে পথে বসাইতে পারে নাই। আমরা দশে মিলিয়া একের অভাব পূর্ণ করিয়াছি, পরিবারের কাহাকেও হীন বৃত্তি অবলম্বন করিতে দিই নাই। আজ আমরা সঙ্কীর্ণ প্রবৃত্তির বশে অক্ষম উপার্জ্জনহীন আত্মীয়ের উপর যত হীন অপবাদের বোঝা চাপাই না কেন, সেই শাকান্নের পরিবর্ত্তে যে স্বর্গীয় প্রতিদান আমরা পাইতাম, কোন পার্থিব বস্তুর সহিত তাহার তুলনা হয় না। সংসারে উপার্জ্জনশীল ব্যক্তির উপর আশ্রিত পরিজনের কি আন্তরিক অনুরাগ, কি অসীম ভালবাসা, অসুখে-বিসুখে আপদে-বিপদে নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়া কি প্রাণঢালা-সেবা, সমবেদনা! এখন মনে হয়, নিজের বুদ্ধির দোষে, তুচ্ছ অর্থের লোভে আমরা আজ কি অমূল্য সম্পদ্ই না হারাইয়াছি। এখন যিনি মাসে হাজার টাকা উপার্জ্জন করেন, মোটরে চড়েন, দশজন চাকর দারোয়ান পোষেন, সমাজে মহা গণ্যমান্য, তাঁহারও অক্ষম সহোদর একমুষ্টি অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, হীন কাজ করে, অপমানিত হয়, তিনি স্বচ্ছন্দে উহা উপভোগ করেন। আবার তাঁহার মৃত্যুর পরই দেখিতে পাই, তথাকথিত সমৃদ্ধ পরিবারের যথাসর্ব্বস্ব নিলামে উঠিয়াছে, পরিবার গাছতলায় বসিয়াছে। এইরূপে কত বর্দ্ধিষ্ণু পরিবার যে দিন দিন ধ্বংস হইয়া যাইতেছে—কে তাহার হিসাব রাখে? একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথার বিলোপে কেবল আমাদের সাংসারিক শান্তিই নষ্ট হয় নাই, জাতির আর্থিক দৈন্যও চরমে উঠিয়াছে।

যুদ্ধ

মানুষ যুদ্ধ করে কেন? পৃথিবী এমনই সুন্দর শস্যশ্যামল, সূর্য্যের আলোক এমনই উজ্জ্বল,—কোমল উষ্ণ আদরস্পর্শের মত গায়ে আসিয়া পড়িতেছে, বাতাসটি এমনই মধুর স্নিগ্ধ হইয়া বহিতেছে, বর্ষার শেষে শরতের আকাশটি এমনি পবিত্র প্রশান্ত নীল একটি অপরাজিতা ফুলের মত ফুটিয়াছে,—যে, এই

শান্ত সুন্দর দিনটিতে মনে হইতেছে—মানুষ যুদ্ধ করে কেন? এই যে জানালা হইতে চাহিয়া দেখিতেছি আকাশে মাটিতে নীল-সবুজের কোলাকুলি, শ্যামল সিক্ত মাঠে গাভীটি লেজ দিয়া মাছি তাড়াইতে তাড়াইতে পরম আরামে নবোদ্গত তৃণ ভোজন করিতেছে, শালিখ পাখী লাফাইয়া ফিরিতেছে, গাছে গাছে ঝোপে ঝোপে ছোট ছোট পাখীগুলির কলমুখরতার যেন আর শেষ নাই—এখানে যুদ্ধ একটা অসম্ভব অবিশ্বাস্য দুঃস্বপ্নের মত বোধ হয়, এবং শান্তির বাণী যেন নিতান্ত সহজ সরল সুপরিচিত বন্ধুর ভালবাসার মত প্রাণ স্পর্শ করে। কিন্তু ঘরের ভিতরে টেবিলের উপর পড়িয়া আছে খবরের কাগজখানা,—বড় বড় কালো কালো বিভীষিকাময় অক্ষর যেন মনের মধ্যে দাগিয়া দিতেছে যুদ্ধক্ষেত্রে কামানের মুহুর্মুহুঃ অনল বর্ষণ, আহত ও আর্ত্তের হাহাকার আর দেশব্যাপী উৎকট অশান্তি।

এ বিলাপ আজ নূতন নয়। আদিমকাল হইতে মানুষ যুদ্ধ করিয়া আসিতেছে—আহার সংগ্রহের জন্য, বাসস্থানের অধিকার লাভের জন্য, লোভের বস্তুটিকে দুর্ব্বলের হাত হইতে কাড়িয়া লইবার জন্য। যুদ্ধের প্রবৃত্তি মানুষের মনে প্রথম হইতেই আছে—এবং সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানব এ প্রবৃত্তিকে একটা মার্জ্জিত রূপ দিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছে—বলিয়াছে "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা", বলিয়াছে 'দুর্ব্বল অসভ্য জাতির মধ্যে তাহাদের মঙ্গলার্থে সভ্যতা বিস্তার করিবার জন্যই সভ্যজাতির এই প্রচেষ্টা'—আরও কত কি! তাই আবিসিনিয়ায় শত শত বীর অটল বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ দিল, তাই চীনের নগরে, গ্রামে নিরীহ নিরস্ত্র গ্রামবাসীর উপর জাপানী সৈন্যদলের ভয়াবহ অত্যাচারে সমস্ত জগৎ কম্পিত। এই ত সেদিন সাম্রাজ্য-লোলুপ নাৎসী-নেতা ও তথাকথিত জনসাধারণের গভর্ণমেণ্ট সোভিয়েট রাশিয়া কর্ত্তৃক পোল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড প্রভৃতি কত রাষ্ট্র ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়ড্ প্রভৃতি মহাকাব্যেও প্রাচীন যুগের ভয়াবহ যুদ্ধের সাক্ষ্য রহিয়াছে। অবশ্য যুদ্ধ ব্যাপারটাই একটা নৃশংস অস্বাভাবিক কাজ, তবু প্রাচীন কালের যুদ্ধরীতির মধ্যে কিছু মনুষ্যত্বের

পরিচয় বুঝি বা খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে। যদি মহাকবির বর্ণনাকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে বলিতে হইবে সেকালে ধর্ম্ম-যুদ্ধ অধর্ম্ম যুদ্ধের ভেদটা যোদ্ধাদের মানিয়া চলিতে হইত। অশ্বারোহী বা রথারূঢ় যোদ্ধার সহিত পদাতিকের, শস্ত্রপাণির সহিত নিরস্ত্রের, সৈন্যের সহিত গ্রামিকের যুদ্ধ হইতেই পারিত না। 'ধর্ম্ম-যুদ্ধে মরিলে স্বর্গে যাইবে' এইরূপ বিশ্বাস একটা আদর্শ মনে জাগাইয়া রাখিত, বীর্য্যের পরিচয় মিলিত। কিন্তু এখনকার যুদ্ধের মধ্যে সে আদর্শের গন্ধও নাই। যে কোনও উপায়ে হউক—মাটীর নীচে লুকাইয়া, আকাশের উপরে উড়িয়া, অসহায় মানুষের উপর পৈশাচিক অত্যাচার—দল বাঁধিয়া কসাই-বৃত্তি—ইহারই নাম যুদ্ধ। এখানে মানুষের নিজের বল-বীর্য্য-সামর্থ্যের পরিচয় দিবারই বা অবসর কোথায় ? আকাশ হইতে অনলবর্ষী বোমা ফাটিয়া পড়িতেছে, ভাগ্যে থাকিলে বাঁচিবে, নয়ত ছিন্নভিন্ন দেহে পড়িয়া থাকিবে। কিছুদিন পূর্ব্বে কাগজে একটি ছবি বাহির হইয়াছিল—স্কুল হইতে ফিরিবার পথে বোমা-বর্ষণের ফলে ভাই-বোনে মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে, দিদির হাতখানি তাহার ছোট ভাইটির গায়ে জড়ানো, নিষ্পাপ শিশুর মুখে তখনও যেন হাসির আভাস লাগিয়া আছে—"They did not want it (war) ; they did not understand it, yet they were the victims of the brutal bombraids of Spain." সমগ্র মানবজাতির পক্ষেও এই একই কথা খাটে। সাধারণ মানুষ যুদ্ধ চাহে না। কেন যুদ্ধ হয় তাহাও সে বুঝে না, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে স্বার্থের সংঘর্ষ বাধে, যুদ্ধের অনল জ্বলিয়া ওঠে, মানুষ দলে দলে পতঙ্গরাশির মত প্রাণ দিতে বাধ্য হয়। Erich Maria Remarque তাঁহার অমরকীর্ত্তি "All Quiet on the Western Front" বইটির মধ্যে জ্বলন্ত ভাষায় এই কথাই বলিয়াছেন।

যুদ্ধ মানুষের স্বভাব নহে, স্বভাবের বিকৃতি। যুদ্ধ যতই ঘোরতর হউক না কেন, উচ্চতর মনুষ্যত্বের আদর্শ মানুষের মনে ফুটিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সকল সুসভ্য জাতির মধ্যে যুদ্ধবিরোধী মনোভাবই জাগিয়া উঠা স্বাভাবিক। শান্তির আকাঙ্ক্ষাই মানুষ করিতেছে। নহিলে 'লীগ অব

নেশন্‌স্‌'এর জন্ম হইত না। অবশ্য লীগ যুদ্ধ ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই এবং উহা শেষ পর্য্যন্ত একটা 'বিরাট চাতুরীময় ছলনা'য় পরিণত হইয়াছে—কিন্তু তবু বলিতে হইবে,—মানুষ যে যুদ্ধ চাহে না, ইহা তাহারই পরিচয়। বস্তুতঃ মানুষের মধ্যে দেব-দানবের যুদ্ধ সর্ব্বদাই চলিতেছে, এবং দানবটা যতদিন সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট না হইবে, ততদিন মানব-সমাজ হইতে যুদ্ধ উঠিয়া যাইবে না, শান্তির মুখোস পরিয়া আড়ালে বসিয়া ছুরি শানাইবে, অসহায় নিরস্ত্র মানুষের রক্তপান করিবে ও বীভৎস হিংস্রলীলায় পৃথিবীকে শোণিত-কর্দ্দমাক্ত করিয়া তুলিবে।

অসি ও লেখনী

তরবারি অপেক্ষাও 'লেখনী অধিকতর শক্তিমান্‌'—ইহার অর্থ এই যে, বর্ত্তমান সমাজে লেখক বিপুল ক্ষমতা ধারণ করে, এমন কি যুদ্ধবিজয়ী বীর-পুরুষও তাহার কাছে পরাভব মানিতে বাধ্য হয়। হঠাৎ শুনিলে কথাটি বিস্ময়কর মনে হইতে পারে। কারণ তরবারি যে সবল হস্তে চালনা করিতে পারে, স্বাভাবিক কারণেই দশজনের মধ্যে তাহার ক্ষমতা সহজে বিস্তৃত হয়, বলবানের অধিকার সাধারণ দুর্ব্বল লোকে স্বেচ্ছায় কিংবা ইচ্ছার বিরুদ্ধে মানিয়া লয়; কিন্তু একমাত্র লেখনীই যাহার অস্ত্র, সেই বাক্‌সর্ব্বস্ব লেখককে লোকের ভয় বা গ্রাহ্য করিবার হেতু আপাতদৃষ্টিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে কি অর্থে ইহা বলা যাইতে পারে যে যোদ্ধা বা রাজার অপেক্ষা কবি বা সাহিত্যিক দেশের মধ্যে অধিকতর প্রতিপত্তি অর্জ্জন করেন?

প্রকৃত কথা এই যে তরবারি ও লেখনীর মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তাহা মূলতঃ মদোদ্ধত বাহুবলের সহিত মানসিক ঐশ্বর্য্যের বিভিন্নতা। তরবারি শারীরিক শক্তির প্রতীক; লেখনী মানুষের হৃদয়বৃত্তি ও বুদ্ধিমত্তার অনুশীলনের উপরে প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতার সুস্পষ্ট চিহ্ন। সুতরাং শস্ত্রপাণি নেতার অপেক্ষা শাস্ত্রপাণি লেখনীচালক বেশী ক্ষমতা ধারণ করে কিনা এই প্রশ্নের নিগূঢ় অর্থ এই দাঁড়ায় যে বাহুবলের অপেক্ষা মানসিক বল বেশী স্থায়ী ও ব্যাপক।

বাহুবলের মূল্য ও সম্মান সর্ব্বদাই পরিস্ফুট রহিয়াছে। জীবনের প্রতি মমতা সকলেরই আছে, সকলেই দেহের কল্যাণ কামনা করে; সুতরাং যে শক্তিমান্ পুরুষের কৃপার উপরে লোকের জীবন-মরণ নির্ভর করে তাহার আনুগত্য সাধারণতঃ সকলেই স্বীকার করিয়া থাকে। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় বাহুবলের জয়গান লিপিবদ্ধ আছে; যুদ্ধনিপুণ রাজা ও সেনাপতির দিগ্বিজয়ের কাহিনী সেখানে সগৌরবে বিবৃত রহিয়াছে। বর্ত্তমানেও শারীরিক শক্তির মহিমা ক্ষুণ্ণ হয় নাই; দেশে দেশে সবল দুর্ব্বলকে উৎপীড়ন করিতেছে, বাহুবলের বিজয়-দুন্দুভি আন্তর্জ্জাতিক নীতি ও শান্তিকে পরাভূত করিয়াছে।

কিন্তু কেবলমাত্র মানুষের দৈহিক ভীতিকে আশ্রয় করিয়া যে শক্তি গড়িয়া উঠে তাহার সুনিশ্চিত সীমা ও শেষ আছে। মানুষ প্রাণের ভয়ে অনেক কিছু সহ্য করিতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যত্বকে বিসর্জ্জন দিতে না পারিলে সে প্রাণের ভয়েও সব কিছুই স্বীকার করিয়া লইতে পারে না। কারণ মানুষের মন ও হৃদয় আছে, ইহাদের দাবী সে চিরকাল অগ্রাহ্য করিতে পারে না। দেহকে রক্ষা করিতে যাইয়া হয়ত সে মোহের বশে অনেক সময়ে বুদ্ধি ও চিত্তবৃত্তিকে বিসর্জ্জন দেয়; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে দেহাতীত কারণের প্রেরণাতেই কাজ করিয়া বসে। সেই মুহূর্ত্তে চিন্তাশীল কল্পনাকুশল লেখক আসিয়া তাহার ক্ষমতা বিস্তার করে।

মানুষের উপরে সাহিত্যের প্রভাব চিরকালই পরিলক্ষিত হইয়াছে, সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে এই প্রভাব আরও বাড়িয়া চলিয়াছে। লোকসমাজে সুলেখকের প্রতিপত্তি বিজয়ী বীরের দর্পকেও হরণ করিয়াছে। চিন্তাশীল ব্যক্তিরা লেখনীর সাহায্যে দেশের মধ্যে নিজের মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। এমন কি লেখনীর আঘাতে বাহুবলে বলীয়ান্ নৃপচূড়ামণির মাথার মুকুট পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিয়াছে, রাজ্যের মধ্যে বিপ্লবের বন্যা আসিয়া বাহুবলের প্রাচীন প্রতীক নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপ ফরাসী-বিপ্লবের কথা বলা যাইতে পারে; ভল্‌টেয়ার প্রভৃতি কয়েকজন অদ্ভুত ধীশক্তিশালী সুলেখকের প্রেরণায় এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল।

অন্য আর একটি কারণেও বাহুবল লেখনীর বলের কাছে পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। বাহুবলের কীর্ত্তি কখনও স্থায়ী হয় না, কিন্তু সুলেখকের লেখনী-প্রসূত সাহিত্য অবিনশ্বর। সেইজন্য তরবারির কীর্ত্তিও লেখনীকে আশ্রয় করিয়া চিরকাল বাঁচিয়া থাকিতে চায়; সুকবির রচনানৈপুণ্যে দিগ্বিজয়ীর ক্ষণস্থায়ী জয়ের কাহিনী লোকসমাজে অমর হইয়া থাকে।

মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান

দেহের পুষ্টির পক্ষে অন্ন-পান যেমন অত্যাবশ্যক মনের বিকাশের পক্ষে শিক্ষাও সেইরূপ একটি অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী। শিক্ষাবিস্তার সম্পর্কে বহু তর্ক-বিতর্কের পরেও দেখা যাইতেছে, শিক্ষাটা আমাদের দেশে সম্পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে না। আমাদের শিক্ষামন্দিরগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ছাপ মারিয়া দিবার যন্ত্রস্বরূপ, এখানে শিক্ষাদানের প্রণালীর মধ্যে এমন কিছু নাই যাহাতে বিদ্যা যথার্থই আমাদের আপন হইয়া উঠে। এই জন্যই আমরা পাশ করিয়া বিদ্যালয় হইতে বাহির হই বটে, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষালাভের আনন্দ ও কল্যাণের মূর্ত্তিটি আমাদের জীবনের মধ্যে ফুটিয়া উঠে না। শিক্ষা আমাদের জীবনের সহিত এক হইয়া মিলিয়া যায় না। কারণ আমাদের শিক্ষালাভের প্রণালীই যে অত্যন্ত কৃত্রিম—আমাদের জীবনের সহিত বিদ্যালব্ধ শিক্ষার কোন সম্বন্ধ নাই। ফলে আমরা শিক্ষাকে বোঝার মত বহন করিয়াই বেড়াই এবং সুযোগ পাইলেই সে বোঝা নামাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হই।

এ কৃত্রিমতার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে প্রথমেই দেখিতে পাওয়া যায়, প্রকৃত শিক্ষালাভের প্রধান অন্তরায়—মাতৃভাষাকে শিক্ষালয় হইতে দূরে সরাইয়া রাখা। একথা অস্বীকার করিতে পারা যায় না যে পুস্তকের মধ্য হইতে আমরা যে কোন জ্ঞানের বিষয় সংগ্রহ করি, তাহাকে মনের মধ্যে যথার্থ সত্যরূপে লাভ করিবার উপায় মাতৃভাষার মধ্য দিয়া সেটিকে চোলাই করিয়া লওয়া। যেখানে আমাদের চিন্তার সহিত ভাষার বিচ্ছেদ ঘটে সেখানে চিন্তা

কেবল ভারমাত্র হইয়া পৃথক্ হইয়া থাকে। আপন ভাষার সাহায্যে মনের মধ্যে সেটিকে গ্রহণ করিতে পারি না বলিয়া রক্তমাংসের সহিত মিলিয়া মিশিয়া তাহা এক হইয়া যায় না। এই রকম অবস্থায় যাহা কিছু পড়া যায় তাহা পুঞ্জীভূত হইয়া জমিয়া থাকে—আলোক বিকিরণ করিতে পারে না—আমাদের মননশক্তিকে উদ্বোধিত করে না। আমরা যে সাহিত্য পড়ি তাহা আমাদের রসবোধকে উদ্দীপ্ত করিয়া তোলে না। বিদ্যালয়ের মধ্যে আমরা কোনমতে পাঠ্যাংশ কণ্ঠস্থ করিয়া কাজ চালাইতে চেষ্টা করি, কিন্তু ছাত্রজীবনের গণ্ডী ডিঙ্গাইবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের মন হইতে কেতাবী বিদ্যা নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। যাহারা ইংরাজী ভাষা শিখিয়া বিদ্যালয়ে অগ্রসর হইতে পারিয়াছে তাহাদের অবস্থাই এরূপ। আর যাহাদের সে সুযোগ ঘটে নাই—তাহাদের মনের ক্ষুধা মিটাইবার কোন ব্যবস্থাই বর্ত্তমানে আমাদের দেশে হইয়া উঠিল না।

পাশ্চাত্ত্য প্রভাব আমাদের ইংরাজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়কে যে সাহিত্য-বিজ্ঞানের অধিকার দিয়াছে, দেশের জনসাধারণের সহিত তাহার অংশ ভাগ করিয়া না লইলে এই শিক্ষাযজ্ঞে কি অভিশাপ লাগিবে না? দেশজোড়া শিক্ষাহীনতার এই বিপুল অন্ধকারকে দূর করিবার একমাত্র উপায় শিক্ষাকে অতি সহজলভ্য করা। এমন অবস্থা করিতে হইবে যেন আগ্রহ করিয়া হাত বাড়াইলেই তাহা পাওয়া যায়। গোড়াতেই যদি বৈদেশিক ভাষার একটা প্রাচীর তুলিয়া রাখা যায়, তবে তাহা অতি স্বাভাবিক কারণেই শিক্ষার্থীর মনে ভীতির সঞ্চার করিবে। সাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার বাড়াইতে হইলে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান করিতে হইবে। উচ্চ শিক্ষিতের মধ্যেও বিদ্যার যথার্থ সার্থকতা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে মাতৃভাষারই আশ্রয় লওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় আছে বলিয়া মনে হয় না।

আলস্যপরায়ণ ভীরু শিক্ষাবিলাসীর দল বলিতে পারেন—আমাদের মাতৃ-ভাষার সাহায্যে উচ্চশিক্ষা দান করা সম্ভব নহে, কারণ বাঙ্গলায় তেমন উচ্চস্তরের গ্রন্থ নাই। এ কথা নিতান্তই অশ্রদ্ধেয়। চাহিদা থাকিলে উপযুক্ত

শিক্ষাগ্রন্থ আপনিই আসিবে। জাপানের আদর্শ এ বিষয়ে সর্ব্বথা অনুকরণীয়। পাশ্চাত্ত্যবিদ্যাকে জাপান তাহার আপন ভাষার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছে। আর উদ্ভাবনী শক্তি জাপানী হইতে বাঙ্গালীর কম নয়। নূতন নূতন অজস্র শব্দচয়নের অবকাশ বাঙ্গলা ভাষায় প্রচুর। এখন কেবল শ্রদ্ধা ও উদ্যম লইয়া কার্য্যে ব্রতী হওয়াই একমাত্র প্রয়োজন।

১৯৪০ সাল হইতে বাঙ্গলা দেশের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার বাহনরূপে মাতৃভাষার দাবী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই প্রয়োজনের তাগিদে গণিত, প্রাথমিক বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের পুস্তক বাঙ্গলা ভাষাতে ইতিপূর্ব্বেই প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই অবস্থার সুফল ফলিতে আরম্ভ করিলে মাতৃভাষা কলেজেও উচ্চ-শিক্ষার বাহন হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। ইহাতে একদিকে যেমন অল্পসময়ে অধিক ভাব গ্রহণের সুবিধা হয় অন্যদিকে তেমনই মাতৃভাষায় নূতন নূতন সম্পদের সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে।

মাতৃভাষার ভিতর দিয়া শিক্ষালাভ ও চিন্তার আদান-প্রদানের কতকগুলি সাধারণ সুবিধা ব্যতীত আরও একটি কথা বিবেচনা করিবার আছে। প্রত্যেক দেশের সাহিত্যের ও সংস্কৃতির একটা বিশেষ রূপ, দেশের মনীষিবৃন্দের চিন্তাধারার একটা বিশেষ প্রকাশ সেই ভাষার ভিতর দিয়াই সর্ব্বোৎকৃষ্টভাবে সম্ভব হইতে পারে। সেজন্য মাতৃভাষার ভিতর দিয়া যদি দেশের মনীষিবৃন্দ তাঁহাদের চিন্তাধারা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন, তবে তাহা সহজ ও স্বাভাবিক-ভাবে দেশের বিদ্যার্থিগণের অন্তর স্পর্শ করিবে। দেশের সংস্কৃতিগত বিশিষ্ট রূপ দেশের ছাত্রগণের নিকট সুস্পষ্ট হইবে এবং তাহারা সেই সংস্কৃতির উত্তরোত্তর উৎকর্ষসাধনে মনোযোগী হইবে।

এভারেষ্ট অভিযান

অন্যের অসাধ্যকে সহজসাধ্য করিবার আগ্রহ, অন্যের পরাজয়ের গ্লানিকে নিজের যশোরাশি দিয়া ঢাকিয়া দেওয়ার চেষ্টা পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষের

মধ্যেই অল্পবিস্তর আছে। তাহাদের মধ্যে যাহারা সাহসী তাহারা অনেক কারণেই নূতন তথ্য আবিষ্কার করিবার জন্য পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে অদম্য উৎসাহে ঘুরিয়া বেড়ায়। কেহ কেহ লাভের নিমিত্ত পরিশ্রম করে; তাহারা অর্থসঞ্চয়, কর্ম্মক্ষেত্রের বিস্তার, স্বজাতির রাজ্যলাভ, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার প্রভৃতি জনহিতকর উদ্দেশ্য লইয়া অম্লানবদনে ভয়ানক বিপদেরও সম্মুখীন হয়। তাহাদের প্রচেষ্টায় মহাসমুদ্রের কোন অংশই মানব-জ্ঞানের অগোচর নাই; জলপথে যাহারা বাণিজ্য কিংবা সংগ্রাম করে তাহাদের প্রেরণায় নির্ভীক নাবিকের দল পৃথিবীর দুরধিগম্য স্থলভূমির প্রত্যেকটি অংশই প্রত্যক্ষ করিয়া মানচিত্রে চিত্রিত করিয়াছে। অনেকে এরূপ কোন জাগতিক লাভের অপেক্ষা না করিয়া শুধু বিপদ্-বিজয়ের আনন্দের জন্য নূতন কিছু আবিষ্কার করিতে চাহে; তাহারা পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া অভিনব লক্ষ্যস্থলে প্রথমে উপনীত হইবার লোভে সকল প্রকার লাভ-ক্ষতিকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। আবার অজ্ঞাত বস্তুকে জ্ঞান-গোচর করিবার আকাঙ্ক্ষায় অনেকে আবিষ্কারক হইয়াছে। এই বৈজ্ঞানিক-সুলভ নিরলস অনুসন্ধিৎসা তাহা-দিগকে পৃথিবীময় পর্য্যটন করাইয়াছে।

এই সকল কারণ ছাড়াও বহু নূতন আবিষ্কারের মূলেই অপর একটি শাশ্বত প্রেরণা রহিয়াছে; ইহা হইতেছে অনির্দ্দিষ্ট বিষয়ের, অপরিজ্ঞাত বস্তুর দুর্লভ আকর্ষণী শক্তি। মানুষ এই আকর্ষণের বশেই জলহীন মরুভূমিতে, জীবহীন বিপৎসঙ্কুল অরণ্যমধ্যে জীবন পণ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। জগতে যাহা কিছু রহস্যের অন্তরালে সুদৃঢ়ভাবে আত্মগোপন করিতে চায়, সূক্ষ্মানুভূতিসম্পন্ন মানুষের মন তাহার জন্য দুর্নিবার কৌতূহল অনুভব করে।

বিংশ শতাব্দীতে গৌরী-শৃঙ্গের শিখরে অধিরোহণ করিবার জন্য যে কয়টি অভিযান হইয়াছে তাহার মূলে রহিয়াছে এই দুজ্ঞের্য়কে জানিবার দুর্জ্জয় বাসনা। হিমালয়ের ভ্রূকুটিভীষণ মূর্ত্তিকে উপেক্ষা করিয়া, উদ্ধত গিরিরাজের গাত্র বাহিয়া উনত্রিশ হাজার ফিট উর্দ্ধে উঠিবার প্রচেষ্টা কোনও পার্থিব পুরস্কারের আশায় হয় নাই; ইহা অর্থলোভের জন্য, এমন কি শুধু গৌরবের

জন্যও নহে। গৌরী-শৃঙ্গ বর্ত্তমানে কেবলমাত্র পৃথিবীর উচ্চতম গিরিশিখর নহে ; ইহা এখন মানুষের সর্ব্বোচ্চ কল্পনার প্রতীক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মানুষ গত শতাব্দী হইতে দৃশ্য জগৎকে করায়ত্ত করিবার যে বিপুল সাধনা আরম্ভ করিয়াছে, গৌরী-শৃঙ্গকে জয় করিতে না পারিলে তাহা যেন অসম্পূর্ণই থাকিয়া যায়। সেইজন্য দুঃসাহসী নর বারংবার এই পর্ব্বত-চূড়াকে আক্রমণ করিতেছে। তাহাদের এই প্রচেষ্টা হিমালয়ের হিম ও প্রস্তরে প্রতিহত হইলেও মানুষের বিশ্ববিজয়িনী প্রাণশক্তি যে অবশেষে প্রকৃতির রহস্য-দুর্গকে অধিকার করিবে না, ইহা কে বলিতে পারে ?

১৯২২ সালে সি. জি. ব্রুস্ গৌরীশৃঙ্গ-বিজয়রূপ অদ্যাবধি অসমাপ্ত নাটকের প্রথম অঙ্কের সূচনা করেন। কিন্তু এই দুরূহ কার্য্যের ভয়াবহ পরিণাম পূর্ব্ব হইতে সম্যক্ জানা না থাকায় এই অভিযান বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই। অদম্য উৎসাহ লইয়া ব্রুস্ ১৯২৪ সনে পুনরায় গৌরী-শৃঙ্গ আক্রমণ করেন ; কিন্তু শিখরে পৌঁছিবার বাসনা তাঁহার বিফল হয়। তবে এইবার তিনি আটাশ হাজার ফিট পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়াছিলেন।

তারপর নয় বৎসর কাল হিমালয়ের সঙ্গে মানুষের সঙ্গে আর কলহ হয় নাই ; তবে ইহা সন্ধি নহে, সাময়িক যুদ্ধবিরতি মাত্র। ১৯৩৩ সনে এই চরম আবিষ্কারের জন্য প্রবল ও সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা হয়। বিশেষ আয়োজনের পর সর্ব্বপ্রকার বৈজ্ঞানিক অস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া বৈমানিক ফেলোয়েস্ এবং ডগ্‌লাস, ও ক্লাইড্ স্‌ডেলের মারকুইসের নেতৃত্বে হাউস্‌টন্ 'মাউণ্ট এভারেষ্ট বৈমানিক অভিযান' করেন। ইহার সমসময়েই রাট্‌লেজ একই উদ্দেশ্যে আর একটি দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। উভয় প্রয়াসই ব্যর্থ হয়। কিন্তু বাধা যত বেশী, জয়ের যশোলিপ্সা ততই প্রবল। সেইজন্য রাট্‌লেজ ১৯৩৬ সনে পুনরায় গৌরীশৃঙ্গ অভিযান পরিচালনা করেন। পর্ব্বতারোহণে সুদক্ষ, কষ্টসহিষ্ণু, স্বাস্থ্যবান্ ব্যক্তি লইয়া বিশেষ সতর্কতার সহিত এই দল গঠিত হয়। তথাপি নিসর্গের প্রতিকূলতা অতিক্রম করা সম্ভব হইল না! এই অল্পকাল পূর্ব্বে ১৯৩৮ সনে আরও একটি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।

এই সমস্ত অভিযান ব্যর্থ হইবার কারণ এই যে, হিমালয়ের শিখরদেশে প্রকৃতি ভয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে অচল আসন স্থাপন করিয়া বসিয়াছেন। সেখানে ভীষণ শৈত্য, আবরাম তুষার-ঝটিকা ও প্রলয়ঙ্কর তুষারস্তূপ অবাধে রাজত্ব করিতেছে। শৈত্যকে যদি বা আচ্ছাদন-বস্ত্রের দ্বারা প্রতিহত করা যায়, ঝঞ্ঝাকে যদি বা সহ্য করা সম্ভব হয়, সর্ব্বগ্রাসী তুষারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার কোনও উপায় সেখানে নাই। যোজনব্যাপী বিপুলাকৃতি খণ্ড খণ্ড তুষাররাশি আপন ইচ্ছায় নামিয়া চলিয়াছে, ইহা মানুষের কোন বাধাই মানে না; ইহার নির্ম্মম গতির সম্মুখে পড়িয়া বারে বারে আবিষ্কারকদিগের শিবির ঝড়ের মুখে তৃণখণ্ডের মত নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে অজ্ঞাতের ইঙ্গিতে যাঁহারা প্রাণ দিয়াছেন, তাঁহাদিগের সংখ্যাও দ্রুতবেগে বাড়িয়া চলিয়াছে।

তথাপি এই প্রচেষ্টার বিরাম নাই। বীরের প্রকৃতি যতদিন অকুণ্ঠিতভাবে পরাজয় মানিয়া লইতে অস্বীকার করিবে, ততদিন এই প্রচেষ্টার বিরাম হইবে না। হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিবার আকাঙ্ক্ষায় যে কয়জন ইংরাজ ও জার্ম্মাণ প্রাণ দিয়াছেন, তাঁহাদের আত্মবলিদান মানুষকে নির্ভীক হৃদয়ের দুরধিগম্য লক্ষ্যের দিকে চলিবার প্রেরণা দিতেছে। তাঁহাদের উদাহরণ মানুষের দুরন্ত জ্ঞানস্পৃহাকে, দুর্জ্জয়কে জয় করিবার বাসনাকে সঞ্জীবিত রাখিতেছে। গৌরীশৃঙ্গ মানুষের দিগ্বিজয়ী উচ্চাশার প্রতীক।

আমরা কি আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের চেয়ে সুখী?

আমরা আমাদের পিতৃপিতামহদের অপেক্ষা জীবনে অধিক সুখ লাভ করিতেছি কিনা, ইহা যথার্থভাবে নিরূপণ করা বিশেষ কঠিন। এই প্রশ্নের উত্তরে সাধারণতঃ দুইটি মত উঠিতে পারে। এক পক্ষ বলিতে পারেন যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা নিঃসন্দেহে আমাদের অপেক্ষা অধিক সুখী ছিলেন, কারণ তাঁহারা শান্তিতে ও স্বাচ্ছন্দ্যে জন্মভূমির ক্রোড়ে সমাজের শৃঙ্খলা মানিয়া কুলক্রমাগত বৃত্তির অনুসরণ করিয়া পরমানন্দে জীবনের দিনগুলি কাটাইয়া

গিয়াছেন। অপর পক্ষ বলিবেন যে, আমাদের ভাগ্যেই সুখাধিক্য ঘটিয়াছে, কারণ আমরা আধুনিক সভ্যতার আলোকে প্রাচীন সংস্কারের জড়তা কাটাইয়া অভিনব জ্ঞান ও শক্তির সন্ধান পাইয়াছি। উভয় পক্ষেই প্রবল যুক্তির অবকাশ আছে সন্দেহ নাই এবং উভয় মতই আংশিকভাবে সত্য।

কিন্তু আমাদের অনুমান—প্রকৃত সিদ্ধান্ত এই মতদ্বয়ের মধ্যভূমিতে অবস্থিত। একথা বলা চলে না যে, আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষের অপেক্ষা অধিকতর সুখী ; আবার একথাও বলা চলে না যে, তাঁহাদের অপেক্ষা দুঃখ আমাদের বেশী। পক্ষান্তরে তাঁহারাও আমাদের অবস্থার সঙ্গে নিজেদের অবস্থার তুলনা করিয়া অধিক সুখ কিংবা অধিক দুঃখের দাবী করিতে পারেন না। প্রকৃত কথা এই যে, জীবনে সুখ ও দুঃখের পরিমাণ সর্ব্বদা সমান রহিয়াছে ; হাসি-কান্না-হর্ষ-বিষাদের পাকচক্র অনাদি কাল ধরিয়া একইভাবে ঘুরিয়া চলিয়াছে। ইতিহাসের কোন সময়েই নিরবচ্ছিন্ন সুখ কিংবা অবিমিশ্র দুঃখ অগণিত মানুষের ভাগ্যে সমভাবে জুটিয়াছে ইহা কল্পনা করা ভুল। যাঁহারা প্রাচীন যুগের দিকে তাকাইয়া বর্ত্তমান সম্বন্ধে আক্ষেপ করেন, অথবা যাঁহারা আধুনিকতার গর্ব্বে পুরাতন কালের জীবনযাত্রাকে উপেক্ষার চক্ষে দেখেন তাঁহাদের উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর আলোচনা করিলেই এই তথ্যে উপনীত হওয়া যায়।

সাধারণতঃ অনেক লোকেরই ধারণা আছে যে, প্রাচীনকাল অতি সুখের সময় ছিল ; এবং তখন মানুষসকল দুর্ভাবনার হস্ত এড়াইয়া নিশ্চিন্ত মনে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। এইরূপ ধারণা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। বর্ত্তমান যখন অতি রূঢ় মূর্ত্তিতে দেখা দেয় তখন মানুষের মন অধীর আবেগে অতীতের এক স্বপ্নরাজ্যে স্বর্ণযুগের প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনার অতৃপ্ত কামনার ও নিষ্ফল সাধনার সার্থকতা কল্পনা করে। সেইজন্য মনে হয় পূর্ব্বে জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় সকল উপকরণই অনায়াসলভ্য ছিল, এবং যাহার যাহা আন্তরিক বাসনা তাহা সহজেই সিদ্ধ হইত। কিন্তু সত্য সত্যই সুখ কখনও সুপ্রচুর, সিদ্ধি কখনও সহজ ছিল না। আমাদের পিতৃপুরুষগণ সংসার হইতে কেবলমাত্র

আনন্দই আহরণ করিয়াছেন, দুঃখের ছায়াও স্পর্শ করেন নাই, একথা বলিলে মহাভুল হইবে। তাঁহারাও জীবনে অনেক গ্লানি ভোগ করিয়াছেন। দূর হইতে দেখিতে সব কিছুই সুন্দর ও স্পৃহণীয় বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু সময়ের ব্যবধান ভেদ করিলে দেখা যাইবে যে, বর্ত্তমান যুগের মতই পূর্ব্বকালে জীবন-নাট্য জয়-পরাজয়ের সংঘাতে বিচিত্র ছিল। তখন জীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা ছিল বটে, কিন্তু অনেক সময়ে সেই শান্তি অন্যায়কে নিরুপদ্রবে সহ্য করিয়াছিল, সেই শৃঙ্খলা স্বাধীন চিন্তা ও কর্ম্মের পথে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তখন গৃহে অন্নের সংস্থান ছিল বটে, কিন্তু নিরন্ন লোকের সংখ্যাও মুষ্টিমেয় ছিল না। তখনও রোগ-শোক ছিল, অনাবৃষ্টি ছিল, বর্গীর হাঙ্গামা ছিল, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ছিল।

যাঁহারা আবার বর্ত্তমান সভ্যতাকেই প্রকৃত সুখের আকর মনে করিয়া অতীত কালের সংস্কারবদ্ধ জীবনকে দুঃখময় বলিয়া প্রচার করেন তাঁহারাও সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করেন নাই। আধুনিক সময়ে বিজ্ঞানের অনেক আবিষ্কারই মানুষের কার্য্যে লাগিয়াছে, বিজ্ঞানের প্রভাবে আমরা এখন অনেক সুখ ও সুবিধার অধিকারী হইয়াছি যাহা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারেন নাই। কিন্তু সুখের সঙ্গে স্বস্তি বা শান্তি আসে নাই; আমাদের সৃষ্ট যন্ত্র ক্রমশঃ আমাদেরই কণ্ঠরোধ করিতে চাহিতেছে। ধনী-নির্ধন ও সবল-দুর্ব্বলের কলহ দিন দিন প্রবলতর হইতে চলিয়াছে; নিদারুণ জীবন-সংগ্রামে অসংখ্য লোক পরাজয় মানিয়া সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবিচারের বিরুদ্ধে প্রবল আক্রোশে আক্রমণ চালাইয়াছে। ফলতঃ পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করিলে ইহাই মনে হয় যে, আমরা বহু পরিশ্রমে সভ্যতার যে আকাশচুম্বী সৌধ সগর্ব্বে রচনা করিয়াছি ইহার ভিত্তি হিংসা, অশান্তি ও স্বার্থপরতার পঙ্কিল ভূমিতে প্রোথিত হইয়াছে।

বর্ত্তমানকে হীন প্রমাণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, আমরা বহুকালব্যাপী সাধনায় যে নূতন জ্ঞানের সন্ধান পাইয়াছি তাহা নিশ্চয়ই মহামূল্য। কিন্তু আধুনিকতার আবেশে নিতান্ত আচ্ছন্ন না হইলে ইহা কখনও সিদ্ধান্ত করা

যায় না যে, বিংশশতাব্দীর বস্তুতান্ত্রিক ও যন্ত্রসর্ব্বস্ব সভ্যতা মর্ত্ত্যের গৃহে অমরাবতীর আনন্দ আনিয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে সুখ-দুঃখ চিরকাল সংসারে সমভাবেই আছে। আমরা যখন 'হায় রে সেকাল' বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলি তখন উচ্ছ্বাসের বশে তৎকালের দুঃখকে ভুলিয়া যাই। আবার যখন প্রাচীন কালের জীবনযাপনের পদ্ধতিকে অনুকম্পার চক্ষে দেখি, তখন বিস্মৃত হই যে, অধুনালুপ্ত বহু আনন্দে আমাদের পিতৃপুরুষগণের প্রাত্যহিক জীবন অনুরঞ্জিত ছিল। সত্য এই যে, আবহমান কাল ধরিয়া নিজেদের ভাগ্য ও কর্ম্মের ফলে মানুষ সুখ ও দুঃখ পাইয়া আসিতেছে। ইহাই যুগে যুগে অপরিবর্ত্তিত বিধান।

বাঙ্গলার কৃষকের অবস্থা

যন্ত্র-সভ্যতার যুগে মানুষের মনে হইতে পারে যে, কৃষকের কোনও প্রয়োজন নাই। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে এই বিরাট যন্ত্র-সভ্যতাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে একমাত্র কৃষক। কারণ কৃষকের ক্ষেতখানি হইতে যন্ত্র-দানবের খোরাক না আসিলে, তাহার দ্বারা কাহারও কোন কার্য্যই সুসম্পন্ন হইতে পারে না। কৃষক জলে ভিজিয়া, রৌদ্রে পুড়িয়া দেহ তাম্রবর্ণ করিবার পর যে দ্রব্য উৎপন্ন করিবে, তাহাই নানারূপ যন্ত্রের ভিতর দিয়া নানা মূর্ত্তি লইয়া বিলাসের উপকরণ হিসাবে আমাদের নিকট উপস্থিত হইবে। সকল রকম শিল্প-সামগ্রীর মূলে রহিয়াছে কাঁচা মালের প্রয়োজন এবং ইহার জনক কৃষক ; কিন্তু প্রায় দেশেই দেশহিতৈষিগণ কৃষকের মঙ্গলের প্রতি তত সুনজর দেন না। আধুনিক রাষ্ট্র-চিন্তায় জন-জাগরণের ফলে গণতন্ত্রের প্রতি মানুষের মর্য্যাদাবোধ জাগ্রত হওয়ায় সমুদ্রপারের দেশগুলিতে কৃষকের ন্যায্য অধিকারের প্রতি কিছু কিছু দৃষ্টি পড়িতেছে ; কিন্তু দুঃখের বিষয় একমাত্র কৃষিজাত দ্রব্যের উপর বাঙ্গলাদেশের লক্ষ লক্ষ নরনারীর জীবন নির্ভর করা সত্ত্বেও বাঙ্গলাদেশের কৃষকের ভাগ্যহীনতা চরমে পৌঁছিয়াছে।

নূতন ভারত-শাসন আইন প্রবর্ত্তিত হওয়ার ফলে ভারতের তথা বাঙ্গলার কর্ত্তৃত্বভার অনেকাংশে নিজেদের হাতে আসায় বাঙ্গলার দেশহিতৈষী নেতৃবর্গ কৃষককুলের মঙ্গলের প্রতি নজর দিয়াছেন এবং তাহাদের উন্নতির জন্য নানারূপ বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়নের পরিকল্পনা করিতেছেন। এই সমস্ত পরিকল্পনার ফলাফল কি হইবে তাহা একমাত্র ভবিষ্যৎই নির্দ্ধারণ করিতে পারিবে; কিন্তু এখনও বঙ্গদেশের কৃষককুলের অবস্থা যে অত্যন্ত ভয়াবহ হইয়া রহিয়াছে এবং অচিরে ইহার যথোপযুক্ত পরিবর্ত্তন না হইলে যে কৃষকদের সত্তা চিরতরে লোপ পাইবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

বঙ্গদেশের কৃষকের চিত্র মনে করিতেই চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত, প্লীহাস্ফীত উদরের ভারে কম্পিত, জীর্ণ শীর্ণ একটি অস্থিপঞ্জর। আর কচুরীপানাপূর্ণ পচা জলে ভরা খানা-ডোবার গায়ে বাঁশবনের কিনারায় তাহার ছোট্ট একুখানি খড়ের চালাঘর। ঘরখানির ভিতরে মেঝের উপর অথবা একপাশে একখানি ভাঙ্গা বাঁশের মাচায় শতচ্ছিন্ন কাঁথার বিছানা পাতা; ছিন্ন-মলিন বালিশটির ফাঁক দিয়া তুলা বাহির হইয়া পড়িতেছে। স্যাঁৎসেঁতে মেঝের উপর একখানি জীর্ণ মাদুরে দুই-তিনটি বালক-বালিকা ঘুমাইয়া রহিয়াছে। তাহাদের অস্থিচর্ম্মসার নগ্ন দেহের রেখায় রেখায় প্রেতলোকের শোচনীয় কাহিনী ফুটিয়া উঠিয়াছে। একটি মিটমিটে প্রদীপের আলোয় দেখা যাইতেছে একপাশে একটি ভাঙ্গা কাঠের বাক্স। আরশোলা ও ইঁদুরের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মধ্যে কৃষকের যৎসামান্য সম্পত্তিটুকুও স্থান পাইয়াছে। ইতস্ততঃ ছড়ানো আছে দুই-একটা মাটির হাঁড়ি-কলসী। জানালার ফাঁক দিয়া মশার ঝাঁক উড়িয়া আসিতেছে। বাহিরে দাওয়ার উপরে একখানি সান্‌কিতে সামান্য পান্তা ভাত, কিছু লঙ্কা, পেঁয়াজ ও অল্প একটু নুন। অদূরে ভাঙ্গা বেড়ায় হেলান দেওয়া রহিয়াছে একখানি লাঙ্গল, পাশে খুঁটিতে বাঁধা রহিয়াছে একজোড়া বলদ—তাহাদের শারীরিক অবস্থাও তাহাদের প্রভুরই মত। ইহাদেরই সাহায্যে সমস্ত দিন ক্ষেতে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া দেশের লোকের খোরাক উৎপন্ন করিতে শেষ রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত ব্যয় করিয়া যখন

ক্লান্ত দেহে অবসন্ন প্রাণে বঙ্গদেশের হতভাগ্য কৃষক বাড়ীতে ফিরে, তখন হয়ত জমিদারের পেয়াদা আসিয়া বাড়ীর দুয়ার হইতে তাহাকে খাজনার দায়ে জমিদারের কাছারীতে টানিয়া লইয়া যায়।

ফসল উঠিবার বহু পূর্ব্বেই কৃষক দেনার দায়ে এরূপ শোচনীয়ভাবে জর্জ্জরিত হইয়া পড়ে যে, ফসল উঠিয়া তাহার বাড়ীতে না আসিয়া, অনেক সময়েই তাহা মহাজন এবং জমিদারের কবলে চলিয়া যায়। তাহাকে ঋণের জন্য পরক্ষণেই আবার অন্যের দ্বারস্থ হইতে হয়। অনেক সময় জমিতে বুনিবার বীজের পর্য্যন্ত অভাব হইয়া পড়ে। অর্থের সঙ্কুলান না হওয়ায় উপযুক্ত সময়ে ক্ষেত্রে বীজ পর্য্যন্ত পড়ে না। জমির উৎপাদন-শক্তি বৃদ্ধির জন্য কৃষকের স্বাস্থ্যের অভাবে, ফসলের উপযুক্ত পরিচর্য্যা সম্ভবপর হয় না। এইরূপ নানা অসুবিধার মধ্য দিয়া একমাত্র দেহ ও মনের সাহায্যে তৈয়ারী করা কৃষকের সযত্নলালিত ফসলটি যখন মাথা গজাইয়া তাহার হতাশাখিন্ন স্থির মনের কোণে ক্ষুদ্র উল্লাস-তরঙ্গের সৃষ্টি করে এমনি সময়ে হয়ত একদিন প্রচণ্ড বন্যা করালমূর্ত্তিতে আসিয়া তাহার ক্ষেতখানিকে গ্রাস করিয়া চলিয়া যায়। তখন কৃষক যে তিমিরে, সেই তিমিরে। সেই সময়ে তাহার সাহায্যের জন্য, উৎসাহপ্রবণ ধনীর আত্মপ্রসাদ চরিতার্থ করিবার জন্য সঙ্কটত্রাণ-সমিতির সৃষ্টি হয় মাত্র; কিন্তু তাহার দ্বারা প্রকৃতপক্ষে কৃষকের স্থায়ী উপকারের সঙ্গত ব্যবস্থা করা প্রায়ই সম্ভবপর হইয়া উঠে না। ইহার জন্য প্রয়োজন ব্যক্তিগত সাহায্য ছাড়াও রাজ-সরকার হইতে ব্যাপকভাবে কৃষি-ঋণের ব্যবস্থা করা। অপেক্ষাকৃত সুসময়েও কৃষক যাহাতে বীজ ক্রয় করিতে পারে, জমির পরিচর্য্যা করিতে পারে, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত যন্ত্রপাতির সাহায্যে অল্প সময়ে অল্প পরিশ্রমে অধিক কার্য্যক্ষমতা ও ফসল লাভ করিতে পারে এবং সাধারণভাবে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিয়া তাহার সমস্ত চিন্তা এবং শক্তি ফসল উৎপাদনেই ব্যয় করিতে পারে, তাহার জন্য সরকার হইতে কৃষককে প্রথম প্রথম বিনা সুদে এবং পরে অল্প সুদে টাকা ধার দেওয়ার ব্যাপক ব্যবস্থা করার প্রয়োজন অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমানে যে ব্যবস্থা আছে তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

শুধু ইহাই যথেষ্ট নহে। সর্ব্বোপরি মনে রাখিতে হইবে যে, কৃষকরাও মনুষ। সুতরাং তাহাদেরও মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার আছে। তাহাদেরও শিক্ষার দাবী আছে, দেশের রাজনীতিতে তাহাদেরও বক্তব্য থাকিতে পারে এবং আর দশজনের মতই দেহের এবং মনের পূর্ণাবয়ব প্রাপ্তির আশা-আকাঙ্ক্ষা করাও তাহাদের পক্ষে অনধিকার-চর্চ্চা নহে।

বিতর্ক-সভা

মানবের কল্যাণের যতগুলি উপায় আজ পর্য্যন্ত অবলম্বিত হইয়াছে তাহার মধ্যে উপযুক্ত বাগ্‌বিন্যাসই যে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী ও হিতকারী তাহাতে আর বিশেষ কোনো সন্দেহের অবসর নাই। সাহিত্যের মধ্য দিয়া সংবাদপত্রের মারফতে—চিন্তাশীল ও ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির চিন্তাধারায় এবং মতবাদ গঠনের মধ্যেও এই বাগ্‌বিন্যাসেরই ক্ষমতা অধিক দেখা যায়। বিশেষ করিয়া আধুনিক যুগ অনেক পরিমাণে 'প্রোপাগ্যাণ্ডা' বা প্রচারের যুগ। যে যাহার মতবাদ যত কৌশলে এবং যত সুযুক্তিপূর্ণ করিয়া অপরের উপরে যত চতুরতার সহিত সুবিন্যস্ত করিতে পারিবে তাহার মতবাদ সাধারণে ততই প্রতিষ্ঠালাভ করিবে। আধুনিক জগতের অস্তিত্ব যে মূল সূত্রটিকে কেন্দ্র করিয়া দানা বাঁধিয়া উঠিবার প্রয়াস করিতেছে, সেই রাজনীতি-ক্ষেত্রেও এই বাগ্‌বিন্যাসের যে কিরূপ অপ্রতিহত প্রভাব, তাহা বিভিন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থার ফলাফলে অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।

ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রসার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চিন্তার এবং বাক্যের স্বাধীনতা ঘোষিত হইয়াছে। রাষ্ট্রের পরিচালক আইন-পরিষদ্‌গুলিতে বিভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তিগণের মধ্যে যিনি যাঁহার মতবাদ যত কৌশলে এবং যুক্তিপূর্ণ-ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন তিনিই জনসাধারণ-কর্তৃক তত সমর্থিত হইবেন; এবং সেই মতানুসারে দেশের ও দশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত হইবে। রাজনীতি-ক্ষেত্র ছাড়াও ছোট বড় সমস্ত প্রতিষ্ঠানেই এইরূপ মতামতের প্রাধান্যের উপরেই সমস্ত বিধি-ব্যবস্থা এবং মঙ্গলামঙ্গল

নির্ভর করিয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় বাক্‌শক্তির স্ফুরণ যে জীবন-যাত্রায় প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির অন্যতম, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এইজন্য প্রথম হইতেই যাহাতে বাগ্‌বিন্যাসের অনুশীলন সম্ভব হয় তাহার জন্য স্কুল হইতেই বিতর্ক-সভার সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

স্কুল-কলেজের এই সমস্ত বিতর্ক-সভায় উপযুক্ত ব্যক্তির নেতৃত্বে এবং সভাপতিত্বে বাক্যস্ফুরণের সহায়তা করা যাইতে পারে। এই সমস্ত সভায় দুইটি কৃত্রিম প্রতিপক্ষ সৃষ্টি করিয়া সাহিত্যিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি নানাবিষয়ে নানাপ্রকারের বিতর্কের অবতারণা করা যাইতে পারে। এই বিষয়ে একটি কথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে এরূপ তর্ক-বিতর্কের সময়ে কতকগুলি মূল নিয়ম প্রত্যেকেরই মানিয়া চলিতে হইবে। এই নিয়ম প্রতিপালনের উপরেই নিয়মতান্ত্রিক চিন্তাধারা গঠনের ভিত্তি গড়িয়া উঠে। আমাদের হৃদয়ে প্রতিনিয়তই নানারূপ চিন্তা এলোমেলো হইয়া উপস্থিত হয়। এই সমস্ত চিন্তাস্রোতগুলিকে একটি বিশিষ্ট পথে পরিচালিত করার নামই চিন্তাশক্তি। ইহাতে যথেষ্ট স্বাধীনতার অবসর থাকিলেও সংযমের প্রয়োজন। বক্তব্য বিষয়ে গড় গড় করিয়া কতকগুলি কথা উচ্চৈঃস্বরে বলিতে পারিলেই বক্তব্য বিষয় প্রতিষ্ঠিত হইবে না। এজন্য বক্তব্য বিষয়টিকে সুযুক্তিতে এবং উপযুক্ত কৌশলে অপরের নিকট উপস্থাপিত করাই প্রয়োজন। প্রগল্‌ভতার দ্বারা এইরূপ উদ্দেশ্য কখনই সফল হইতে পারে না।

এইরূপ বিতর্ক-সভায় চিন্তাশক্তি গঠনের এবং প্রকৃত বাগ্‌বিন্যাসের ক্ষমতা অর্জ্জিত হয়; কারণ এই ব্যবস্থায় যাঁহারা যোগদান করেন তাঁহারা প্রত্যেকেই সম্পূর্ণরূপে জানেন যে ব্যাপারটি আগাগোড়াই কৃত্রিম এবং নিছক 'অ্যাকাডেমিক' ছাড়া ইহার কোনও সার্থকতা নাই। এখানে ব্যক্তিগত জয়-পরাজয়ের সহিত ব্যক্তিগত বিরোধ বা বন্ধুত্বের কোনপ্রকার সম্পর্ক নাই। রাজ্যের উত্থান-পতন লইয়া এখানে যে তর্ক ও মীমাংসা করা হইবে তাহাতে বাস্তব রাজ্য পরিচালনার কোনই পরিবর্ত্তন হইবে না। যে সমস্ত বিভিন্ন মতবাদ এখানে অতি সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হইবে, তর্ক-সভাগৃহের বাহিরে

যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলিকে ঘরটির ভিতরেই ফেলিয়া রাখিয়া যাইতে হইবে। অথচ যে মূল শক্তিটি এখানে অর্জ্জিত হইল সেই শক্তিটি জীবনের মহা উপকারী বন্ধুর ন্যায় সমস্ত জীবন সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া প্রত্যেক কর্ম্মে সহায়তা করিবে।

তোমার গ্রামের কোন আধুনিক ঘটনা

ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি একটি দিনের কথা। গ্রামে দুইটি জমিদার-বাড়ীর দোল এক সঙ্গে খুব ঘটা করিয়া অনুষ্ঠিত হয়। বারোয়ারি কালী-বাড়ীর কাছে দুইটি অতি প্রাচীন কদম গাছের তলায় দোল হয়। সারা বছর ধরিয়া এখানে যে জঙ্গল জন্মে এই সময় তাহা পরিষ্কার করিয়া মাটি দিয়া নূতন বেদী তৈয়ারী করা হইয়া থাকে। প্রতি বৎসরের মত এবারেও দোলের কয়েক দিন আগে বহু লোকজন মিলিয়া জঙ্গল পরিষ্কার করিতেছিল। বৈকালের দিকে একটি বানর সঙ্গে করিয়া দুইজন লোক সেখানে উপস্থিত হইল। লোক দুইটি বাঙ্গালী, বীরভূম অঞ্চলে নাকি তাহাদের বাড়ি। বানরের খেলা দেখাইয়া অর্থোপার্জ্জন করে; সঙ্গে দুইটি বানর ছিল, একটি কয়দিন হইল মারা গিয়াছে ইত্যাদি বলিয়া তাহারা নিজেদের পরিচয় দিল।

যথারীতি ভূমিকার পরে তাহারা বানরের খেলা দেখাইয়া আমাদের সকলকেই বিশেষ মুগ্ধ করিল। পরে দর্শকমণ্ডলীর নিকট হইতে কিছু কিছু পয়সা লইয়া লোক দুইটি সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বিদায় লইল।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙিতেই একটি গোলমাল কানে আসিল। বাহিরে আসিয়া যাহা শুনিলাম তাহাতে আশ্চর্য্য না হইয়া পারিলাম না।

আমাদের গ্রামের পূর্ব্ব দিকে কয়েক ঘর কৈবর্ত্তের বাস। তাহাদের একটি ঘরে রাতে সিঁদ কাটিয়া চুরি হইয়াছে। চুরিটি অদ্ভুত ধরণের। গৃহস্বামীর অভ্যাস লণ্ঠন জ্বালাইয়া ঘুমান। তাহার একটি কারণ আছে। তাহার ঘরে আগে আলো থাকিত না, সেই সময় এক রাতে প্রায় তাহার সম্মুখ হইতেই খুব বড় রকমের এক চুরি হইয়া যায়। চোর অন্ধকারে কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া

হঠাৎ জলের কলসীটি উল্টাইয়া ফেলে ; সেই শব্দে তাহার ঘুম ভাঙিয়া যায় এবং তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিতে জ্বালিতে চোরটি তাহার মূল্যবান্ বাক্সটি লইয়া সিঁদ দিয়া বাহিরে আসিয়া অন্ধকারে মিলাইয়া যায়। এই ঘটনাটির পর হইতে গৃহস্বামী লণ্ঠন জ্বালাইয়া ঘুমান অভ্যাস করে। এখানে বলিয়া রাখা দরকার গৃহস্বামীটি কিঞ্চিৎ সঙ্গতিশালী বলিয়া আশেপাশে তাহার খ্যাতি আছে।

সেই রাতে ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্বামী লক্ষ্য করিল তাহার তক্তপোষের তলায় অবস্থিত লণ্ঠনটির আলো একবার কমিতেছে ও আর একবার বাড়িতেছে। লণ্ঠনটির এরূপ আচরণের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া সে অতি সন্তর্পণে তক্তপোষের নীচে চাহিয়া যাহা দেখিল তাহা সহজে বিশ্বাস করা কঠিন।

সে দেখিল একটি বানর বসিয়া পাশের একটি ডালা হইতে একটির পর একটি করিয়া কুল খাইতেছে এবং নিবিষ্ট চিত্তে লণ্ঠনটির আলো কমাইতেছে ও বাড়াইতেছে। কুলের ডালাটি প্রায় খালি হইয়া আসিয়াছে ; মনে হইল বানরটি অনেকক্ষণ ধরিয়া এই প্রকার আহার ও খেলায় ব্যাপৃত আছে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে বানরটির খেলা সেদিন বৈকালে দোল-মঞ্চের নিকট দেখা গিয়াছিল এ সেই বানর ; গলায় সেই লাল রঙের ফিতা, গায়ে সেই নীল রঙের জামা। গৃহস্বামীর তখনও মনে হইতেছে—স্বপ্ন না বাস্তব ? কি করিবে না করিবে ভাবিতে ভাবিতে সে উঠিয়া বসিল, এদিকে তাহার সাড়া পাইয়া বানরটি চক্ষের পলকে তক্তপোষের পার্শ্ববর্ত্তী সিঁদ দিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

গৃহস্বামী কাল বিলম্ব না করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল বানর কিংবা তাহার প্রভুদিগের চিহ্ন কোথাও নাই। ইতিমধ্যে গৃহের অন্যান্য লোকজনও উঠিয়া পড়িয়াছিল। দেখা গেল সিঁদটি খুব বড় নহে, একজন মানুষের পক্ষে তাহার ভিতর দিয়া ঘরে আসা কঠিন। বানরের পক্ষে অবশ্য ইহার সাহায্যে ঘরে যাতায়াত করা সহজ। বানরটি ঘরে আসিয়া এই সিঁদ দিয়া থালা-বাসন ও কিছু কিছু অন্যান্য জিনিষপত্র বাহিরে চালান দিয়াছে। আরও হয়ত দিত, কিন্তু কুল ও লণ্ঠনের দিকে নজর পড়ায় সে আপন কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়াছিল।

এজন্য সে তাহার মনিবদের নিকট শাস্তি পাইয়াছিল কিনা জানা যায় নাই।

বলা বাহুল্য গ্রামে বহুবার বহু রকমের চুরি হইয়াছে, কিন্তু এ রকমের চুরি কখনও হয় নাই। সুতরাং এই ব্যাপার লইয়া গ্রামে যে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে আর বিচিত্র কি! খবরের কাগজেও এ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল।

লোক দুইটি বলিয়াছিল মৃত বানরটি নাকি 'বড় খেলোয়াড়' ছিল। হয়ত সে চুরির ব্যাপারে একেবারে সিদ্ধহস্ত ছিল। দুইটি বানর একসঙ্গে না জানি কত বড় চুরিই করিতে পারিত!

দরিদ্রগণের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য

ভারতবর্ষে দরিদ্রের সেবা গৃহস্থের অবশ্যপালনীয় ধর্ম্ম বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে। সুগৃহস্থের সংসারে দরিদ্র কখনও ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরে না। ভিখারীকে দুই মুষ্টি অন্ন দান করিয়া অন্নহীনের মুখে অন্ন তুলিয়া দিয়া গৃহী নিজেকে ধন্য মনে করেন। গৃহীর আদর্শের মধ্যে এই ভাবটি বর্ত্তমান থাকায় ভারতবর্ষে ধনি-দরিদ্রের ব্যবধানটা তেমন দুর্লঙ্ঘ্য হইতে পারে নাই। যে কৃতী সমর্থ, তাহার উপরে সমাজের অন্য দশজনের অধিকার আছে। সমাজে যাহারা আর্থিক অবস্থায় হীন, তাহারা অপেক্ষাকৃত সৌভাগ্যবানের নিকট অর্থ-সাহায্যের দাবী লইয়া উপস্থিত হয়। যদি তাহাদের আশা পূর্ণ না হয় তবে তাহা সেই কৃতী পুরুষদেরই অকৃতার্থতার পরিচয়। যে ধনীর ধনে অক্ষমের সেবা হইল না, তাহার ধনের সার্থকতা কোথায়?—ইহাই তো ভারতবর্ষের গৃহস্থের সনাতন আদর্শ।

দরিদ্রসেবার আগ্রহের মধ্যে ধনের গর্ব্ব বা অভিমান নাই। ধনলাভকে আমাদের দেশে চরম পুরুষার্থ বলিয়া মনে করা হয় নাই; ধনত্যাগকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া গৌরব করা হইয়াছে। দারিদ্র্য আমাদের নিকট অতিমাত্রায় লজ্জার বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইত না। আমাদের দেশে যাঁহারা সমাজের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন, সেই সর্ব্বত্যাগী ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের দারিদ্র্যের নিকট

রাজাধিরাজকেও মাথা নত করিতে হইয়াছে। অনাড়ম্বর জীবনই আমাদের দেশে আদরের বস্তু ছিল। বোধ হয় এই কারণেই দরিদ্রের প্রতি অবজ্ঞা ও উপেক্ষার ভাব অন্যান্য দেশে যেমন তীব্র, আমাদের দেশে সেরূপ কোন দিনই ছিল না। দরিদ্র-নারায়ণের সেবা, দুঃখী-কাঙ্গালীকে অন্নদান, বস্ত্রদান ভিন্ন ধনীর উৎসব সম্পূর্ণ হইত না। দরিদ্রের উপকার করিয়া তাহাকে চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করা গেল—ধনগর্ব্ব-প্রসূত এই মনোবৃত্তি আমাদের দেশে চিরকালই নিন্দিত। স্বয়ং দেবদেব মহেশ্বর যে দেশে ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করিয়া ভিখারীর মূর্ত্তি ধরিয়াছেন, সেখানে পুণ্যকামী 'দরিদ্রের সেবা করিতে পারিলে ঈশ্বরের সেবা করিয়া কৃতার্থ হইলাম' এইরূপ মনে করিয়া কৃতজ্ঞতার সহিত দরিদ্রদিগকে অন্নদান করিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে?

অবশ্য সমাজের মধ্যে ধনি-দরিদ্রের ভেদ থাকিবেই। কিন্তু একজন ঐশ্বর্য্যে স্ফীত হইয়া উঠিবে আর তাহারই আশে পাশে আর একজন অন্নের অভাবে তিল তিল করিয়া মরিতে থাকিবে, ইহা সুব্যবস্থিত সমাজের রীতি নয়। যে সমাজে মানুষকে এরূপ নিরন্ন নিরুপায় করিয়া রাখা হয়, সেখানে ধনৈশ্বর্য্যের মধ্যেও ভয়ের বস্তু আছে, কারণ তাহা হইতে ঘোরতর অকল্যাণের সৃষ্টি হইতে পারে।

পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহেও দরিদ্রের দুঃখ নিবারণের জন্য রাষ্ট্রব্যবস্থা হইতে অনেক বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। কিন্তু সেখানে দারিদ্র্যকে একটা মহাপাপ বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে এবং ধনীর অবজ্ঞা-দৃষ্টি হইতে ভিখারী সভয়ে সসঙ্কোচে আপনাকে সরাইয়া রাখে। ভিক্ষাবৃত্তি সেখানে আইনতঃ দণ্ডনীয়, সুতরাং দলে দলে রোগক্লিষ্ট ভিখারীর পাল সেখানে শহরের শ্রী এবং স্বাস্থ্য নষ্ট করে না। কিন্তু তাহারা যাহাতে জীবনের প্রয়োজনীয় অন্ন-বস্ত্র ঔষধ-পত্র হইতে বঞ্চিত না হয়, তাহার জন্য সেখানে নাগরিকদের সদাজাগ্রত চেষ্টা রহিয়াছে। তাহাদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে, দরিদ্র-সন্তানদের জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয়, নৈশবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে, আশ্রয়হীনের জন্য বাসস্থানও আছে। জনসাধারণ এই সব প্রতিষ্ঠানে যথেষ্ট অর্থ-সাহায্য

করে এবং অন্য উপায়েও আনুকূল্য করিয়া থাকে। তবে এ বিষয়ে ভারতবাসীর সহিত ইউরোপীয় মনোবৃত্তির পার্থক্য এই যে ইউরোপীয় জনসাধারণ দরিদ্রের উপকারের জন্য যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া থাকে, তাহাতে সুশৃঙ্খলভাবে কাজ হয়, সাহায্যও যথেষ্ট হইতে পারে, কিন্তু দাতার সহিত গ্রহীতার হৃদয়বৃত্তির যোগ নাই বলিলেই হয়। দরিদ্র সেখানে নত হইয়া দান গ্রহণ করে বটে, কিন্তু প্রাণ খুলিয়া সে আশীর্ব্বাদ ও জয়ধ্বনি করিবে কাহার উদ্দেশ্যে? উপকার ও আশ্রয় সেখানে একটা প্রাণহীন সমাজযন্ত্রের মধ্য হইতে আসিতেছে, মানুষের করুণাপূর্ণ হৃদয় সেখানে কোথায়?

চা

চা-বৃক্ষ যদিও বট-বৃক্ষের ন্যায় বিরাট আয়তনবিশিষ্ট নহে, বড় জোর আট-দশ ফুট লম্বা তথাপি চায়ের আদর বট হইতে কত বেশী তাহা সকলেই জানেন। বট-বৃক্ষের শাখায় শাখায় শকুনি বাসা বাঁধে এবং রৌদ্র-জলে পুড়িয়া বেচারী বটগাছ রাস্তার কিনারায় অনাদরে দাঁড়াইয়া সময় কাটায়। মরিয়া যাওয়ার পরই কি তাহার দুর্দ্দশা কম!—সে তখন "শুষ্ক জীর্ণ হ'য়ে শুধু রন্ধনের জোগায় ইন্ধন"। কিন্তু কচি কচি ছোট ছোট চায়ের চারাগুলির আদর কত বেশি! সারির পর সারি ঢালু ক্ষেতে সেগুলি সাজানো থাকে, কি সুন্দর দেখিতে! ইহাদের পরিচর্য্যারই কি ব্যবস্থা কম? নূতন নূতন চারাগাছগুলির স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রচুর পরিমাণে জল অতিশয় উপকারী, সেজন্য এগুলিতে যথেষ্ট জল সেচন করিতে হয়। চায়ের চাষের জন্য পার্ব্বত্যভূমি অত্যন্ত অনুকূল। চাকে বাঁচাইবার জন্য অতিশয় যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে ক্ষেতের আগাছাগুলি নিড়াইয়া ফেলিতে হয় এবং অনবরত পরিচর্য্যার দ্বারা পোকামাকড় হইতে ইহাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করা আবশ্যক হইয়া পড়ে।

চাগাছ অবশ্য দশ-বার ফুট পর্য্যন্ত বাড়িতে পারে, কিন্তু সচরাচর তিন ফুটের বেশী বাড়িলে চা পাওয়া যায় না; এইজন্য বেশী বাড়িবার সময় চারার

মাথা ছাঁটিয়া দেওয়া হইয়া থাকে এবং গুঁড়িগুলিও ছাঁটিয়া ফেলা হয়—তখন চারাগাছগুলি অতি সুন্দর ঝোপের মতন দেখায়।

চা-বাগানে যখন চা-পাতা তোলা হয় তখন সেই দৃশ্যটি বড় চমৎকার ; বহু কুলি—স্ত্রী এবং পুরুষ—অতি ভোরে পিঠের উপর বাঁশের ঝুড়ি ঘাড়ের সহিত দড়ি দিয়া ঝুলাইয়া লইয়া দল বাঁধিয়া চা-ক্ষেতে যায় এবং মহা উল্লাসে চায়ের পাতা কাটিয়া ঝুড়ি বোঝাই করিয়া লয়। বছরের মধ্যে তিন-চারবার এইরূপ পাতা সংগ্রহ করা হয় এবং এগুলি তিন-চার শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। প্রথমবার যে কুঁড়িগুলি সংগ্রহ করা হয় সেগুলির নাম 'পিকো' বলা হইয়া থাকে ; ইহাই বাজারের সবচেয়ে ভালো চা। তারপর ছোট ছোট পাতাগুলি 'সাউচাঙ্' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। শেষবারে যে বড় বড় পাতা আহরণ করা হয় সেগুলিকে 'কম্পু' বলা হইয়া থাকে এবং বাজারে এই পাতার দর অত্যন্ত কম। আমরা বাজার হইতে যে পাতা চা বা গুঁড়া চা অথবা আধগুঁড়া বা 'ফ্যানিংস্' চা কিনি তাহা কিন্তু রীতিমত কতকগুলি বিশিষ্ট প্রণালীতে প্রস্তুত ঐ বিভিন্ন সময়ের সংগৃহীত ফসল। প্রথমতঃ চারা হইতে পাতা সংগ্রহ করার পর বাতাসে সেই পাতাগুলি শুকাইয়া লইতে হয়, তারপর এগুলি নরম হইলে কলের মধ্যে এগুলিকে 'রোল' করিয়া লইয়া পরে কোনো স্যাঁত্সেঁতে গুদামঘরে বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়। শেষে চালুনি দিয়া চালিয়া লইয়া নানারূপ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া বিক্রয়ার্থে প্রেরিত হইয়া থাকে।

আমাদের হাতে বাজার হইতে প্যাকেট-ভর্ত্তি সেই চা বাড়িতে আসিয়া পুনরায় নব জন্ম লাভ করে ; গরম জলে এই চা ভিজাইয়া সেই আরক দুধ ও চিনি সহ কাপে ভরিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত করা হয় আমাদের পানের জন্য। এক হিসাবে চাকে দ্বিজ বলা যাইতে পারে। চা-বাগানে চা-করগণের কুলিদের হাতে একবার ইহাদের জন্ম হয়—পুনরায় বাড়ীতে চাকরের হাতে ইহারা দ্বিতীয়বার জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে।

ভারতবর্ষে চায়ের প্রচলনের ইতিহাস অতি বিচিত্র, চায়ের আদি জন্মস্থান চীনদেশে, সেখান হইতে ইউরোপে ইহার প্রচলন হয় ; আমরা চীনের এত

নিকটে থাকিয়াও বিশেষতঃ বহু প্রাচীন যুগ হইতে ভারতের ও চীনের সহিত বাণিজ্যসম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও আমরা চায়ের ব্যবহার শিখিলাম ইউরোপীয়ান—ইংরাজদের কাছে।

এখন অবশ্য ভারতে দরিদ্রের পর্ণকুটির হইতে ধনীর অট্টালিকায় চায়ের অপ্রতিহত প্রভাব। অনেক গোঁড়া ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত পর্য্যন্ত চায়ের অদ্ভুত ভক্ত। তরুণ ছাত্রসমাজের ত কথাই নাই। স্বাস্থ্যের হানিকর বলিয়া অনেক হিতৈষী দেশপ্রেমিক বাহিরে সরকারী ভাবে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়া আন্দোলনের অবসানে এই অভিনব সোমরস পরমাদরে নির্লিপ্তভাবে পান করেন।

পরীক্ষার সময়ে অধিক রাত্রি জাগরণ করিবার জন্য ছাত্রদের কাপের পর কাপ চা না হইলে চলে না। অফিসের কেরাণীকুল মাঝে মাঝে চা-পানে ক্লান্তি দূর করিতে না পারিলে কলম-পেষায় অক্ষম হইয়া পড়েন। কলেজের অধ্যাপকগণ ক্লাশের পর এক কাপ চা না পাইলে পুনরায় গলার শক্তি এবং মনের স্ফূর্ত্তি অর্জ্জন করিতে পারেন না। অনেকে আবার প্রাতঃকালে 'Bed tea' না পাইলে নিত্যনৈমিত্তিক প্রাতঃক্রিয়াদির অনুপ্রেরণা পান না। চায়ের নাকি ম্যালেরিয়ার রোগ-বীজাণু নষ্ট করিবার ক্ষমতা আছে এবং ইহাতে ট্যানিক অ্যাসিড্ থাকায় গলার পক্ষে নাকি অত্যন্ত উপকারী।

যদিও ষ্টেশনে চা-ষ্টলের বিজ্ঞাপনীতে লেখা থাকে—

'ইহাতে নাহিক মাদকতা দোষ।
কিন্তু পানে করে চিত্ত-পরিতোষ।'

—তবু চা যে একটা নেশা, উপযুক্ত সময়টিতে চা না পাইলে যে আফিম-খোরের মতই মেজাজটা বিগ্‌ড়াইয়া যায়, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তবে একথাও নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করিতে পারা যায় যে শ্রমজনিত ক্লান্তি অপনোদন করিয়া সাময়িক অবসাদ দূর করিতে এমন অল্প দোষযুক্ত আসবও আর দ্বিতীয় নাই। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যাইতে পারে—

হায় হায় হায়
দিন চলি যায়

চা-স্পৃহা-চঞ্চল
চাতক দল চলো
চলো চলো হে।
টগবগ উচ্ছল
কাথলি জল জল,
এল চীন-গগন হ'তে
পূর্ব্ব-পবন-স্রোতে
শ্যামরসধারাপুঞ্জ
শ্রাবণ-বাসরে
ঝর ঝর ঝরে
ভুঞ্জ হে ভুঞ্জ
দল বল হে।

সুখী জীবনের আদর্শ

প্রকৃত সুখ কিসে হয়? এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে অতি অল্প লোকই যথার্থ উত্তর দিতে পারে। অথচ সংসারে সকলেই সকল অবস্থার মধ্যে সুখ অন্বেষণ করিতেছে। সুখ কি? এ সম্বন্ধে অবশ্য মানুষমাত্রেরই একটি অস্পষ্ট ধারণা আছে। সাধারণতঃ লোকে ভাবে—যে বস্তুটি তাহার নাই তাহা কোন রকমে অর্জ্জন করিতে পারিলেই বা উপভোগ করিতে পারিলেই সে প্রকৃত সুখের অধিকারী হইবে। দরিদ্র ব্যক্তি ধনকেই সুখের কারণ বলিয়া ভাবে, নষ্টস্বাস্থ্য লক্ষপতি দরিদ্রের স্বাস্থ্যকেই স্পৃহার বিষয় মনে করে। সর্ব্বত্রই মানুষ এইরূপে অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপ্তিকে বা প্রাপ্ত বস্তুর উপভোগকেই সুখের নিদান বলিয়া কল্পনা করে। কিন্তু যখন প্রবল চেষ্টা ও পরিশ্রমের পর কার্য্যফল তৃপ্তিকর হয় না, তখন আবার অবসাদ ও অতৃপ্তি আসিয়া মানুষকে আক্রমণ করে। মরুভূমিতে মরীচিকার মত সুখের ছবি সম্মুখ হইতে সরিয়া যায়। সুতরাং সত্যই সুখময় জীবন কোন্‌টি? ইহা বিশেষ ভাবিবার কথা।

জীবনের আদর্শ সকলের এক হইতে পারে না, জীবন যাপনের এমন একটি প্রণালী স্থির করিয়া দেওয়া যায় না যাহার দ্বারা সকলেই এক রকম সুখ ও শান্তি লাভ করিতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তিরই আনন্দময় জীবন সম্বন্ধে বিশিষ্ট আদর্শ আছে। এক্ষণে আমার ব্যক্তিগত আদর্শ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

জীবনে প্রকৃত সুখের জন্য পরিমিত অর্থের প্রয়োজন আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। অনেকেই মনে করেন—অর্থ দ্বারা সুখ বা শান্তি মিলে না; কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের সমাজ যে ভাবে গড়িয়া উঠিতেছে তাহাতে অর্থের অভাব শোচনীয় হইলে জাগতিক সুখ-শান্তি সম্ভব হয় না। সর্ব্বদা যদি অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা সমাধানেই ব্যস্ত থাকিতে হয় তাহা হইলে জীবনে আত্মোন্নতিকর ও পরিতৃপ্তিকর অন্যান্য কার্য্যের জন্য অবসর বা উৎসাহ পাওয়া যায় না। সেইজন্য দারিদ্র্যকে লক্ষ্য করিয়া কবি বলিয়াছেন—"দারিদ্র্যদোষো গুণরাশি-নাশী"। কিন্তু ইহাও নিশ্চিত সত্য যে অর্থের বাহুল্য প্রকৃত সুখের কারণ নহে; পরন্তু অনেক স্থলেই প্রয়োজনাতিরিক্ত ঐশ্বর্য্য সুখের পরিপন্থী। ধনসঞ্চয় জীবনের উদ্দেশ্য নহে, ধন নিমিত্ত মাত্র; সংসারের পথে অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে ছুটিয়া চলিবার কালে পাথেয় হিসাবেই ইহার প্রয়োজন।

লোকসমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে পারাই জীবনের চরম সার্থকতা নহে। খ্যাতি ও প্রতিপত্তির মোহ অনেকেই অনুভব করে; কিন্তু স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহা সহজেই বোধ হয় যে জন-কোলাহলের মধ্যে সাধারণ অজ্ঞতা ও অদূরদর্শিতার সুযোগ লইয়া নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করায় কৃতিত্ব বিশেষ কিছুই নাই। যশের আকাঙ্ক্ষা সকলেরই আছে এবং এই আকাঙ্ক্ষাই অনেক মহৎ কার্য্যের অনুপ্রেরণা দিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত চিন্তাশীল ব্যক্তি শুধু সৎকর্ম্মের দ্বারা অর্জ্জিত যশকেই কামনা করেন, খ্যাতির লোভে তিনি নিজেকে দশের মধ্যে প্রচার করিতে চাহেন না।

প্রকৃত সুখ অর্থে কিংবা খ্যাতিতে নহে, যে সুখের আদর্শ আমার মনে জাগিয়া আছে তাহার মূলে ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার কিংবা দিগ্বিজয়ের গর্ব্ব নাই। সংসারের সাধারণ অভাব-অভিযোগ মিটাইয়া নিজের যাহা কিছু কর্ম্মদক্ষতা

অন্তর্নিহিত আছে একান্তমনে তাহার চর্চ্চা করিয়া বাহিরের কর্ম্মে তাহাকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারিলেই যথার্থ সুখের অধিকারী হওয়া যায়। একথা সত্য যে, অতি অল্প লোকই মহৎ গুণের অধিকারী হয়। অসামান্য বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ কিংবা জ্ঞানশালী ব্যক্তির সংখ্যা চিরকালই নগণ্য; কিন্তু যে যাহা পাইয়াছে তাহার প্রকৃষ্ট ব্যবহার করাই শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। যে জীবন আমাকে অখণ্ড জ্ঞানচর্চ্চার ও অবিচলিত আত্মোন্নতির সুযোগ দিবে সেই জীবনই আমি সর্ব্বাপেক্ষা সুখকর মনে করি।

এই উচ্চাশা সামান্য লোকের পক্ষে বিড়ম্বনামাত্র বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু এই আশা পোষণ করিবার মধ্যেও যে আনন্দ আছে তাহা আমরা জগতের বরেণ্য পুরুষদিগের জীবনী আলোচনা করিলে দেখিতে পাই। সর্ব্বকালেই এমন এক শ্রেণীর লোক পৃথিবীতে আসেন, যাঁহারা উগ্র কর্ম্ম ও পৌরুষযুক্ত চরিত্রের দ্বারা প্রথিতকীর্ত্তি হইতে চাহেন নাই, তাঁহারা শুধু চাহিয়াছেন নিভৃতে আপনার মন ও হৃদয়ের বৃত্তিগুলিকে স্বাভাবিকভাবে বিকাশ করিবার নিরবচ্ছিন্ন সুযোগ। এই বাসনার দ্বারা অনুপ্রেরিত হইয়া নবদ্বীপের পণ্ডিত-শিরোমণি আচার্য্যগণ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্বের আলোচনায় পরম আনন্দে দিন যাপন করিয়াছেন। আমি অবশ্য নিজেকে ইঁহাদের সহিত তুলিত করিবার স্পর্দ্ধা রাখি না। তবে ইঁহাদিগকে উদাহরণরূপে গ্রহণ করিয়া ইহাই বলিতে চাহি যে, আমি যে আদর্শ জীবনের কথা বলিতেছি জ্ঞানী ও মহৎ ব্যক্তিরা তাহার অনুমোদন করিয়াছেন।

অবশ্য অভাব-বোধকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিতে না পারিলে জীবনে সুখী হওয়া যায় না। আমরা অভাবের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়াইয়া চলিয়াছি বলিয়া অল্প লইয়া আমরা আর তৃপ্ত থাকিতে পারি না। ইহা নিশ্চয়ই অস্বীকার করি না যে অভাবের তীব্র অনুভূতিই মানুষকে নিত্য নূতন কর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে; কিন্তু বাহিরের অভাব মিটাইবার উন্মত্ত প্রচেষ্টার ফলে অন্তরের অভাব অনেক স্থলে চিরকালই রহিয়া যায়। ইহাই আমার আনন্দময় জীবন সম্বন্ধে মনের ধারণা।

শরৎকালের জ্যোৎস্না

শরৎকাল পরম রমণীয় সময়। বর্ষার অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণের পর এই সময় পৃথিবী চিত্তহারিণী শ্যামল স্নিগ্ধ শোভা ধারণ করে। আকাশে ঘনকৃষ্ণ জলদ-জাল আর রবিকর আচ্ছন্ন করিয়া রাখে না, শুধু জলবাহী লঘুপক্ষ শুভ্র মেঘগুলি সুনীল আকাশে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে থাকে। বাংলার মাঠে মাঠে কাঁচা-পাকা ধানের শিষ্‌গুলি মাথায় তুলিয়া ছোট ছোট ধানগাছগুলি হেলিয়া দুলিয়া নয়ন মনের তৃপ্তি সাধন করে। নদীতে নদীতে কাকচক্ষুর ন্যায় স্বচ্ছ সলিল কলোচ্ছ্বাসে তটতরুমূলকে আন্দোলিত করিয়া ছুটিতে থাকে। নানা বর্ণের সুগন্ধি পুষ্প-নিচয় প্রস্ফুটিত হইয়া বর্ণ ও গন্ধের প্রাচুর্য্যে বনভূমি ভরপুর করিয়া দেয়; বৃক্ষের শাখায় ও লতার অভ্যন্তরে বসিয়া বিচিত্র বর্ণের সুস্বর বিহঙ্গকুল লক্ষ কণ্ঠে কলকাকলী তুলিয়া দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত করিয়া রাখে। গ্রীষ্মের প্রবল প্রকোপ শেষ হইয়া এই সময়ে শীতের আগমন মৃদুভাবে সূচিত হয়। সুতরাং শরীর ও মনের পক্ষে সুখকর নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া শরৎকালকে স্পৃহণীয় করিয়া তোলে। এই রম্য ঋতু কবিদের নিকট হইতে চিরকাল প্রশস্তি পাইয়া আসিয়াছে। প্রাচীন যুগে কালিদাস শরৎ ঋতুর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যপ্রাচুর্য্যের উচ্ছ্বসিত বর্ণনা করিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশে শরৎকালে যে অপূর্ব্ব সুষমা আকাশে ও ধরাপৃষ্ঠে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে আধুনিক সময়ে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ তাহা অসংখ্য গানে ও কবিতায় বিচিত্র নৈপুণ্যের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন।

এই রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের কার্পণ্যহীন অজস্রতায় সুমণ্ডিত শরৎ ঋতুতে জ্যোৎস্নালোকে প্লাবিত রজনী কি যে অপার্থিব শোভা ধারণ করে, কবির লেখনী কিংবা চিত্রকরের তুলিকা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে তাহার সম্যগ্‌-ভাবে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি স্বভাবতঃই আনন্দ-দায়ক; সকল ঋতুতেই চন্দ্রকিরণোদ্ভাসিত প্রকৃতি নয়ন-মন অনুরঞ্জন করে। কিন্তু শরৎকালে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সর্ব্বত্রই একটি সলীল সজীবতা ও অপরিসীম শান্তির আভাস জাগিয়া থাকায় এই সময়ে নিভৃত যামিনীর নীরবতার মধ্যে

জ্যোৎস্নার আলোক-দৃষ্টির সম্মুখে স্বপ্নলোকের তোরণদ্বার উন্মুক্ত হইয়া থাকে। চন্দ্রকিরণ-বিধৌত শস্যশ্যামল প্রান্তর কিংবা মৃদুশ্বাসী তরুরাজির ঘনচ্ছায়ায় অর্দ্ধ-সমাচ্ছন্ন সলিলবাহী নদীর ধারে দাঁড়াইলে মনে হয়—যে অশরীরী সৌন্দর্য্য এতদিন শুধু কল্পনার বস্তু ছিল তাহা আজ মর্ত্ত্যের মৃত্তিকায় মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। দূরে আম্রবীথিকার অভ্যন্তরে গ্রামের ছোট ছোট গৃহগুলি কম্পমান আলোক ও ছায়ার সম্পাতে অদৃষ্টপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করে। দিবসের প্রখর দৃষ্টিপাতে যে দীনতা ও ত্রুটি দরিদ্রের কুটীরে প্রকাশ পাইয়াছিল, রাত্রির স্নিগ্ধ কিরণে তাহা নিঃশেষে মুছিয়া গিয়া গ্লানিহীন পরিপূর্ণতায় রূপান্তরিত হয়। শশাঙ্কের কোমল করের মধুর অবলেপ মানুষের কীর্ত্তি ও পরাজয়কে নির্ব্বিচারে সুষমামণ্ডিত করে।

শরৎকালে জ্যোৎস্না এইরূপ 'আনন্দিত নন্দন-লোকের' সন্ধান দেয়। বসন্ত নিশীথেও অবশ্য চন্দ্রালোক স্বপ্নজাল বিস্তার করে। যাহার কিছুমাত্র সৌন্দর্য্য-বোধ আছে সে-ই চৈত্র-পূর্ণিমার আকর্ষণী শক্তি অনুভব করিয়াছে। কিন্তু বাসন্তী জ্যোৎস্নাতে উগ্রতা ও মাদকতা আছে, শরৎকালের চন্দ্রকিরণে আছে প্রশান্তি ও দাক্ষিণ্য। মানুষের মনেও এই সময়ে অপ্রমত্ত মাধুর্য্য বিরাজ করে; সেই কারণেই বোধ হয় বাঙ্গালী হিন্দুদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উৎসব এই শরৎ ঋতুতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

একটি বিদায় অভিনন্দন

(একজন শিক্ষকের বিদায় উপলক্ষে)

গুরুদেব,

তুমি আজ আমাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছ এই চিন্তা আমাদের মনে গভীর দুঃখের ছায়া ফেলিয়াছে। ত্রিশ বৎসর কাল অপরিসীম উৎসাহের সহিত শিক্ষাদানে ব্রতী থাকার পর তুমি পরিণত বয়সে কর্ম্ম হইতে অবসর লইতেছ; ইহাতে আমাদের বলিবার কিছু নাই, কিন্তু তোমাকে আজ

হারাইতে বসিয়াছি ইহা স্মরণ করিয়া কিছুতেই আমরা আত্মসংবরণ করিতে পারিতেছি না। শোকাপ্লুত হৃদয়ে তোমার চরণে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিবার জন্য আমরা আজ এখানে সমবেত হইয়াছি। শুধু আমরাই তোমার ছাত্র হইবার গৌরব দাবী করিতে পারি না; একনিষ্ঠ সুদীর্ঘ কর্ম্মজীবনের মধ্যে অগণিত ছাত্রের জ্ঞান-প্রদীপ তুমি নিজহস্তে জ্বালাইয়া দিয়াছ। তাহারা আজ সকলে এখানে উপস্থিত নাই, তাহাদের অনেকেই আজ দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে; আমরা তোমার নবীনতম শিষ্য—তোমার পুরাতন ও নবীন সকল ছাত্রের পক্ষ হইতে আজ তোমাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

হে আচার্য্য! ইহা অশেষ সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া স্বীকার করিতেছি যে আমরা শিক্ষা-জীবনের প্রথমেই তোমার ন্যায় পূতচরিত্র অধ্যাপনাদক্ষ শিক্ষকের পদপ্রান্তে বসিয়া অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করিতে পারিয়াছি। তোমার বিদায়-দিনে আজ যে কথা স্মরণ করিয়া বিস্মিত হইতেছি তাহা তোমার অবিচলিত ধৈর্য্য। কোন অবস্থাতেই আমরা তোমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতে দেখি নাই। বিদ্যাগৃহে যখন পুস্তকের পত্রাবলীতে নিহিত সত্য আমরা আমাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের মধ্যে আনিতে বারংবার অক্ষম হইতেছিলাম, তখনও তুমি হাস্যমুখে নিরলস অধ্যবসায়ের সহিত বিচিত্র প্রণালীতে সেই সত্যকে সহজ ও সরস করিয়া দিতে চাহিয়াছ। বিদ্যালয়ের বাহিরে যখন আমরা অসংযত উচ্ছ্বাসে শাসন-নিয়মের বাহিরে যাইয়া পড়িতাম, তখনও তুমি ক্রোধপরবশ না হইয়া যুক্তি ও অনুযোগের দ্বারা নিজের পুত্রের মত আমাদিগকে শিষ্টাচারের গণ্ডীর মধ্যে টানিয়া আনিয়াছ। অন্যায়ের প্রতি তোমার ছিল কঠোর আক্রোশ, কিন্তু অপরাধীর প্রতি তোমার করুণার অন্ত ছিল না।

আজ মনে পড়িতেছে যে, আমরা অনেক সময়ে অবিমৃষ্য ব্যবহারের দ্বারা তোমার মনঃকষ্টের কারণ হইয়াছি; তোমার নিকট হইতে যে বিপুল দান আমরা প্রতিনিয়ত গ্রহণ করিয়াছি, তাহার উপযুক্ত সম্মান আমরা রাখিতে পারি নাই, আজ তোমার বিদায়ের দিনে আমাদের অজস্র ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা স্মরণ করিয়া আমরা নিরতিশয় লজ্জিত হইতেছি। কুণ্ঠিতচিত্তে প্রার্থনা করিতেছি

যে তোমার স্বভাব-সুলভ ঔদার্য্যের বলে তুমি আমাদের অজ্ঞান-কৃত অপরাধ মার্জ্জনা করিও।

গুরুদেব! তুমি আজ বিদ্যালয় হইতে অবসর গ্রহণ করিতেছ; কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে বিদ্যালয় হইতে তুমি সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবে না, পরোক্ষভাবে ইহা তোমার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সাহায্য পাইবে। আমরা আশা করি, দূরে সরিয়া গেলেও তুমি আমাদিগকে তোমার স্নেহ হইতে একেবারে বঞ্চিত করিবে না, আমাদের কথা স্মরণে রাখিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ করিবে। তুমি আমাদের হৃদয়ে যে আসন পাতিয়া বসিয়াছ তাহাতে তোমার স্মৃতির প্রদীপ চিরদিন আমাদের জীবন-পথকে আলোকিত করিবে।

ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—তোমার জীবন শান্তিময় ও নিরাময় হউক। নিবেদন ইতি—

ভক্তি-অবনত

শৈলগ্রাম উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের ছাত্র-বৃন্দ

দাতব্য চিকিৎসালয়

মানুষের জন্য যে পরিমাণ ব্যাধি সৃষ্ট হইয়াছে তাহাতে বোধ হয় চিকিৎসালয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া চিকিৎসালয়ের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারে নাই এরূপ লোক অতি দুর্লভ। এই সুজলা সুফলা বঙ্গভূমি এখন যে ভাবে ব্যাধিসমূহের লীলাভূমি হইয়াছে তাহাতে প্রায় সকল বাঙ্গালীরই জীবনের সঙ্গে ঔষধের নিত্য সম্বন্ধ ঘটিয়াছে। গ্রামে গ্রামে বহুরূপী ম্যালেরিয়া জ্বর অবাধে রাজত্ব করিতেছে। ইহার সঙ্গে আসিয়াছে ইহার সহোদর কালাজ্বর এবং দূর-সম্পর্কিত আরও নানা রোগ। এই সঙ্ঘবদ্ধ ব্যাধি-বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সমস্ত দেশ জুড়িয়া এক বিরাট চিকিৎসা-শিবির স্থাপন করিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

একথা সত্য যে শুধু চিকিৎসক কিংবা চিকিৎসালয়ের সংখ্যা বাড়িলেই রোগের নিবৃত্তি হয় না। চিকিৎসাকে একেবারে সহজলভ্য করিয়া না দিতে

পারিলে রোগার্ত্তদের নিষ্কৃতি নাই। দেশের অধিকাংশ লোকই এত দরিদ্র যে তাহারা প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াও জীবনধারণের উপায় উদ্ভাবন করিতে পারে না; সাধারণ চিকিৎসালয় হইতে ঔষধ ক্রয় করিবার অবস্থা তাহাদের নহে। যাহাদের অন্ন-বস্ত্রই জোটে না তাহারা রোগে মৃতপ্রায় হইলেও অর্থব্যয় করিয়া ঔষধ ব্যবহার করিতে পারে না। এই অগণিত মৃত্যুপথ-যাত্রীদের জন্য দেশে অসংখ্য দাতব্য-চিকিৎসালয়ের প্রয়োজন। বিনামূল্যে ঔষধ ও চিকিৎসকের যত্ন পাওয়া সম্ভব না হইলে ইহাদের রোগের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার অন্য কোনও উপায় নাই।

এই প্রয়োজন চিরকালই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এবং দরিদ্রের পক্ষে চিকিৎসাকে সুলভ করিতে অনেকেই সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছেন। বহু দানশীল ধনী ব্যক্তির চেষ্টায় বিনা মূল্যে দরিদ্রের চিকিৎসার জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতার বিখ্যাত মাড়োয়াড়ী বণিক্‌কুল এইবিষয়ে সকলের অগ্রণী। বাঙ্গালা দেশে রোগ ও দারিদ্র্য একসঙ্গে এরূপ প্রবলভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছে যাহাতে দরিদ্রের চিকিৎসা-সমস্যার সমাধান কোনও ব্যক্তি-বিশেষের পরহিতৈষণায় হওয়া সম্ভব নহে, দেশ-হিতকর কার্য্যের পরিকল্পনা ও পরিচালনার ভার স্বতঃই যাহার উপর ন্যস্ত হইয়া থাকে একমাত্র সেই দেশীয় সরকারই এই বিপুল ভার বহন করিতে পারেন। অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে বাঙ্গালাতে শাসক-সম্প্রদায় কোন দিনই এই কর্ত্তব্যের প্রতি একেবারে উদাসীন থাকেন নাই। বহু পূর্ব্ব হইতেই এদেশে সমস্ত জেলায় এবং মহকুমায় দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে অতি অল্প লোকই চিকিৎসিত হইবার সুযোগ পাইয়াছে; কারণ প্রায় সকল দরিদ্র ব্যক্তিই চাষ-আবাদ লইয়া শহর হইতে বহুদূরে অবস্থান করে। দাতব্য চিকিৎসালয়ের দূরপ্রসারী হস্ত গ্রাম পর্য্যন্ত না পৌঁছিলে ব্যাধিকে বিতাড়িত করা সম্ভব নহে।

সৌভাগ্যক্রমে বঙ্গীয় স্বায়ত্তশাসন আইনের দ্বারা স্থাপিত জেলা-বোর্ডগুলি দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছে। ইহারা জেলার মধ্যে বহু স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে; ম্যালেরিয়া রোগের প্রতি-

যেধের জন্য কুইনাইন প্রভৃতি ঔষধ অকাতরে বিতরণ করিতেছে। কালাজ্বরের প্রকোপ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হওয়ায় এই কাল ব্যাধিকে প্রশমিত করার জন্য ইহাদের যত্নে কতকগুলি বিশিষ্ট চিকিৎসা-কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই মহৎ ব্রত এখনও পূর্ণভাবে উদ্‌যাপিত হ য়নাই; যখন প্রতিটি গ্রামে গ্রামে দরিদ্রের জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইবে তখনই এই বৃহৎ জনহিতকর কার্য্য সম্পূর্ণ হইবে।

দাতব্য চিকিৎসালয়গুলি সাধারণতঃ সকালে কিংবা বৈকালে একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য খোলা থাকে। সেই সময়ে সমাগত রোগীদিগকে পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসক ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দেন। ঔষধের কোনও মূল্য দিতে হয় না, তবে সাধারণতঃ দুই চারিটি পয়সা ব্যয় করিয়া রোগীর খাতায় নাম লিখিয়া লইতে হয়। যদি কেহ অতি দারিদ্র্যের জন্য এই সামান্য অর্থও দিতে না পারে, তবে চিকিৎসক তাহাকে এই ব্যয় হইতেও অব্যাহতি দিতে পারেন। দাতব্য চিকিৎসালয়ের চিকিৎসককে সর্ব্বদা ধৈর্য্য ও বিবেচনার সহিত কার্য্যে নিরত থাকিতে হয়; কারণ অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত রোগার্ত্ত ব্যক্তির ভিড়ের মধ্যে সহজেই অধীর হইয়া উঠিলে চিকিৎসা-কার্য্যে ত্রুটি ঘটিতে পারে। চিকিৎসককে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে অর্জ্জিত বিদ্যাকে লোক-সেবায় নিযুক্ত করিতে পারার সৌভাগ্য সকলের মেলে না; যাঁহার মেলে তাঁহারই বিদ্যা-সাধনা চরিতার্থতা লাভ করে।

শিষ্টাচার

যথার্থ সভ্য ও ভদ্র ব্যক্তির লোকসমাজে চলা-ফেরায় কথা-বার্ত্তায় আচার-ব্যবহারে যে একটি বিশিষ্ট সৌজন্য ও শীলতা পরিলক্ষিত হয় তাহাকেই শিষ্টাচার বলা যায়। শিষ্টাচার পরিমার্জ্জিত রুচির পরিচায়ক। ইহা শুধু বিদ্যা কিংবা বুদ্ধির দ্বারা সাধিত হয় না; পৃথিবীতে তাই পাণ্ডিত্যাভিমানীর অশিষ্টতা, অহঙ্কৃত বুদ্ধির দুর্বিনয় প্রায়ই দেখা যায়। বিদ্যা-বুদ্ধি শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতি সব কিছু মিলিয়া চিত্ত ও মনের যে প্রকৃত সংস্কৃতি গড়িয়া তোলে, ব্যবহারের

বিশিষ্টতায় তাহা প্রকাশ পায়। সকল অবস্থার মধ্যেই অন্যের সুবিধা-অসুবিধা মতামত ও অনুভূতিকে সম্মান করিয়া চলাই শিষ্টাচারের প্রধান লক্ষণ।

সংসারে প্রতিনিয়ত যে পরিমাণ অশিষ্ট লোকের সহিত পরিচয় হয়, তাহাতে মনে হয় যে অনেকেই শিষ্টাচারকে একটি গুণ বলিয়া মনে করে না; তাহারা হয়ত ভাবে যে, যে সমস্ত গুণ না থাকিলে সংসারে সুখী হওয়া যায় না শিষ্টাচার তাহাদের মধ্যে একটি নহে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে শিষ্টাচার একটি বিশিষ্ট সামাজিক গুণ; জীবনের সুখ ও সাফল্য ইহা অনেকাংশে সহজলভ্য করিয়া দেয়। কারণ বর্ত্তমানে সুখ বা মঙ্গল শুধু নিজের উপরে নির্ভর করে না। মানুষ যখন একাকী নিঃসঙ্গ হইয়া বনে-জঙ্গলে বাস করিয়াছে তখন সেই বন্যাবস্থায় হয়ত তাহার শিষ্টের ন্যায় আচরণ করা আবশ্যক হয় নাই, কারণ সেই সময়ে কেবলমাত্র বনের সিংহ-শার্দ্দূলই ছিল তাহার ব্যবহারের সঙ্গী। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে মানুষ দলবদ্ধ হইয়া জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই মুহূর্ত্তেই তাহাকে অপরের সঙ্গে ব্যবহার করার সঙ্গত প্রণালী শিখিবার চেষ্টা করিতে হইয়াছে। সমাজে কেহই স্বতন্ত্র হইয়া বাস করিতে পারে না; সেখানে সর্ব্বদা দশজন পরিচিত-অপরিচিত লোকের সংস্পর্শে আসিতে হয়, তাহাদের সঙ্গে অহরহঃ ভাব ও অনুভূতির বিনিময় করিতে হয়। সেইজন্য ব্যবহারের দ্বারা লোকের তুষ্টিসাধন করা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে এবং এই প্রয়োজন শুধু পরের চিত্তানুরঞ্জনের জন্য নহে; নিজের স্বার্থের জন্যই শিষ্টাচারের প্রয়োজন। কারণ অশিষ্ট ব্যবহার অসংখ্য শত্রুর সৃষ্টি করে এবং ইহাতে ব্যক্তিগত সুখ ও সমৃদ্ধির নিশ্চিত ব্যাঘাত অবশ্যম্ভাবী।

সেইজন্য দেখিতে পাই সমাজের ভিত্তি-পত্তন হইতেই মানুষ আচারে ব্যবহারে শিষ্ট হওয়ার সাধনা আরম্ভ করিয়াছে। ইহাতে আংশিক সিদ্ধিলাভ করিতেই বহুকাল কাটিয়া গিয়াছে, কারণ আদিম প্রবৃত্তিগুলির উদ্দাম গতিকে সংযমের গণ্ডীর মধ্যে আনিতে না পারিলে বাহিরের আচরণে শিষ্টতা আসিতে পারে না। মনের বৃত্তিকে এই ভাবে নিয়ন্ত্রিত করাই প্রকৃত সভ্যতা এবং এই সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় তখনই যখন সমাজের মধ্যে ভদ্রোচিত আচার

স্বাভাবিক ও সহজ হইয়া আসে। সাধারণতঃ সভ্যতার সহিত শিষ্টাচারের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ।

ইহা মনে হইতে পারে যে শিষ্টাচার রক্ষা করিতে যাইয়া অনেক সময়ে সত্যকে ক্ষুণ্ণ করিতে হয়, বাহিরের আচরণের দ্বারা মনের প্রকৃত ভাব গুপ্ত রাখিতে হয়। অবশ্য ইহা স্বীকার্য্য যে এইরূপ দুই একটি অবস্থার কল্পনা করা যাইতে পারে যে ক্ষেত্রে রূঢ় না হইলে সত্যের অমর্য্যাদা হয়। কিন্তু সত্য-ভাষণের সঙ্গে শিষ্টাচারের কোনও স্বভাবসিদ্ধ বিরোধ নাই। প্রকৃতপক্ষে সত্য আক্রমণের অস্ত্র নহে; লোকে মনে ব্যথা পায় এইরূপ সত্য অকারণে প্রচার করার মধ্যে কোনও পৌরুষ নাই। বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করার সময়ে 'প্রথম ভাগে' আমরা সকলে পড়িয়াছিলাম, 'কাণাকে কাণা, খোঁড়াকে খোঁড়া বলিও না।' বস্তুতঃ এই সামান্য উপদেশটি গভীর তত্ত্বের ব্যঞ্জক; ইহার অর্থ এই নহে যে কাণাকে 'পদ্মলোচন' কিংবা খোঁড়াকে 'ক্ষিপ্রপদ' বলিতে হইবে। যাহার যে অভাব তাহাকে তাহা অকারণে স্মরণ করাইয়া তাহার মনঃকষ্টের কারণ হওয়া শিষ্টাচার-সঙ্গত নহে—ইহাই এই উপদেশের তাৎপর্য্য।

শিষ্টাচার সাধারণতঃ স্বভাব-সুলভ গুণ; অন্তরের দাক্ষিণ্য যাহাদের আছে তাহাদের আচরণে সৌজন্য আপনা হইতেই প্রকাশ পায়। কিন্তু শিক্ষার দ্বারাও আচারের উৎকর্ষ সাধন করা যাইতে পারে এবং বিদ্যাশিক্ষার সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গেই এই শিক্ষার আরম্ভ হওয়া উচিত।

আদর্শ ছাত্রের জীবন-প্রণালী

একটি গাছ হইতে ভালো ফুল বা ফল পাইতে হইলে আমরা বহুযত্নে গাছটির পরিচর্য্যা করি, গোড়া খুঁড়িয়া দিই, জল সেচন করি, আলো বাতাস হইতে বঞ্চিত না হয়, কীট না লাগে, সেদিকে দৃষ্টি রাখি; বীজের অঙ্কুরোদ্গম হইতে আরম্ভ করিয়া ফুল ফোটা, ফলধরা পর্য্যন্ত বিশেষ ঔৎসুক্য সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করি।

মানুষের জীবনটিও কাজে লাগাইতে হইলে উপযুক্ত পরিচর্য্যার প্রয়োজন। মানুষের জীবন ঠিকমত গড়িয়া তুলিবার উপযুক্ত সময় ছাত্রজীবন। এইজন্য

সুনিয়ন্ত্রিত ছাত্রজীবন সম্বন্ধে, আদর্শ ছাত্র সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট মূর্ত্তি মনের সম্মুখে রাখা দরকার। এই আদর্শের উপরে মানুষের ভবিষ্যৎ জীবনের অনেক কিছুই নির্ভর করে। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে যাঁহারা শিক্ষাগুরু ছিলেন, তাঁহারা এই কথাটি অতি সুন্দরভাবে বুঝিয়াছিলেন। তাঁহারা মানুষের জীবনটি চারিভাগে ভাগ করিয়াছিলেন—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস। এই অংশগুলির পরস্পরের মধ্যে একটা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ ছিল, একটি অপরটি হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল না; একটিরই স্বাভাবিক এবং সুসঙ্গত পরিণতি ছিল অন্য একটি। ছাত্রজীবনের—অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যের যে আদর্শ তাঁহারা সম্মুখে রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা উন্নত আদর্শ আর কিছু হইতে পারে কিনা তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহের অবসর আছে।

আমরা শুনিয়াছি—"ছাত্রাণাম্ অধ্যয়নং তপঃ"—ছাত্রের পক্ষে অধ্যয়নই তপস্যা। অনন্যচেতাঃ হইয়া সে অধ্যয়নে লাগিয়া থাকিবে। তাহার আহার বিহার, কাজকর্ম্ম সমস্তই এই এক বিশেষ লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিত হইবে। সুকঠোর নিয়মের বন্ধনে শান্ত ও সংযত আবেষ্টনের মধ্যে তাহার জীবনটি গড়িয়া উঠিবে। গুরুজনের প্রতি বাধ্যতা, শ্রমশীলতা, নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রভৃতি গুণ তাহার পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক, তাহার নিজস্ব প্রকৃতির অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইবে। এই সকল গুণ মানুষের পক্ষে আয়ত্ত করা একান্ত কঠিন নহে, ইহা অভ্যাস-সাপেক্ষ। চরিত্রকে একটি সুসংযত রূপ দিতে গেলেই একটি দৃঢ় আশ্রয় দরকার। মহৎ চরিত্রের যে একটি প্রধান গুণ—সংযম—তাহা ঐ স অভ্যাসকে আশ্রয় করিয়া বাড়িতে থাকে। সংযম ছাত্রজীবনের একমাত্র অবলম্বন বলিলেও চলে। ইহা কোন অনাবশ্যক প্রাণহীন কঠোরতা নহে। ভবিষ্যৎ জীবনে মনুষ্যত্বের একটি সুনির্দ্দিষ্ট আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া অগ্রসর হইতে গেলেই সংযম অভ্যাস করা আবশ্যক। প্রাচীন কালের আরুণি, উপমন্যু প্রভৃতি যে সকল আদর্শ ছাত্রের কথা আমরা জানিতে পারি, আহার-বিহারে জীবনের প্রত্যেকটি পদক্ষেপে তাঁহাদের সংযমের পরিচয় আজও আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে।

এই সকল গুণকে ভূষিত করে বিনয়। আদর্শ ছাত্রের স্বভাবে এমন একটি সুমার্জ্জিত বিনয়ের কমনীয়তা প্রকাশ পায় যাহা ঐ গুণগুলির কঠোরতা দূর করিয়া দেয়। স্বভাবের সৌন্দর্য্য এবং মাধুর্য্য চরিত্রের মহত্ত্বের উপরে একটি কোমলতা বিস্তার করে। বিদ্যা যাঁহার অন্তরের ভূষণ, বিনয় তাঁহার পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। এই জন্যই বলা হইয়াছে—'বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্'।

কেহ যেন মনে না করেন যে, ছাত্রজীবনে তবে আর কিছুরই প্রয়োজন নাই, খেলা-ধূলা সব বাদ দিয়া শরীরকে পিষ্ট নিপীড়িত করিয়া একমনে অধ্যয়নে লাগিয়া থাকাই আদর্শ ছাত্রের জীবনযাত্রা। আগেই বলা হইয়াছে, মনুষ্য-জীবনকে একটি সুচারু রূপ দিবার পরিকল্পনা থাকিলে ছাত্রজীবনকে সুন্দর করিয়া গড়িতে হইবে। অধ্যয়নটি যথাযথভাবে করিবার জন্যই শরীরকে এবং মনকে তাহার উপযুক্ত খাদ্য দিতে হইবে। খেলা-ধূলা, নির্দোষ আমোদ-প্রমোদ শরীর ও মনের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যই প্রয়োজন। পুস্তকের স্তূপের নীচে চাপা পড়িয়া থাকিলে স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তি নষ্ট না হইয়া পারে না। "All work and no play makes Jack a dull boy"—কথাটি অত্যন্ত সত্য। যিনি গ্রন্থকীট হওয়ার ফলে শরীর শীর্ণ করিয়া ফেলেন, তাঁহার মধ্যে ছাত্রের পূর্ণ আদর্শ রহিয়াছে ইহা স্বীকার করা যায় না।

যে যুগের কথা আগে বলা হইয়াছে, তখনকার ছাত্রেরা কি করিতেন? অধ্যয়ন ছাড়াও তাঁহাদের বহু কাজ করিতে হইত। তাঁহারা গুরুর সহিত একত্র বাস করিতেন, গুরু-সেবার সমস্ত আয়োজনের ভার নিজ হস্তেই গ্রহণ করিতেন। তাঁহারা গুরুর গোধন রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন, গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ভিক্ষা করিয়া আনিতেন ও সেই ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল স্বহস্তে পাক করিয়া গুরুকে খাওয়াইয়া পরে গুরুর প্রসাদ পাইতেন। এইরূপে নানা উপায়ে গুরুকে প্রসন্ন করিতে পারিলে তবে তাঁহাদের বিদ্যালাভ হইত। কারণ তখন তো অধ্যয়ন-অধ্যাপনার কাজটি অর্থের আদান-প্রদানের ফলে একটি স্বার্থঘটিত ব্যাপারে পরিণত হয় নাই। তাই গুরু-শিষ্য সম্বন্ধটিও বড় মধুর, বড় পবিত্র ছিল—এই সম্বন্ধটির খাতিরেই শিষ্যকে অধ্যয়ন ছাড়াও বহু কাজ করিতে হইত,

তাহাতে তাহার মানসিক এবং দৈহিক বৃত্তিসমূহের উপযুক্ত অনুশীলন হইত। বর্ত্তমান যুগে অবশ্য শিক্ষকের জন্য এইরূপ কর্ম্মের কথা কোন ছাত্র ভাবিতেও পারে না। কিন্তু ছাত্রের দৈহিক ও মানসিক পুষ্টির জন্য ছাত্রের অবশ্যকর্ত্তব্য বিষয়ের অন্যতম হওয়া দরকার—পুঁথির বাহিরে—বিদ্যালয়ের অট্টালিকার সীমার পরপারে—খোলা মাঠে বিচরণের জন্য সময় যাপন।

যেমন খেলা-ধূলা-ব্যায়াম প্রভৃতির প্রতি আদর্শ ছাত্রের অকৃত্রিম অনুরাগ থাকিবে, সেইরূপ তাহার প্রকৃত কাজ যে জ্ঞান আহরণ সে সম্পর্কেও তাহার মনে একটি সদাজাগ্রত শ্রদ্ধার ভাব জাগরিত রহিবে।

এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প আছে। বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী একদিন এক ব্রাহ্মণের নিকট আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, "ব্রাহ্মণ! তুমি যাহার তাহার নিকট আমাকে হেলায় বিলাইয়া দিও না। যাহাকে পবিত্রচিত্ত, অপ্রমত্ত, মেধাবী এবং ব্রহ্মচর্য্যযুক্ত বলিয়া জানিবে, যে কখনও তোমাকে অবজ্ঞা করে না, এইরূপ শিষ্য পাইলে তাহাকেই যথার্থ অধিকারী জানিয়া আমাকে তাহার হস্তে শ্রদ্ধার সহিত দান করিও। আর যাহারা তোমার নিকট উপকৃত হইয়াও তোমার প্রতি আদরযুক্ত নয়, তাহারা প্রকৃত শিষ্যই নয়, সেইরূপ বিদ্যার্থীকে কখনও বিদ্যা দান করিবে না। সৎপাত্রের হস্তে বিদ্যা অধিকতর শোভিতা হইয়া গুরুর মুখ উজ্জ্বল করিয়া থাকে।" গল্পটির মধ্যে আক্ষরিক অর্থ ছাড়াও গভীরভাবে চিন্তা করিবার বিষয় আছে। আদর্শ ছাত্রের কর্ত্তব্য বিনয়-নম্রভাবে শ্রদ্ধার সহিত বিদ্যা গ্রহণ করা; এইরূপ না হইলে কখনই যথার্থভাবে বিদ্যালাভ সম্ভব হইতে পারে না।

যিনি আদর্শ ছাত্রের উপযুক্ত ঐ গুণগুলি অভ্যাসের দ্বারা অর্জ্জন করেন, তিনিই গুরুর প্রিয় শিষ্য বলিয়া পরিগণিত হন। এই জন্যই সেকালে গুরু কঠিন পরীক্ষা দ্বারা ছাত্রের মধ্যে কে উপযুক্ত তাহা বুঝিয়া বিদ্যা দান করিতেন।

সাধারণ গ্রন্থাগার

ছোট ছোট কাঠ-কুটা একটি একটি করিয়া জমাইয়া পাখী তাহার ছোট্ট বাসাটি বাঁধে। সারাদিনের চঞ্চলতার পরে বাসায় আসিয়া পাখীটি বিশ্রাম করে। ভাল একটি পুস্তকালয় আমাদের চিত্তের বিশ্রাম-নীড়। কর্ম্মক্লান্ত দিনের ব্যস্ততা, হানাহানি মারামারির মধ্যে ক্লিষ্ট পীড়িত চিত্ত এইখানে আসিয়া ক্লান্তি দূর করিতে চায়। এইখানে আছে অনাদিকালের মানব-মনের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। মানব যুগ যুগ ধরিয়া কি ভাবিয়াছে, কি জানিয়াছে, কোন্ অনুভূতির তালে তালে তাহার হৃদয় সাড়া দিয়াছে, তাহার ছাপ রাখিয়া গিয়াছে এই অতি ছোট ছোট বইগুলির পৃষ্ঠা ভরিয়া কালো কালো হরফের মধ্যে। নদী বহিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহার ঢেউয়ে যে কল-সঙ্গীত বাজিয়া উঠিয়াছিল, তাহারই স্বরলিপি আঁকিয়া রাখিয়া গিয়াছে লুপ্তস্রোত বালুপথের রেখায় রেখায়। এইখানে আসিয়া কান পাতিলে শুনিতে পাইবে, অতীত এক বিরাট শব্দহীন ভাষায় আলাপ করিতেছে। শত শত শ্রেষ্ঠ মানব-জীবনের সার চিন্তাসম্পদ্ এইখানে আমাদের দৃষ্টিপাতের অপেক্ষায় পড়িয়া রহিয়াছে। এখানে পাই বিশ্রাম, এখানে পাই চিত্তের বল ও আনন্দ, এখানে আছে বহু মানবের পুঞ্জীভূত ভাষা প্রশান্তির মধ্যে নিত্য সমাহিত। সত্য-সত্যই যুগযুগান্তরের সঞ্চিত জ্ঞান কতকগুলি কাগজের মোড়কে আবদ্ধ হইয়া যেন পড়িয়া রহিয়াছে। এইগুলি একত্র সংগৃহীত হইয়া সাধারণের উপকারার্থে স্তরে স্তরে সজ্জিত হইয়া থাকে সাধারণ গ্রন্থাগারে। এইজন্যই পাঠাগারের মূল্য জ্ঞানসঞ্চয়নে এত বেশী। যখন মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার হয় নাই, তখন লোকে হাতে হাতে পুঁথি লিখিয়া লইত। তালপাতায়, ভূর্জ্জপত্রে, চামড়ার উপরে, মাটির বা ধাতুর তৈরী খণ্ড খণ্ড পাতের উপরে, পাথরে, মানুষ তাহার চিন্তার ফলাফল সঞ্চয় করিয়া রাখিত। তখন সাধারণ লোকের মধ্যে বিদ্যার চর্চ্চা বড় একটা ছিল না। ধনী ব্যক্তিগণ বহু অর্থব্যয়ে ঐ সকল সংগ্রহ করিয়া নিজ নিজ আবাস-ভবনে অথবা দেবমন্দিরে গ্রন্থাগার স্থাপন করিতেন। বিশিষ্ট পণ্ডিত ভিন্ন আর কেহ তাহা ব্যবহার

করিবার সুযোগ পাইত না। ভারতবর্ষে, তিব্বতে, চীনে এবং পৃথিবীর অন্যান্য নানা দেশে এইরূপ গ্রন্থাগারের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

জানা গিয়াছে প্রাচীন ভারতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি মূল্যবান্ গ্রন্থশালা ছিল। শ্রীহর্ষের বিপুলায়তন গ্রন্থাগারের কথাও আমরা জানিতে পারিয়াছি। খলিফ-অল-মামুনের সময়ে বাগদাদে একটি গ্রন্থশালা স্থাপিত হইয়াছিল; কাইরোর বিরাট পুস্তকালয়ের কথা ইতিহাস-পাঠকমাত্রেই জানেন। বিখ্যাত সেকেন্দ্রিয়ার গ্রন্থশালায় বহু সঞ্চিত জ্ঞান পুঞ্জীভূত করিয়া রাখা হইয়াছিল। যদিও এই সকল গ্রন্থাগারের অধিকাংশ গ্রন্থই খুব মূল্যবান্, তথাপি সেগুলি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল না।

বর্ত্তমান যুগে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। জ্ঞানের পরিধি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এবং মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্ত্তনের ফলে পুস্তকসংখ্যাও বাড়িয়া গিয়াছে এবং যে সমস্ত দেশে জ্ঞানচর্চ্চা হইয়া থাকে সেখানে বৃহৎ বৃহৎ সাধারণ পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে সরকার পরিচালিত গ্রন্থালয়গুলির প্রয়োজনীয়তাই সমধিক দেখিতে পাওয়া যায়—কারণ রাষ্ট্রের বাহিরে ব্যক্তিগত পরিচালনায় যে সকল সাধারণ গ্রন্থালয় প্রতিষ্ঠিত করা হয় সেগুলি অনেক সময় অর্থাভাবের জন্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া উঠিতে পারে না। তবু এরূপ সাধারণ পাঠাগারও দেশের জ্ঞানবিস্তারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকে।

ফরাসী দেশের রাজধানী প্যারী নগরীর 'Bibliotheque Nationale' নামক গ্রন্থাগারটি এখন পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ গ্রন্থাগার। লণ্ডনের 'British Museum' এবং আমেরিকার বোষ্টন ও ওয়াশিংটন নগরের গ্রন্থশালাও বিপুলায়তন ও বিশ্ববিখ্যাত। রোমের 'Vatican Library'-র গৌরবও অল্প নহে। ভারতবর্ষেও কয়েকটি বিশেষ মূল্যবান্ সাধারণ গ্রন্থালয় আছে। ইহাদের মধ্যে কলিকাতার 'Imperial Library' বৃহত্তম। ইহা ছাড়া কলিকাতায় স্থাপিত 'Asiatic Society of Bengal', পাটনার 'Khuda Bux Library' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কলিকাতায় 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে'র যে সাধারণ গ্রন্থাগার আছে তাহাতে

অসংখ্য প্রাচীন পুঁথি, দুষ্প্রাপ্য বা অপ্রাপ্য গ্রন্থ এবং অধুনালুপ্ত অনেক সংবাদপত্র প্রভৃতি অতিশয় যত্নসহকারে সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য সংগৃহীত করিয়া রাখা হইয়াছে। রাজশাহী শহরের 'বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি'র যে সাধারণ পাঠাগার আছে তাহাও বিশেষ প্রসিদ্ধ। বাঙ্গলার বাহিরে ভারতে যে সমস্ত প্রদেশে গ্রন্থাগার-আন্দোলন বেশ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে তাহার মধ্যে বরোদার নাম সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। অধুনা পরলোকগত বরোদার মহারাজ সয়াজী রাও বাহাদুর দেশের জন-সাধারণের শিক্ষার বিষয়ে বিশেষ অগ্রণী ছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহারই আগ্রহ, উদ্যম এবং উৎসাহে তাঁহার রাজ্যের গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমুদ্র পারের দেশগুলির অনুকরণে ভারতেও Travelling Library বা ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার আরম্ভ হইয়াছে। নানা বিষয়ের বহুসংখ্যক পুস্তক আছে, এমন এক একটি অস্থায়ী গ্রন্থালয় একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাওয়া হয়। ইহাতে সাধারণ পল্লীবাসী পর্য্যন্ত বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবার সুযোগ পাইয়া থাকে।

এই সমস্ত সাধারণ পুস্তকালয় দেশের অজ্ঞতা দুর করিবার পক্ষে যে কতদুর উপযোগী তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই দরিদ্র দেশে সাধারণের পক্ষে তাহার প্রয়োজনমত পুস্তক কিনিয়া তাহার জ্ঞানভাণ্ডার পুষ্ট করা একরূপ অসম্ভবই হইয়া পড়ে। এরূপ অবস্থায় সাধারণ গ্রন্থাগারের বহুল প্রতিষ্ঠা ছাড়া জ্ঞানার্জ্জনের পথ প্রায় রুদ্ধ হইয়া পড়ে। এই সমস্ত গ্রন্থাগারে সাময়িক পত্রিকা পাঠের ব্যবস্থা থাকায় যাঁহারা পয়সা ব্যয় করিয়া খবরের কাগজ কিনিতে পারেন না তাঁহারাও দেশের ও দশের সংবাদ অনায়াসেই পাইয়া থাকেন।

বস্তুতই একটি সুপরিচালিত ভাল গ্রন্থাগার জাতির পরম সম্পদ্ এবং পল্লীবাসী অল্পশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত মানুষের চিত্ত-সংযমের একটি প্রধান উপায়। আগ্রহশীল পাঠককে জ্ঞানী মানবের শ্রেষ্ঠ চিন্তারাশির সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দাও, দেখিবে ঐ বিরাট মনের সহিত আলাপ করিতে করিতে তাহার চিত্তের প্রসার আপনিই বাড়িয়া গিয়াছে। যুগযুগান্তরের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ—

যাঁহাদিগকে কোনও দিন আর দেখা যাইবে না—তাঁহাদিগের মানস-রাজ্যের এই চিত্রশালায় প্রবেশ করিলে যে অসীম রহস্যের সন্ধান পাওয়া যায় তাহার মূল্য জাতিগঠনে অপরিসীম। এইস্থানে যেন বিশ্বের জ্ঞান পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ সত্যই বলিয়াছেন—"এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়াছে, মানবাত্মার অমর অগ্নি কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কালো চামড়ার কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। ইহারা যদি সহসা বিদ্রোহী হইয়া উঠে, নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া ফেলে, অক্ষরের বেড়া দগ্ধ করিয়া একেবারে বাহির হইয়া আসে, কালের শঙ্খরন্ধ্রে এই নীরব সহস্র বৎসর যদি এককালে ফুৎকার দিয়া ওঠে, তবে সে বন্ধনমুক্ত উচ্ছ্বসিত শব্দের স্রোতে দেশ বিদেশ ভাসিয়া যায়। হিমালয়ের মাথার উপরের কঠিন তুষারের মধ্যে যেমন কতশত বন্যা বাঁধা পড়িয়া আছে, তেমনি এই পুস্তকাগারের মধ্যে মানবহৃদয়ের বন্যাকে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে"।

একটি চোরের আত্মকাহিনী

চোরের আবার আত্মকাহিনী কি? উপরের নামটি দেখিয়াই আপনি হয়ত শ্লেষভরে নাসিকা কুঞ্চিত করিতেছেন; মনে ভাবিতেছেন—চোরের আত্মকাহিনী আবার কিরূপ ব্যাপার? আপনারা পৃথিবীর জ্ঞানী, গুণী, কৃতী মহাপুরুষদের দীর্ঘ দীর্ঘ আত্মজীবনী পড়িয়াছেন এবং তাহাতে চমৎকৃত হইয়াছেন। আত্মজীবনীর মধ্যে আপনারা উন্নতমনা লোকের অন্তরের অন্তরঙ্গ মানুষটির পরিচয় পাইয়াছেন। রুশো, টলষ্টয় প্রভৃতি মহাপুরুষেরা তাঁহাদের আত্মকাহিনীর মধ্যে তাঁহাদের নিজস্ব ব্যক্তিত্বের অতি ঘনিষ্ঠ পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিও আপনাদের অতিপরিচিত অতিপ্রিয় আত্মজীবনীর তালিকার মধ্যে আছে। মহাত্মা গান্ধীর আত্মকাহিনী এবং হিট্‌লার, মুসোলিনীর আত্মজীবনীও আপনারা মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া মানব-সম্পর্কে অনেক রহস্য অবগত হইয়াছেন। ইহাদেরই পার্শ্বে সামান্য

একজন চৌর্য্যবৃত্তি-পরায়ণের আত্মযন্ত্রণার কাহিনীর কথা শুনিতে একটু অদ্ভুত অসঙ্গত ঠেকিতেছে না কি ?

কিন্তু তবু বলি সচ্চরিত্র পাঠক! দয়া করিয়া আমার কথাটা একবার শুনিলে আপনার নরকের পথ প্রশস্ত নাও হইতে পারে। আধুনিক যুগে সকলেরই মুখে 'বোল' ফুটিয়াছে, আপন আপন কথা সকলেই বলিয়া নিজের দাবী প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইতেছে। চেতনাহীন "একটি টাকা"ও যেন আর নীরব থাকিতেছে না, ফলে আপনারা "একটি টাকার আত্মকাহিনী"ও বরদাস্ত করিয়াছেন ; জেলখানার সহিত সংস্রব আছে বলিয়াই আমি কি এমন অপরাধ করিয়াছি যে আমার কথাটা আমি বলিবার সুযোগও পাইব না।

আজ আমি সকলের ঘৃণার পাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছি, কিন্তু এমন তো আমি চিরদিন ছিলাম না। সমাজের মঙ্গলের জন্য আজ আমাকে পশুর মত আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। কিন্তু সমাজের দরদী হিতৈষীদিগকে জিজ্ঞাসা করি—আমি কি সমাজের কেহ ছিলাম না ? আমাকে মানুষের মত বাঁচিবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয় নাই কেন ? কাড়িয়া খাওয়া ছাড়া আমার অন্য উপায় ছিল না কেন ? পাঠকের সহিত জঁ্যা ভল্‌জঁ্যার নিশ্চয়ই পরিচয় আছে। মনে করিয়া দেখিবেন, সাতটি অন্নহীন শিশুর জন্য নিরুপায় যুবকের সেই অন্তর্দ্বন্দ্ব। একখানি রুটি চুরির জন্য বৎসরের পর বৎসর কারাবাস—পশুর অপেক্ষা হীন জীবনযাপন। আজ আপনি খবরের কাগজে দুঃসাহসিক চুরির বিবরণ পড়িতে পড়িতে সম্মুখস্থ চায়ের টেবিলে সঞ্চিত আহার্য্যরাশির কথা ভুলিয়া যান এবং এই সকল চুরির কোন কিনারা হয় না বলিয়া পুলিশকে গালি দেন, কিন্তু একবার কল্পনা করিয়া দেখিবেন কোন এক দৈবদুর্য্যোগে আপনার এই বিশাল অট্টালিকা, মোটরগাড়ী, দাসদাসী সমস্তই অন্তর্হিত—নির্ভর করিবার যোগ্য কেহ নাই, শুধু সঙ্গে লাগিয়া আছে অবিশ্বাস, সন্দেহ—আর পুলিশের খরদৃষ্টি—যে কোন মুহূর্ত্তে ধরা পড়িয়া যাইবার ভয়। কাহারও কাছে হাত বাড়াইবার উপায় নাই—কিন্তু গুরু ভারের মতন রহিয়াছে অনাহারক্লিষ্ট সন্তানগুলির শুষ্ক মুখ আর করুণ চাহনি। এই সময়ে যদি একটিমাত্র সহজ উপায়ে আপনার সমস্ত দ্বন্দ্বের মীমাংসা হইবার সুযোগ

উপস্থিত হয়—তখন আপনি কি করেন? কোন অসতর্ক মুহূর্ত্তেও কি আপনার এতটুকুও পদস্খলন হয় না? সৌভাগ্যের উচ্চশিখরে বসিয়া এত বড় কথাটা বিনা চিন্তায় বলিয়া ফেলিবেন না, দর্পহারী মধুসূদন আছেন।

আমি বলিব চোর শুধু আমি নই, চোর আপনিও। তফাতের মধ্যে আমার চুরি ধরা পড়িয়া যায় বলিয়া আমি আজ গারদে বন্দী—আর আপনি আইনের প্যাঁচ করিয়া এমন নিপুণ কৌশলে চুরি করিতেছেন যে আপনাকে ধরিবার কোন উপায় নাই। আপনি চোর কিসে, তাহা বুঝাইয়া বলিব? আপনি একটু আগেই বলিতেছিলেন—সমাজের মঙ্গলের জন্যই—ইহাদের অর্থাৎ আমাদের—দূরে খেদাইয়া রাখা উচিত। খুবই ঠিক কথা, সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনি যে আরামে দিন কাটাইতেছেন, বিলাসে ব্যসনে দুই হাতে জলের মত অর্থব্যয় করিতেছেন, আপনার চায়ের টেবিলে যে অপচয় হয়, তাহাতে আমার সংসারের দশদিনের অন্নসংস্থান হয়,—বলুন কাহার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া এই নিষ্ঠুর বীভৎস বিলাসিতার উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে? আপনার প্রতিবেশী যখন অন্নাভাবে শুকাইয়া মরিতেছে, আপনি তখন আপনার স্ত্রীর জন্য হীরার গহনা গড়াইতে দেন। ভিখারী দুয়ারে আসিলে অর্দ্ধচন্দ্র দিবার জন্য দরোয়ান রাখিয়াছেন। আপনার হৃদয়হীনতার তুলনা নাই; সমাজের মঙ্গলের জন্য আপনি যে বক্তৃতা দেন তাহা শুনিলেও পাপ হয়। সমাজের মঙ্গলের জন্য যদি আপনার প্রাণ কাঁদিত তাহা হইলে আপনাকে আজ পরম আরামে দিন কাটাইতে দেখা যাইত না। সমাজের মঙ্গলের জন্য যদি সত্য সত্যই সকলের একটা আন্তরিক আগ্রহ থাকিত, তবে একজন বিলাসিতার মধ্যে ডুবিয়া থাকিবে আর তাহারই পাশে আর একজন অনাহারে অভাবে চুরি করিতে বাধ্য হইবে, এমন ব্যবস্থা কখনই টিকিয়া থাকিত না। তবু যে নিতান্ত অভাবের তাড়নাতেই একটা সামাজিক অন্যায় করিয়া বসিল তাহার সংশোধনের জন্য আপনারা যে জেলখানা বানাইয়া রাখিয়াছেন সেখানে ভালমানুষও খারাপ হইতে বাধ্য হয়। মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলির উচ্ছেদ সাধন করিয়া তবে আপনারা জেলখানা হইতে পশুর মত তাহাকে তাড়াইয়া দেন—জেলখানার

ভিতরে নিতান্ত পশুর মত তাহাকে দিয়া ঘানি পর্য্যন্ত ঘুরাইয়া নিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন না। চোরও যে মানুষ, তাহা আপনারা স্বীকারই করেন না।

মনে পড়িতেছে প্রথম যেদিন চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িলাম। বেদম প্রহার খাইয়া প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় শুনিতে পাইলাম ভীড়ের মধ্য হইতে ছোট একটি মেয়ে বলিতেছে, "বাবা, বাবা, আমি চোর দেখ্ব!" পরে আমাকে দেখিয়া আবার কহিল, "চোর কই, বাবা, ও তো মানুষ!" এত মার খাইয়াও সহ্য করিয়াছিলাম, কিন্তু এই শিশুটির কথায় আমার চোখে জল আসিল। মানুষ যে আমি ছিলাম, এই শিশুটির চোখে তাহা ধরা পড়িয়াছিল। আজ হয়ত আমিও তাহা ভুলিয়াছি—কিন্তু ভাবিতেছি এই অধঃপতনের জন্য দায়ী কে?

স্কুল ম্যাগাজিন

একদিন আমাদের মনে একটা নূতন পরিকল্পনার উদয় হইল। সকলে মিলিয়া নানা গভীর গবেষণার পরে স্থির করা গেল, একটা পত্রিকা বাহির করিতে হইবে। পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি, কাজেই পত্রিকার নাম "পঞ্চমী"। ছাপিবার খরচ নাই, কিন্তু তাহাতে কি? হাতে লিখিয়াই পত্রিকাটি প্রকাশ করা স্থির হইল। কেহ কথামালার কাঠুরিয়ার গল্পটি নিজের ভাষায় লিখিয়া আনিল, কেহ ইংরাজী গল্পের বই হইতে অনুবাদ করিয়া দিল, কেহ বা নিজের কল্পনাকেই যথাসম্ভব আশ্রয় করিয়া কিছু কিছু লিখিল. মাছ ধরিতে গিয়া একটা নতুন রকমের গুটিপোকা দেখিয়া আসিয়া একজন তাহারই সচিত্র জীবনবৃত্তান্ত রচনা করিল এবং স্ব-রচিত কবিতাও যথাস্থানে আসন লাভ করিল। পত্রিকার প্রথমদিকে একটি "পাঠকের প্রতি নিবেদন"—তাহার অন্তে "কেহ ছিঁড়িবেন না" এবং শেষের দিকে ধাঁধাঁ, কৌতুক-কবিতা এবং সম্পাদকীয়—মোট কথা একটি সুপরিচালিত পত্রিকার মধ্যে যাহা কিছু থাকা দরকার—সমস্তই আমাদের ক্ষুদ্র পত্রিকাখানিকে সুশোভিত করিল। পত্রিকাটির মধ্যে হাতের লেখা লাইন-গুলির শ্রীছাঁদ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই, বানান-ভুলেরও অন্ত ছিল না এবং আমাদের

সম্পাদকীয় অংশটুকুর মধ্যে সম্পাদকজনোচিত গাম্ভীর্য্য ও কূটনীতির পরিচয়ও পাওয়া যায় নাই। কিন্তু তবু যখন 'পঞ্চমী' প্রথম আলোক দর্শন করিল, তখন আমরা নিজেদের কৃতিত্বে মুগ্ধ ও অভিভূত হইয়া পড়িলাম। তবু তো আমরা পত্রিকা ছাপিতে পারি নাই; ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখিলে যে আনন্দ হয় তাহা হইতে তখন আমরা বঞ্চিত থাকিয়াও হাতের লেখা আঁকা-বাঁকা অক্ষরে নিজেদের নাম দেখিয়াই অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। বালকের অপরিণত উৎসাহের কথা ভাবিয়া যতই হাস্য-পরিহাস করা হউক না কেন—বাল্যবয়সে এইরূপ আনন্দ ও উত্তেজনার একটা মূল্য আছে। মানুষ রচনা করিতে চায় এবং ভালও বাসে; কোন কিছু লইয়া যেমন করিয়া হউক একটা কিছু গড়িয়া তোলাতেই তাহার বিশেষ আনন্দ। এইজন্য স্কুলে পত্রিকা প্রকাশের আয়োজনে বালকের উৎসাহ উদ্দীপিত করিয়া তুলিবার একটা সত্যকার সার্থকতা আছে। পত্রিকায় লিখিয়া, নানাজনের কাছ হইতে চাহিয়া লেখা সংগ্রহ করিয়া সম্পাদনের ভার লইয়া কাজ করিতে করিতে দায়িত্ববোধ জাগ্রত হইয়া ওঠে, তাহার শিশু-চিত্ত একটা আশ্রয় অবলম্বন করিয়া স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে।

নানা বিষয় লইয়া লেখায় হাত পাকাইবার চেষ্টায় ছাত্রের মনে সাহিত্য-রসবোধ অঙ্কুরিত হয়। রচনার ইচ্ছা, আগ্রহ ও শক্তি ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকে। স্কুলের পাঠ্য-বিষয়-বহির্ভূত এই অপরিণত রচনাগুলির মধ্যেই বালকের মনে যথেচ্ছ লীলার অবসর পায়। কার কোন্ দিকে স্বাভাবিক প্রবণতা—সাহিত্যের কোন্ মহলে কে ভাবী কালে প্রবেশাধিকার লাভ করিবে, তাহার দিঙ্‌নির্ণয় হইবার সুযোগও এইখানে। কিশোর মনের সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশের পক্ষে একখানি নিজস্ব পত্রিকার মূল্য খুবই বেশী।

যাহা কিছু চিন্তা করা যায়, তাহা ভাষার মধ্যে রূপ দিবার শক্তি একটি বিশেষ আদরের বিষয়। লিখিতে লিখিতেই এই শক্তির বিকাশ সম্ভবপর হইয়া উঠে। জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে লেখা যদি চলিতে না পারে, ভাষায় যদি তাহা ফুটিয়া না উঠে, তাহা হইলে পাঠচর্চ্চা বালকের পক্ষে ভারমাত্র হইয়া

উঠে। পঠিত বিষয়গুলি বালক ছাত্রের মনে কিভাবে প্রতিফলিত হইতেছে তাহা বুঝিবার প্রথম ও প্রধান উপায় লেখার আশ্রয় গ্রহণ করা। পঠিত বিষয় ঠিক মত আয়ত্ত করিবারও উপায় লিখিয়া অভ্যাস করা। লেখায় চিন্তা সুপরিস্ফুট রূপ গ্রহণ করিতে থাকে, মনের কথাকে বাহিরে ভাষায় মূর্ত্তি দিবার শক্তি বাড়ে। যে বিষয়বস্তুটি লইয়া লিখিতে হইবে, সে বিষয়ে চিন্তা করিয়া লইবার ও পর্য্যবেক্ষণ করিবার অভ্যাসের ফলে, লিখিতে লিখিতে পর্য্যবেক্ষণের শক্তিও বাড়ে এবং আমাদের আশে পাশে যাহা কিছু আছে তাহার দিকে চিত্তের ঔৎসুক্য না বাড়িয়া পারে না। কিন্তু পাঠচর্চ্চার মত লেখাও একটি অভ্যাসের বিষয় ও বহুদিনের সাধনার সামগ্রী। সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে বাল্যকাল হইতেই এ সাধনায় দীক্ষিত হইবাব প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের পাঠ প্রস্তুতের জন্য যাহা লেখান হয়, তাহা বালকের মনকে সাধরণতঃ স্পর্শ করে না। পাঠাভ্যাসের অবশ্যকরণীয়তাই এই বিমুখতার প্রধান কারণ। এই জন্য এমন একটি ক্ষেত্র রাখিবার প্রয়োজন—যেখানে তাহার মনটা মুক্তি পায়—সেখানে সে যাহা খুসী, তাহা লইয়া যেমন অভিরুচি সেইরূপ লিখিবার অবসর পায়। লিখিতে লিখিতে লেখার আদর্শ সম্বন্ধে মনের মধ্যে একটা রূপ আপনিই ফুটিয়া উঠে। পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে লেখাটি অন্যান্য ছাত্র এবং শিক্ষক মহাশয়গণ পড়িবেন, সর্ব্বোত্তম প্রবন্ধ বা গল্প অথবা কবিতা পুরস্কার পাইবে, ইত্যাদি উৎসাহোদ্দীপক ব্যবস্থা থাকায় লেখার আগ্রহ বাড়িয়া যায়। সর্ব্বোপরি এইরূপ একখানি পত্রিকা অবলম্বন করিয়া একটি বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের পরস্পরের মধ্যে পরিচয় ও সহযোগিতা আরো নিবিড় হইয়া উঠে—একের চিন্তা-ধারা অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিবার সুযোগ পায়। এইরূপ পত্রিকার মারফত বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যেও একটা ঐক্যসূত্র প্রতিষ্ঠার সুবিধা হয়। যে কারণে স্কুলের বাহিরে একটা সংলগ্ন খেলার মাঠ রাখা অত্যাবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হয়—ঠিক সেই কারণেই ক্লাসের অবশ্যপাঠ্য বিষয়গুলির বাহিরে বালকদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে সাহিত্যচর্চ্চার আয়োজন হিসাবে প্রত্যেক স্কুলের একখানি নিজস্ব পত্রিকা থাকা দরকার। এখানে বালকেরা নিজে লিখিবে,

নিজের চেষ্টায় সাহিত্যের সামগ্রী নিজেরা আহরণ করিয়া আনিবে। সকলে হয়ত ভাল পারিবে না। বাল্য ও কৈশোরের এই অপরিণত প্রয়াসের মধ্যে ভবিষ্যতের সাহিত্যরথীর সম্ভাবনা যে লুকাইয়া নাই, তাহা কে বলিতে পারে? আমের মুকুল প্রতিবৎসরই অসংখ্য ঝরিয়া পড়ে। অল্প কয়েকটিতেই তো শেষ পর্য্যন্ত ফল ধরে। কিন্তু সেই অল্প কয়েকটির মূল্য কি অকিঞ্চিৎকর?

তোমার ছাত্র-জীবনের অভিজ্ঞতা

আমার ছাত্র-জীবনের প্রথম দিনটির কথা বেশ মনে পড়ে। এই দিনটি হইতেই আমার প্রকৃত ছাত্র-জীবনের আরম্ভ হয়, কেননা এই দিনটিতেই আমি প্রথম স্কুলে যাই। ইহার আগে বাড়ীতে কিছু কিছু লেখাপড়া করিয়াছি, কিন্তু একটা বাঁধাধরা নিয়মের বশবর্ত্তী হই নাই। স্কুল সম্বন্ধে মনে মনে অনেক ভয় ছিল; মাষ্টার মহাশয়দের শাসন, পরীক্ষায় পাশ করা, সহপাঠীদের অত্যাচার ইত্যাদির কাহিনী আমার অপেক্ষা বয়সে বড় দুই একজনের নিকটে শুনিয়াছিলাম তাই স্কুলে যাওয়ার প্রস্তাবে কোন মতেই উৎফুল্ল হইতে পারিলাম না। বারে বারে ভাবিলাম বাড়ীতে পড়িতেছিলাম এই তো ভাল ছিল, স্কুলে না গেলে কি পণ্ডিত হওয়া যায় না! কিন্তু সে বয়সে মনের ইচ্ছা প্রকাশ করিবার মত ক্ষমতা ছিল না, আর প্রকাশ করিলেও আমার কথা তখন শুনিবে কে? যাহাই হউক সেই দিনটিকে চরম দুঃখের দিন বলিয়া গ্রহণ করিয়া নিতান্ত বাধ্য হইয়াই স্কুলে আসিলাম এবং বহু ছাত্রের মধ্যে দ্বিতীয় বেঞ্চের একধারে নিজের আসন লইলাম।

তাহার পরে বহুদিন কাটিয়া গিয়াছে, একটির পর একটি করিয়া উপরের শ্রেণীতে প্রোমোশন পাইয়াছি। যে ঘরে প্রথম বসিয়াছিলাম তাহার পরে আরও কতকগুলি ঘর পরিবর্ত্তন করিয়াছি, বেঞ্চ পরিবর্ত্তনের কথা তো ধরিই না। আজ পিছনের দিকে চাহিয়া মন আনন্দে ভরিয়া উঠে। যে-দিনটিকে এক সময় চরম দুঃখের দিন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম, সেই দিনটিই আজ জীবনের স্মরণীয় দিন বলিয়া মনে হইতেছে।

মাষ্টার মহাশয়দের শাসন,পরীক্ষায় পাশ করা বা সহপাঠীদের অত্যাচার ছাত্র-জীবনের একমাত্র জিনিষ নহে, বস্তুত এ সবই তুচ্ছ ও উপেক্ষণীয়। আমার ছাত্র-জীবনের কথা ভাবিলে কেবলই মনে হয় সামান্য কয়টি বৎসরে সকল দিক্ হইতে এত প্রাচুর্য্য কি করিয়া আসিল ? পড়া-শুনা খেলা-ধূলা ও আমোদ-আহ্লাদের ভিতর দিয়া দিনগুলি কি ভাবে কাটিয়া গিয়াছে তাহা বুঝিতেও পারি নাই।

গ্রীষ্মের ছুটির আগে পরীক্ষা দিতে হইবে, অথচ মন পড়িয়া রহিয়াছে কাঁচা আমের দিকে ও খেলার মাঠে। আর কয়দিন পরে আম পাকিতে শুরু হইবে, এদিকে হকি শেষ হইয়া সবে মাত্র ফুটবল আরম্ভ হইয়াছে, এ-অবস্থায় পরীক্ষার পড়া লইয়া কি করিয়া ঘরে থাকা যায় ! কিন্তু তবুও উপায় নাই, পরীক্ষায় পাশ করিতে না পারিলে লজ্জায় মুখ দেখান যাইবে না। এই তো সামান্য কয়টা দিন, তার পরেই তো ছুটি। এই ভাবে অশান্ত মনকে বারে বারে পড়াশুনার মধ্যে টানিয়া আনিয়াছি।

বর্ষা নামিয়াছে। এত মেঘ করিয়াছে যে স্কুলঘর অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। একটি অব্যক্ত আনন্দ মনকে বারে বারে বাহিরে টানিতেছে। এমনি একটি দিনে আমাদের যে মাষ্টার মহাশয় রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' কবিতাটি শুনাইয়া-ছিলেন। তাঁহার প্রতি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিব। বর্ষা শেষ হইয়াছে, আকাশে বাতাসে শরতের আভাস পাওয়া যাইতেছে ; স্নিগ্ধ বাতাসে ও শেফালির গন্ধে ভাল করিয়া ফর্সা না হইতেই ঘুম ভাঙিয়া যায়। অধীর আগ্রহে পূজার ছুটির দিন গুণিতেছি।

শীতকালে খুব তাড়াতাড়ি বেলা হয়, এত সকালে স্নান করা কঠিন। কিন্তু স্কুলে যাওয়ার আনন্দে এ-কষ্ট গায়েই লাগে না। বাৎসরিক ফল বাহির হইবার আগের কয়টি দিন যেন কাটিতে চাহিত না। এ-সময় মনে মনে যে কতবার নম্বর যোগ দিতাম তাহার হিসাব নাই। আহা, অমুক প্রশ্নের উত্তর ঐভাবে না লিখিয়া যদি এই ভাবে লিখিতাম ইত্যাদি মনে করিয়া বারে বারে নিজেকে ধিক্কার দিতাম।

সরস্বতী পূজার আগের কয়টি দিন একটা উত্তেজনার ভিতর দিয়া

কাটাইতাম। এবার নূতন ধরণের ফোয়ারা করিতে হইবে, ভাল করিয়া আলোর ব্যবস্থা করিতে হইবে এমনি হাজার হাজার জল্পনা কল্পনা চলিত। পূজার দিনটির কথা লিখিয়া শেষ করা কঠিন।

ধীরে ধীরে শীত বিদায় লইতেছে ; লেপের পরিবর্ত্তে এখন একখানা চাদর গায়ে দিলেই চলে, আর দিনকতক বাদে চাদরেরও প্রয়োজন হইবে না। স্কুলের আমগাছগুলিতে অজস্র মুকুল ধরিয়াছে ; বাতাসে মাঝে মাঝে আম্র-মুকুলের গন্ধ ভাসিয়া আসে, হঠাৎ মন কোথায় যেন উধাও হইয়া যায়। স্কুলের দক্ষিণে একটি বড় পলাশ গাছ আছে, এই সময়টিতে মনে হয় গাছটিতে যেন আগুন ধরিয়াছে।

গ্রামের পথে দল বাঁধিয়া স্কুলে যাওয়া, যাইতে যাইতে কত বিষয়ের আলোচনা, কত আকাশ-কুসুম রচনা—এ-সব জীবনকে মাধুর্য্যমণ্ডিত করিয়াছে। মাষ্টার মহাশয়দের নিকট হইতে যাহা লাভ করিয়াছি তাহার তো তুলনাই নাই। স্কুলের সেই সকল জীর্ণ ঘরে ভাঙা বেঞ্চের উপর বসিয়া ধীরে ধীরে পৃথিবীর সম্বন্ধে আরও অনেক নূতন পরিচয় লাভ করিয়াছি। অবশ্য সকল সময়েই যে পড়িতে ভাল লাগিয়াছে তাহা নহে, অনেক সময় নীরসও ঠেকিয়াছে ; কিন্তু সব কিছু মিলিয়া আমার বিস্ময়ের ভাবকে ক্রমশঃ বাড়াইয়াই তুলিয়াছে। একটু চুপ করিয়া থাকিলেই মাষ্টার মহাশয়দের কণ্ঠস্বর পর্য্যন্ত যেন শুনিতে পাই। তাঁহাদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়াছি, সান্নিধ্য ও সাহচর্য্যেই নিজের চিত্তবিকাশের পথ পাইয়াছি। ছাত্র-জীবনের বহু অভিজ্ঞতা জীবনকে কত বিচিত্র কত সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়।

সংবাদপত্র-পাঠ

বর্ত্তমান যুগে সংবাদপত্রের প্রচার মানবের কর্ম্ম-জীবনের গণ্ডীকে আশাতীত ভাবে প্রসারিত করিয়াছে। সংবাদপত্র পাঠে মানুষের জাগতিক জ্ঞান আহরণের পথ প্রশস্ততর হইয়াছে। পূর্ব্বে পৃথিবী-পরিভ্রমণকারিগণও যে জ্ঞান যে অভিজ্ঞতা

লাভ করিতে পারিতেন না, আজ আমরা ঘরে বসিয়া সেই জ্ঞান সঞ্চয় করিতে পারি। সমগ্র জগতের লোক আজ যেন পাড়া-প্রতিবাসীতে পরিণত হইয়াছে। বিশ্বের ছোট বড় সকল রকম প্রাত্যহিক সংবাদ বক্ষে বহন করিয়া শত শত সংবাদপত্র প্রতি প্রভাতে আমাদের দ্বারে আসিয়া হাজির হয়। মুহূর্ত্তমধ্যে পৃথিবীর বিচিত্র সংবাদ আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। পৃথিবীর কোন্ সুদূর প্রান্তে কি ঘটিয়াছে; কোন্ অজ্ঞাত জাতির জীবন কোন্ অভিনব পথে অগ্রসর হইতেছে; কোন্ উন্নতিশীল জাতির সৌভাগ্য-আকাশে বিদ্রোহ-বিপ্লবের কৃষ্ণমেঘ ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে, কোন্ নিভৃত মন্ত্রণাগারে আত্ম-গোপন করিয়া কোন্ ভণ্ড স্বদেশপ্রেমিক সর্ব্বনাশের ষড়যন্ত্র ফাঁদিতেছে, এইরূপ মানব-মনের যত কিছু নিগূঢ় মন্ত্রণা, গুপ্তচরের ন্যায় সংবাদপত্রগুলি গোপনে আমাদের কাণে কাণে কহিয়া দিতেছে। অন্যদিকে কোথায় কোন্ বাঁধ ভাঙ্গিয়া দামোদরের দুর্ব্বার বন্যা, ব্রহ্মপুত্রের প্রবল তরঙ্গ, পদ্মানদীর উদ্দাম জলস্রোত কোন্ কোন্ হতভাগ্য গ্রামবাসীর সর্ব্বস্ব ভাসাইল, উন্মত্ত বারিধিবক্ষে কোন্ সর্ব্বনাশা ঝড়ে পড়িয়া কোন্ কোম্পানির কোন্ বাণিজ্য-তরীখানি কত মূল্যের কি কি পণ্য বুকে লইয়া অকালে সলিল-সমাধি লাভ করিল, পৃথিবীর ক্ষণিকের শিহরণ, তাহার গাত্রচর্ম্মের সামান্য একটু কুঞ্চন গর্ব্বিত মানবশিশুর শতাব্দীর রচনা কিরূপে নিমিষে ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছে, তাহার তাসের নগরী, বাঁশের সেতু, বালির বাঁধ, ধূলির সৌধ একটি কম্পনে কেমন করিয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে—সুপটু পটুয়ার ন্যায় উহার সকরুণ চিত্র অঙ্কিত করিয়া সংবাদপত্র আমাদের চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতেছে। উহা সর্ব্বদ্রষ্টা বণিকের ন্যায় বাজারের দৈনিক দর জানাইয়াই নিশ্চিন্ত হয় না, ভাবী ফসলের নির্ভুল হিসাব, ভবিষ্যৎ চাহিদার অভ্রান্ত পরিমাণ ও পণ্য-মূল্যের অবশ্যম্ভাবী উত্থান-পতনের আভাস দিয়া, ব্যবসাদারগণকে সতর্ক করিতেছে। সর্ব্ব-বিদ্যাবিশারদ অধ্যাপকের মত অভিনব জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র বিকাশ, নিত্য নূতন মতবাদের অপূর্ব্ব সমালোচনা, মানব-মনের গোপন অনুভূতি, বিভিন্ন মানব-সমাজের বিচিত্র আদর্শ তন্নতন্ন করিয়া বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া পৃথিবীর জ্ঞান-

ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। পর্ব্বত হইতে পরমাণু পর্য্যন্ত কেহই উহার অনন্ত কৌতূহলী চক্ষুকে ফাঁকি দিতে পারে না। সর্ব্ব-সঞ্চয়শীলা বিশ্বপ্রকৃতির ন্যায় মানব-সংসারের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাটিও উহা ত্যাগ করে না। ১৯২৭ সালের ১৭ই আগষ্ট বারটা বিশ মিনিটে নিদ্রাভঙ্গের পর হইতে কে আর এ পর্য্যন্ত ঘুমায় নাই, কোন্ গ্রামের আড়াই বছরের ছেলে তাহার পিতামাতাকে ত্যাগ করিয়া তাহার পূর্ব্ব জন্মের পিতামাতার নিকট যাইবার জন্য বায়না ধরিয়াছে, কোন্ হতভাগ্য হাই তুলিয়া আর হাঁ বুজাইতে পারে নাই এ সমস্ত অতি-প্রয়োজনীয় সংবাদগুলিও বাদ পড়ে না। এক কথায় একখানি সংবাদপত্র বিরাট বিশ্বের জ্ঞান-কর্ম্ম-ধর্ম্ম-জগতের এক একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ—দৈনিক মানব-লীলার অপূর্ব্ব চলচ্চিত্র।

জগতে লোক-শিক্ষার, জ্ঞান-বিস্তারের, সর্ব্বজাতি-সমন্বয়ের যতগুলি পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহার মধ্যে সংবাদপত্রের আসন যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—এ কথা অকুণ্ঠিত চিত্তে বলা যাইতে পারে। ইহা বর্ত্তমান সুসভ্য জগতের অশেষবিধ কল্যাণ-সাধনে নিয়োজিত রহিয়াছে। সংবাদপত্র পাঠ না করিলে আমাদের শিক্ষা ও জ্ঞান সম্পূর্ণ বিকশিত হইতে পারে না। পুস্তকের শিক্ষা সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। সংবাদপত্রের শিক্ষা অসীম ও অভিনব। কিন্তু দুঃখের বিষয় এদেশের অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর; নগণ্য শিক্ষিত লোকেরও অধিকাংশই দরিদ্র; এজন্য স্বাধীন ও সঙ্গতিপন্ন দেশবাসীর মধ্যে ইহা যেরূপ কল্যাণ সাধন করিয়াছে, তাহার তুলনায় এদেশে ইহার উপযোগিতা একান্ত নগণ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

দায়িত্ববোধ-সম্পন্ন প্রকৃত হিতৈষী ব্যক্তির পরিচালনায় সংবাদপত্র যে আমাদের অশেষ কল্যাণ সাধন করে তাহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু স্বার্থান্ধদের হাতে পড়িয়া উহা নানা অনর্থেরও সৃষ্টি করে। প্রত্যেক দেশে এক এক দল স্বার্থপর লোক সংবাদপত্রের অসীম শক্তির সহায়তা গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব অভীষ্ট সাধন করে, দেশের সর্ব্বনাশসাধনও করিয়া থাকে। সংবাদ-পত্রের সাহায্যে মিথ্যা কথা ও ভ্রান্ত মতবাদ প্রচার করিয়া দেশের সরলচিত্ত ও

অশিক্ষিত জনসাধারণকে উত্তেজিত ও বিপথে চালিত করিয়া তাহারা আপন আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া লয়। এ দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার মূলে উহার প্রভাব যথেষ্ট বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। সংবাদপত্র পড়িলে অনেক সময় মনে হয় জগতে সত্য-মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় কিছুই নাই। ন্যায় অন্যায়, ধর্ম্ম অধর্ম্ম—এ সমস্তই বুঝি নির্ভর করে কেবল প্রচার ও বিজ্ঞাপনের উপর।

মুদ্রাযন্ত্রের উন্নতির সহিত সংবাদপত্রের সংখ্যা অগণিত হইয়া উঠিয়াছে। দৈনিক, সাপ্তাহিক, অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক, এমন কি বার্ষিক পত্রিকাও শত শত মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে। সংবাদ-প্রচারই ইহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে; এগুলিতে রাজনীতি, সমাজনীতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য, সাহিত্য ও শিল্পকলা প্রভৃতি মানব-সমাজের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয় বিশেষ নিপুণভাবে আলোচিত হইতেছে।

ছাত্রজীবন

ছাত্রজীবনকে অল্পাধিক সকল যুগেই লোকে কর্ম্মজীবনের উদ্যোগপর্ব্ব বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং কর্ম্মজীবনের সহায়করূপে বিদ্যানুশীলনই অন্যতম কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। বিশেষভাবে অধ্যয়নই যে সকল দেশের সকল যুগের ছাত্রগণের প্রধানতম করণীয় কর্ম্ম একথা সর্ব্বাগ্রে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। বিদ্যাচর্চ্চার দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন এবং জগতের জ্ঞাতব্য নানা-বিষয়ক প্রাথমিক জ্ঞান-লাভের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে সদাচার, পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্যজ্ঞান, শিক্ষক ও গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা এবং তাঁহাদের উপদেশ প্রতিপালন করিবার প্রবৃত্তি, দয়া, সমবেদনা, একত্র হইয়া কার্য্য সম্পন্ন করিবার ক্ষমতা প্রভৃতি বিকশিত হয় সে সকল দিকে দৃষ্টিপাত করাও ছাত্রগণের অন্যতম কর্ত্তব্য। ছাত্রজীবনের আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া প্রথমেই আমাদিগকে ছাত্রের এই প্রাথমিক কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হইতে হইবে এবং বিদ্যালাভই ছাত্রজীবনের কেন্দ্রীয়

লক্ষ্য এই কথা প্রতি ছাত্রের অন্তরে সর্ব্বদা জাগরূক থাকা প্রয়োজন। "ছাত্রাণাম্ অধ্যয়নং তপঃ" এই সত্য কোন বিশেষ দেশের বা বিশেষ যুগের নহে, ইহা সকল দেশের ও সকল যুগের ছাত্রজীবনের মূলমন্ত্র।

যদিও বিদ্যানুশীলনই ছাত্রজীবনের মূল লক্ষ্য, তবুও এই প্রসঙ্গে আরও দুই একটি কথা বিবেচনা করিবার আছে। ছাত্রজীবন কর্ম্মজীবনের মূল ভিত্তি; কাজেই যে সমাজে যে আবহাওয়ায় এবং যে সামাজিক অগ্রগতির ভিতর বিশ্বমানব অগ্রগামী, তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকিয়া ছাত্রজীবন যাপন করা সম্ভবপর বা কর্ত্তব্য কি না? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব কঠিন নহে। ছাত্রগণের জগতের অন্যান্য দেশের গতিধারা লক্ষ্য করা এবং সে সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে সকল জ্ঞান শাশ্বত সনাতন, যে সকল বিদ্যা সকল কালেই নূতন, সেগুলি লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে যে সকল জ্ঞান সাময়িক এবং যুগানুযায়ী সেগুলিও লাভ করা ছাত্রগণের প্রয়োজন। নতুবা পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ সম্ভব নহে। শিক্ষালাভের চরম লক্ষ্য মনুষ্যত্বের বিকাশ। ছাত্রজীবনে ইহার সূচনা। মনুষ্যোচিত গুণগরিমা অর্জ্জন করিতে না পারিলে শুধু বুদ্ধিবৃত্তিকে বিকশিত করিলে ছাত্রসমাজের জীবন পঙ্গু হইয়া যাইবে। সমস্ত দেহের বিকাশ বন্ধ করিয়া মস্তিষ্কের বিকাশ সাধন যেরূপ অসম্ভব, সেইরূপ জীবনের ও সমাজের বিভিন্ন ভাব ও জ্ঞান হইতে আপনাকে বঞ্চিত রাখিয়া যদি পাণ্ডিত্য অর্জ্জনের চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে বুদ্ধি উজ্জ্বল ও স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে বিকাশ লাভ করিবে কি না ঘোর সন্দেহ। তবে সেই সঙ্গে ইহাও মনে রাখা কর্ত্তব্য যে ছাত্রগণ যেন তাঁহাদের মূল লক্ষ্য বিদ্যানুশীলন হইতে ভ্রষ্ট হইয়া শুধু সমাজ বা দেশের অবস্থা ও গতিধারা লক্ষ্য করিতে আরম্ভ না করেন। তাহা হইলে শুধু জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশই যে বাধাপ্রাপ্ত হইবে তাহা নহে, বহির্জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞানও পল্লবগ্রাহিতায় পরিণত হইতে পারে। কারণ জীবনের প্রধানতম এবং প্রাথমিক জ্ঞানগুলি লাভ না করিলে মানবসমাজের সভ্যতা, রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির দিক্ দিয়া যে অগ্রগতি তাহাও সম্যক্ উপলব্ধি করা যায় না। সেইজন্য ছাত্রজীবনের শিক্ষাদানে ব্রতী ব্যক্তিবৃন্দের নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থাধ্যয়নই মূল লক্ষ্য

হওয়া কর্ত্তব্য। মানুষের কেন্দ্রীয় শক্তি বুদ্ধিগত বলিয়া এই বুদ্ধিকেই বিকশিত করিবার জন্য অধ্যয়নই ছাত্রগণের তপস্যা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

বুদ্ধিকে কেন্দ্র করিয়া অগ্রসর হইতে হইতে দেহ, মন এবং আত্মার সম্পূর্ণ স্ফুরণ করাই মানুষের আদর্শ। সেইজন্য ত্যাগ, সংযম, উদারতা প্রভৃতি যাহাতে বর্দ্ধিত হয় ছাত্রজীবন হইতে সে সকল বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। যে দেহকে আশ্রয় করিয়া জীবন তাহাও যাহাতে বলিষ্ঠ ও কর্ম্মপটু হয়, সে দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সেইজন্য দৈহিক শক্তি অর্জ্জনের জন্য প্রত্যহ নিয়মিত ব্যায়াম করা ছাত্রদের বিশেষ কর্ত্তব্য।

অতএব ছাত্রগণের অধ্যয়ন যে তপস্যা, সেই তপস্যা তাঁহাদের পাঠ্যপুস্তকগুলি কেন্দ্র করিয়া—সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম্মনীতি এবং দৈহিক শক্তি—এ সকল বিষয় অনুশীলন করিবার জন্য, সকল বিষয় অধ্যয়ন করিবার জন্য বিস্তৃত হউক। "ছাত্রাণাম্ অধ্যয়নং তপঃ" এই মন্ত্র নূতন বৃহত্তর ভাবের উদ্দীপনায় তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করুক।

স্বাস্থ্যই সম্পদ্

বাল্য, কৈশোর এবং যৌবনের এমনই একটি উদ্যম উৎসাহের স্বতঃস্ফূর্ত্ত চঞ্চলভাব আছে, তখন শক্তির এমন একটি আনন্দ-হিল্লোল সমস্ত শরীরে বহিয়া যায় যে—শরীরটাকে যে যত্ন করিবার প্রয়োজনীয়তা আছে, স্বাস্থ্যের জন্য যে শরীরটাকে নিয়মিতভাবে গড়িয়া তুলিতে হয় সে কথা ভাবাই অনেক সময় কঠিন হইয়া পড়ে। দৈনন্দিন সাধারণ কাজকর্ম্মগুলি সম্পন্ন করিতেছি, ঘুরিতেছি, নানাস্থানে যাতায়াত করিতেছি, হঠাৎ একদিন শরীরটা অসুস্থ হইয়া পড়িল, তখন বুঝিতে পারা যায়, উৎসাহ উদ্যমের মূল যে দেহ তাহার প্রতিও আমাদের একটি কর্ত্তব্য আছে। আমাদের কাজকর্ম্মের মূল পুঁজি ঐ শরীরটার প্রতি তখন যত্ন লওয়া আবশ্যক মনে হয়। বার্দ্ধক্য যখন ক্রমশঃ ঘনাইয়া আসে তখন শরীরের প্রতি যত্ন করিবার প্রবৃত্তি অনেকটা বৃদ্ধি পায়। দেহের প্রতি অযত্নের পরিণাম

মনুষ্যসমাজে একটি সাধারণ অভিজ্ঞতার বিষয় হইয়াছে। সেই অভিজ্ঞতা হইতেই শরীরের উন্নতি-সাধনকারী নিয়মগুলি সাধারণ উপদেশের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। তাই স্বাস্থ্য যে একটি সম্পদ্ এবং বিশেষ প্রয়োজনীয় সম্পদ্ একথা বুঝিতে খুব বিলম্ব হয় না, যদিও স্বাস্থ্যকে সম্পদ্ বলাটা প্রথম দৃষ্টিতে অতিশয়োক্তি মনে হইতে পারে।

স্বাস্থ্য যে সম্পদ্ একথা আমাদের একটি সনাতন প্রবাদ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেই হইবে না, বরং কথাটিকে বিচার করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। সম্পদের লক্ষণ হইতেছে এই যে উহা আমাদের দৈনন্দিন অভাব হইতে আরম্ভ করিয়া সকল প্রকার অভাবই দূর করিতে পারে। অবশ্য কি পরিমাণ অভাব দূর হইবে তাহা সম্পদের মাত্রার উপর নির্ভর করে। সম্পদের আরও একটি লক্ষণ এই যে উহাকে মূলধন হিসাবে খাটাইয়া সমৃদ্ধ হওয়া যাইতে পারে। সংসার-জীবনে সর্ব্বপ্রকার উন্নতিলাভে স্বাস্থ্য মানুষকে কি পরিমাণ সহায়তা করে আমরা যদি একবার ভাবিয়া দেখি তাহা হইলে একথা বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে স্বাস্থ্যই জীবনের মূল সম্পদ্। স্বাস্থ্যের অভাবে সকল স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা থাকিলেও তাহা বিন্দুমাত্র তৃপ্তিদান করিতে পারে না এবং স্বাস্থ্য থাকিলেই জীবনে অন্য সকল প্রকার উন্নতি লাভের চেষ্টা করা যায়। সুস্থদেহ দরিদ্র মজুর অসুস্থ অর্থশালী ব্যক্তি হইতে যে অধিকতর সুখী একথা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। জীবনের সকল প্রকার আনন্দ, পরিতৃপ্তি ও কর্ম্মতৎপরতার মূলে আছে স্বাস্থ্য। সুস্থ অবস্থায় ইহা আমরা সব সময়ে বুঝিতে না পারিলেও অসুস্থ হইলে আলো-আঁধারের মত একথা বেশ বুঝিতে পারি। এই সকল কারণেই সম্পদ্ রক্ষার জন্য মনুষ্যের একটি স্বাভাবিক আগ্রহ আছে, একটা সদা সতর্ক ভাব আছে; সম্পদ্ যেমন মানুষ তাহার সমস্ত শক্তি দিয়া রক্ষা করিবার চেষ্টা করে, নতুবা তাহার অস্তিত্ব রক্ষা করা সুকঠিন হইয়া পড়ে, সেইরূপ স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যও মানুষের অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য—এই অমূল্য উপদেশ স্বাস্থ্যই সম্পদ্ এই কথাটির মধ্যে নিহিত আছে।

সম্পদকে আমরা ব্যবহার করি নিত্য নৈমিত্তিক অভাব পূরণের জন্য এবং মূলধনরূপে খাটাই ঐশ্বর্য্যলাভের জন্য। আমাদের স্বাস্থ্যকেও সেইরূপ যথানিয়মে দৈনন্দিন কার্য্যাবলী সম্পাদনের জন্য এবং জীবনের বিভিন্ন ভাবের উন্নতিলাভের জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে এবং শরীরকে এইরূপ সম্পূর্ণ-ভাবে ব্যবহার করিতে হইলে তাহার যত্ন করিতে হইবে, তাহার বৃদ্ধি-বিষয়ে সচেতন হইতে হইবে এবং যাহাতে ক্ষয় না হয় সে বিষয়েও অবহিত হইতে হইবে।

স্বাবলম্বন

প্রাণিজগতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মানুষই সকলের অপেক্ষা অসহায়। অন্য সকল জীবশিশু জন্মগ্রহণের অল্পকাল পরেই আপন আপন শক্তির উপর নির্ভর করিতে অভ্যস্ত হয়। কিন্তু মানবশিশুর নিজের পায়ের উপর নির্ভর করিয়া দাঁড়ান অনেক দিনের চেষ্টা ও অভ্যাসের ফলে সম্ভবপর হয়। মানুষকে মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিবার জন্য পিতামাতার সাহায্য, সমাজের আইন-কানুন, রীতি-নীতি, রাষ্ট্রের সুব্যবস্থা এবং বিদ্যায়তন সকলের সুশৃঙ্খলা প্রভৃতির উপর নির্ভর করিতে হয় এই সকলকে উপেক্ষা করিয়া চলা কোন ব্যক্তিবিশেষের পক্ষেই সম্ভবপর নয়। সম্পূর্ণ স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে; কিন্তু তবুও আমরা স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য উপদিষ্ট হই। স্বাবলম্বনকে শুধু একটি আবশ্যকীয় গুণ বলিয়াই আমরা ক্ষান্ত হই না, ইহার অভাবকে জীবনের একটি বিশেষ দৈন্য বলিয়া অনুভব করি।

যদিও সমাজস্থ ব্যক্তিবৃন্দের পরস্পর সহায়তার মধ্য দিয়া ব্যক্তি-জীবন অগ্রসর হয় এবং মানুষের সমাজবদ্ধতা তাহার উন্নতির অন্যতম কারণ, তবুও আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া না চলিলে ব্যক্তিগত জীবনে কখনও সত্যকার উন্নতি সম্ভবপর নহে। ইহা সমষ্টি-জীবনেও অনুরূপ সত্য। সেই জন্যই সভ্যতার আদিম যুগ হইতে যে সকল গুণ মনুষ্যসমাজে সযত্নে অনুশীলিত হইতেছে—স্বাবলম্বন তাহাদের অন্যতম।

অপরের উপর নির্ভর না করিয়া বাল্যকাল হইতে আপনার কাজ যথাসাধ্য আপনি করিতে চেষ্টা করিলেই ইহা পরবর্ত্তী জীবনে স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত হয়।

ছাত্রজীবনে যে সকল ছাত্র গৃহশিক্ষক বা অন্যান্য শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত আপনাদের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যাবলী সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয় তাহারাই পরবর্ত্তী জীবনে সমাজের ও দেশের সেবা করিতে এবং ব্যক্তিগত জীবনে উন্নতি করিতে অধিকতর সমর্থ হয়। অবশ্য শিক্ষক বা গৃহশিক্ষকের নিকট হইতে কোন উপদেশ বা সাহায্য লওয়া ছাত্রের পক্ষে একটুও নিন্দনীয় নহে; কিন্তু যদি ছাত্রগণ শিক্ষক বা গৃহশিক্ষকের উপরই তাহাদের পাঠ প্রস্তুত বিষয়ে নির্ভর করে তবে তাহাদের ফল মঙ্গলকর হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। স্বাবলম্বী হওয়ার অর্থ ইহা নয় যে—কোন ব্যক্তি অপরের সাহায্য গ্রহণ করিবে না। তবে স্বাবলম্বী ব্যক্তিকে মূলতঃ আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হইবে, আপনার অন্তর্নিহিত শক্তির একটি প্রাণবন্ত প্রেরণার বশে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে এবং অপরের সহায়তা সেই শক্তিকে কার্য্যকরী হইবার পথে সাহায্য করিবে। যদি সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গ সকলে স্বাবলম্বী হন তাহা হইলে সমগ্র সমাজ আত্মশক্তিতে উদ্দীপিত হইয়া উঠিবে।

আপনার শক্তিকে বিকশিত করিবার মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি আছে; তবুও মধ্যে মধ্যে আলস্য জড়তা সঙ্কীর্ণতা আসিয়া মানুষকে কর্ম্মবিমুখ সুবিধাবাদী করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু মানুষ যেন কখনও সেই সকল সুবিধার মূর্ত্তিধারী 'মারে'র নিকট আত্মসমর্পণ না করে, সে যেন আপন অন্তর্নিহিত শক্তির আশ্রয়েই অগ্রসর হয়। এইজন্যই সকলে স্বাবলম্বনের উপদেশ দিয়া থাকেন এবং এই উপদেশের মধ্যেই উন্নতি লাভের মূলমন্ত্র নিহিত আছে।

সমাজ-জীবনে যখন জড়তা আসে তখনই পরানুগ্রহপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায় এবং সমাজের লোকও সুবিধাবাদী হইয়া পড়ে। আমাদের যে একান্নবর্ত্তী পরিবারগুলি নষ্ট হইয়া যাইতেছে তাহা শুধু পাশ্চাত্ত্যের নূতন প্রলোভনময় সমাজ-ব্যবস্থার সম্মুখীন হওয়ার জন্যই নহে, একান্নবর্ত্তী পরিবারসমূহের

অধিকাংশ ব্যক্তির মধ্যে সুবিধাবাদের আশ্রয় লইবার চেষ্টাও তাহার একটি অন্যতম কারণ। একজন অর্থোপার্জ্জক ব্যক্তির পরিশ্রমের সুযোগ গ্রহণের চেষ্টা পরিবারস্থ সকল ব্যক্তিই যদি করেন এবং আলস্যে ও বৈঠকখানার মজলিসে দিনযাপন করাকেই জীবনের কর্ত্তব্য মনস্থ করেন তাহা হইলে মনে করিতে হইবে সমাজে ক্ষয় ধরিয়াছে। আমাদের সমাজের একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রাণশক্তি এইভাবেই নষ্ট হইয়া যাইতেছে। স্বাবলম্বী হইবার প্রবৃত্তির অভাবেই এইরূপ ঘটিয়াছে। এক্ষেত্রে একটি কথা আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে সঙ্ঘবদ্ধ জীবন স্বাবলম্বনের প্রতিকূল নহে ; প্রত্যেকে আপনার শক্তি অনুসারে সমগ্র সঙ্ঘজীবনকে শক্তিমান্ করিবার চেষ্টা করিলে তাহাতেই পূর্ণ স্বাবলম্বনের কাজ হইবে। স্বাবলম্বী হইতে হইলে স্বতন্ত্র হইতে হইবে এইরূপ কোন বাধ্যবাধকতা নাই। শুধু আপনি স্বাবলম্বী হইয়া উঠিলেই হইবে না, আরও পাঁচজনের উঠিবার পথ প্রশস্ত করিতে হইবে। এইখানেই স্বাবলম্বনের পূর্ণ সার্থকতা !

জনসেবা

যুগপ্রভাতে বীর সন্ন্যাসী জড়ভাবে সমাচ্ছন্ন জাতিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন :—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

আর্ত্ত ব্যথিত দারিদ্র্যপীড়িত নরনারায়ণের সেবাই যে মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এই কথাই তিনি আমাদিগকে বলিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার এই বজ্রগম্ভীর উপদেশ শুধু মহাশূন্যে প্রতিধ্বনিত হইয়াই ফিরিয়া আসে নাই। তাঁহার উপদেশে অনুপ্রাণিত হইয়া আমাদের দেশের বহু স্থানের যুবকবৃন্দ সেবা-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছেন এবং এই সেবা-প্রতিষ্ঠানগুলি সমস্ত দেশের মধ্যে জালের মত বিস্তৃতি লাভ করিতেছে।

মানুষের সেবা যে হীনকর্ম্ম নয়, ইহা যে মানুষকে সত্যকার মানুষ করিয়া তোলে তাহাই সকলকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত বহুযুগ পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে সমাগত অতিথিবৃন্দের সেবার ভার শ্রীকৃষ্ণ স্বহস্তে লইয়াছিলেন। স্পষ্টতঃ যদিও আমাদের দেশে জনসেবার জন্য কোন প্রতিষ্ঠান পূর্ব্বে ছিল না, কিন্তু তবুও আমাদের গ্রাম্য উৎসবগুলির মধ্যে, বাঙ্গালীর সামাজিক ভোজনের মধ্যে গ্রামস্থ সর্ব্বশ্রেণীর জনসাধারণের আহারে তাহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিবার যে ব্যবস্থা ছিল তাহার মধ্যে মানবহৃদয়ের জনসেবা-প্রবৃত্তিকেই বীজাকারে দেখিতে পাই। পাশ্চাত্ত্য দেশের মানবপ্রীতির মধ্যেই আমরা আধুনিক প্রণালীর জনসেবার প্রতিষ্ঠান গড়িবার প্রেরণা লাভ করিয়াছি।

বিবেকানন্দ পাশ্চাত্ত্য দেশ সকল পরিভ্রমণ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়া যে সেবাশ্রম এবং সেবকসঙ্ঘ গড়িয়া তোলেন উহাই আমাদের দেশের সর্ব্বপ্রথম সংগঠিত সেবা-প্রতিষ্ঠান। গত অর্দ্ধোদয়-যোগে বাংলা দেশের যুবকবৃন্দ সেবাকার্য্যে যে সাফল্য দেখাইয়াছেন তাহা বাস্তবিকই অতীব প্রশংসনীয়। গত অর্দ্ধোদয়-যোগের পূর্ব্বে যে অর্দ্ধোদয়-যোগ হইয়াছিল সেই উপলক্ষেই ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম বিবেকানন্দের উপদেশে সেবক-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উহাই সর্ব্বপ্রথম সম্মিলিত ভাবে সেবাকার্য্য সম্পন্ন করে। আমাদের বর্ত্তমানে কর্ত্তব্য, জনসেবার এই ভাব দেশের প্রতি পল্লীর যুবকবৃন্দের মধ্যে ছড়াইয়া দেওয়া এবং প্রতি মেলায়, প্রতি উৎসবে যাহাতে অসহায় জনসাধারণ কোনরূপে বিপন্ন হইতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা। আজও গ্রামে গ্রামে কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মহামারী রোগে আক্রান্ত হইয়া বিনা চিকিৎসায় বহু লোক অকালে প্রাণত্যাগ করে। আজও বন্যায় দুর্ভিক্ষে বহুদিনের বুভুক্ষা-পীড়িত নরনারীর কাতর ক্রন্দনে গগন পবন মুখরিত হয়। ভারতের যুবকবৃন্দকে দুর্গতগণের অভাব দূর করিবার যে গুরুদায়িত্ব যুগাচার্য্য দিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের তাহা পালন করিতে হইবে। নগরের সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিবৃন্দের নিকট হইতে অর্থ, বস্ত্র প্রভৃতি লইয়া গ্রামের জনসাধারণের মধ্যে তাহা বিলাইয়া দিতে হইবে। রোগ-জর্জ্জরিত যে সকল ব্যক্তি শুশ্রূষার অভাবে

প্রাণত্যাগ করিতে চলিয়াছে তাহাদিগকে শুশ্রূষা করিতে হইবে। আর্ত্ত, ব্যথিত, রোগাক্রান্ত যে যেখানে আছে সকলকে সেবা না করিয়া আমাদের ঈশ্বরের নাম লইবারও উপায় নাই ; কারণ ঈশ্বর জনসাধারণের মধ্যেই—ব্যাধিগ্রস্তদের মধ্যেই মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

আর্ত্তের ব্যথিতের সেবা করিয়া তাঁহাদের ধন্য করিব না—আমরাই সেবা করিয়া ধন্য হইব—জনসেবায় এই সেবকের মনোবৃত্তি লইয়া আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। তবেই সেবা হইবে সার্থক।

গ্রামে ফিরিয়া যাও

'গ্রামে ফিরিয়া যাও'—নাগরিক সভ্যতার প্রতিক্রিয়ারূপে চিন্তাশীল ব্যক্তিবৃন্দ আমাদিগকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন। যন্ত্র ও বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই নাগরিক সভ্যতা এবং আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্য ও কারখানা বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহার ফলে বৈজ্ঞানিক দিক্ দিয়া উন্নত স্বাধীন দেশগুলি যথেষ্ট আর্থিক উন্নতি লাভ করিয়াছে সামাজিক ব্যবস্থাতেও সম্পূর্ণ রকমের একটা পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং চিন্তাধারাতেও ইহা যথেষ্ট পরিবর্ত্তন আনিয়াছে। কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত দেশগুলি এই যান্ত্রিক সভ্যতা দ্বারা সমভাবে উপকৃত হয় নাই। বিশেষতঃ ভারতবর্ষের পল্লীসমূহের কুটীর-শিল্প নষ্ট হওয়ায় এবং পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহের অনুকরণে যন্ত্রশিল্পের যথেষ্ট প্রসার না হওয়ায় ভারতবর্ষের দিক্ দিয়া সভ্যতা উপকার অপেক্ষা অপকারই বেশী করিয়াছে। আমাদের এ ব্যাপারটি বিশেষভাবে আলোচনা করিবার প্রয়োজন আছে। অবশ্য এই আলোচনা-প্রসঙ্গে আমাদের আরও একটি কথা ভাবিবার আছে। গ্রাম্যজীবনে ফিরিয়া যাইবার পক্ষে অর্থনৈতিক কারণ ছাড়াও সংস্কৃতির দিক্ দিয়া এবং সরল আধ্যাত্মিক জীবন যাপনের দিক্ দিয়াও প্রয়োজনীয়তা আছে।

প্রথমেই আমাদের একটি কথা বিনা বিতর্কে স্বীকার করিয়া

লওয়া উচিত যে যান্ত্রিক সভ্যতা আমাদিগকে যতই ক্ষতিগ্রস্ত করুক না কেন, বর্ত্তমান সময়ে যন্ত্রকে উপেক্ষা করিয়া আমরা একপাও অগ্রসর হইতে পারি না। তবে আমাদিগের প্রকৃতি এবং মনও যাহাতে যান্ত্রিক না হয়, মনের ভিতর যাহাতে একটি সরল স্বচ্ছন্দতা থাকে সে বিষয়ে অবহিত হওয়া সকলের প্রয়োজন। মানুষ যে যন্ত্রের উপর—এই কথা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। শহরের বিলাস-ব্যসনের দিকে প্রলুব্ধ না হওয়া মঙ্গলকর; কিন্তু গ্রাম্যজীবনকেও শুধু কুটীর-শিল্প এবং কৃষিকর্ম্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভবপর হইবে এরূপ অনুমান করা কঠিন। বরং জাপানের গ্রাম্য যান্ত্রিক শিল্পের অনুকরণে অল্প মূলধনে আধুনিকভাবে যাহাতে গ্রামেও যন্ত্র-শিল্প প্রবর্ত্তিত হইতে পারে সেই বিষয়ে আমাদের মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। শুধু "সেই সুন্দর পল্লী-জীবন", "সেই গোচারণ মাঠ" বা "সেই মর্ম্মরায়মাণ বেণুকুঞ্জ" বলিয়া হা হুতাশ করিয়া আবার 'চল গ্রামে' বলিলে তাহা চমৎকারভাবে নাটকীয় ও সাময়িক চিত্তহারী হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে বাস্তবিক কোন কাজ হইবে না। মধ্যবিত্ত বেকার যুবকবৃন্দ যদি গ্রামে থাকিয়া অর্থোপার্জ্জনের সুযোগ না পায় তবে গ্রাম্যজীবনের সুস্নিগ্ধতা সরলতা বা পল্লীবৃক্ষগুলির সৌন্দর্য্য কিংবা পাখীর কলতান বাস্তবজীবনে কিছুই কার্য্যকরী হইবে না। পল্লীকে নূতন অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর পুনর্গঠিত করিতে পারিলেই গ্রামে ফিরিয়া আসা সম্ভব। নতুবা কেবল ভাবাবেগে ভিটার মাটি আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিলেই কাজ হইবে না—এ-কথা আমাদের সর্ব্বাগ্রে মনে রাখিতে হইবে।

কি ভাবে গ্রাম্যজীবন পুনর্গঠিত হইতে পারে এ বিষয়ে বহু মনীষী চিন্তা করিতেছেন এবং আমরা আশা করি এই সম্বন্ধে একটি নির্দ্দেশ আমরা অদূর ভবিষ্যতে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবৃন্দের নিকট হইতে পাইব। অনুমান হয় কুটীর-শিল্প, হাঁস-মুরগীর চাষ, কৃষিকর্ম্ম, অল্প মূলধনের বস্ত্র-শিল্প প্রভৃতি গ্রামের পুনর্গঠনের লক্ষ্য বস্তু হইবে। তাহা হইলে নাগরিক-জীবনের মোহও আমাদের অনেকটা নষ্ট হইবে এবং গ্রামগুলি সত্যসত্যই শহরের পরিপূরক হইবে।

'গ্রামে ফিরিয়া যাও' কথাটির ভিতরে আরও একটি সত্য লুক্কায়িত আছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণী সরকারী চাকুরী লইয়া একটি নাগরিক সমাজ ও সভ্যতা সৃষ্টি করিয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এদেশে স্থায়ী প্রতিষ্ঠালাভের পর হইতে এই সমাজ ক্রমবর্দ্ধমান হইয়াছে এবং অবশেষে একটি নূতন বিলাসিতাপূর্ণ পাশ্চাত্ত্যের অনুকারী সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছে। এই নাগরিক সভ্যতা আমাদের অনেক বিষয়ে উপকারে লাগিলেও অনেক দিক্ দিয়া ইহা আমাদের ক্ষতি করিয়াছে এবং তাহা পূরণ করিতে হইলে আমাদের গ্রামকে পুনর্গঠন করিয়া সেখানে ফিরিয়া যাওয়া দরকার। গ্রামের জমিদারগণ বিলাসব্যসনের মোহে গ্রাম ছাড়িয়া শহরে চলিয়া গিয়াছে এবং গ্রাম সেই কারণে অবহেলার বস্তু হইয়াছে। জমিদারবৃন্দের এখন গ্রামে ফিরিয়া আসা কর্ত্তব্য এবং শহরের বিলাসিতাময় জীবনও পরিত্যাগ করা উচিত। বর্ত্তমান যান্ত্রিক যুগে যে সমস্ত অত্যাবশ্যক দ্রব্যের অভাবে তাঁহারা গ্রাম ছাড়িয়া শহুরে হইয়াছেন, গ্রামকে পুনর্গঠিত করিলে সে অভাব দূর হইবে। পল্লীর গ্রামগুলি শহরের শ্রী ধারণ করিয়া আবার নূতনভাবে গড়িয়া উঠিবে। আশা করা যায় এ-স্বপ্ন একদিন বাস্তবে পরিণত হইবে। তাহা হইলে আধুনিক সভ্যতার নূতন প্রাণ-সঞ্চার হইবে।

তোমার প্রিয় ঔপন্যাসিক

রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-স্মৃতিতে' তাঁহার সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষাতের ছবিটি মনে দাগ কাটিয়াছিল,—সেই গৌরকান্তি দীর্ঘকায় পুরুষ—খড়্গ-নাসায়, চাপা ঠোঁটে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একটা প্রতিভার লক্ষণ; বক্ষের উপর দুইহাত বদ্ধ করিয়া সকলের নিকট হইতে আপনাকে পৃথক্ করিয়া রাখা; সেই বিনয়নম্র মধুর ভাব আর ললাটের সেই অদৃশ্য রাজতিলক! বঙ্কিমচন্দ্রের এই মূর্ত্তি যেন চক্ষুর সম্মুখে ভাসিতেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব বাঙ্গলা সাহিত্যে তথা বাঙ্গালার ইতিহাসের স্মরণীয় ঘটনা। তিনি কথা-সাহিত্যে যে যুগান্তর আনিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত

হইতে হয়। তাঁহারই হাতে বাঙ্গলা উপন্যাস নূতন করিয়া জন্মলাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্য যে গৌরবের অধিকারী তাহার মূলে রহিয়াছে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা। বঙ্কিমচন্দ্রের পরে যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহারা তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়াছেন, কেহ তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। বাঙ্গলা উপন্যাস-ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র এখনও সকলের উর্দ্ধে রহিয়াছেন; তাঁহার স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, সেই স্বাতন্ত্র্যে মুগ্ধ হইয়া বাঙ্গালী জাতি তাঁহাকে জয়মাল্যে বিভূষিত করিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা শতমুখী। 'বন্দেমাতরম্'-এর স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' বাঙ্গালীর মনে সর্ব্বপ্রথম দেশপ্রেমের বন্যা আনিয়াছিল। উপন্যাসের ভিতর দিয়া তিনিই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালীকে দেশের সেবায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই উপন্যাসে শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ও দেশপ্রেমিকের মিলন ঘটিয়াছে; পরস্পর পরস্পরকে সম্পূর্ণাঙ্গ করিয়াছেন; এখানে বঙ্কিমচন্দ্র শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক নহেন বা শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিকও নহেন, তিনি একাধারে শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ও দেশপ্রেমিক।

সামাজিক উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য অনুকরণীয়। কেবলমাত্র আখ্যায়িকা নহে, বিভিন্ন জীবন্ত চরিত্র ও নিখুঁত সামাজিক চিত্র তাঁহার প্রতিটি সামাজিক উপন্যাসকে অপরূপ করিয়া তুলিয়াছে। 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'দেবী চৌধুরাণী', 'ইন্দিরা' ইত্যাদি সবগুলিই বাঙ্গলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্। বাঙ্গালীর সমাজকে তিনি নির্ভীকভাবে বিচার করিয়াছেন। এখানে তিনি একজন বিরাট সংস্কারক। কিন্তু সর্ব্বোপরি তিনি একজন অসামান্য প্রতিভাশালী আর্টিষ্ট—ইহা আমরা মুহূর্ত্তের জন্যও যেন বিস্মৃত না হই।

তাঁহার দৃষ্টিপথে বাঙ্গালীর জীবনের সকল দৃশ্যই পতিত হইয়াছে; কেবলমাত্র জমিদারের বৈঠকখানা বা সুরম্য উদ্যানবাটিকা নহে; জমিদারের অন্তঃপুর, দাস-দাসী-রাঁধুনীদের কলহ-দ্বন্দ্ব সুখ-দুঃখ ইত্যাদি কিছুই তিনি উপেক্ষা করেন নাই। এমন কি আহার্য্য-সামগ্রীর খুঁটিনাটিও তিনি বাদ দেন নাই। বালবিধবার জীবনের ব্যর্থতা, প্রতীক্ষা-ক্লান্ত বালিকা বধূর প্রহর-গণনা,

নিষ্ঠুর সমাজের নগ্নমূর্ত্তি, নারীত্বের গৌরব—সবই তাঁহার হাতে অপূর্ব্বভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র আদর্শবাদী, তিনি কোনখানেও আদর্শভ্রষ্ট হন নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিও তাঁহার অসীম কৃতিত্বের পরিচায়ক। ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে তিনি দক্ষতার সহিত উপন্যাসের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার 'দুর্গেশনন্দিনী', 'রাজসিংহ', 'সীতারাম' প্রভৃতি উপন্যাসগুলিতে দেশের অতীত গৌরবের উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে। ভারতবাসী যে ভীরুভাবে বিজেতার নিকট আত্মসমর্পণ করে নাই, তাহার ভিতরেও যে শৌর্য্য-বীর্য্য ছিল, তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাস সেই সাক্ষ্যই প্রদান করে। এই উপন্যাসগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্রের মৌলিকতা বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

ইহা ছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্রের আরও দুইখানি উপন্যাস আছে যাহাদের সামাজিক কিংবা ঐতিহাসিক উপন্যাসের পর্য্যায়ে ফেলা যায় না, যদিও তাহাদের মধ্যে ঐতিহাসিক ঘটনা অল্পবিস্তর রহিয়াছে। 'মৃণালিনী' ও 'কপালকুণ্ডলা' এই ধরণের উপন্যাস। 'মৃণালিনী'র পটভূমি ঐতিহাসিক-ঘটনাসম্ভূত ; ইহাতে যুদ্ধবিগ্রহ আছে, কিন্তু তাহাই সব নহে। যুদ্ধবিগ্রহের ভিতর দিয়া ঔপন্যাসিক অদ্ভুত কৃতিত্বের সহিত কয়জন নরনারীর জীবন-কাহিনী ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাই 'মৃণালিনী'র মূল সুর ধ্বনিত হইয়াছে মৃণালিনী ও গিরিজায়ার গানে।

'কপালকুণ্ডলা'র রঙ্গমঞ্চ তীব্র আলোকে আলোকিত হয় নাই, তাহা আধা-আলো আধা-আঁধারে আবৃত, ইহার ভিতরে প্রকৃতির আপন হাতে গড়া এবং মানবসমাজ-সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা কপালকুণ্ডলার জীবননাট্য ভীতিপূর্ণ রহস্যের ভিতর দিয়া অভিনীত হইয়াছে। কপালকুণ্ডলা বঙ্কিমচন্দ্রের অপরূপ অমর সৃষ্টি।

বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্রগুলির প্রত্যেকটিই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্র ; একজনের সহিত আর একজনের এতটুকু সাদৃশ্য নাই। তাহা ছাড়াও বড় কথা এই যে, তাঁহার প্রতিটি নর-নারী জীবন্ত। তাই তাঁহার যে কোন নর-নারী

পাঠকের মনে গভীর ছায়াপাত করে। তারপর বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গী যে কোন পাঠককে মুগ্ধ ও অভিভূত না করিয়া পারে না। তিনিই ভাষাকে পাণ্ডিত্যের নিগড় হইতে মুক্ত করিয়া তাহার ভিতরে একটি অপূর্ব্ব সজীবতা আনিয়া দিয়াছেন, ইহা অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই। বস্তুতঃ এদিক্ দিয়া তাঁহার কাছে আমাদের ঋণের সীমা নাই।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বর্ণনায় তিনি আপনার অজ্ঞাতসারে কবি হইয়া উঠিয়াছেন। উপন্যাসের ভিতরে ছোট ছোট কবিতা গান তাঁহার কাব্য-প্রতিভার সাক্ষ্য প্রদান করে। হাস্যরসের দিক্ হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের দান বাঙ্গলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্। তাঁহার গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজের মত আর একটি চরিত্র বাঙ্গলা সাহিত্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। এই সব কারণে তাঁহার উপন্যাস কখনও পুরাতন হয় না, তাহা যতবার পড়া যায় ততবারই ভাল লাগে; কেবল ইহাই নহে, তাঁহার যে কোন উপন্যাস যে কোন স্থান হইতে পড়া যায়, তাহাতে পাঠকের মন সমান পরিতৃপ্তি লাভ করে।

বঙ্কিমচন্দ্রকে শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের সম্মান দিয়া বাঙ্গালী জাতি নিজেই ধন্য হইয়াছে। তিনি যদি আবির্ভূত না হইতেন তাহা হইলে বাঙ্গলা সাহিত্যের কি হইত, কে জানে?

খেলা-ধুলা শিক্ষার অঙ্গ

বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহার উদ্দেশ্য শুধু শুষ্ক পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়া বিদ্যালয়ের উপাধি আহরণ নহে; প্রকৃত শিক্ষার সার্থকতা হৃদয় ও মনের বৃত্তিসমূহের সুসমঞ্জস উৎকর্ষ লাভে। কিন্তু দেহের সহিত মনের সম্বন্ধ এত নিবিড় যে দেহকে উপেক্ষা করিলে মন বা অন্তঃকরণের সম্যক্ উন্নতি সম্ভব হয় না। সেইজন্য মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য দৈহিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজন। নষ্টস্বাস্থ্য ব্যক্তিদের নিকট জীবন অনেক সময়ে অর্থশূন্য বলিয়া মনে হয়; তাহাদের কর্ম্মে উৎসাহ কিংবা চিন্তায় গভীরতা থাকে না। কিন্তু দৈহিক স্বাস্থ্যের ন্যায় অমূল্য সম্পদ্ লাভ করিতে হইলে বাল্যকাল হইতেই সচেষ্ট হইতে হয়। যেমন

যত্নসহকারে পুস্তক পাঠ করিয়া বিদ্যালাভ করিতে হয়, সেইরূপ শ্রদ্ধার সহিত দেহচর্য্যা করিয়া দেহকে বলিষ্ঠ ও কর্ম্মক্ষম করিয়া তুলিতে হয়।

বাল্যকালে খেলাধূলার চর্চ্চা করাই স্বাস্থ্য গঠন করিবার সহজ ও স্বাভাবিক উপায়। খেলাধূলার আনন্দ সকলকেই অনায়াসে আকৃষ্ট করে, সুতরাং নিয়মিত ভাবে ইহার চর্চ্চা করিলে আনন্দ উপভোগের মধ্য দিয়াই শক্তিসঞ্চয়ের সুযোগ পাওয়া যায়। ব্যায়ামের দ্বারাও দৈহিক বলবৃদ্ধি করা যাইতে পারে, কিন্তু দশ জন বন্ধু-বান্ধবের সহিত একত্র হইয়া মাঠে খেলাধূলার মধ্যে যে নির্ম্মল আনন্দ উল্লাস আছে, ব্যায়ামাগারের নিয়মবদ্ধ অঙ্গভঙ্গীর মধ্যে তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ যে সমস্ত খেলাধূলা হইয়া থাকে তাহাদের সকলেরই বিশেষ গুণ এই যে তাহারা দেহের শক্তি ও মনের আনন্দ এক সঙ্গেই বিধান করিয়া থাকে।

স্বাস্থ্যের জন্য খেলাধূলার প্রয়োজনীয়তা আছেই; কিন্তু ইহা ছাড়াও খেলাধূলার চর্চ্চা কতকগুলি মানসিক বৃত্তির স্বাভাবিক বিকাশকে সাহায্য করে। ফুটবল, হকি, ক্রিকেট প্রভৃতি খেলার ফলে বিদ্যার্থীরা উত্তরকালে জীবনযুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি অর্জ্জন করে। কারণ এই সমস্ত খেলায় একদল খেলোয়াড় এক উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া বিরুদ্ধ পক্ষকে পরাজিত করিবার জন্য নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা করে। এইরূপ খেলার মাঠে পরস্পর মিলিত হইয়া নিঃস্বার্থভাবে কর্ত্তব্য সাধন করিবার অভ্যাস জন্মে। ভবিষ্যৎ জীবনে ইহার উপকারিতা প্রতি পদেই অনুভূত হয়। কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে খেলাকে বিলাসের সামগ্রী বলিয়া ধরিয়া লইলে ইহা হইতে বিন্দু-মাত্র উপকারের আশা নাই বরং তাহাতে অনিষ্টের সম্ভাবনাই বেশী। সুতরাং দেহ ও মনের স্বাস্থ্য-সম্পদ্ হিসাবে ইহার ব্যবহার কল্যাণকর।

খেলাধূলার দ্বারা দেহ ও মনের দৃঢ়তা ও পটুতা জন্মে; ফলে আকস্মিক বিপদের মধ্যেও স্থির হইয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার ক্ষমতা হয়। সর্ব্বোপরি সংসারে বিচিত্র অবস্থা-বিপর্য্যয়ের মধ্যে অবিচলিত ধৈর্য্যের সহিত জীবনের প্রতি কর্ত্তব্যের দায়িত্ব বজায় রাখিবার জন্য খেলোয়াড়-সুলভ মনোবৃত্তির বিকাশ

আবশ্যক। জীবনে উত্থান-পতন জয়-পরাজয় আছেই। জয়লাভের আনন্দে আত্মহারা হওয়া অথবা পরাজয়ের গ্লানিতে ভাঙ্গিয়া পড়া প্রকৃত শিক্ষার পরিচায়ক নহে। খেলার মাঠে জয়-পরাজয়কে সহজভাবে স্বীকার করিয়া লওয়ার অভ্যাস থাকিলে কর্ম্মক্ষেত্রেও সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্যকে বরণ করা সহজসাধ্য হয়। প্রকৃত খেলোয়াড় যেমন খেলার আনন্দকেই মূল্যবান্ বলিয়া মনে করে, খেলার ফলাফলকে নহে, সেইরূপ যথার্থ কর্ম্মী ফলাকাজ্ক্ষার অপেক্ষা কর্ম্মের স্বাভাবিক আকর্ষণকেই প্রকৃত সুখ বলিয়া অনুভব করে।

অনেকের ধারণা আছে যে বিদ্যার্থীকে খেলাধূলায় উৎসাহিত করিলে তাহাদের বিদ্যাচর্চ্চার ব্যাঘাত হয়। এই ধারণা একেবারেই ভ্রান্ত। বাল্যকালে বিদ্যার প্রসঙ্গ সাধারণতঃ নীরস বলিয়া মনে হয়; সেই সময়ে লেখাপড়ার সহিত নিয়মিত খেলাধূলার যোগ না থাকিলে বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের নিকট একটি ভয়াবহ স্থান হইয়া দাঁড়ায়, বিদ্যালয় বা বিদ্যাশিক্ষার প্রতি বিদ্যার্থীদের কোনই আকর্ষণ থাকে না। খেলাধূলার চর্চ্চা একেবারে ত্যাগ করিয়া কেহ যদি বিদ্যাশিক্ষায় মন নিয়োগ করে তাহা হইলেও ফল ভাল হয় না। তাহার দেহ স্বাস্থ্যহীন হয় এবং মনে আনন্দ ও উচ্চাশা থাকে না। প্রকৃতপক্ষে, যে-শিক্ষা মানসিক বৃত্তিগুলির পরিপূর্ণ উন্নতি সাধন করিতে চাহে নিয়মিত খেলাধূলার চর্চ্চা তাহার অপরিত্যাজ্য অঙ্গ।

একজন কবির আগমন উপলক্ষে একটি অভিনন্দন

হে কবি, আজ তোমার আগমনে আমাদের এই নিভৃত ক্ষুদ্র পল্লীর একটানা জীবনযাত্রার মধ্যে একটি অভূতপূর্ব্ব সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে; সেই সুরে কণ্ঠ মিলাইয়া আমরা তোমাকে সাদরে বরণ করিতেছি। আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি তুমি গ্রহণ কর।

সভ্যতার সকল প্রকার প্রাণহীন কৃত্রিমতা হইতে বহুদূরে অবস্থিত এই পল্লীর আহ্বানে তুমি সাড়া দিয়াছ; আমাদের আশা আছে, তোমার কাব্য-

প্রেরণার মূলে ইহা হয় তো খানিকটা রসসিঞ্চন করিবে। কারণ তুমি শহরের কবি নও, তুমি প্রকৃতপক্ষে জনপদের কবি ; আমাদের এ আশা সফল হউক, তাহাই সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি।

তোমার কবিতার ভিতর দিয়া তোমার সহিত আমাদের যে পরিচয় ঘটিয়াছিল, তাহা আজ আরও নিবিড় ও মধুর হইল। ইহার পরে তোমাকে হয়ত নিজেদের মধ্যে এমন করিয়া পাইব না, কিন্তু তোমার কবিতা আমাদের সম্পর্ককে আরও ঘনিষ্ঠ, আরও মাধুর্য্যমণ্ডিত করিবে। তোমার কবিতায় যে ফুলের গন্ধ বিকীর্ণ হইবে, যে আম্রমুকুলকে ঘিরিয়া মৌমাছি গুঞ্জন করিয়া উঠিবে, চৈত্র-সন্ধ্যাকে মুখরিত করিয়া যে কোকিল ডাকিয়া উঠিবে, সে ফুল, সে আম্রমুকুল, সে কোকিলকে তো আমরা প্রত্যক্ষ দেখিব আমাদেরই চারিপাশে। তখন নূতন করিয়া ধরণীর সহিত আমাদের যেন পরিচয় ঘটিবে। সেই নূতন পরিচয়ের অপরিসীম আনন্দের কথা কল্পনা করিয়া আজ তোমাকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাইতেছি।

বর্ত্তমান যন্ত্র-তান্ত্রিক সভ্যতার যুগে পরিত্যক্ত, উপেক্ষিত পল্লীর শ্রীহীনতা নিদারুণ হইয়া উঠিয়াছে। মনে হয় ভগবান্‌ও বুঝি পল্লীগুলিকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই নিষ্ফলতার মধ্যে একমাত্র তুমিই স্মরণ করাইয়া দিয়াছ পল্লীগুলি জীর্ণ পাতার মত প্রাণহীন আবর্জ্জনা নহে, জাতীয় জীবনের দিক্ হইতে ইহাদের একটি বিশেষ মূল্য আছে। নৈরাশ্যের ঘনান্ধকারে আমরা যেন নিজেদের হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম, তোমার অমৃতময় করস্পর্শে আমরা আবার নিজেদের ফিরিয়া পাইয়াছি। আমাদের সম্মুখে তুমি অনন্ত সম্ভাবনার দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিয়াছ। আমাদের অন্তরের গভীরতম কৃতজ্ঞতা তুমি গ্রহণ কর।

তোমাকে যে সংবর্দ্ধনা করিতেছি তাহার শেষ এইখানেই নয় ; আমাদের পরবর্ত্তী যুগে যাহারা আসিবে তাহারাও তোমার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিবে। তাই আমাদের পরেও যুগে যুগে এই নিভৃত পল্লীগ্রামে তোমার উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য রচিত হইবে। সেই অনাগত যুগের কথা স্মরণ করিয়া আজ তোমাকে সাদর অভিনন্দন জানাইতেছি, ইহা গ্রহণ করিয়া তুমি আমাদের ধন্য কর।

দেশের জল-বায়ু দেশের নিজস্ব সম্পদ্, দেশের কবিও জল-বায়ুর মত দেশবাসীর সহিত অবিচ্ছিন্ন সম্পর্কে বিজড়িত; তিনি: কালের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া আপন প্রভাব বিস্তার করেন। তোমার প্রভাবও এমনি করিয়া যুগে যুগে অনুভূত হইবে; জাতির জীবনে তুমি চিরন্তন সত্য হইয়া থাকিবে।

আজ আমাদের আয়োজনে অনেক ত্রুটি রহিয়া গেল, কিন্তু আমরা জানি আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিগুলি তুমি উপেক্ষা করিবে; তুমি বাহিরের আয়োজনকে বাদ দিয়া আমাদের অন্তরের ভাষাতীত ভাবকে গ্রহণ করিবে। এখানে আসিবার কষ্ট ও অসুবিধা হাসিমুখে সহ্য করিয়া তুমি আপন উদারতাই পরিচয় দিয়াছ।

ভগবানের নিকট কায়মনে প্রার্থনা করি, তুমি দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া সুস্থ দেহে তোমার কবি-প্রতিভাকে নানাভাবে বিকসিত করিয়া তোল, তোমার নব ছন্দঃ নূতন আনন্দগান বঙ্গভারতীর পূজাকে সার্থক করিয়া তুলুক। ইতি

গুণমুগ্ধ
বিষ্ণুপুরের অধিবাসিবৃন্দ

বৃহৎ নগরে বাসের সুবিধা ও অসুবিধা

বৃহৎ বৃহৎ নগরগুলিই বর্ত্তমান সভ্যতার কেন্দ্রস্থল। লণ্ডন, নিউইয়র্ক, কলিকাতা প্রভৃতি যে সমস্ত সুবৃহৎ সুসমৃদ্ধ নগর স্বীয় বিরাট ঐশ্বর্য্য ও নূতনত্বের আড়ম্বরে জগদ্‌বাসীর বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে তাহাদিগকে এই যন্ত্র-সভ্যতার বাহন বলা যাইতে পারে। সভ্যতা বিকাশের প্রথমাবস্থায় যখন মানুষ নিজ স্বল্প প্রয়োজনে সন্তুষ্ট হইয়া জীবন যাপন করিত, তখন এই সব বৃহৎ নগরের সৃষ্টি সম্ভব হয় নাই। বর্ত্তমানে নগরগুলি নানাবিধ বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও রাজনৈতিক জ্ঞানের দৃষ্টান্তস্থল হইয়া মানুষের উদ্ভাবনীশক্তি ও শিল্পচাতুর্য্যের সাক্ষ্য দিতেছে। এই বাহ্য আড়ম্বর ও ঐশ্বর্য্যের চমক আমাদিগকে চমৎকৃত করিলেও বহু চিন্তাশীল মনীষীর মতে উহা অবিমিশ্র মঙ্গলের হেতু নহে। অন্য

দেশে যাহাই হউক না কেন আমাদের ভারতবর্ষের নগরগুলির শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্রামগুলি ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে, গ্রামের সম্পদ্ হরণ করিয়া নগরকে স্ফীত করা হইতেছে।

আজকাল সকলেরই নগর-বাসের দিকে প্রবল ঝোঁক পড়িয়াছে। সরলতা ও শান্তির নিকেতন পল্লীভূমির অফুরন্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সম্ভার আজ অনাদৃত ও উপেক্ষিত; ধনী পল্লী ছাড়িয়া নগরে বাস করিতেছে। অন্নহীন দরিদ্রও অন্নের আশায় পল্লীর মায়া কাটাইতে বাধ্য হইতেছে। নাগরিক-সভ্যতার ঠাট বজায় রাখিতে হইলে প্রচুর উপার্জ্জনের প্রয়োজন; অর্থের ইন্ধন না যোগাইতে পারিলে উহার আলো পাওয়া যায় না। তাই বিংশ শতাব্দীর মানব আজ উপার্জ্জনের নেশায় ভালমন্দ ভুলিয়া নগরের দিকে ধাবিত হইতেছে।

অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে বলিয়াই এখন নগরবাসের সুবিধা ও অসুবিধার কথা আলোচনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। জীবনযাত্রার সর্ব্বপ্রধান পাথেয় যে শিক্ষা তাহার কেন্দ্রও এখন নগর। নগরের কোলাহল হইতে দূরে থাকিয়া শান্ত তপোবনের নিস্তব্ধতার সাহায্যে মনকে সংযত করিয়া ত্যাগী ও আদর্শবাদী গুরুর নিকট হইতে শিক্ষালাভের যে আদর্শ তাহা ভারতবাসী বহুদিন হইল ভুলিয়া গিয়াছে। এখন বৃহৎ নগরেই সর্ব্ববিধ শিক্ষালাভের সম্পূর্ণ সুবিধা। বিশ্ববিদ্যালয় ও তৎসংশ্লিষ্ট উচ্চশিক্ষার শিক্ষায়তনগুলি বিশেষভাবে নগরেরই শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। সুবৃহৎ সাধারণ পাঠাগারসমূহ তাহাদের জ্ঞানের ভাণ্ডার নগরবাসীর জন্যই সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমান জগতের নানাবিধ অর্থকরী ও কার্য্যকরী শিক্ষালাভ নগরবাসের দ্বারাই সম্ভবপর হইতে পারে।

বৃহৎ নগরগুলিতে ব্যবসায় ও অন্যবিধ কার্য্যোপলক্ষে নানা দেশের লোক আগমন করে। নগরে বাস করিয়া তাহাদের আকৃতি, প্রকৃতি, ভাষা প্রভৃতির প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায়; বিদেশে ভ্রমণ না করিয়াও বাহির জগতের সহিত কতকটা সুপরিচিত হওয়া যায়। নগরই বিভিন্ন জাতির মিলন স্থল। এই

মিলনের ফলে মন উদার ও গুণগ্রাহী হয়। ভিন্ন দেশবাসীদের সম্বন্ধে যে সমস্ত ভুল ধারণা থাকে তাহা তাহাদের সহিত ভাব-বিনিময়ের ফলে ক্রমে ক্রমে দূর হইয়া যায়।

উন্নত ধরণের চিকিৎসা-প্রণালীর আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ রোগের সুচিকিৎসার জন্য নগর-বাস অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। দেশের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণ নগরেই অবস্থান করেন। তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ও চিকিৎসা-নৈপুণ্যের সুযোগ গ্রহণ করিতে হইলে নগরে আসিয়াই তাঁহাদের দ্বারস্থ হইতে হয়। এতদ্ব্যতীত সুপরিচালিত হাঁসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয় পল্লীগ্রামে দুর্লভ।

নগরগুলির অন্যতম প্রধান আকর্ষণ আমোদ-প্রমোদ। নাট্যশালা, চলচ্চিত্র প্রভৃতির সম্বন্ধে যতই বিরুদ্ধ সমালোচনা হউক না কেন, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে তাহারা ক্ষেত্রবিশেষে সুপরিচালিত হইয়া শিক্ষা ও আনন্দ উভয়ই প্রদান করিতেছে। ইহা ছাড়া নানা প্রকার প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়া-কৌতুক, যানবাহনের নূতনত্ব ও সুবিধা এবং সর্ব্বোপরি সহজ সুখময় জীবন-যাপন-প্রণালী দিন দিন নগরের আকর্ষণ বৃদ্ধি করিতেছে।

এই সব সুবিধার জন্য ধনী, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র—সকল প্রকার লোকই নগরের দিকে ঝুঁকিয়াছে। ইহা ধনীর বিলাস-আগার, দরিদ্রের অন্ন-সংস্থানের মূল। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী ভদ্রলোকেরও নগরই একমাত্র আশ্রয় হইয়া পড়িয়াছে।

নাগরিক জীবনের সুবিধার তুলনায় অসুবিধাও কিছু কম নহে। কবির চক্ষে নগরের প্রকৃত রূপ—'ইটের উপরে ইট, তাহাতে মানুষ কীট।' এই সৌধ-কানন ভেদ করিয়া স্বাস্থ্যপ্রদ প্রাণস্বরূপ সূর্য্যালোক অতি অল্প স্থানেই ঠিকমত পৌঁছিতে পারে। উহার অভাবে বহু গৃহের নিম্নতল চিরকাল আর্দ্র ও অন্ধকারময় থাকিয়া যায় এবং বহু রোগের বীজ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়া মহামারী সৃষ্টি করে। উপযুক্ত উপার্জ্জনে অক্ষম বহু দরিদ্র ব্যক্তি

অর্থাভাববশতঃ বাধ্য হইয়া ঐরূপ গৃহে বাস করিয়া অকালে ভবলীলা সংবরণ করে। পুরুষেরা দিবসের অধিকাংশ সময় বাহিরে যাপন করিয়া হয়ত কোনরূপে স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে সমর্থ হয়—কিন্তু রমণীরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা দিনের পর দিন ঐরূপ স্থানে বাস করিয়া যৌবনেই বার্দ্ধক্যের পোষাক পরিয়া মৃত্যুর অভিমুখে অগ্রসর হন।

স্বাস্থ্যরক্ষার দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু বিশুদ্ধ বায়ুও নগরে বিশেষ দুর্লভ। প্রাচীরের পর প্রাচীর সগর্ব্বে দণ্ডায়মান হইয়া পবনের গতি পদে পদে প্রতিহত করে। নগরের বায়ু সর্ব্বদাই ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া থাকে; উপরন্তু শীতকালে সহস্র গৃহ হইতে উত্থিত ধূমরাশি উচ্চ বায়ুস্তরে গমনে অসমর্থ হইয়া জীবন্ত নগরের উপর যেন মৃত্যুর যবনিকা টানিয়া দেয়। বিশুদ্ধ খাদ্যের অভাব নগর-সমূহে বিশেষভাবে অনুভূত হইয়া থাকে। টাটকা মাছ ও শাকসব্জী বিশেষ দুর্মূল্য, বিশুদ্ধ দুগ্ধ বা ঘৃত দুষ্প্রাপ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পক্ষান্তরে রসনাতৃপ্তিকর বহু অখাদ্য ও কুখাদ্য বস্তুর প্রাচুর্য্য নগরবাসীর স্বাস্থ্যভঙ্গের হেতু হয়।

নগরবাসীকে দেখিয়া মনে হয় সে যেন অকালে মাতৃক্রোড়ভ্রষ্ট অসহায় শিশু। ঘন দূর্ব্বাদলের শ্যামলিমা, মুক্ত আয়ুষ্কর বায়ু, পত্রের মর্ম্মধ্বনি, পক্ষীর কূজন, বিমল চন্দ্রালোক—এই সকল হইতে সে চির-বঞ্চিত। পল্লীমাতার বক্ষভরা মধুময় স্নেহ হারাইয়া সে ভ্রান্ত মৃগের ন্যায় সুখ-মরীচিকার পিছনে ছুটিয়া ছুটিয়া অবশেষে ক্লান্ত হইয়া মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়ে! অন্তরের সৌন্দর্য্য হারাইয়া সে বেশভূষা দ্বারা নিজের দীনতা ঢাকিবার চেষ্টা করে। আড়ম্বর-প্রিয়তা বিলাসিতা প্রভৃতি দোষগুলি তাহার চরিত্রের অঙ্গ হইয়া পড়ে, মন সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়। মানুষ মানুষকে ভালবাসে না বা বিশ্বাস করে না। একের বিপদ্ দেখিয়া অপরে উপেক্ষার হাসি হাসিয়া চলিয়া যায়। এক গৃহে বাস করিয়াও একে অপরের সহিত পরিচয়ের প্রয়োজন অনুভব করে না। কৃত্রিমতার জাল বুনিয়া নগরবাসী তাহার মধ্যে উর্ণনাভের মত বাস করে এবং অবশেষে নিজের জালে নিজেই জড়াইয়া মরে।

তোমার প্রিয় কবি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে লোক যেন আর ধরিতেছে না। বহু পরিশ্রমে একটি কোণে সামান্য একটু জায়গায় কোন মতে দাঁড়াইয়াছি। জনতার চাপে নিশ্বাস ফেলিতেও যেন কষ্ট বোধ হইতেছে। তবুও একটা উত্তেজনার জন্য এসব কিছুই গায়ে লাগিতেছে না। সকলেরই উৎসুক দৃষ্টি দরজার দিকে নিবদ্ধ। আর কতক্ষণ এমনি করিয়া থাকিতে হইবে; প্রতি মুহূর্ত্তটি যেন নিশ্চল পাথরের মত স্থির হইয়া রহিয়াছে। হঠাৎ সকলের কলধ্বনি থামিয়া গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলর এবং কয়জন অধ্যাপক ও ভদ্রমহিলার সঙ্গে যে পুরুষপ্রবর হলে প্রবেশ করিলেন তিনিই হইতেছেন রবীন্দ্রনাথ। বার্দ্ধক্যের ভারে দেহ নুইয়া পড়িয়াছে; শুভ্র কেশ ও শ্মশ্রু, প্রশস্ত ললাট, সুগঠিত নাসিকা, দেহের রং উজ্জ্বল গৌরবর্ণ এবং সব কিছুকে ছাপিয়া চোখে মুখে লোকোত্তর প্রতিভার দীপ্তি বিরাজমান। রবীন্দ্রনাথ 'গান্ধারীর আবেদন' আবৃত্তি করিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব কণ্ঠস্বরে শ্রোতৃবৃন্দের প্রাণ-মন উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

রবীন্দ্রনাথের সহিত কবে পরিচয় ঘটিয়াছে তাহা স্মরণ নাই। বর্ণমালার সহিত পরিচিত হইবারও আগে প্রিয়জনের মুখে তাঁহার কবিতা শুনিয়া তাঁহার সহিত পরোক্ষ পরিচয় ঘটিয়াছিল। রূপকথা ও ছেলে-ভুলানো ছড়ার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ অলক্ষ্যে শিশুর হৃদয়ে আপন আসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তারপরে পড়িতে শিখিয়াই তাঁহার কবিতা সময়ে অসময়ে পাঠ করিয়াছি, আবৃত্তি করিয়াছি। কবিতার রসোপলব্ধি করিবার সময় তখনও হয় নাই, কিন্তু তবুও রবীন্দ্রনাথের কবিতা ভাল লাগিত। যেমন একদিন তাঁহার সমগ্র মগ্ন চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করিয়া জল পড়িয়াছিল ও পাতা নড়িয়াছিল ঠিক তেমনি করিয়াই একদিন তাঁহার 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর' টুপুর কবিতার ছন্দোলালিত্য ও একটা অবর্ণনীয় অস্পষ্ট ভাব বালক পাঠককে কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। এই ভাবে ঋতুচক্রের সহিত রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটি যোগ-স্থাপন হয়।

তাঁহার কবিতা যেন বর্ষা-শরৎ-বসন্তকে পরম উপভোগ্য করিয়া তুলিত। তিনি যেন অন্তরের অন্তঃপুরে থাকিয়া আনন্দবোধকে জাগ্রত করিয়া রাখিতেন। তাঁহার কবিতা পাঠ করিয়া মন-প্রাণ 'শুধু অকারণ পুলকে' উল্লসিত হইয়া উঠিত।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কবিতা আরও ভাল লাগিয়াছে। এ ভাল লাগাকে বিশ্লেষণ করা কঠিন, কেননা তাঁহার কাব্য-প্রতিভা আজ পর্য্যন্ত বিচার-ক্ষমতাকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ কেবল হিমালয়ের কথাই মনে করাইয়া দেন—'অনন্তরত্নপ্রভবস্য যস্য'। সেই অনন্ত রত্নের মাত্র দুই চারিটির উল্লেখ করাই সম্ভব।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথের 'জনগন-মন-অধিনায়ক' ও 'দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী' আবালবৃদ্ধবনিতার সমধিক প্রিয় স্বদেশী সঙ্গীত। এই দুইটি গানের ভিতর দিয়া দেশপ্রেম যে ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতে দেশদ্রোহীর হৃদয়েও দেশপ্রেমের সঞ্চার না হইয়া পারে না। ইহা ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সঙ্গীত বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনকে কতটা সমৃদ্ধ করিয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

বিভিন্ন ঋতুর উদ্দেশ্যে রচিত তাঁহার কবিতা ও গানগুলি বাঙ্গালীর মন কি ভাবে অধিকার করিয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। ছন্দঃ, ভাব ও ভাষার দিক্ হইতে তিনি যে অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা উপলব্ধি করিয়া কেবল বিস্মিতই হইতে হয়; সে বিস্ময়কে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কেবল কবিতা নহে গানেও তিনি সকলের উর্দ্ধে আপনার আসন স্থাপনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ সুরস্রষ্টা; তাঁহার গীতি-কবিতাগুলি ভাব, ভাষা ও সুরের সংমিশ্রণে অতুলনীয়। বস্তুতঃ তিনিই প্রথম দেখাইয়াছেন—গান কেবলমাত্র সুরসর্ব্বস্ব নহে, শ্রেষ্ঠ গানের ভিতরে শ্রেষ্ঠ কবিতারও যাবতীয় উপাদান অনায়াসে থাকিতে পারে। অন্য দিক্ বাদ দিলেও একমাত্র গীতি-কবিতার দিক্ হইতে রবীন্দ্রনাথ চিরদিন শ্রেষ্ঠ কবির সম্মান লাভ করিবেন। ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে, রবীন্দ্রনাথের গীতি-কবিতার

সংখ্যা যে কোন দেশের যে কোন যুগের সকল কবির গীতি-কবিতার সংখ্যা অপেক্ষা অনেক বেশী।

উচ্চ ভাবের দিক্ হইতে রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক। 'কথা ও কাহিনী'র সমকক্ষ হইতে পারে এমন কবিতা বাঙ্গলায় অন্য কেহ অদ্যাবধি রচনা করেন নাই; অন্য ভাষায়ও এরূপ কবিতার সংখ্যা হয়ত বেশী হইবে না। হাস্যরসের কবিতা হিসাবে 'জুতা আবিষ্কার', 'হিং টিং ছট্' প্রভৃতি সমান উপভোগ্য রহিবে। 'শিশু' ও 'শিশু ভোলানাথে'র কবিতাবলী ভাববৈচিত্র্যে ও রসমাধুর্য্যে অতুলনীয়। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের উপরে তাঁহার কবিতা সকল দেশের সকল কালের 'এলিজি'কে হার মানাইয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যগ্রন্থ যদি বিলুপ্ত হইয়া যায় তবুও তিনি এই কবিতাটির ভিতর দিয়াই অমর হইয়া থাকিবেন। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতার সংখ্যা বেশী না হইলেও যে কয়টি আছে তাহাদের ভাবের গভীরতা ও ছন্দের বৈচিত্র্য চিরবিস্ময়ের বস্তু।

রবীন্দ্রনাথ যাহাতে হাত দিয়াছেন তাহাই যেন নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে। তাঁহার করস্পর্শে 'মৌন মাটির মর্ম্মের গান' ধ্বনিয়া উঠিয়াছে, তাজমহল সৌন্দর্য্যের দূতরূপে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে, রেখার বন্ধনে আবদ্ধ ছবি প্রাণ লাভ করিয়াছে, নদী নূতন বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়াছে, পৃথিবী স্বর্গ হইতেও অধিকতর সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। 'যেতে নাহি দিব' কবিতা পাঠকের হৃদয়কে অব্যক্ত বেদনায় ভরিয়া তুলে; সে বেদনা তাহার দৃষ্টিকে প্রসারিত করিয়া দেয়। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটি পাঠককে আপন সঙ্কীর্ণ পরিধির বাহিরে উন্মুক্ত অম্বরতলে বিরাট জনতার মাঝখানে লইয়া যায়। মৃত্যুকে তিনি শ্যামরূপে কল্পনা করিয়াছেন। অন্য কবিদের কাছে মৃত্যু বিভীষিকাময়; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে মৃত্যু সুন্দর অপরূপ, মৃত্যুর ভিতরে তিনি দেখিয়াছেন একটি বৃহত্তর পরিণতির ইঙ্গিত।

রবীন্দ্রনাথ যেন বিশ্বপ্রকৃতির সহিত এক হইয়া রহিয়াছেন; আজ তাঁহাকে বাদ দিয়া কবিতা বা সৌন্দর্য্যোপলব্ধি সম্ভব নহে। কেবল কবিতাই নহে, কি

গল্প, কি উপন্যাস, কি নাটক, কি প্রবন্ধ সকল ক্ষেত্রেই কবি রবীন্দ্রনাথ আমাদের সারাটা হৃদয় জুড়িয়া বসিয়া আছেন। পৃথিবী যেমন অফুরন্ত প্রাণের রসে পরিপূর্ণ, জীবন ধারণের জন্য তাহার শরণ না লইলে চলে না; রবীন্দ্রনাথ তেমনি কাব্য-রসের আধার, তাঁহার কবিতা ব্যতীত জীবন-ধারণ করা অসম্ভব। জীবনে কবিতার মূল্য অত্যন্ত বেশী ;—সকল কর্ম্মের পরে যে আনন্দ আমাদের জীবনকে মধুর করিয়া তোলে তাহাই রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থের পৃষ্ঠায় আমাদের অবসরের প্রতীক্ষায় উন্মুক্ত হইয়া রহিয়াছে।

নদীর আত্মকথা

আমি একটি নদী—তোমরা আমায় 'গঙ্গা' ব'লে ডাকো। সত্যই আমি 'গঙ্গা' নামটি বড় ভালবাসি। আমাকে জটায় লুকিয়ে রেখে শিব 'গঙ্গাধর' নাম পেয়েছেন। আমার পক্ষে এটা কম গৌরবের কথা নয়; তবে দুঃখ হয়—ত্রিলোকেশ্বরের মাথায় উঠে কত না চপলতা প্রকাশ করেছি—কত না পাপ হয়েছে ওতে। আমার একটা নাম 'জাহ্নবী'। ও নামটা আমার তেমন ভাল লাগে না। একটু ছেলেমানুষী করেছিলাম ব'লে রাক্ষুসে মুনি আমায় গিলে ফেলেছিল।

ঠিক কোন্ দিনটিতে জ্ঞানের উন্মেষ হয় তা যেমন তোমরা কেউই বল্‌তে পার না তেমনি আমিও পারি না। এখন ঠিক ক'রে বলা অসম্ভব—কবে, কেমন ক'রে আমি বড় হ'য়ে তোমাদের মাঝখানে এসে পড়েছি, আর কি ক'রেই বা তোমাদের এত পরিচিত হ'য়েছি। তবে শৈশবের স্মৃতি মনের কোণে মাঝে মাঝে অস্পষ্ট হ'য়ে ফুটে ওঠে। মনে হয় কত যুগ আগে আমি যেন কোন তুষারের রাজ্যে একা একা আপন মনে ঘুরে বেড়াতাম ;—শীতের দিনে কুঁকড়ে কুঁকড়ে চলাফেরা কর্‌তাম, কখনও বা একটু আধটু খেলা কর্‌বার লোভ হ'তো। যখন একটু গরম পড়্‌তো তখন একটু একটু ক'রে ভয়ে ভয়ে এগিয়ে আস্‌তাম সাম্‌নে কি আছে দেখ্‌বো ব'লে; বাহির বিশ্বের সঙ্গে পরিচিত হবার একটা

তীব্র আকাঙ্ক্ষা আমার মনে জেগে উঠ্‌তো। কিন্তু বড় বড় পাহাড়গুলো পথ রোধ ক'রে দাঁড়িয়ে ধমক দিয়ে বল্‌তো—অতটুকু মেয়ে যাচ্ছিস্‌ কোথা? ভয় পেয়ে থ'ম্‌কে দাঁড়াতাম, কিন্তু বহির্জগতের বিরাট জীবনধারার বিচিত্র কোলাহল আমাকে নিরন্তর আহ্বান করতো। তাই পাহাড়গুলোর পাশ কাটিয়ে চুপি চুপি এগিয়ে যাবারই চেষ্টা করতাম।

আমার এ সাধনা বিফল হ'ল না। হঠাৎ একদিন বুঝ্‌লাম আমার শক্তি সহস্রগুণ বেড়ে গেছে। শুধু এইটাই বুঝতে পারি না কতদিন আমি সেই তুষারের দেশে কাটিয়েছি আর ঠিক কোন্‌ দিনটিতে কেমন ক'রে আমি শক্তির প্রাচুর্য্যে ছুট্‌তে সুরু করেছি তোমাদের দিকে। তোমরা বল ভগীরথ তপস্যা ক'রে আমায় নিয়ে এসেছেন কিন্তু আমার তো মনে হয় আমারই তপস্যায় তুষ্ট হ'য়ে কোন মহাপুরুষ হঠাৎ একদিন আমাকে পাষাণকারা চূর্ণ ক'রে উদ্দামবেগে ছুটে চল্‌বার শক্তি দিয়েছিলেন। যাই হোক তখনকার সে উত্তেজনা জীবনে কোন দিন ভুল্‌বো না। কত বাধা এল, কিন্তু কেউ সেদিন আমার সাম্‌নে দাঁড়াতে পার্‌লো না। বড় বড় পাহাড়গুলোকে ধাক্কা মেরে তাদের মাথায় পা দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে চল্‌লাম, আমার মুখ দিয়ে ফেনা উঠ্‌তে লাগ্‌লো, চুলগুলো পিছন দিকে উড়্‌তে লাগ্‌লো। তবু আমার শ্রান্তি এল না, এতটুকু বিচলিত হলাম না। ছোট ছোট গাছ আর লতাগুলোর কি স্পর্দ্ধা! তারা চাইল আমার পথ রোধ ক'র্‌তে! বেচারীদের দুর্ভাগ্যের কথা আর কি বল্‌ব?—দেশছাড়া হ'য়ে পাক খেতে খেতে আমার সঙ্গে তারা ছুট্‌তে থাক্‌লো। যা পায় সামনে তাই ধ'রে বাঁচতে চায় কিন্তু তাদের কোথাও দাঁড়াতে না দিয়ে টেনে নিয়ে ছুট্‌লাম। যেদিন তোমাদের মাঝখানে এসে দাঁড়ালাম, সেইদিন কেন জানি না, আমি কেমন একরকম হ'য়ে গেলাম। মনে এই প্রশ্নের উদয় হ'লো—জীবন কি? কিসের জন্য আমার জন্ম? কিসের জন্য সংসারে আমার অস্তিত্ব? স্থির হ'য়ে ভাব্‌লাম—ভাব্‌তে ভাব্‌তে তন্ময় হ'য়ে গেছি এমন সময় শুন্‌তে পেলাম নিখিল বিশ্ব যেন সঙ্গীতের ঝঙ্কারে ব'লে উঠ্‌লো—বেঁচে থাকা পরের জন্য, জীবের সেবার জন্যই অস্তিত্ব; পরোপকারে যে জীবন উৎসর্গ করতে

পারে, জীবনান্তে বিশ্বপতির ক্রোড়ে সেই স্থান পায়। সেদিন থেকেই আমার পরিবর্ত্তন হয়েছে, আমার ভীষণতা দূর হয়েছে। সেদিন থেকেই আমি দু'হাতে তোমাদের অন্ন বিতরণের চেষ্টা ক'রে আস্‌ছি। জানি না—অসীমের বুকে আমার স্থান হবে কিনা।

জনসেবাই ভগবৎসেবা

মানুষের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যুগে যুগে এক একজন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং মানুষকে ভাই বলিয়া ভালবাসিবার শিক্ষা দিয়াছেন। জেরুজালেমের দেবশিশু মানুষকে ভালবাসিয়া নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। কপিলবস্তুর রাজকুমার জীবের দুঃখে ব্যথিত হইয়া পথের ধূলি বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। শচীর দুলাল সোনার অঙ্গে ধূলি মাখিয়া আচণ্ডাল সকলকেই অসীম প্রেমে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। নান্নরের কবির কণ্ঠ হইতে ঝঙ্কৃত হইয়াছিল—

"শুনহ মানুষ ভাই—
সবার উপরে মানুষ সত্য,
তাহার উপরে নাই।"

এই সেদিনও দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতলে শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃতময়ী বাণী এই প্রেমমন্ত্রে বিশ্বকে নূতন প্রেরণা দিয়াছিল। তাঁহার দিগ্বিজয়ী শিষ্যের কণ্ঠ হইতে উদাত্ত গম্ভীর স্বরে উৎসারিত হইয়াছিল,—"Put off to the next life the reading of Vedanta, the practice of meditation. Let the body be consecrated to the service of others." যে মানুষের বিবেক তাহাকে অহরহঃ মহৎ হইবার অনুপ্রেরণা দিতেছে সেই মানুষই কেমন করিয়া নিষ্ঠুর হয়, হৃদয়হীনতায় হিংস্র পশুকেও পরাভূত করে তাহা ভাবিতেও বিস্ময় বোধ হয়। এ কাহার নিষ্ঠুর পরিহাস!

আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাই সে সমস্তই এক বিরাট শক্তি দ্বারা সৃষ্ট।

তাহাকেই আমরা ঈশ্বর বলিয়া পূজা করি। তিনিই সকলের পিতা। আমরা সকলেই সেই এক পিতার সন্তান। তাই আমরা সকলেই ভাই—মানুষ মানুষের ভাই। ভাইয়ের সহিত কলহ করিতে যেমন আমরা অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে একটি নিষেধ-বাণী শুনিতে পাই, যে কোন মানুষের সহিত কলহ করিতে—যে কোন মানুষকে ঘৃণা করিতে আমরা তেমনই নিষিদ্ধ হইব, যদি ঈশ্বরের প্রতি আমাদের কিছু মাত্র বিশ্বাস থাকে, যদি আমরা বিশ্বপিতার ভ্রূকুটি উপেক্ষা করিবার দুঃসাহসকে মনের মধ্যে স্থান না দিই।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর বিরাজ করেন। যখন মানুষকে ঘৃণা করি তখন তাহার হৃদয়-শতদলে যিনি অবস্থান করিতেছেন তাঁহাকেই ঘৃণা করা হয়। কবি সত্যই বলিয়াছেন,—

"মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।"

নরই নারায়ণ ; নরের গ্লানিতে নারায়ণই ক্ষুণ্ণ হন। কুষ্ঠ রোগীর গলিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখিয়া যখন আমরা নাসিকা কুঞ্চিত করি তখন কুষ্ঠরোগীর অন্তরবাসী ভগবান্ই অপমানিত হন। ক্রোধে ঘৃণায় তিনিই আমাদের দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া লন। সুতরাং যদি আমরা ভগবান্কে ভালবাসিতে চাই তাহা হইলে তাঁহার সৃষ্টিকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে হইবে। যে ব্যক্তি সৃষ্টিকে উপেক্ষা করিয়া স্রষ্টার প্রসাদ লাভ করিতে ইচ্ছুক সহস্র জীবনের তপস্যাতেও সে সফল হইতে পারে না। সংসার হইতে যিনি যতদূরে সরিয়া যান বিধাতার আশীর্ব্বাদও তাঁহার উপর ঠিক ততখানিই কমিয়া যায়। অতএব এ সংসারের মধ্যে থাকিয়া মানুষকে ভালবাসিতে হইবে, প্রত্যেক মানুষের দুঃখকে নিজের দুঃখ বলিয়া মনে করিতে হইবে। নগ্ন, বুভুক্ষু, রুগ্ণ, আর্ত্ত সকল মানুষকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিতে হইবে। যে ব্যক্তি বিশ্বকে ভাই বলিয়া বক্ষে স্থান দিতে পারে সে এক অপার্থিব বিমল আনন্দের অধিকারী হয়। সেই আনন্দই যথার্থ আনন্দ, সে আনন্দে অবসাদ নাই, তাহা কল্যাণের প্রাচুর্য্যে ভরপুর। সে আনন্দই ঈশ্বরের স্বরূপ। মানুষ যখন সেই আনন্দের আস্বাদ পায় তখন তাহার আর চাহিবার

কিছু থাকে না, তাহাকে প্রলুব্ধ করিবার শক্তি কাহারও আর থাকে না। সত্য-শিব-সুন্দরের স্পর্শে তাহার জীবন ধন্য হইয়া যায়।

সকল দেশেই এমন কতকগুলি 'ধর্ম্মধ্বজী' ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহারা মনে করেন মানুষের অবমাননা করিয়া মনুষ্যত্বের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া শুধু ধর্ম্মানুষ্ঠানগুলি সুসম্পন্ন করিলেই ভগবান্ সন্তুষ্ট হন। এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা অনেক সময় সমাজের অসহায় ও বিপন্ন ব্যক্তিগণের প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হন। এমন কি মানুষের অন্তরদেবতাকে অবমানিত করিয়া কেবল আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মের পালন করিয়া আপনাদিগকে ধার্ম্মিক মনে করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। মানবতার বৃহত্তর ও পূর্ণতর রূপ এই প্রকার প্রাণহীন ধর্ম্মানুষ্ঠানের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। দিকে দিকে যে ব্যথিতের আর্ত্তনাদ দিঙ্‌মণ্ডল আকুল করিয়া তুলিতেছে, তাহার প্রতি সমবেদনাপূর্ণ অনুভূতি ও মানুষের অন্তরস্থিত দেবতার প্রতি শ্রদ্ধানুরঞ্জিত চিত্তের সেবার ভিতর দিয়া ভগবৎসেবার নূতন রূপ আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

একজন মহাপুরুষ

আজ যখন পাশ্চাত্ত্য ভাবধারায় ভারতীয় চরিত্রে এক মহাপ্লাবন আরম্ভ হইয়াছে, ভারতের শান্ত সামগান-মুখর তপোবন ভোগবিলাসের লীলা-নিকেতনে পরিণত হইয়াছে, ত্যাগ যাহাদের বহু শতাব্দীর শিক্ষা ও সংস্কার—তাহারা বিলাসিতায় নিমজ্জিত হইয়া নিত্য নূতন অভাবের সৃষ্টি করিয়া দ্রুতগতিতে ধ্বংসের পথে নামিয়া যাইতেছে, তখন ত্যাগের প্রতিমূর্ত্তি, ভারতীয় শিক্ষার মূর্ত্ত প্রতীক 'বুনো রামনাথ'কেই মনে পড়ে। প্রাচীন ভারতের আলোচনা বিস্মৃতপ্রায় ইতিহাসের আলোচনার মতই নিষ্ফল। জনসাধারণ সে আলোচনায় গৌরব বোধ করিলেও উহা হইতে বর্ত্তমান যুগের উপযোগী আদর্শ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। সকলেরই মনে স্পষ্টভাবেই হউক আর অস্পষ্টভাবেই হউক, এই ধারণা পুষ্ট হয় যে প্রাচীন ভারতের সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা এ যুগে হাস্য-কর। কিন্তু বুনো রামনাথের চরিত্র আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি এ

রামনাথ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থানলাভ করেন নাই, গবেষণাগৃহের মধ্যেও আবদ্ধ থাকেন না, তিনি আমাদের বিশেষ পরিচিত। এখনও যেন আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই—সেই সরলপ্রাণ সদাপ্রফুল্ল ব্রাহ্মণ বৃক্ষতলে বসিয়া অধ্যাপনা করিতেছেন, তাঁহার চরণতলে রাজার ঐশ্বর্য্য লুণ্ঠিত হইয়া তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য কাতরভাবে প্রার্থনা করিতেছে, কিন্তু নিষ্কাম ব্রাহ্মণ সে দিকে মনোনিবেশ না করিয়া ন্যায়ের প্রশ্নের সমাধানেই তন্ময় রহিয়াছেন।

যে সময়ে রামনাথের জন্ম হয় সেই শুভযুগে বাঙ্গলাদেশে শ্রীকান্ত বিদ্যালঙ্কার, মধুসূদন ন্যায়ালঙ্কার প্রমুখ বহু খ্যাতনামা পণ্ডিতের আবির্ভাব হইয়াছিল। রামনাথ দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। কিন্তু বাধা-বিঘ্ন যেমন নদীর বেগকে ভীষণতর করিয়া দেয় দারিদ্র্যও সেইরূপ রামনাথকে অধিকতর দৃঢ়তা ও আত্ম-বিশ্বাস দান করিয়াছিল। আঘাতে আঘাতে তাঁহার হৃদয়-শতদল বিকশিত হইয়া উঠিল। অপূর্ব্ব আলোকচ্ছটায় সকল অজ্ঞান দূরীভূত হইল। অসাধারণ প্রতিভাবলে রামনাথ পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি লাভ করিলেন। তৎকালীন সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িকের নিকট হইতে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া নিজের মৌলিকতার গুণে তিনি উক্ত শাস্ত্রে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া 'তর্কসিদ্ধান্ত' উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। সে যুগে সকল পণ্ডিতই রাজদত্ত বৃত্তি লইয়া চতুষ্পাঠী স্থাপন করিতেন। কিন্তু রামনাথ তাহা করিলেন না। রাজদত্ত সাহায্য লইতে অস্বীকৃত হইয়া তিনি নবদ্বীপের নিকটস্থ এক বনখণ্ডে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এইজন্য লোকে তাঁহাকে 'বুনো রামনাথ' বলিত।

অল্পদিনের মধ্যে রামনাথের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও চরিত্র-মাধুর্য্যের কথা চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। নবদ্বীপাধিপতি রাজা শিবচন্দ্র রামনাথের খ্যাতি শ্রবণ করিয়া একদিন তাঁহার পর্ণকুটীরে উপস্থিত হইলেন। শাস্ত্র-চিন্তায় নিমগ্ন রামনাথ প্রথমে রাজাকে লক্ষ্য করেন নাই, পরে যথারীতি অভ্যর্থনা করিয়া রাজার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা তাঁহার ব্যবহারে পরম প্রীতি লাভ করিয়া এবং তাঁহার দারিদ্র্য দুঃখ দেখিয়া কিছু দান করিবার মানসে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কিছু অনুপপত্তি আছে কি?" কিছুক্ষণ চিন্তা

করিয়া রামনাথ বলিলেন, "মহারাজ, আমি চারিখণ্ড চিন্তামণি শাস্ত্রের উপপত্তি করিয়াছি, এখন আর কিছু অনুপপত্তি ত দেখিতেছি না।" উত্তর শুনিয়া রাজা স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। আত্মভোলা স্বার্থশূন্য ব্রাহ্মণে রাজা দেবত্বের ভাব উপলব্ধি করিয়া পুলকিত হইলেন। রাজা তথাপি অর্থসাহায্য করিতে চাহিলেন কিন্তু নিস্পৃহ ব্রাহ্মণ এবং তাঁহার যোগ্য সহধর্ম্মিণী এ দান গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না।

এক সময়ে কলিকাতায় রাজা নবকৃষ্ণের বাটীতে একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের শুভাগমন হইয়াছিল। এই উপলক্ষে শাস্ত্রচর্চ্চার জন্য এক বিরাট সভা আহূত হয়। ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, নবদ্বীপের শিবনাথ বাচস্পতি প্রভৃতি বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ ঐ সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। দিগ্বিজয়ীর প্রশ্নের উত্তর দিতে কেহই সমর্থ হইলেন না। তখন রামনাথকে আহ্বান করা হইল। দিগ্বিজয়ীর দম্ভ বনবাসীর পাণ্ডিত্যের নিকট চূর্ণ হইয়া গেল। এইবার রামনাথের দিকে কলিকাতাবাসী ধনিবৃন্দের দৃষ্টি পড়িল। রামনাথ দেখিলেন প্রলোভন তাঁহাকে গ্রাস করিতে চাহিতেছে। তখন তিনি সকলের অনুরোধ ধীরচিত্তে উপেক্ষা করিয়া প্রলোভনপূর্ণ কলিকাতা নগরী ও তাহার ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া শান্ত বনকুটীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই লোক যদি 'বুনো', তবে সভ্য কে?

রাজসিকতার গর্ব্বে অন্ধ, ভোগবিলাসিতার সমুদ্রে নিমজ্জিত, আত্মমর্য্যাদা-বোধহীন পরানুকরণপ্রিয় জাতি এই মহাপুরুষের আদর্শ গ্রহণ করিলে বর্ত্তমানের এই দুর্দ্দশা অনেকখানি হ্রাস পাইতে পারে; অধঃপতিত জাতি আবার লুপ্ত গৌরব, নষ্ট বৈশিষ্ট্য ফিরিয়া পায়।

গৃহের শিক্ষা

মানবশিশুর প্রথম জ্ঞানোন্মেষের পর হইতেই শিক্ষা আরম্ভ হইয়া যায় এবং প্রথম শিক্ষালয় পরিবার। পিতা মাতা ভাই ভগিনী প্রভৃতির সুসংযত অনুকরণের মধ্য দিয়া বালক বা বালিকা যে শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে তাহাই তাহার সমস্ত জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা গভীর রেখাপাত করিয়া থাকে। জাতিগঠনে সুমাতার

প্রয়োজন যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক একথা আমরা বলিয়া থাকি। মাতার শিক্ষা বালক বা বালিকার চরিত্র ও জীবন গঠনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ হয় বলিয়া আমরা সুমাতার প্রয়োজন অনুভব করি। অবশ্য পরিবারের মধ্যে আমাদের যে শিক্ষা আরম্ভ হয় তাহা শুধু মাতার নিকট হইতেই প্রাপ্ত শিক্ষা নহে, ভাই-ভগিনী পরিবারস্থ গুরুজনবৃন্দ সকলেই বালককে সমবেদনা, দয়া, গুরুজনের আদেশ প্রতিপালন, গৃহকার্য্য প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল শিক্ষা প্রদান করেন তাহা হইতেই বালক-বালিকাগণ মানুষের প্রাথমিক বৃত্তি ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করে এবং এই শিক্ষা আজীবন স্থায়ী হয়।

বাড়ী হইতে আমরা কি কি শিক্ষালাভ করি তাহার একটি সুনির্দ্দিষ্ট তালিকা নানা কারণে দেওয়া সম্ভবপর নহে। প্রধানতঃ, নানা দেশের নানা পরিবার বিভিন্ন প্রকার সামাজিক ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বাল্যকালীন শিক্ষাও সকল দেশের মাতাপিতা একপ্রকার দেন না। দ্বিতীয়তঃ, পরবর্ত্তী জীবনে পরিবারের বয়ঃস্থ সভ্য হিসাবে চলিবার পদ্ধতি ও শিষ্টাচার প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকারের। পাশ্চাত্ত্য দেশে সমগ্র পরিবার একান্নবর্ত্তী নহে, সেখানকার শিক্ষাধারা অন্য প্রকারের। আমাদের দেশেও পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে পরিবারের শিক্ষাধারা যেরূপ ছিল বর্ত্তমানে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু এই সকল বিভিন্নতা সত্ত্বেও স্নেহ-মমতা ভালবাসা, বিপদে সাহায্য, আনন্দ-উৎসবে একত্র হইয়া এক সঙ্গে কাজ করা প্রভৃতির মধ্য দিয়া সকল দেশের সকল যুগের লোকই বাড়ী হইতে মানুষ হিসাবে প্রাথমিক কর্ত্তব্যগুলির যে শিক্ষা অজ্ঞাতসারে লাভ করিয়া থাকে তাহা উপেক্ষণীয় নহে।

পারিবারিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য এই যে উহা কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট আইন-কানুন বা উপদেশ হইতে আরম্ভ হয় না। পরিবারস্থ সকলের চিন্তা ও ব্যক্তিত্ব অজ্ঞাতসারে অন্যান্য সকলের ভিতর সংক্রামিত হয় এবং পরস্পরের চরিত্র ও জীবনধারাকে একটি বিশিষ্ট রূপ দান করে। অথচ এই অজ্ঞাতসারে লব্ধ শিক্ষা মানুষের অন্যান্য শিক্ষা হইতে তাহাকে অনেক অধিক গভীরভাবে প্রভাবিত করে ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তাই বালকবালিকাকে সৎশিক্ষা দানের নিমিত্ত

মাতাপিতা এবং গুরুজনেরও জীবনকে সৎপথে পরিচালিত করার উপদেশ মহাজনেরা দিয়া থাকেন।

বর্ত্তমান যুগে অনেক সময় শুধু রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যেই বালকবৃন্দের সকল প্রকার শিক্ষাদানের চেষ্টা হইতেছে এবং অতি বাল্যকাল হইতে মাতাপিতা ভ্রাতাভগিনীর নিকট হইতে দূরে, বোর্ডিং স্কুলে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইতেছে। অনেক দিক্ দিয়া এই ধরণের শিক্ষা যে ভাল, একথা অস্বীকার করা চলে না, কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও আমরা বিস্মৃত হইতে পারিব না যে, অতি বাল্যকাল হইতে গৃহ হইতে দূরে থাকিলে স্নেহ-মমতা, মাতাপিতার প্রতি ভক্তি প্রভৃতি মানুষের সাধারণ কতকগুলি বৃত্তি পরিপূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করিতে পারে না এবং সেই ক্ষতি অন্যভাবে পূরণ করাও সহজসাধ্য নহে।

পরিবারের মধ্যে যদি একটি ব্যক্তি উচ্চভাব-সম্পন্ন, উন্নতচরিত্র ধার্ম্মিক এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ হন, তাহা হইলে তাঁহার চরিত্র ও ভাব গৃহের অন্যান্য সকলের উপর সংক্রামিত হয় এবং এইভাবে ক্রমশঃ গৃহের অন্যান্য ব্যক্তিগণ অজ্ঞাতসারে উন্নতভাবের শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। গৃহস্থ-জীবনের শিক্ষার বিশেষত্ব ইহাই যে উহা কঠিন কঠোরভাবে জীবনকে শুষ্ক করিয়া দেয় না, আমাদের অজ্ঞাতসারে ক্রমশঃ গৃহের উন্নতভাবের শিক্ষা, শিষ্টাচারের শিক্ষা, কর্ত্তব্যপরায়ণতার শিক্ষা আমাদের হৃদয়কে অধিকার করিয়া বসে এবং পরিশেষে আমাদিগকে জীবনের প্রাথমিক কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সজাগ করিয়া দেয়।

আমরা যখন বিদ্যালয় হইতে শিক্ষালাভ করি, সমাজ হইতেও শিক্ষালাভের চেষ্টা করি এবং এমন কি সভা-সমিতির সাহায্যে শিক্ষিত হইবার চেষ্টা করি তখন আমাদের শান্ত মঙ্গল মধুর গৃহগুলি হইতেও যে যথেষ্ট পরিমাণে জীবন-গঠনের বস্তু লাভ করিতে হইবে সেকথা যেন বিস্মৃত না হই। মানুষের প্রাথমিক কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবার যে প্রেরণা তাহা আমরা গৃহ হইতেই পাইতে পারি। স্নেহ-মমতা ভালবাসার মধ্য দিয়া যে জীবনকে সুন্দর ও প্রীতিপ্রদ করিতে পারা যায় এবং এ-বিষয়ে গৃহের প্রভাবই যে সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকর ইহা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই।

একটি দুর্ঘটনার বর্ণনা

শ্রীচরণকমলেষু—

মা, গত সপ্তাহে আপনাকে একখানা পত্র দিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার কোন উত্তর পাই নাই। বোধ হয় নানা ঝঞ্ঝাটে আপনি সময় করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু আপনার চিঠি পাইতে একদিন দেরী হইলেও বড় মন কেমন করে। কত রকম এলোমেলো চিন্তা মনের মধ্যে উদয় হয়। আমার পত্রের শীঘ্র উত্তর দিয়া চিন্তা দূর করিবেন। এত শীঘ্র আপনাকে পত্র দেওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু গতকল্য রাস্তার উপর যে দৈব দুর্ঘটনা দেখিয়াছি, তাহা আপনার নিকট বর্ণনা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। সে ঘটনা স্মরণ করিলে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

গতকল্য স্কুল হইতে ফিরিবার সময় দেখি যে বিদ্যালয়ের বাহিরে রাস্তার উপর খুব ভিড় হইয়াছে। সহরের রাস্তা, অনেক সময় লোক হুজুগে পড়িয়া খুব ভিড় করে, বিনা কারণে হয়তো একটা অন্ধের দুরবস্থা পর্য্যবেক্ষণের জন্য একশ' লোক জমিয়া যায়। আবার কোনও কোনও ফেরীওয়ালা নানাবিধ ছড়া কাটিয়া ভিড় জমায়। সময়ে সময়ে ছোট ছোট ছেলেদের রাধাকৃষ্ণ সাজাইয়া রাস্তার উপরেই ব্যবসায়ীরা রীতিমত রোজগার সুরু করিয়া দেয়। এইরূপ যাহোক একটা কিছু হইবে বলিয়াই আমি উৎসুক হইয়া ভিড় ঠেলিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, এক গণক হাত দেখিতেছে আর তাহাতেই এত ভিড়। আমিও একটু অপেক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলাম। কি কুক্ষণেই যে অপেক্ষা করিয়াছিলাম; তাহা না হইলে এ দৃশ্য আমার দেখিতে হইত না।

পথের পার্শ্বে পায়ে-চলা পথের উপর কয়েকটি বালিকা খেলা করিতেছিল; তাহাদের মধ্যে একটি নয় দশ বৎসরের বালিকা কি জানি কেন হঠাৎ দৌড়াইয়া রাস্তার দিকে গেল। পরক্ষণেই চতুর্দ্দিক্ হইতে হৈ হৈ শব্দ উঠিল। সবাই 'ধর' 'ধর' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। দেখিলাম পথের উপর

বালিকাটি উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে, আর পথের উপর রক্তের ধারা বহিয়া যাইতেছে। বালিকাটির সঙ্গীগুলি তাহার নাম করিয়া একত্রে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল এবং বোধ হয় তাহার আত্মীয়দের খবর দেওয়ার জন্য একদিকেই দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। ইত্যবসরে জনতা আসিয়া বালিকাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে, সকলেই 'জল আনো' 'বরফ আনো' 'ভিড় ছাড়ো' বলিয়া চীৎকার করিতেছে। ভিড় ছাড়া তো দূরের কথা, ভিড় ঐ চীৎকারে আরও জমিতে লাগিল। আমি তাড়াতাড়ি ভিড় ঠেলিয়া মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলাম। বরফহস্তে আমার এই চাঞ্চল্য ও আগ্রহ দেখিয়া সকলে আমাকেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, 'হ্যাঁ মশায়, আপনাদের কেউ?' সকলকেই 'হ্যাঁ না' বলিয়া সন্তুষ্ট করিয়া আমি বরফ লইয়া বালিকাটির মস্তকে ধরিলাম। দেখিলাম তাহার মস্তকে আঘাত লাগিয়াছে। তাহার কুঞ্চিত কেশরাশির কিয়দংশ নিম্নের চামড়া সমেত কঠিন চাকা লাগিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। ক্ষতস্থানে বরফ ধরিয়া রহিলাম, আর সকলে কেহ বাতাস, কেহ জল দিতে লাগিল। আর বাকি সকলে হৈ চৈ করিতে লাগিল। বালিকাটির বাড়ী নিশ্চয়ই কাছে; কারণ তৎক্ষণাৎ একজন স্ত্রীলোক উন্মাদিনীর মত ভিড় ঠেলিয়া আসিয়া বালিকাটির নিকট আছাড় খাইয়া পড়িলেন এবং বালিকাটির নাম ধরিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। আরও অনেকে আসিয়া সেই বিলাপে যোগ দিলেন।

এ্যাম্বুলান্সকে খবর দেওয়া হইয়াছিল। গাড়ীর মধ্যে বালিকাকে তুলিয়া দেওয়া হইল। রাস্তার সবাই আমাকে সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিল। আমি আর বালিকাটির এক আত্মীয় বালিকাকে হাঁসপাতালে লইয়া গেলাম। হাঁসপাতালে তাহার যথারীতি ব্যবস্থা হইয়া গেল, তবে সব কিছুই যেন প্রাণহীন ভাবে। বালিকার পিতা কোন সওদাগরী আফিসে চাকুরী করেন, তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সম্মুখে আমায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সব শেষ'? আমি তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলাম। তাঁহার আত্মীয়ও তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন। বালিকাটির জ্ঞান তখনও ফিরিয়া না আসিলেও ডাক্তারেরা অভয় দিলেন। রাত প্রায় আটটার সময় বালিকার জ্ঞান ফিরিল।

সে শুধু একবার 'মা' বলিয়া আবার অজ্ঞান হইয়া গেল। ডাক্তারের নিকট হইতে কোন ভয়ের কারণ নাই জানিয়া আমি বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

যাহা হউক, আমি আপনার কথামত রাস্তা দিয়া খুব সাবধানের সহিত চলি। গাড়ী-ঘোড়া দেখিয়া হাঁটি। এ ঘটনা আপনাকে না জানাইয়াও থাকিতে পারিলাম না। অধিক আর কি লিখিব? আপনি ও বাবা আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন। ভাই-বোনদের আমার ভালবাসা দিবেন। শীঘ্র শীঘ্র পত্র দিতে ভুলিবেন না। ইতি—

আপনার স্নেহের

শঙ্কর

আমি যদি ভারতের ভাগ্যবিধাতা হই

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষ যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক্ দিয়া নূতনভাবে গঠিত হইবার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করিতেছে, তাহা অতি অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করাইবার জন্য ভারতীয় জনসাধারণের ইচ্ছানুসারে একজন ডিক্টেটর নিয়োগ বাঞ্ছনীয় হইলে একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শক্তিশালী কর্ত্তব্যপরায়ণ নেতার প্রয়োজন হইবে। আমার উপরই যদি সে ভার আসিয়া পড়ে, আমি যদি সে কার্য্যে মনোনীত হই, তবে আমার ক্ষমতা অনুসারে দেশমাতৃকার সেবা করিবার চেষ্টা করিব, ভয়ে পিছাইয়া যাইব না।

দেশের অভাব কত দিক্ দিয়া কি পরিমাণে আছে তাহার তালিকা প্রস্তুত করা সহজসাধ্য নহে। তবে অন্নকষ্ট, প্রাথমিক শিক্ষার অভাব, পানীয় জলাভাব, সংক্রামক রোগ হইতে আত্মরক্ষার ক্ষমতার অভাব, আধুনিক উপায়ে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের অভাব আমরা সকলেই অবগত আছি এবং সকল বিষয়ে সরকার যথাসাধ্য এ দেশের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতেছেন। আমাকে ডিক্টেটর হইয়া প্রথমে সেই চেষ্টাকে সাফল্য-মণ্ডিত করিবার কার্য্যে নিয়োজিত হইতে হইবে।

সরকার-কর্ত্তৃক পরিচালিত সমিতি দ্বারা গ্রামে গ্রামে কৃষকগণকে দিয়া গ্রামের সমস্ত জমির চাষ-আবাদ করাইয়া লইব ; পরিশ্রম অনুপাতে ফসল সমস্ত গ্রামে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে। তাহাতে অল্প পরিশ্রমে অধিক কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হইবে। কৃষকের ঋণ সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া জমিদার ও মহাজনের যাহা ন্যায্য প্রাপ্য তাহা যাহাতে কৃষকেরা শোধ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতেই হইবে। জমিদার মহাজন প্রভৃতি অর্থশালী লোক যদি একসঙ্গে চটিয়া যায়, তবে ডিক্টেটরী আমাকে বেশী দিন করিতে হইবে না। কৌশলে কার্য্যোদ্ধার করিতে হইবে, সাপও মরিবে লাঠিও ভাঙিবে না। কৃষকও খাইয়া পরিয়া বাঁচিবে, জমিদার-মহাজনও ফাঁকী পড়িবে না। ভারতবর্ষের কাঁচামালগুলি হইতে কি কি প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপন্ন হইতে পারে সরকার-কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত কমিটির দ্বারা তাহার তালিকা প্রস্তুত করিয়া নগরে নগরে তাহা উৎপাদন করিবার জন্য ছোট বড় কারখানা স্থাপন করিতে হইবে। সমস্ত ভারতবর্ষে কি পরিমাণ শিক্ষিত বেকার আছে তাহার সংখ্যা মোটামুটি ভাবে লইতে হইবে এবং বিভিন্ন শিল্প-কারখানা স্থাপিত করিয়া যথাসম্ভব শিক্ষিত বেকারগণের ঐ সকল কারখানায় কাজের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

অতঃপর ভারতবর্ষের গ্রাম সকলের সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ রোধের ব্যবস্থার জন্য ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ড সকলের কর্ত্তৃপক্ষগণকে বিশেষ নির্দ্দেশ দান করিতে হইবে। দেশের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে একটু কড়া হইতেই হইবে। যে সমস্ত রোগের প্রতিষেধক ব্যবস্থা সম্ভব হইতে পারে, এইরূপ রোগের যদি বাড়াবাড়ি কোনখানে দেখা যায় তবে সেখানকার স্বাস্থ্যবিভাগের সমস্ত কর্ম্মচারীকে বরখাস্ত করিয়া নূতন লোক নিয়োগ করিব। অসাধু ব্যবসায়ীরা যাহাতে খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল না চালায় তাহার জন্য কঠোর আইন করিব। অতঃপর কৃষি ও শিল্প বিদ্যালয় অন্ততঃ প্রত্যেক জেলায় একটি করিয়া স্থাপনের ব্যবস্থা করিব। ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাবহারিক শিক্ষা যাহাতে ছাত্রগণ পায় তাহার চেষ্টা করিব। বিদ্যালয়ে হিন্দুধর্ম্ম, ইস্‌লাম-ধর্ম্ম ও খৃষ্টধর্ম্মের সাধারণ মহৎ ভাব সকল লইয়া নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিব। সর্ব্বোপরি

প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিব। এ জন্য গ্রামে গ্রামে নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করিব। মাধ্যমিক বিদ্যালয় কি উপায়ে আধুনিক ভাবে উন্নততর করা যায় তাহার জন্য শিক্ষাবিশেষজ্ঞগণের পরামর্শ লইয়া যথাসাধ্য কাজ করিব। ভারতীয় সভ্যতার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস যাহাতে প্রণীত হয় তাহার জন্য পণ্ডিতবর্গকে অনুরোধ করিব এবং সেই ইতিহাসের পাঠ ও পরীক্ষা বিদ্যালয়সমূহে বাধ্যতামূলক করিব। শারীরিক ব্যায়াম অথবা খেলাধূলা অথবা ব্রতচারী নৃত্য—যে কোন এক বিষয়ে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের যোগদান বাধ্যতামূলক করিব। সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা বিদ্যালয়সমূহে প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে।

দশ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে অশিক্ষা ও অজ্ঞতা দূর করিব, সংক্রামক রোগের প্রকোপ হ্রাস করিব, আর্থিক দুর্গতি দূর করিব, কৃষি ও শিল্পের উৎকর্ষ সাধন করিয়া দেশের উন্নতি বিধান করিব। তদন্ত করিয়া, কমিশন বসাইয়া কালহরণ করিব না, বিরাট সেবকদল গঠন করিয়া সমস্ত কাজে এক সঙ্গে হাত দিব এবং দশ বৎসরের মধ্যে নবভাবে উদ্বুদ্ধ এক মহত্তর ভারতবর্ষ সৃষ্টি করিব। জাতি গঠনের জন্য এক বিরাট অর্থভাণ্ডার খোলা হইবে, দেশের ধনবান্ লোকগণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া কাজ করিব। দশ বৎসর পরে কোনও যোগ্যতর ব্যক্তির হাতে কাজের ভার দিয়া ভারতের একজন দীন সেবকরূপে অবশিষ্ট জীবন কাটাইয়া দিব।

গ্রামের বাজার

অর্থনীতিই কোন কোন মনীষীর মতে সমাজের একমাত্র কেন্দ্রীয় ভিত্তি এবং অন্য সকল ইহার উপর প্রতিষ্ঠিত। একথা সম্পূর্ণ সত্য হউক আর না হউক অর্থ জীবনের একটি অন্যতম লক্ষ্য বস্তু এবং জীবনের এই দিক্‌টা ব্যবসায়ের কেন্দ্রসমূহে প্রতিফলিত। খাদ্য ও বস্ত্রকে জীবন উপেক্ষা করিতে পারে না, তাই সমাজস্থ সকল লোক বাজারে একত্র হন এই প্রয়োজনেরই তাড়নায়। গ্রামের

বাজার গ্রাম্যজীবনের অতি প্রয়োজনীয় বস্তুতে পূর্ণ। সেখানে আছে মাছ, আছে ডা'ল-তরকারী, আছে তেল-চিনি-মিছরি-গুড়, আছে কাপড়-গামছা ইত্যাদি। বিলাসিতার বস্তু খুব বেশী সেখানে নাই, সেখানে আছে শুধু সেইগুলি যাহা মানুষের প্রতি মুহূর্ত্তে প্রয়োজন হয়, যাহা মানুষের প্রাথমিক আবশ্যকীয় দ্রব্য। ক্রমশঃ শহরের বিলাসিতা গ্রামে সংক্রামিত হইতেছে এবং সেই সকল বিলাস-দ্রব্য গ্রামেও একটু একটু করিয়া বিস্তৃত হইতেছে।

সমৃদ্ধিশালী গ্রামসমূহে দৈনিক বাজার বসে, কিন্তু সাধারণতঃ অধিকাংশ গ্রাম্য বাজার সপ্তাহে দুই দিন তিন দিন করিয়া বসে। কোথাও কোথাও বা গ্রাম্য বাজার বা হাট সপ্তাহে একদিন করিয়া বসে। দুই একটি গ্রাম্য মুদীখানার দোকান গ্রাম্য বাজারে প্রায় সকল সময় খোলা থাকে। বাজারগুলি সাধারণতঃ নদী-তীরে অবস্থিত। কারণ তাহাতে এক গ্রামের বাজার বা হাটের দ্রব্যাদি অন্য গ্রামে নৌকা সাহায্যে লইয়া যাইবার সুবিধা হয়।

গ্রামের বাজারের দোকান-ঘরগুলি খড় বা 'কেনেস্ত্রা' টিন দিয়া তৈয়ারী। তরকারীর বাজার উন্মুক্ত মাঠের মধ্যেই অধিকাংশ সময় বসিয়া থাকে। মাছ ডা'ল নারিকেল ইত্যাদির বাজার প্রায় ঐ রকম। কুমারের আনীত দ্রব্যাদি অনেক সময় দোকান-ঘরের মধ্যে রক্ষিত হয়। প্রাচীন বিনিময়-প্রথার চিহ্ন গ্রামের বাজারে অনেক সময় দেখা যায়। যাঁহারা মধ্যবিত্ত বা জমিদার বা মহাজন শ্রেণীর লোক তাঁহারা অবশ্য টাকা পয়সা লইয়া বাজারে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে আসেন। কিন্তু কৃষক, তন্তুবায়, কামার, কুমার, তরকারী-বিক্রেতা ও জেলে প্রভৃতি তাহাদের বিক্রয়ের দ্রব্য বিক্রয় করিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যসকল কিনিয়া থাকে। ইহা অবশ্য সাক্ষাৎ বিনিময় নয়। কিন্তু বিনিময়-প্রথার কিছুটা আভাস এই সকল গ্রাম্য ব্যবসায়ীদের কার্য্যের মধ্যে পাওয়া যায়।

বাজারের গোলমালের একটি বিশেষত্ব আছে। কোন প্রকার সুস্পষ্ট শব্দ পাইবার উপায় নাই, অথচ নানা লোকের নানা প্রকার শব্দ একত্রে মিশিয়া এক অদ্ভুত শব্দ বাহির হইতে থাকে। এই শব্দটাকে আমরা 'হট্টগোল'

বলিয়া অভিহিত করি। গ্রামের বাজারের শব্দ পল্লীজীবনের শান্ত নীরবতাকে উপহাস করিয়া দূর দিগন্ত পর্য্যন্ত ধাবিত হয়। আমাদের দেশের বাজারের বিশেষতঃ গ্রামের বাজারের আর একটি বিশেষত্ব দর-কষাকষি। বাজারে দ্রব্যাদি ক্রয়ে 'ওস্তাদ' হওয়ার অর্থ হইতেছে দর-কষাকষিতে অদ্বিতীয় হওয়া।

দূর হইতে কতকগুলি চালা ঘর, কেনেস্ত্রা টিনের ঘর ও মাছ তরকারী ডাল ইত্যাদির বাজার-সম্বলিত গ্রাম্য বাজারকে দেখিতে চমৎকার। যেন তাহারা এক বিচ্ছিন্ন জগতের সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বার্থযুক্ত জীব। সেটা যেন একটা সম্পূর্ণ আলাদা জগৎ। প্রত্যেকে কি যেন একটা কাজে সাময়িকভাবে সেখানে ব্যস্ত, স্পষ্টতঃ পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে তাহারা নিজ নিজ কাজে রত, অথচ একটি উদ্দেশ্য, একটি প্রয়োজনের ঐক্যের সুর সমস্ত বাজারখানির ভিতর হইতে মুখরিতভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

গ্রামের বাজার তাহার অনাড়ম্বর মূর্ত্তি লইয়া, তাহার প্রয়োজনের তীব্রতা লইয়া, তাহার বিভিন্ন গ্রামের সহিত আদান প্রদানের প্রবৃত্তি লইয়া গ্রাম্য জীবনের একটি আবশ্যকীয় বস্তু। গ্রাম্য কুটীর-শিল্প হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক যন্ত্র-শিল্পের দ্রব্যাদি পর্য্যন্ত বুকে লইয়া গ্রামের বাজার আধুনিক ভারতের স্বরূপ প্রকাশ করিতেছে।

পরীক্ষা

পরীক্ষা ছাত্রদের নিকট বিশেষ একটি আতঙ্কের বস্তু। পরীক্ষার নামের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মনে কত বিচিত্র ভাবের উদয় হয়। সেই প্রশ্নপত্র, সেই সতর্ক প্রহরী, সেই সারা বিদ্যালয়ে একটি ভীতিপ্রদ মৌন ভাব—এরূপ কত কি তাহাদের মানসপটে পর্য্যায়ক্রমে প্রতিফলিত হয়। সাধারণতঃ পরীক্ষা বলিতে ছাত্রেরা কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর করাই বুঝে। পরীক্ষার উপযুক্ত সংজ্ঞা দেওয়া না গেলেও ইহা যে আমাদের জ্ঞানের পরিমাপ

করিবার একটি উপায়, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। তাই কতকগুলি বিষয় হইতে উপযুক্ত পরীক্ষক এমন কতকগুলি প্রশ্ন করেন যাহার উত্তরের গুণাগুণ বিচার করিয়া তিনি নিঃসন্দেহে বলিতে পারেন যে উক্ত বিষয়ে কাহার কতটুকু জ্ঞান হইল।

পরীক্ষা ও ছাত্রের মধ্যে একটি নিবিড় সম্বন্ধ রহিয়াছে। ছাত্রজীবন কতকগুলি বিভিন্ন পরীক্ষায় নিঃশেষিত হইয়া যায়। এক একটি পরীক্ষার অন্তে ছাত্রজীবনের ক্রমোন্নতি সূচনা করে। এইরূপ করিয়া কতকগুলি বিভিন্ন পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া আমরা বিভিন্ন খেতাব লাভ করিয়া থাকি এবং দেশের শিক্ষিতদের দলভুক্ত হই। পাঠশালা হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যন্ত ছাত্রদের পরীক্ষারূপ বাধা ঠেলিয়া পথ করিয়া যাইতে হয়। উন্নতির পথে এই অন্তরায় অবশ্যম্ভাবী জানিয়াই ছাত্রেরা পরীক্ষাকে এত ভয় করে। পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী হইলে ছাত্রেরা নাওয়া খাওয়া ভুলিয়া বই লইয়াই পড়িয়া থাকে। তাহাদের এই অধ্যবসায় আসন্ন পরীক্ষার আনন্দের জন্য নহে, তাহার ভয়ে। পাছে পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইতে হয় ও প্রমোশন না হয়, পাছে অভিভাবক রাগ করেন, এই ভয়ে ছাত্রেরা পরীক্ষার পূর্ব্বে এরূপ অস্বাভাবিক পরিশ্রমে ব্রতী হইয়া উঠে। এই সাময়িক উৎসাহ ও অধ্যবসায়ে ছাত্রদের বিশেষ মঙ্গল হয় না, বরং ইহাতে তাহাদের স্বাস্থ্যের হানি হয়। পরীক্ষা এইরূপে নানাভাবে ছাত্রজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ একুশ বাইশ বৎসরের মধ্যে যে কোন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন বিষয়ে 'মাষ্টার' উপাধি লইতে পারে। এই বাইশ বৎসরের জীবনের মধ্যে তাহার আঠারো বৎসর ছাত্রজীবন বলা যাইতে পারে। এই আঠারো বৎসরে তাহাকে বহু পরীক্ষায় প্রস্তুত হইতে হয় এবং কৃতকার্য্য হইতে হয়, তাহা না হইলে ঠিক সময় মত তাহারা অগ্রসর হইতে পারে না।

বিভিন্ন বিষয়ের পরীক্ষার ভার উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত থাকে। পরীক্ষকের সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য যে প্রশ্ন এমন হওয়া উচিত যাহাতে পরীক্ষায় ছাত্রগণ নিজের কিঞ্চিৎ বুদ্ধি ও সাধারণ জ্ঞান প্রকাশ করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত

ছাত্রদের উত্তর পরীক্ষাকালে ছাত্রদের ক্ষমতার প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা প্রত্যেক পরীক্ষকের কর্ত্তব্য। যদি শিক্ষাকেন্দ্রে রীতিমত শিক্ষাদান করিয়া পরীক্ষার সময় প্রশ্নগুলি সহজ ও সরল করা যায় তাহা হইলে অধিকাংশ ছেলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে। পরীক্ষার নামে যে বিভীষিকা তাহা অন্তর্হিত হয়। ছাত্রেরা পরীক্ষাকে আনন্দের সহিত গ্রহণ করে এবং পরীক্ষায় অকৃতকার্য্যতার জন্য অনেক সময় ছাত্রেরা নির্ব্বোধের মত যে পাপ করিয়া ফেলে তাহাও দূরীভূত হইয়া যায়।

শুধু বিদ্যালয়ে নহে সর্ব্বক্ষেত্রেই পরীক্ষার প্রচলন আছে। যে কার্য্যে যাহাকে নিয়োগ করিতে হইবে সেই কার্য্যে তাহাকে পূর্ব্বে পরীক্ষা করিয়া লওয়ার রীতি সকল ক্ষেত্রেই প্রচলিত। বর্ত্তমান যুগে ভারতবর্ষে এই পরীক্ষার বিধি এত দ্রুততর বৃদ্ধি পাইয়াছে যে একান্ত উপযুক্ত না হইলে কোনও একটি পথ ধরিয়া জীবনযাত্রায় অগ্রসর হওয়া দুষ্কর। চাকুরী-ক্ষেত্রে এই পরীক্ষা ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। বড় বড় চাকুরীর কথা ছাড়িয়া দেওয়া উচিত, কারণ ঐ সমস্ত চাকুরী উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করাই বাঞ্ছনীয় এবং তাহার জন্য রীতিমত শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও প্রয়োজন। আজকাল সামান্য মাহিনার চাকুরীর জন্যও যুবকদের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতে হয় এবং ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যদি তাহারা জয়ী হইতে পারে তবেই তাহারা চাকুরী পাইয়া থাকে। অনেকে ভিন্নমত হইলেও বেশীর ভাগ লোকই স্বীকার করিবে যে বর্ত্তমান যুগের শিক্ষার উদ্দেশ্য চাকুরী গ্রহণ ও টাকা রোজগার। নূতন সৃষ্টির অনুপ্রেরণা লইয়া, নূতন কিছু করিবার বাসনা লইয়া কয়জন ছাত্র শিক্ষা আরম্ভ করিয়া থাকে?

চাকুরীই অনেকের চরম লক্ষ্য। কিন্তু এই চাকুরী-স্থলেও পরীক্ষার প্রভাব রীতিমত লক্ষিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত চাকুরীর জন্য পরীক্ষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কারণ বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকের কতদূর প্রস্তুত হইল ইহাই পরীক্ষা করা হয়, কিন্তু এই সব চাকুরীর ক্ষেত্রে কর্ম্মপ্রার্থী বাস্তব জীবনে চলিবার পক্ষে কতদূর উপযুক্ত, সাধারণ জ্ঞানে কতদূর অগ্রসর, ইহাই পরীক্ষা করা হয়। কেবল পাঠ্যপুস্তকে মন দিয়া, দিনরাত তাহাতে পরিশ্রম করিয়া

অন্যান্য বিষয় অবহেলা করা যুক্তিযুক্ত নহে। বরং নানাদিক্ দিয়া উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়াও ভাল, তথাপি দিন-রাত্রি পড়িয়া কেবল পুস্তকের কীট হইয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়া ভাল নহে। দেশের উন্নতি যে কেবল প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রদের উপর নির্ভর করে, তাহা নহে।

আমাদের দেশে পরীক্ষার এখনও অনেক সংস্কার ও পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন। পরীক্ষা যদি ছাত্রদের জ্ঞান ও তাহাদের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির মান-স্বরূপ হয় তাহা হইলে দেখিতে হইবে যে পরীক্ষা যেন ছাত্রদের উপযুক্ত দেশ, কাল ও পাত্রোপযোগী হয়।

মানবজীবনই একটি কঠোর পরীক্ষা, পৃথিবীই সেই পরীক্ষা-স্থল। এখানে মানুষের উত্থান-পতন আছে, ভুল-ভ্রান্তি, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি নানারূপ বাধা-বিঘ্নও আছে। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার গৌরবই চরম গৌরব।

বেকার-সমস্যা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ

বিগত মহাযুদ্ধের কুফলস্বরূপ জগতের সর্ব্বত্র আজ বেকার-সমস্যা ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে। অন্যান্য স্বাধীন দেশে এই সমস্যা তত ভীষণ নহে, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য পরাধীন দেশে এই সমস্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। বিশেষ করিয়া বেকার-সমস্যার সর্ব্বনাশকর ফল আজ ভারতের প্রত্যেক মধ্যবিত্ত ব্যক্তির ঘরে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

বিগত মহাযুদ্ধের পর যে জগদ্ব্যাপী 'Trade Depression'-এর উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে বেকার-সমস্যা সমধিক বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে বেকার-সমস্যা যে ছিল না তাহা বলা যায় না, তবে ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে বিগত মহাযুদ্ধই বর্ত্তমান বেকার-সমস্যাকে এতটা তীব্র করিয়া তুলিয়াছে।

যুদ্ধের সময় কেবল বহু লোক সৈনিক-শ্রেণীভুক্তই হয় নাই, বহু নূতন নূতন শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শাসনবিভাগের কাজও অনেক অংশে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধের শেষে ঐ সকল প্রতিষ্ঠান বন্ধ

হওয়ায় তাহাতে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ কর্ম্মহীন হইয়া পড়ে। তাহাতেই বেকার-সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। যুদ্ধে যে ভীষণ ব্যয় হইয়াছিল তাহার ফলে টাকার অভাবে বহু ব্যবসা-বাণিজ্য একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। দেশবিদেশে এখন বেকার-সমস্যা সমাধানের জন্য আন্দোলন সুরু হইয়াছে।

দেশে ধনি-সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহারা শত লোকের মুখের অন্ন কাড়িয়া লইয়া একাই ভোগ করিতেছে। ইহা ছাড়া দেশের ধনি-সম্প্রদায় রাজানুগৃহীত। আজকাল নাই হউক, কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ধনীর দুলালেরা অর্থের বলে শাসনবিভাগেও বেশ মোটা মাহিনার চাকুরী পাইয়া আসিয়াছেন। বর্ত্তমানে প্রতিযোগিতামূলক (Competitive) পরীক্ষার সৃষ্টি হইলেও ধনীরও সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব চাকুরী-ক্ষেত্রে পূর্ণভাবেই বিদ্যমান। চাকুরীর ব্যবস্থা করিয়া বেকার-সমস্যার সমাধান সম্ভব হয় না। শিল্প-বাণিজ্য-ব্যবসায় প্রভৃতি এই সমস্যার তীব্রতা হ্রাস করিতে পারে। ব্যবসা-বাণিজ্য-ক্ষেত্রে ধনীরা তাঁহাদের গচ্ছিত মূলধন প্রায়ই বিদেশী ব্যবসায়ীর হাতে তুলিয়া দিয়া তাহাদের তত্ত্বাবধানে টাকা খাটাইয়া লাভ করিয়া থাকেন। দেশীয় ব্যবসায়ীর দক্ষতার উপর তাঁহাদের খুব কমই বিশ্বাস। আবার ধনী ব্যক্তিরা দেশী বা কুটীর-শিল্পকে সাহায্য না করিয়া তাঁহাদের নিত্য প্রয়োজনীয় বা বিলাস-দ্রব্য বিদেশ হইতে আনয়ন করিয়া দেশের টাকা বিদেশীর ঘরে তুলিয়া দিয়া আসেন।

আমাদের দেশে গরীবের সংখ্যাই অধিক। যে দেশের প্রত্যেকের গড়ে দৈনিক আয় মাত্র ছয় পয়সা, সে দেশ যে কত গরীব তাহা সহজেই অনুমেয়। শতকরা নব্বুই জন লোক আমাদের গ্রামে বাস করে। ইহারাই দেশের খাদ্য-সম্ভার যোগায়; আর আজ ইহারাই নিরন্ন, ইহারাই হাহাকার করিতেছে। গরীবদের মধ্যে বেকার-সমস্যা বেশী নাই, কারণ তাহারা কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিয়া থাকে। তাহাদের আভিজাত্য-গৌরব বা আত্মাভিমান নাই তাহারা খাটিতে না পাইলে ভিক্ষা করে। কিন্তু হতভাগ্য মধ্যবিত্তেরা! তাহাদের একূল ওকূল দু'কূলই নষ্ট।

মধ্যবিত্ত গৃহের যুবকগণই বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যেই উচ্চশিক্ষা সমধিক। এই সমস্ত শিক্ষিত যুবকগণ যখন কর্ম্মক্ষেত্রে জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য অবতরণ করে, তখন তাহাদের অন্তরে শিক্ষাভিমান, আভিজাত্য-গৌরব, ভদ্রতাজ্ঞান যথেষ্ট বর্ত্তমান থাকে। সেইজন্য সহজে তাহারা কোন হীন কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক হয় না। তাহারা কুলিগিরি করিতে পারে না, রিক্সাও টানিতে পারে না। তাহারা বরং বসিয়া থাকিবে তবুও এরূপ হীনতা অবলম্বন করিয়া তাহাদের সমুদয় আশা-ভরসা-গৌরব জলাঞ্জলি দিতে পারিবে না। তাহাদের শিক্ষাই তাহাদের এরূপ করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে।

বেকার-সমস্যা সমাধানের জন্য যে সমস্ত উপায় উদ্ভাবন করা হইয়াছ, তাহার মধ্যে নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া এই সকল বেকারদের পালন করিবার বহু প্রস্তাব হইয়াছে। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের মূলে যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, সে অর্থ কোথা হইতে আসিবে ? দেশে ধনি-সম্প্রদায় যদি আজ এই দুর্ভাগ্যদের প্রতি সহানুভূতি দেখান তবেই অনেক মঙ্গল, নচেৎ বেকার-সমস্যার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন করিয়া গভর্ণমেণ্টকে গালাগালি দিয়া কোন ফল হইবে না।

দেশের শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন হইতেছে। আশা করা যায় ইহার ফলে ছাত্রগণ কেবল পণ্ডিত হইবে না, তাহারা মানুষ হইবে। কুটীর-শিল্পের পুনরুজ্জীবনে শিক্ষিত বেকার-সম্প্রদায়কে পল্লী অঞ্চলে যাইয়া চাষ-আবাদ করিতে উপদেশ দেওয়া হইতেছে। নূতন নূতন ব্যবসায়ের পথ দেখানো হইতেছে। সবই সত্য ; কিন্তু ইহাতে সকলের সহানুভূতির বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের বেকার যুবকেরা যখন দেশের শিল্পের জন্য প্রাণপাত করিবে তখনই হয়তো আমাদের ধনি-সম্প্রদায় তাঁহাদের বিলাসদ্রব্যের মূল্য হিসাবে রাশি রাশি টাকা বিলাতী দোকানে দিয়া আসিবেন।

কি ব্যবসা, কি বাণিজ্য, কি কৃষি-শিল্প কি যন্ত্র-সম্ভার—প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ভারতের যথেষ্ট উন্নতি বাকি রহিয়াছে। এই সমস্ত উন্নতির দিকে যদি দেশের ধনবানেরা মনোনিবেশ করেন, তাহা হইলে বেকার-সমস্যা অনেক পরিমাণে

হ্রাস পাইতে পারে। আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে জীবন-বীমার কার্য্যে লক্ষ লক্ষ লোক প্রতিপালিত হয়। এই ব্যবসায়ে আমাদের দেশ আদৌ উন্নত নহে। যদি এই ব্যবসা শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের চেষ্টায় প্রসারলাভ করিতে পারে, তাহা হইলে বহু বেকারের অন্নের সংস্থান হইয়া যাইবে। কুটীর-শিল্পের প্রতি সর্ব্বসাধারণের অনুরাগ জাগাইয়া তুলিতে হইবে। যন্ত্র শিল্পের সহিত পাল্লা দিয়া কুটীর-শিল্প কখনই টিকিতে পারিবে না। দেশের এই কুটীর-শিল্পকে যদি দেশবাসী রক্ষা না করে তবে করিবে কে? কুটীর-শিল্পজাত দ্রব্য যদি দেশবাসী কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত দামেও ক্রয় করে তবেই দেশের চরকা, দেশের ঘানি চলিবে, নচেৎ নয়।

মধ্যবিত্ত ঘরের বেকার-সমস্যার বিভিন্ন কার্য্যকরী সমাধানের মধ্যে কোন্‌টি পরে বা কোন্‌টি আগে আরম্ভ করিতে হইবে তাহা বিবেচনা না করিয়া যদি একযোগে সব আরম্ভ করা যায়, যদি দেশের যুবকেরা প্রতিজ্ঞা করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নামিতে পারেন, যদি তাঁহারা দেশের ও দশের নিকট দাবী জানাইয়া নিজেদের পথ পরিষ্কার ও সুগম করিয়া লন, তাহা হইলে তাঁহাদের এই সদিচ্ছা ও মহৎ উদ্দেশ্যের আনুকূল্যই গভর্ণমেণ্ট করিবে, ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস!

বিদ্যালয়ে ব্যায়াম-শিক্ষা

'শিক্ষা' শব্দটা আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'মানসিক শিক্ষা' এই অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকি। শরীর-চর্চ্চা যে শিক্ষারই একটা অঙ্গ একথা আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই। শিক্ষা বলিতে শারীরিক, মানসিক এবং নৈতিক সকল প্রকার শিক্ষাই বুঝাইয়া থাকে। সেই জন্য শারীরিক ব্যায়ামাদি শিক্ষাকে ছাত্রজীবনের অবশ্য প্রতিপালনীয় কর্ত্তব্য হিসাবে গ্রহণ করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। তজ্জন্য বর্ত্তমানে বিদ্যালয়সমূহে শারীরিক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইতেছে। পাশ্চাত্য দেশে বিদ্যালয়সমূহে যেরূপ খেলাধূলা ও ব্যায়ামশিক্ষা প্রচলিত আছে সেইগুলির অনুকরণে আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলিতেও

শরীর-চর্চ্চার ব্যবস্থা ক্রমশঃ হইতেছে। আমাদের দেশের বিদ্যালয়সমূহে বহুদিন হইল দুই একজন ড্রিল-শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন এবং তাঁহারাই যথাসাধ্য শারীরিক শিক্ষা এতকাল দিয়া অসিয়াছেন। কিন্তু কিছুকাল হইল বিদ্যালয়সমূহে ব্যায়ামাগার স্থাপন ও ব্যায়াম-শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই শরীর-চর্চা ছাত্রদিগের মধ্যে একটি ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য শ্রদ্ধেয় স্বর্গত গুরুসদয় দত্ত আই, সি, এস্ মহোদয় ব্রতচারী আন্দোলন প্রচারের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

শরীর-চর্চ্চা বহু কারণে ছাত্রবৃন্দের অবশ্য করণীয়:—প্রথমতঃ প্রত্যেক মানুষেরই দেহ ও মনকে বিকশিত করা কর্ত্তব্য এবং সেই হিসাবে প্রত্যেক ছাত্রেরই উচিত ব্যায়াম করা অথবা খেলাধূলা করা অথবা ব্রতচারী নৃত্যে যোগদান করা। দ্বিতীয়তঃ, প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর কোন ছাত্রের শারীরিক পরিশ্রমমূলক কার্য্যাদি পরবর্ত্তী জীবনে করিতে হইলে ছাত্রজীবন হইতেই শরীর-চর্চ্চায় বিশেষ পারদর্শী হইতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য এবং সেই হিসাবে শরীর-চর্চ্চা করণীয়। তৃতীয়তঃ, বিদ্যালয়ের শিক্ষায় যে মানসিক পরিশ্রম হয় তাহার অবসাদ দূর করিবার নিমিত্ত বৈকালে খেলাধূলা ও ব্যায়ামের আবশ্যকতা আছে। শরীরের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট লাভ করিবার চেষ্টার ফলে ছাত্রগণ ক্রমশঃ রুগ্ণ, দুর্ব্বল ও কর্ম্মশক্তি-হীন হইতেছে। ইহার প্রতীকারার্থে শারীরিক ব্যায়ামের জন্য ছাত্রগণের মনোযোগী হওয়া আবশ্যক।

যদিও একই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য ছাত্রবৃন্দ প্রস্তুত হইয়া থাকে তবুও তাহাদের সকলকে একই ছাঁচে ঢালিয়া প্রস্তুত করিবার কল্পনা করা অসঙ্গত। সাধারণভাবে সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্ক প্রভৃতির মোটামুটি জ্ঞান বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রেরই লাভ করা উচিত ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু তবুও কেহ ভবিষ্যৎ জীবনে কৃষিজীবী, কেহ বা খেলোয়াড়, কেহ বা ব্যবসায়ী এবং কেহ বা ব্যায়ামবীর হইবেন ইহা আমরা আশা করিতে পারি এবং সেই হিসাবে শুধু মানসিক শিক্ষায় পারদর্শিতা না দেখাইয়া যাহাতে ছাত্রবৃন্দ

শারীরিক শিক্ষাতেও সুপটু হইয়া গড়িয়া উঠে সেই উদ্দেশ্যে বাল্যকাল হইতেই ছাত্রবৃন্দের ড্রিল, ব্যায়াম, ফুটবল প্রভৃতি খেলা অথবা ব্রতচারী নৃত্য বা অন্যান্য প্রকারের শরীর-চর্চ্চাতে মনোনিবেশ করিবার ব্যবস্থা বিদ্যালয়-কর্ত্তৃপক্ষের অবশ্য করণীয়।

বর্ত্তমানে শারীরিক শিক্ষা এরূপ অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট লইবার জন্য প্রস্তুত হইবার পর যদি অবসর থাকে তবে একটু শরীর-চর্চ্চা করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহার দিকে আরও বেশী লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে শারীরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিতে হইবে। অবশ্য তাহা করিতে হইলে যে কোন প্রকার শরীর-চর্চ্চায় ছাত্রগণ আত্মনিয়োগ করিলেই চলিবে এইরূপ নিয়ম করিতে হইবে এবং সামান্য পরিমাণে ইহার পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থাও করা যাইতে পারে। আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দের কুসংস্কারশূন্য বিচারশীল মন এবং সুস্থ ও সবল দেহের একান্ত প্রয়োজন। শরীর-চর্চ্চা দেশের বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইলে আমরা একদিন উক্ত প্রকার পরিপূর্ণ অনুশীলনপ্রিয় ছাত্রবৃন্দের উদ্ভব আশা করিতে পারি। বিদ্যালয়-কর্ত্তৃপক্ষের এদিকে মনোযোগ প্রয়োজন।

ফেরিওয়ালা

যাহারা নগরের রাজপথে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া নানারূপ দ্রব্য বিক্রয় করে তাহাদিকে ফেরিওয়ালা বলা হয়। বলিতে গেলে একটি ক্ষুদ্র দোকান মাথায় বহন করিয়া বিভিন্ন দ্রব্যের নাম করিতে করিতে ফেরিওয়ালা রাস্তা দিয়া অগ্রসর হয়। তাহার স্বরে ক্রেতা আকৃষ্ট হইয়া দ্রব্য ক্রয় করে। পল্লী অঞ্চলেও ফেরিওয়ালা আছে। তাহারা ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে পল্লীর পথ বাহিয়া হাঁকিতে হাঁকিতে চলিয়া যায়। শহরে এই ফেরিওয়ালার সংখ্যা এত অধিক যে, এক মনোহারী দ্রব্য লইয়াই অমন হাজার হাজার ফেরিওয়ালা শহরের পথে

পথে অলিতে গলিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সামান্য মাথার কাঁটা হইতে আরম্ভ করিয়া পোষাক-আষাক সব কিছুই ফেরিওয়ালার নিকট পাওয়া যায়। যে সমস্ত দ্রব্যের নিত্য প্রয়োজন এবং বিশেষ করিয়া যে সমস্ত দ্রব্যে স্ত্রীলোকের প্রয়োজন, সেই সকল দ্রব্য লইয়া কতকগুলি ফেরিওয়ালা দিনের বেলা ফেরি করিয়া বেড়ায়। ইহা ছাড়া বড় বড় রাজপথে সংবাদপত্র, রুমাল, সাবান, ফিতা, বোতাম প্রভৃতি নানারূপ দ্রব্য লইয়া ফেরি করাও আছে। বাসে, ট্রামে রেলগাড়ীতে সর্ব্বত্রই ফেরিওয়ালা।

ফেরি করা বর্ত্তমান যুগে একটি রীতিমত ব্যবসায়। অনেক সময় বড় বড় ব্যবসার বিজ্ঞাপন হিসাবেও ফেরি করা হইয়া থাকে। জনতাকে আকৃষ্ট করিবার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করিয়া এই সকল ফেরিওয়ালা দ্রব্য বিক্রয় করিয়া থাকে। অবিরাম চীৎকার করিয়া ইহারা দ্রব্যের গুণবর্ণনা করে। কথায় যে যত অভিভূত করিতে পারিবে তাহার ততই লাভ। অতএব এই প্রকার ব্যবসায়ে বিক্রেতা ও বিক্রয়ের কৃতিত্বই সমধিক, বিক্রেয় দ্রব্যের গুণ নহে। অনেক সময় নানারূপ গীতবাদ্য-সহকারে ফেরিওয়ালা ফেরি করে। কখনও কখনও বহুরূপী সাজিয়া তাহারা ক্রেতা সংগ্রহ করে। এই সব উপায়ের অন্তরালে বিশেষ কোন দ্রব্যের চলন বা মালের কাটতিই একমাত্র উদ্দেশ্য। ব্যবসা-ক্ষেত্রে ফেরিওয়ালারা খুব উপকারী। ক্রেতাদের দিক্ হইতে ফেরিওয়ালার উপকারিতা এই যে, তাহারা অনেক সময় বাড়ী বসিয়া কিংবা ট্রামে, বাসে গাড়ীতে বসিয়া অভিলষিত দ্রব্য ক্রয় করিতে পারেন। দোকানের দর হইতে ফেরিওয়ালার নিকট জিনিষের দর কখন কম, আবার কখনও বা বেশী হইয়া থাকে।

কিন্তু ফেরিওয়ালারা প্রায়ই ফাঁকির মতলবে থাকে। যেহেতু তাহাদের অবস্থিতির কোন স্থিরতা নাই, এইজন্য সুবিধা পাইলেই তাহারা নিরীহ খরিদ্দারকে ঠকাইয়া লয়। অনেক সময় কম দামের জিনিষ নানা কথায় বুঝাইয়া বেশী দামে বিক্রয় করে এবং কখনও কখনও আসল জিনিষ বলিয়া নকল বিক্রয় করিয়া থাকে। পথে পথে এই সমস্ত ফেরিওয়ালারা এরূপ ভিড় করে যে অনেক

সময় চলাচল কষ্টকর হইয়া উঠে। প্রায়ই চলার পথ জুড়িয়া তাহারা দ্রব্য-সম্ভার বিছাইয়া বসে এবং সেখান হইতে পথ অতিক্রম করা একরূপ অসাধ্য হইয়া দাঁড়ায়। ইহার বিরুদ্ধে শহর বা নগরের কর্ত্তৃপক্ষেরা কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেও পুলিশের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া তাহারা নির্ব্বিবাদে ব্যবসায় চালাইয়া যায়। দেখা গিয়াছে যে অনেক ক্ষেত্রে দৈবদুর্ঘটনার জন্য ফেরিওয়ালারাই দায়ী। তাহারা বাস বা ট্রাম আসিলে এরূপ ভিড় করিয়া বক্ বক্ করিতে আরম্ভ করিয়া দেয় যে, অনেকে অসাবধান হইয়া দুর্ঘটনায় আহত হইয়াছে। ফেরিওয়ালারা অনেক সময় পথিককে বিরক্ত করিয়া তোলে ; ফলে অনেকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও জিনিষ ক্রয় করিতে বাধ্য হন।

ফেরিওয়ালা যে বর্ত্তমান যুগের একটি ধর্ত্তব্য বস্তু, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। ফেরিওয়ালাদের জীবনযাত্রার পদ্ধতি যাহাই হউক না কেন, তাহাদের ফেরির পদ্ধতি যে কত বিচিত্র তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। ভাল দ্রব্য লইয়া সৎপথে থাকিয়া যদি ফেরিওয়ালারা পরিশ্রম করে তবে তাহাদের উন্নতি অনিবার্য্য। বর্ত্তমানে বেশীর ভাগ খরিদ্দারই ফেরিওয়ালার প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন নহে। যদি ফেরিওয়ালারা নিজেদের ব্যবহারে ক্রেতাদিগের সহানুভূতি লাভ করিতে পারে তাহা হইলেই তাহারা করিয়া খাইতে পারিবে। আর গরীবদের পক্ষেও নিতান্ত অল্প মূলধনে ব্যবসা করা ও অন্নের সংস্থান করা সম্ভবপর হইবে।

কথোপকথন—চলচ্চিত্র

সুধীর। কি হে অমর, কাল রাত্রে তোমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, কোথায় ছিলে ?

অমর। ও হরি, তুমি কিছুই জানো না বুঝি ? আমার এক মেশোমশায় এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে সিনেমায় গিয়েছিলাম।

সুধীর। তুমি যে বড় ঘন ঘন সিনেমায় যাচ্ছ, নেশায় দাঁড়ালো নাকি ?

অমর। এক রকম তাই বটে, আমি প্রায়ই যাই। কি জানো সিনেমা সম্বন্ধে তোমাদের যে ধারণাই থাকুক না কেন, আমি কিন্তু সিনেমাকে খারাপ বলি না।

সুধীর। কিসে ?

অমর। কিসে কেন ? সিনেমা দেশের একটি শিল্প-প্রতিষ্ঠান। অন্যান্য দেশে এই শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং এই প্রতিষ্ঠানে কত শত লোক প্রতিপালিত হচ্ছে। আমাদের দেশেও সিনেমা আজ অনেকের অন্ন যোগাচ্ছে। এই বেকার-সমস্যার যুগে সিনেমার উন্নতি একান্ত প্রয়োজন। এক এক সিনেমায় কত লোক খাটছে। একটা ফিল্ম্ তুলতে গেলে ষ্টুডিও থেকে আরম্ভ ক'রে কত লোকের প্রয়োজন হয়। দেশী সিনেমা একটা স্বদেশী শিল্প, ওতে সকলেরই সহানুভূতি থাকা উচিত।

এ ছাড়া যাকে তোমরা Mass Education বল তা সিনেমার দ্বারাই সম্ভব। চলচ্চিত্রে ভাল ভাল ছবি তুলে সর্ব্বসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া চল্‌তে পারে। সমাজের কোথায় গলদ, কি করলে দেশের উন্নতি সম্ভব তা চলচ্চিত্রে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। স্বদেশ-প্রীতি জাগাতেও সিনেমা অদ্বিতীয়। আমাদের প্রাচীন-কাহিনী, পৌরাণিক-গাথা, কত বীরের কথা, কত মহত্ত্বের উদাহরণের দ্বারা আমাদের মনে দেশের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ এনে দেয়। তোমরা হয়তো বল্‌বে সিনেমার মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে যাহা নৈতিক চরিত্রের পক্ষে অনিষ্টকর। একটু বিচার করলেই বুঝ্‌তে পারবে যে যেহেতু সিনেমা এক প্রকার আনন্দের স্থান, সেইজন্য বাধ্য হয়েই নৃত্য ও গীতের অবতারণা করতে হয়। তাতে সকলেরই নির্দ্দোষ আনন্দ পাওয়া উচিত। যারা নৈতিক চরিত্রে স্বভাবতঃই হীন তারা সিনেমায় না গেলেও খারাপ হবে। ভাল মন্দ নিয়ে জগৎ। যারা মন্দ তারা সিনেমাই দেখুক আর ভাগবত-পাঠই শুনুক—ফল সমানই।

মানুষের জীবনে আমোদ-প্রমোদের প্রয়োজন আছে। পরিশ্রমের পর বিশ্রাম ও একটু একটু আমোদ আহ্লাদ সকলেই করতে চায়। এত অল্প পয়সায়

এরূপ সুন্দর আমোদ ও আনন্দ দিতে সিনেমা ছাড়া আর কি আছে? থিয়েটার-যাত্রা বা অন্য কিছু আমোদ-প্রমোদ অনেকক্ষণ ধ'রে হয়, এইজন্য আনন্দের পরে অবসাদ আসে। একরাত্রি থিয়েটার বা যাত্রা দেখ্‌লে তার পরের দিন কিছুই করা যায় না, আলস্যে সময় কেটে যায়। এরূপ আনন্দ লাভ ক'রে শক্তি সঞ্চয় করা দূরের কথা, উপরন্তু শক্তির অপচয় ঘটে। কিন্তু সিনেমা দুই তিন ঘণ্টা দেখ্‌লে অবসাদ কখনই আসে না, বরং তাতে পরে কার্য্যে উৎসাহ আসে। এই সমস্ত কারণেই আমার সিনেমার প্রশংসা করিতে ইচ্ছা হয়। এই ধর না, কাল আমি 'Last days of Pompeii' দেখে এলাম। বিস্তুভিয়াসের সে কি ভীষণ মূর্ত্তি!—হলোই বা ছবিতে, দেখায় তো সত্যির মত। সাড়ে চার আনা পয়সা খরচ ক'রে আমি কি আর দেশ বিদেশের সব দেখ্‌বার জিনিষ দেখ্‌তে পাই, এ তবুও এক জায়গায় ব'সে দুনিয়ার যত রকম দৃশ্য আছে সব দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

সুধীর। তুমি যা বল্লে তাতে যদি আমি সিনেমার বিরুদ্ধে একটা কথাও বলি তা হ'লে আমার উপর চ'টে আগুন হবে। তবুও বলি একটা জিনিষের দোষ-গুণ জেনে রাখাই ভাল। সিনেমার যে কিছুই গুণ নাই একথা আমি বলতে চাই না, তবে হয়তো তুলনা ক'রে দেখতে গেলে দোষের ভাগটাই বেশী হবে। তুমি প্রথমে যা বল্‌লে সিনেমা দেশের একটি শিল্প-প্রতিষ্ঠান; কিন্তু এ শিল্প এমন কিছু ব্যাপক নহে যাতে বেকার-সমস্যার কিছু সমাধান হ'তে পারে। আমাদের দেশ কৃষিজীবী। আমাদের দেশের সম্পদ্‌ মাটির মধ্যে লুকানো। কৃষির উন্নতিতেই আমাদের উন্নতি। সিনেমার উন্নতিতে অতি মুষ্টিমেয় লোকের আহার্য্যের সংস্থান হ'তে পারে। আমাদের দেশের টাকা Photographyর ও Film machineএর জন্য ইংলণ্ড ও জার্ম্মানীতে তুলে দিয়ে আস্‌বো? ঠিক Economically দেখতে গেলে আমরা সিনেমার উন্নতিতে ঠকে যাই, লাভবান্‌ হই না, দেশে যে পরিমাণ অর্থের আগম হয়, তা অপেক্ষা বেশী চ'লে যায় বাইরে। বিদেশী ব্যবসায়ীরা তাদের film দেশে বিদেশে ভাড়া খাটাচ্ছে; আমরা কি তাই পারি? অতএব তোমার ও যুক্তি ভুয়ো যুক্তি।

তারপরে Mass Educationএর কথা বল্‌ছো। Mass Educationএর অন্য উপায় আছে। রেডিওর দ্বারায় Mass Education সম্ভব। খরচও তাতে কম। যখন লোকে সিনেমায় যায় তখন ঠিক Education পেতে যায় না আমোদ উপভোগ করতে যায়। সিনেমার দ্বারা অনুপ্রেরিত হ'য়ে সমাজ-সংস্কার কয়জন করে? আমাদের দেশে প্রাচীন-সভ্যতার গৌরব অনুভূতি, সে তো পুস্তক পাঠের দ্বারাও হয়। সুদূর পল্লী-অঞ্চলে যে ব্যক্তি পড়তে জানে এরূপ ব্যক্তিকে দেখেছি অনেক চাষা-ভূষাকে রামায়ণ মহাভারত প'ড়ে শোনাতে। আমাদের দেশে সিনেমার সৃষ্টি ও আজ পর্য্যন্ত যে উন্নতি এই সমুদায় আলোচনা করলে দেখ্‌তে পাবে সিনেমা নৈতিক অবনতির জন্য কতখানি দায়ী।

সিনেমার আমোদ সস্তায় হয়। কিন্তু এ আমোদে নেশা আসে। সিনেমা দেখা এমন পাজি নেশা যে এর জন্য কত ছাত্র তাদের অমূল্য ছাত্রজীবন একেবারে বরবাদে দিচ্ছে। কত গৃহী এই সিনেমায় খরচ ক'রে সংসারে অভাব টেনে আন্‌ছে। কত গরীব এই নেশায় মত্ত হ'য়ে পেটে না খেয়ে সিনেমা দেখ্‌ছে। তাদের রক্ত-জল-করা পয়সায় ম্যানেজারের ও স্বত্বাধিকারীর পকেট ভর্ত্তি হচ্ছে। সিনেমা দেখার পর শারীরিক অবসাদ না এলেও মানসিক অবসাদ আসেই।

অমর। তা হ'লে তুমি কি নিজে সিনেমা দেখ না?

সুধীর। দেখি। খুব কচিৎ। যখন প্রকৃতই ভাল ও শিক্ষণীয় film আসে তখনই। আমার মতে একটি Film Guide Company খোলা উচিত যারা বিচার ক'রে ব'লে দেবে, কোন্ কোন্ film ছাত্রদের দেখা উচিত, কোন্ কোন্ film মেয়েদের বা কি কি film বৃদ্ধদের দেখা উচিত।

অমর। হাঃ হাঃ পাগল আর কি! আচ্ছা, ভাই, আসি।

সুধীর। এসো।

গ্রাম্য চিকিৎসক

চিকিৎসা এমনই একটি ব্যাপার যে রোগী বা তাহার আত্মীয়স্বজন সাময়িকভাবে তাহার জন্য চিকিৎসককে স্বর্গীয় দূত বলিয়া গ্রহণ করিলে যদিও আদিম মানুষের মনোবৃত্তি আত্মপ্রকাশ করিবে তবুও তাহা অস্বাভাবিক হইবে না। গ্রামে সাধারণতঃ চিকিৎসক দুর্লভ, তাই চিকিৎসকের ব্যক্তিত্ব গ্রামে দূরপ্রসারী হইবে এ কথা অনুমান করা কঠিন নহে। কিন্তু সেই সঙ্গে প্রথমেই নগরের চিকিৎসকের সহিত গ্রামের চিকিৎসকের একটি সাধারণ পার্থক্য নির্দ্দেশ করা খুব সহজ। নগরের চিকিৎসক রোগী এবং তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের সহিত সাধারণ ভদ্রলোকের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং তাহাতে একটা যান্ত্রিকতা থাকে। কিন্তু গ্রামের চিকিৎসক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগীর সঙ্গে আত্মীয়-স্বজনের হৃদয়ে যথেষ্ট সাহস ও শক্তি প্রদান করিয়া থাকেন।

আমাদের দেশে গ্রামে এবং শহরে বহু প্রকার চিকিৎসা প্রচলিত আছে—যথা, এলোপ্যাথি, কবিরাজী, হাকিমী, হোমিওপ্যাথি, ইত্যাদি। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে প্রতিযোগিতায় এলোপ্যাথি চিকিৎসাই শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। মফঃস্বল শহরে অবশ্য সকল প্রকারের চিকিৎসকই গ্রাসাচ্ছাদনের চেষ্টায় অন্ততঃ আংশিক সাফল্য লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু গ্রামে এলোপ্যাথি চিকিৎসকই অর্থোপার্জ্জনের দিক্ দিয়া সাধারণতঃ অধিক সাফল্য লাভ করিয়া থাকেন। অবশ্য গ্রামস্থ অধিবাসীবৃন্দ দরিদ্র, তাই অল্প পয়সায় চিকিৎসা সম্ভব হওয়ায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকও গ্রামে চিকিৎসা করিয়া কোন রকমে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। কবিরাজগণ শুধু মফঃস্বল শহরে হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণের পাশাপাশি নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারেন।

গ্রামের চিকিৎসকবৃন্দের মধ্যে মোটামুটি দুইটি ভাগ করা চলে। যাঁহারা ৩০-বৎসর বা ৪০ বৎসর পূর্ব্বে ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন তাঁহারা বেশ-

ভূষা বা বৈঠকখানা সাজানোর দিক্ দিয়া ততটা আড়ম্বরপ্রিয় নহেন। কিন্তু যাঁহারা ইদানীং পাশ করিয়া আসিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিতেছেন তাঁহারা চাল-চলনে অনেকটা নাগরিক চিকিৎসকদের মত হইতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের ব্যবহারে যান্ত্রিকতা বিশেষ নাই এবং তাঁহারাও গ্রামবাসীদের প্রতি আত্মীয়ের ন্যায় সহানুভূতিশীল। চিকিৎসা-পদ্ধতির দিক্ দিয়া বর্ত্তমান যুগে গ্রামের ও শহরের চিকিৎসা-পদ্ধতির পার্থক্য অল্প। অবশ্য শহরে যন্ত্রাদি ও ঔষধ-পথ্যাদির যে সুবিধা হয় গ্রামে তাহা সম্ভব হয় না। তবে সাধারণ রোগাদিতে গ্রামের চিকিৎসকদের ঔষধের দ্বারা যথেষ্ট কাজ চলিতে পারে।

গ্রামের চিকিৎসক গ্রামের অশিক্ষিত জনসাধারণের নিকট একটা মস্ত বড় রহস্যময় ব্যক্তি। চিকিৎসক তাঁহাদের নিকট এমন এক দিব্যশক্তিশালী পুরুষ যিনি ইচ্ছা করিলেই রোগকে ঔষধরূপ অস্ত্রবলে বিদূরিত করিতে পারেন। অবশ্য জনসাধারণের এই ধারণা অসঙ্গত ও ভিত্তিশূন্য নয়। তবুও অনেক সময় তাহারা চিকিৎসককে একজন ওঝা ভাবিয়া বসে এবং হয়ত বা মনে করে ঔষধ উপলক্ষ্যমাত্র। ওঝার ইচ্ছারূপ মন্ত্রশক্তিই রোগ দূর করিবার মূল কারণ। অবশ্য ক্রমশঃ জনসাধারণের এই সকল কুসংস্কার দূর হইয়া যাইতেছে এবং চিকিৎসকের অস্তিত্বের জন্য গ্রামবাসিগণ চিকিৎসার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সম্বন্ধে ক্রমশঃ সচেতন হইতেছে। আমাদের দেশের পল্লীগুলিতে "ফুঁ দেওয়া", "জল-পড়া", তাবিচ, কবচ, মাদুলী প্রভৃতির এত অধিক প্রচলন ছিল যে রোগ-গুলিকে বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচনা করিয়া প্রতিকার-ব্যবস্থাই যে চিকিৎসার মূল বস্তু এ কথা জনসাধারণের বুঝিতে বিলম্ব হইত। অবশ্য আজকাল গ্রামের চিকিৎসকবৃন্দের অস্তিত্ব এ বিষয়ে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করিতেছে।

'রামের সুমতি'তে শরৎচন্দ্র নীলমণি ডাক্তারের চিত্র দিয়াছেন। এরূপ বিবেকহীন অর্থপিশাচ দুই একজন চিকিৎসক গ্রামে যে দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহা নয়; কিন্তু ইহা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। গ্রামের চিকিৎসক সাধারণতঃ সহৃদয়, উদারচিত্ত ও স্বল্পে সন্তুষ্ট। একদিকে গ্রামবাসীর অজ্ঞতা, দারিদ্র্য আর অন্যদিকে জল-পড়া ও মাদুলীর সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া

তাঁহাদিগকে কাজ করিতে হয়। রোগীর জীবনের দায়িত্ব লইয়া তাঁহারা চিকিৎসা করেন—শহরের ডাক্তারের দ্বারা চিকিৎসিত হইবার অভিজ্ঞতা যাঁহাদের আছে তাঁহারাই জানেন, বড় বড় শহরে ইহা কত দুর্লভ। বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার নামে বিশেষত্ব দেখাইতে ও রোগীর রক্ত ইত্যাদি পরীক্ষা করাইতেই সময় ও অর্থ শেষ হইয়া যায়। অনেক সময় রোগী মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এক ফোঁটা ঔষধও পায় না। গ্রামের চিকিৎসক একটি রোগীর জীবন রক্ষা করিতে যে প্রাণপণ চেষ্টা করেন, শহরে তাহা প্রায় দুর্লভ।

অগ্নিকাণ্ড—একটি চিঠি

পরম পূজনীয়—

শ্রীযুক্ত পিতৃদেব-

শ্রীচরণকমলেষু

শতকোটিপ্রণতিপূর্ব্বক নিবেদন—

বাবা,

আপনার আশীর্ব্বাদ-পত্র পাইয়া যার-পর-নাই আনন্দিত হইয়াছি। আমার পত্র দিতে বিলম্ব হইয়াছে সে জন্য আমায় ক্ষমা করিবেন। এ বিলম্ব ইচ্ছাকৃত নয়। গত সপ্তাহে আমাদের এ অঞ্চলে এক বিরাট অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। এক গৃহস্থের বাড়ীতে হঠাৎ আগুন লাগিয়া সব ভস্মীভূত হইয়া যায়, তবে কাহারও প্রাণহানি হয় নাই। আমি শুনিবামাত্র ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া যথাসাধ্য আগুন নিভাইবার চেষ্টা করিয়াছি। শুনিলে আপনি সুখী হইবেন যে আমি সেই প্রজ্বলিত গৃহাভ্যন্তর হইতে এক রুগ্ণ বৃদ্ধকে মৃত্যুর করাল গ্রাস হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। শ্রীভগবানের কৃপায় আমার কোনরূপ ক্ষতি হয় নাই। কি করিয়া আগুন লাগিল এবং কি করিয়া আমরা সকলে তাহা নিভাইয়াছিলাম তাহা আপনার বিজ্ঞপ্তির জন্য অতি সংক্ষেপে জানাইতেছি।

সে দিন শুইতে একটু রাত হইয়াছিল। আমি নিত্যকার অভ্যাসমত শুইবার পূর্ব্বে আমাদের মেসের ছাদে ইতস্ততঃ পায়চারী করিতেছিলাম। আমাদের পাড়াটি শহরের প্রান্তসীমায় বলিয়া এখানে রাস্তায় গ্যাসের আলো বহু দূরে দূরে অবস্থিত। তাহাতে পথ আলো করা দূরে থাক অন্ধকার যেন আরও বাড়াইয়া দেয়। যে দিনের কথা বলিতেছি ঐ দিন বেশ গুমট করিয়াছিল। দূরে বস্তির বাসিন্দারা গরমের জন্য রাস্তায় খাটিয়া পাতিয়া শুইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে তখনও সকলে ঘুমায় নাই, অস্পষ্ট কলরবও শুনা যাইতেছিল। এমন সময়ে আমি পশ্চিম দিকের সম্মুখের নারিকেল গাছটির পাশ দিয়া আকাশকে ধূমায়িত দেখিতে পাইলাম। প্রথমে মেঘ বলিয়া আমার ভ্রম হইয়াছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সেই স্থানে এক রক্তিম আভা দেখিতে পাইলাম। ঘন নৈশ অন্ধকারের ভিতর সেই আলোর আভাস বড় ভীষণ দেখাইতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে কি আর্ত্তনাদ! সেই আর্ত্তস্বর যেন কত দেশ দেশান্তর, গিরি-দরী-সাগর পার হইয়া আসিতেছে। অস্পষ্ট শুনা যাইতেছে, 'গেল, গেল, সব গেল! কে কোথায় আছ রক্ষা কর।' আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। তড়িতের মত নীচে নামিলাম। চীৎকার করিয়া অন্যান্য সকলকে জাগাইলাম। ব্যাপারটি কি কেহ বা বুঝিয়া কেহ বা না বুঝিয়াই চীৎকার করিতে লাগিল। আমরা ঊর্দ্ধশ্বাসে ঘটনাস্থলের দিকে দৌড়াইতে লাগিলাম। বস্তির সেই বাসিন্দারাও আমাদের অনুসরণ করিল।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম লেলিহান অগ্নিশিখা তাহার তাণ্ডব-লীলা সুরু করিয়া দিয়াছে। একখানি অনুচ্চ দ্বিতল গৃহ সম্পূর্ণরূপে অগ্নিময়। সেই গৃহের অধিবাসী মাত্র জন তিনেক প্রাণী কিছুদূরে দাঁড়াইয়া উন্মাদের মত এই ধ্বংসলীলা অবলোকন করিতেছিল আর মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিতেছিল। তাহাদের মুখের ভাব বর্ণনা করা যায় না। নিশ্চল অপলক নেত্রে তাহারা চাহিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে তাহাদের দেহ ভীষণভাবে কম্পিত হইতেছিল। আমরা যে যাহা পারিলাম, ঘটি, বাটি, বাল্‌তি, হাঁড়ি, কলসী লইয়া নিকটবর্ত্তী জলাশয় হইতে জল আনিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে সুরু করিলাম। আমরা

প্রথমে প্রাণপাত চেষ্টা করিয়াও কিছু করিতে পারিতেছিলাম না। ঠিক এমন সময় সেই তিনজন প্রাণীর মধ্যে একটি ছোট বালিকা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"ওমা, দাদু কই ? দাদু যে এখনও ঘরের মধ্যে !" বলিবামাত্র অপর দুই ব্যক্তি 'বাবা' 'বাবা' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। এইরূপ ভীষণ অগ্নির মধ্যে বৃদ্ধের অবস্থা যে কি হইতে পারে তাহা অনুমান করিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম। আমাদের মধ্যে সকলেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সেই অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করে কার সাধ্য ! পশ্চাৎ দিক্ হইতে বস্তির কুলি-মজুরেরা তখন সোৎসাহে আগুন নিভাইতে ব্যস্ত। আমি কিঞ্চিৎ ভাবিয়া লইলাম। তাহার পর আপনার শ্রীচরণ স্মরণ করিয়া একখানি পুরু ভিজা চটের দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া সেই প্রজ্বলিত গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। সকলেই সমস্বরে নিষেধ করিল—শুনিলাম না।

শুনিয়াছিলাম নীচের কোন এক ঘরে বৃদ্ধটি শুইয়াছিলেন। প্রথমে তাড়াতাড়ি দুই একটি ঘরে প্রবেশ করিয়া সন্ধান করিলাম, শেষে একটি ঘরে তাঁহাকে অচেতন অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিলাম। সেই ঘরে তখন আগুনের দাপাদাপি সুরু হইয়াছে। উপরে কড়ি পুড়িতেছে, জানালা দরজা পুড়িয়া প্রায় ভস্মীভূত। মেঝের সিমেণ্ট ফাটিয়া যাইতেছে। সে কী ভীষণ চট্ পট্ শব্দ ! আমি ক্ষিপ্রতার সহিত সেই বৃদ্ধকে স্কন্ধে ফেলিয়া অগ্নি ভেদ করিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলাম। সঙ্গে সঙ্গেই জ্বলন্ত কড়িকাঠ খসিয়া পড়িল। সকলেই "বেঁচেছে, বেঁচেছে" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। বাহির হইয়া আমি দ্বিরুক্তি না করিয়া সেই অচেতন বৃদ্ধকে তাড়াতাড়ি হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিলাম।

কি করিয়া আগুন লাগিয়াছিল তাহা গৃহবাসী কেহই বলিতে পারিল না। সেইজন্য সঠিক খবর আপনাকে দিতে পারিলাম না। তবে সে সম্বন্ধে তদন্ত চলিতেছে।

যাহা হউক আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন। মাতাকে আমার সংবাদ দিয়া তাঁহার চরণে আমার ভক্তিপূর্ণ শত সহস্র প্রণাম

জানাইবেন। ছোট ভাইবোনদের আমার স্নেহাশিস্ দিবেন। যত শীঘ্র সম্ভব পত্রোত্তরে আপনাদের কুশল সমাচার অবগত করাইবেন। ইতি—

সেবকাধম

বীরেশ্বর

মহাপুরুষগণের জীবনী

ইংরাজীতে একটি প্রবাদ আছে যে একটি জাতির ইতিহাস সেই জাতির প্রতিভাবান্ ব্যক্তিবৃন্দের ইতিহাস। কথাটা হয়ত সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও একেবার অসত্য নয়। জাতি যে সমস্ত কর্ণধার ব্যক্তিবৃন্দ-কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়, তাঁহাদের জীবনীর ভিতর দিয়া জাতিকে আমরা বুঝিতে পারি। মহামানবদের জীবন যে সমাজের সাধারণ লোকের অতি প্রয়োজনীয়, একথা আমরা "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" এই প্রবাদ হইতে বুঝিতে পারি। কাজেই আমাদের নিজেদের জীবনকে মহান্ করিবার জন্য মহামানবদের জীবনের আলোচনা যে প্রয়োজনীয় ইহা একটি সাধারণ সত্য বলিয়া সমাজে চিরকাল পরিগৃহীত হইয়াছে।

কেন যে মহাপুরুষদের জীবনী সমাজ এত শ্রদ্ধার সহিত পর্য্যবেক্ষণ করে, কেন মহাপুরুষবৃন্দের নিকট সমাজ সর্ব্বযুগে নতি স্বীকার করিয়াছে, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে গেলে দেখা যাইবে ব্যক্তিগত জীবনে ও সমাজ-জীবনে যেখানে যে সকল দোষ-ত্রুটি-গ্লানি ফুটিয়া উঠিয়াছে, শুধু মহামানবদের সংস্পর্শেই তাহা দূরীভূত হইয়াছে। সমাজকে অগ্রগামী করিবার পথে তাঁহাদের যে সাধনা, তাঁহাদের যে ঐকান্তিকতা তাহাই তাঁহাদিগকে মহাপুরুষ করিয়া তুলিয়াছে। অনেক সময় শুধু ব্যক্তিগত জীবনের উৎকর্ষ সাধনের জন্যই অনেক মহাপুরুষ তাঁহাদের জীবনের উৎসাহ উদ্যম ব্যয় করিয়া থাকেন; কিন্তু সে সকল ক্ষেত্রেও তাঁহাদের সাধনার ফল সমাজ লাভ করিয়া থাকে। নিউটন বা গ্যালিলিও যখন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানলাভের অনুসন্ধিৎসায় তাঁহাদের সাধনা আরম্ভ

করেন, তখন ব্যাপারটা অবশ্য তাঁহাদের ব্যক্তিগত জ্ঞানাকাঙ্ক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু তাঁহারা যেদিন সিদ্ধিলাভ করিলেন, সেদিন তাঁহাদের সাধনার ফল সমগ্র সমাজ লাভ করিল। সকল প্রকারের মহামানবের জীবনই এইরূপ সমাজকে অগ্রগামী করিয়া দেয়, এইজন্যই তাঁহারা সমাজে শ্রদ্ধেয় ও ভক্তির পাত্র এবং তাঁহাদের আদর্শ অন্যের অনুকরণীয়।

সাধারণতঃ আমরা যে জন্য মহামানবদের জীবনীর আলোচনা করি এবং অনেক সময় তাঁহাদের অনুকরণ বা অনুসরণ করিতে আদিষ্ট হই, তাহা ব্যক্তিগত জীবনে তাঁহাদের মহত্ত্ব এবং প্রতিভা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইবার জন্য। যিনি হয়ত জীবনে পাণ্ডিত্য লাভ করিবার উচ্চাভিলাষ পোষণ করেন, বিশ্বের বিভিন্ন বিষয়ে পণ্ডিত ব্যক্তিবৃন্দের জীবনী তাঁহাকে উৎসাহ ও উদ্যম প্রদান করিবে। যিনি আজীবন বিজ্ঞান-সাধনা করিতে চাহেন তাঁহার নিকট নিউটন ও কেপ্লারের জীবনী একটি আদর্শ মানবতারূপে প্রতিভাত হইবে। যদি রাষ্ট্র-নেতা হইতে চাহেন তাঁহার নিকট মাট্‌সিনি, গ্যারিবল্ডী, কাভুর বা সান ইয়াট্ সেনের জীবনী খুব মূল্যবান্ বোধ হইবে। যিনি সাহিত্যসেবা করিতে চাহেন, মিল্টন, ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ, শেলী, গেটে প্রভৃতির জীবনী তাঁহাকে আনন্দ দিবে। এখানে একটি কথা আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, শুধু যাঁহারা প্রতিভাশালী তাঁহাদের জন্যই মহামানবদের জীবন নহে। সাধারণ লোকও সর্ব্বশ্রেণীর মহামানবদের জীবনী পাঠের দ্বারা নিজেদের জীবনকে তাঁহাদেরই জীবনের আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া সুন্দর ও পবিত্র করিতে পারেন এবং বিচার-ও চিন্তাশক্তিকে উদারতর করিয়া তোলেন।

সমাজের বিশৃঙ্খল মুহূর্ত্তে অনেক সময় এরূপ দুই একজন মহামানবের আবির্ভাব হয়, যাঁহাদের নির্দ্দেশ সমাজের সর্ব্বস্তরের লোকেই গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় এবং তাঁহারা সমাজকে সর্ব্বতোভাবে অগ্রগামী করিবার জন্য আত্মবিসর্জ্জন দেন। জর্জ্জ ওয়াশিংটন আমেরিকার ঐরূপ একজন মহামানব; মোগলযুগে মহারাষ্ট্রে শিবাজীর গুরু রামদাস স্বামী ছিলেন ঐরূপ একজন ব্যক্তি।

রেলভ্রমণ

তখনও বিজয়ার ব্যথাভরা সুখের রেশটুকু হৃদয় হইতে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয় নাই। আমার অগ্রজ প্রস্তাব করিয়া বসিলেন যে রেলভ্রমণে পূজার ছুটিটুকুর সদ্‌গতি করিতেই হইবে। পূর্ণ উৎসাহ ও প্রকাণ্ড উদ্দীপনা লইয়া সর্ব্বপ্রথম আমিই এ প্রস্তাবে রাজী হইয়া পড়িলাম। আমার অগ্রজ বেশী সঙ্গী সাথী লইয়া ভ্রমণের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাই একা আমাকে পাইয়া তিনি সন্তুষ্ট হইয়া তোড়জোড় আরম্ভ করিয়া দিলেন।

একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দের মধ্য দিয়া আমরা দুটি প্রাণী শহরের রাজপথ দিয়া হাওড়া ষ্টেশন অভিমুখে চলিতে লাগিলাম। সুজাগ নগরের পথে জন-কলরব তখনও সর্ব্বোচ্চ স্তরে বিরাজমান। প্রত্যেক পথিক ও আরোহী তাহার পার্শ্ববর্ত্তী পথিক ও আরোহীর সহিত অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে আলাপ করিতেছে। তথাপি কিঞ্চিৎ দূর হইতে তাহা কর্ণগোচর হয় না। বিপুল জনতার বিচিত্র কোলাহল ব্যাবেলের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। মনে হয় সকলেই বকিতেছে, কিন্তু কেহই কাহাকেও বুঝিতেছে না। যথাসময়ে হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হওয়া গেল। আমার অগ্রজ তাঁহার পূর্ব্বসঞ্চিত অভিজ্ঞতার দোহাই দিয়া টিকিট কিনিতে চলিয়া গেলেন। আমি কিঞ্চিৎ জনবিরল স্থান হইতে ষ্টেশনের ব্যাপার দেখিতে লাগিলাম। ষ্টেশনে অনেকেই যাইয়া থাকেন, কিন্তু আমার বোধ হয় অনেকেই ষ্টেশনের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের সময় পান না। তাঁহাদের দৃষ্টি ঘড়ির দিকে, টিকিটকাটা আফিসের দিকে নিবদ্ধ থাকে, আর থাকে মালবাহী কুলিদের উপর।

যাহা হউক আমি কি দেখিলাম, তাহাই বলি। ষ্টেশন-রাক্ষসী একদিক্ হইতে নানাদেশীয় ও নানাপ্রকারের লোক উদরজাত করিতেছে, আর অপর দিক্ হইতে তাহাদিগকে বাহির করিয়া দিতেছে। তাহার ধূমায়িত উষ্ণ নিশ্বাসের ধূলিকণায় সমস্ত ষ্টেশন পরিপূর্ণ। আমি দেখিলাম ষ্টেশনের বিরাট চত্বরে অনেকেই সময় যাপনের সুরাহা করিয়া লইয়াছে। এই সমস্ত দূরের

যাত্রীর লটবহরের বর্ণনা করিতে গেলে দিশাহারা হইয়া পড়িতে হয়। ইহারা বর্ত্তমান যুগের যাযাবর ; কিন্তু আদিম যাযাবর হইতে ইহাদের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী এবং সেই জন্যই ইহাদের দ্রব্যের তালিকাও অনুরূপ দীর্ঘাকৃতি। তাহাদের মধ্যে কেহ আরামে নিদ্রা দিতেছে, কেহ বা সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে পাঠে নিরত, কতক বা একত্রে গোল হইয়া আহারে ব্যস্ত, আবার অনেকের সহিত শারীরিক সান্নিধ্য ঘটাইয়াও মানসিক অবস্থায় দেশ-দেশান্তরে বিরাজ করিতেছে। আমি আপন মনে এই সব নিরীক্ষণ করিতেছি, এমন সময় আমার ভ্রাতা আসিয়া স্কন্ধে হস্তার্পণ করিলেন। উভয়ে তখন জনতা ভেদ করিয়া রাঁচি ফাষ্ট প্যাসেঞ্জারের জন্য ৯নং প্লাটফরমের দিকে অগ্রসর হইলাম। বলা বাহুল্য আমাদের মালপত্র একটি কুলির মস্তকে দেওয়া হইয়াছিল, আর আমার ভ্রাতা অতি বিশুদ্ধ হিন্দীর ব্যবহার করিয়া উচ্চকণ্ঠে তাহার গতি প্রতিহত ও প্রশমিত করিয়া চলিতে লাগিলেন। এইবার বুঝিতে পারিলাম হাঁকডাক করিয়া হৈ চৈ করিতে আমাদের প্রস্তাবিত রাষ্ট্রভাষা কত মজবুত।

ট্রেনের কামরার মধ্যে তিল ধারণেরও স্থান নাই। কাজেই অনেক বোম্বেওয়ালার হুমকী অগ্রাহ্য করিয়া আমরা একটি কামরায় উঠিয়া পড়িলাম এবং বহুকষ্টে কখনও নরম কখনও গরম হইয়া আমরা দুইটি আসন দখল করিয়া বসিলাম। তখন আমাদের কি স্বস্তি, কি আনন্দ! যেন সবেমাত্র রাজ্য অধিকার করিয়াছি। নূতন সাফল্যের আমেজটুকু পূর্ণভাবে ভোগ করিতে না করিতেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল। রাত তখন ৯।৪ মিনিট—গাড়ী গম্ভীর নিনাদ করিতে করিতে ষ্টেশন পরিত্যাগ করিয়া মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল।

ট্রেনের কামরাকে লোকচরিত্র শিক্ষা করিবার একটি বিশেষ কেন্দ্র বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কারণ এই ক্ষুদ্র কামরার মধ্যে ছত্রিশ রকম জাতের লোক বসিয়াছে এবং বিভিন্ন ভাষার ঝঙ্কারে কামরাটি মুখরিত হইতেছে। আমাদের কামরাটি ক্ষুদ্র ছিল ও তাহাতে ২০ জন বসিবেক বলিয়া বিজ্ঞপ্তি ছিল। মস্তক গণনা করিয়া দেখিতে পাইলাম মাত্র ৩৪টি লোক উঠিয়াছে। তাহাদের মধ্যে

কেহ কেহ ব্যাধির ভাণ করিয়া প্রায় তিনজনের স্থান এক এক জনে অধিকার করিয়া শুইয়া আছে। ইহা হইতে বাকিগুলির অবস্থা সহজেই অনুমেয়। কেহ বা কোন রকমে একটু বসিয়াছে, অনেকেই দাঁড়াইয়া আছে। সেই ক্ষুদ্র কামরার মধ্যে কোনখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের, কোনখানে শিক্ষা-সংস্কৃতির, আবার কোন-খানে বা নিছক খোস গল্পের আলোচনা চলিয়াছে। আমি এক এক করিয়া সব দল কয়টি পরীক্ষা করিলাম। যাহাদের বাক্‌পটুতা আছে এবং কণ্ঠস্বরও ঈষৎ অনুশীলিত তাহারা মধ্যে মধ্যে সকলের দৃষ্টি ও শ্রুতি আকর্ষণ করিতেছিল। আমি সকলের আলোচনার বিষয় ক্রমান্বয়ে শিক্ষা ও পরীক্ষা করিতেছিলাম। ইত্যবসরে গাড়ী দুই একটি ষ্টেশনে থামিয়াছিল এবং আরও দুই একটি যাত্রীকে সেই ক্ষুদ্র কামরায় গ্রহণ করার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছিল। তন্ময় হইয়া কতক্ষণ আভ্যন্তরীণ দৃশ্য দেখিতেছিলাম তাহা বলিতে পারি না হঠাৎ আমার ভ্রাতা বাহিরের শোভা দেখিতে দেখিতে তদ্‌গত চিত্তে গাহিয়া উঠিলেন—"এমন চাঁদের আলো, মরি যদি সেও ভালো, সে মরণ স্বরগ-সমান।" চমকিয়া আমিও তখন বাহিরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলাম।

সেটি ছিল ত্রয়োদশীর রাত্রি। বাহিরে চাহিয়া দেখি যে আমাদের গাড়ী উন্মুক্ত প্রান্তর দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। উভয় পার্শ্বের ধান্যক্ষেত্রে কে যেন দুধ ঢালিয়া দিয়াছে। দূরে বনানীর শিরে চন্দ্রকিরণ গলিত রজতের মত ঝরিয়া পড়িতেছে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট খাল ও পরিপূর্ণ জলাশয় পারদের শুভ্রতা ধারণ করিয়াছে। মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বনের ধার দিয়া গাড়ী ছুটিয়া চলিল। উচ্চ উচ্চ বৃক্ষগুলি আজ যেন শ্বেত শিরোবাস পরিধান করিয়া পূর্ণিমা-উৎসবের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহাদের তলায় অন্ধকার যেন জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে। আলো-আঁধারের বিপুল সমাবেশ এমন আর দেখি নাই। সেই চন্দ্রকিরণ-বিধৌত রজনীর অপরূপ শোভা দেখিতে দেখিতে আমার মনে যে যুগপৎ কত ভাবের উদয় হইয়াছিল তাহা এখন স্মরণ নাই। কিছু পরে বাঙ্কের উপর একটু জায়গা করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম।

ভোর ৬টায় মুড়ী ষ্টেশনে গাড়ী পৌঁছিলে আমার অগ্রজ আমায় জাগাইয়া

তুলিলেন। আমার বিশ্রামের ঘটা সমন্ধে কিঞ্চিৎ সরস মন্তব্য প্রকাশ করিয়া জিনিষপত্র নামাইতে তৎপর হইলেন। বি. এন্. আর. হইয়া রাঁচি যাইতে এই মুড়ী ষ্টেশনে বড় গাড়ী ছাড়িয়া ছোট গাড়ীতে উঠিতে হয়। ইহা আমি জানিতাম, তাই আমাদের কায়েমী ব্যবস্থার বিপর্য্যয় ঘটিলেও আমি তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করি নাই। বিনা বাক্যব্যয়েই গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম। আমার মুখে গত রাত্রির বিশ্রামজনিত অপার তৃপ্তির ছায়া পড়িয়াছে। কতক-গুলি প্রত্যক্ষদ্রষ্টা বিদ্বেষের চক্ষে আমায় দেখিতে লাগিল। মুড়ী ষ্টেশনে মুখ-হাত ধুইয়া 'উদরায়' কিঞ্চিৎ অর্থের সদ্ব্যয় করিলাম। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ। ইহা ছাড়া গোঁড়ামীও যে একবারে নাই তাহা নহে। সেইজন্য তিনি তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া আমার সেই তথাকথিত দুষ্কর্ম্মের সাক্ষী মাত্র হইয়া রহিলেন।

আধঘণ্টা কি তিনি কোয়ার্টার পরে আমাদের ছোট গাড়ী ছাড়িল। এই মিটার গেজের গাড়ী 'মুড়ী' হইতে 'লোহারডাগা' পর্য্যন্ত দৈনিক একবার যায় ও একবার আসে। মধ্যপথে রাঁচি ষ্টেশন। মুড়ী হইতে রাঁচি পর্য্যন্ত পথের দৃশ্য অতি মনোরম। আমরা বাংলার ছেলে; চিরকাল সমতল ক্ষেত্রের মানুষ। পাহাড় আমাদের চিরকালই আকর্ষণ করে। 'সিল্লি' ষ্টেশন ছাড়িয়া যাইবার পর আমাদের গাড়ীখানি দুর্ভেদ্য গিরিমালা ও নিবিড় বনের মধ্য দিয়া ছুটিতে লাগিল। তখনও সূর্য্য উদিত হয় নাই। প্রভাতের শীতল বাতাসে বেশ শীতানুভূতি হইতে লাগিল। গাড়ীর এক দিকে—উচ্চ গিরিমালা অপর দিকে পাতালস্পর্শী খাদ। এইরূপ বিপজ্জনক পথের মধ্যে আসিয়া আনন্দের অপেক্ষা ভয় হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু কেন জানি না আমার অন্তর এক অব্যক্ত আনন্দে ভরিয়া উঠিয়াছিল। ভাবিতেছিলাম এ চলার শেষ যেন কখনও না হয়। এমন সময় গাড়ী 'জোনা'য় আসিয়া পৌছিল। এখানে গাড়ী অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে। আমরা উভয়ে নামিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। এখানকার মাটি লাল ও সর্ব্বত্র পাথরকুচি ও কাঁকর ছড়ানো। আমরা পুনরায় গাড়ীতে চড়িলাম; এবার গাড়ী বিখ্যাত জোনার জঙ্গলের

মধ্য দিয়া চলিতে লাগিল। শাল, তাল, তমাল, হিন্তাল প্রভৃতি গাছ দেখিতে না পাইলেও এক প্রকার বৃক্ষ দেখিলাম, তাহারা বেশ ঋজুভাবে উঠিয়া পাহাড়ের সমুদায় পাষাণ গাত্র আবৃত করিয়াছে,—যেন পাষাণ প্রাণে আনন্দের এক অখণ্ড পুলক জাগিয়াছে। এইরূপ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিতে লাগিলাম। মনে হইতেছিল এ দৃশ্য যেন কখনও শেষ না হয়। কিন্তু সব জিনিষেরই শেষ আছে। আমাদের চলারও শেষ হইল। আমরা বেলা দশটায় রাঁচি পৌছিলাম।

বুদ্ধদেব

প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধোদনের এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। এরূপ কথিত আছে—শুদ্ধোদন-পত্নী এক রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিতেছিলেন যে এক বিশাল শ্বেতহস্তী তাঁহার উদরে প্রবেশ করিতেছে। তাহার পর তাঁহার ঐ পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। শুদ্ধোদন পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন শাক্যসিংহ। শাক্যসিংহের জন্মগ্রহণের পর তাঁহার মাতা দেহত্যাগ করেন। বাল্যকাল হইতেই শাক্যসিংহ নির্জ্জনতাপ্রিয়, চিন্তাশীল এবং সদয়-হৃদয় ছিলেন। একদিন শাক্যসিংহের চক্ষুর সম্মুখে একটি পাখী বাণাহত হইয়া ভূতলে পড়িল। শাক্যসিংহ তাহাকে অতি যত্নে শুশ্রূষা করিয়া বাঁচাইবার চেষ্টা করিলেন। এদিকে যে বালকটি উহার দিকে তীর ছুঁড়িয়াছিল সে আসিয়া পাখীটির দাবী করিল। শাক্যসিংহ পাখীটির শুশ্রূষা করিয়া সুস্থ করিয়াছেন বলিয়া পাখীটির উপর তাঁহারই শুধু যথার্থ অধিকার আছে বলিলেন। বালকটি তর্কের পর শাক্যসিংহের নৈতিক দাবী মানিয়া চলিয়া গেল। বালক শাক্যসিংহ ক্রমে যুবক হইলেন এবং পিতা শুদ্ধোদন তাঁহাকে গোপা নাম্নী একটি সুন্দরী কন্যার সহিত বিবাহ দিয়া সংসার-আনন্দে ডুবাইয়া রাখিতে চাহিলেন। কিন্তু পিতার চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ২০ বৎসর বয়সে রাজপুত্র তাঁহার একটি পুত্রসন্তান জন্মিবার পর গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন। জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর কথা চিন্তা করিয়াই শাক্যসিংহের বৈরাগ্য আসিয়াছিল। তিনি

জরাগ্রস্ত, ব্যাধিগ্রস্ত ও মৃত ব্যক্তির দেহ দেখিবার পরই প্রাণিগণের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা ভাবিয়া চিন্তাকুল হন এবং তাহারই পরিণতি সন্ন্যাস।

অতঃপর শাক্যসিংহ বৈশালী নগরে আসিয়া একজন পণ্ডিতের নিকট বেদাদি অধ্যয়ন করেন ও তাহার পর রাজগৃহের রুদ্র নামক ঋষির নিকট হইতে যোগ শিক্ষা করেন। অবশেষে পাঁচজন শিষ্যসহ গয়ার নিকট উরুবিল্ব নামক স্থানে আসিয়া নৈরঞ্জনা নদীতীরে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। কৃচ্ছ্র-সাধনে তাঁহার শরীর অস্থিচর্ম্মসার হইয়া গিয়াছিল। দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা করিয়াও যখন তাঁহার অভীষ্ট পূর্ণ হইল না তখন তিনি কৃচ্ছ্র সাধন ত্যাগ করিলেন এবং কিছু কিছু পান-ভোজন করিয়া নূতন ভাবের সাধনা আরম্ভ করিলেন। শিষ্যগণ একে একে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। সাময়িকভাবে তিনি একটু হতাশ হইয়াছিলেন। কিন্তু আবার সুদৃঢ়চিত্ত হইয়া আপনার কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অবশেষে ঘনপত্রসমাচ্ছন্ন বটবৃক্ষতলে শাক্যসিংহের ধ্যানমগ্নচিত্তে নির্ব্বাণের মহাশক্তি উপস্থিত হইল। শাক্যসিংহ জীবের দুঃখ হইতে মুক্তিলাভের উপায় আবিষ্কার করিলেন। সেই দিন হইতে তাঁহার নাম হইল গৌতম বুদ্ধ এবং যে বৃক্ষতলে তিনি সিদ্ধিলাভ করেন তাহার নাম হইল বোধিদ্রুম। তাঁহার এখন কর্ত্তব্য হইল অজ্ঞানে আচ্ছন্ন এই জগদ্বাসীকে নির্ব্বাণের পথে চালিত করা। তিনি গয়ার নিকটস্থ মৃগদাবে আসিয়া তাঁহার পূর্ব্ব পাঁচজন শিষ্যকে তাঁহার নবলব্ধ নির্ব্বাণতত্ত্বে দীক্ষিত করেন এবং ক্রমশঃ তাঁহার নূতন ধর্ম্ম সমস্ত দেশের মধ্যে প্রচার করেন। এই ধর্ম্মের মূল কথা অহিংসা। সৎদৃষ্টি, সৎসঙ্কল্প, সদ্বাক্য, সদ্ব্যবহার প্রভৃতি ইহার সাধনোপায়। বুদ্ধদেব তৎকালীন হিংসাবহুল যাগযজ্ঞাদি বৈদিক ধর্ম্মের বিরোধিতা করিয়াছিলেন এবং দেশে একটি ধর্ম্মবিপ্লব আনিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয়াছিল এবং সম্রাট্ অশোকের চেষ্টায় এই বৌদ্ধধর্ম্ম সমগ্র এশিয়ায় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

বুদ্ধদেব রাজার ছেলে হইয়াও জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বৃক্ষতলে, সাধনা করিয়াছিলেন বৃক্ষতলে এবং অবশেষে আশী বৎসর বয়সে কুশীনগরে নির্ব্বাণ

লাভ করিয়াছিলেন বৃক্ষতলে। বুদ্ধদেব যজ্ঞবিধির নিন্দা করিলেও হিন্দুদিগের নিকট বিষ্ণুর অবতাররূপে পূজিত হইয়া থাকেন। ভারতের ধর্ম্মসাধনা যে শুধু ভারতেরই মঙ্গল করে নাই—তাহা যে বিশ্বের মঙ্গল সাধন করিয়াছে, তাহা বুদ্ধ-প্রচারিত ধর্ম্ম হইতেই আমরা বুঝিতে পারি। বাস্তবিক পক্ষে বুদ্ধদেব বৈদিক ধর্ম্মেরই এক বিদ্রোহী সন্তান। উপনিষদের আধ্যাত্মিক ভাব তাঁহার জীবনে পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল।

যান-বাহন

নব্য প্রস্তরযুগে অগ্নি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে প্রথম চাকার পরিকল্পনা হয়। তাহার পর হইতে আদি মানব দারুনির্ম্মিত চক্রের উপর এক গাড়ী প্রস্তুত করিয়া নিজেদের লটবহর স্থানান্তরিত করিত। এই সকল গাড়ী কুকুর, গাধা, ছাগল গরু বা ঘোড়ায় টানিত। সেই আদি যুগ হইতে পশুকর্ত্তৃক গাড়ী টানার রীতি চলিয়া আসিয়াছে। যানের অনেকাংশে উন্নতি হইয়াছে বটে, কিন্তু বাহনের কোনই উন্নতি হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্য্যন্ত লোকে কল্পনা করিতে পারে নাই যে মানুষ বা পশু ছাড়া অন্য কিছু যানের বাহনরূপে কাজে লাগানো যাইতে পারে। আমরা যদি প্রাচীন সভ্যতার আলোচনা করি তাহা হইলে দেখিতে পাইব মিশর হইতে আরম্ভ করিয়া, মেসোপোটেমিয়া, ইউফ্রেতিস্ ভ্যালি, সিরিয়া, এসিরিয়া, গ্রীস, রোম, ক্রীট প্রভৃতি দেশেই প্রথমে সভ্যতার বিকাশ হয়। এশিয়ার ভারতবর্ষ ও চীনের সভ্যতা মিশরের সভ্যতার সমসাময়িক। এই প্রাচীন সভ্যতার যুগেও অশ্ব, উষ্ট্র, হস্তী, গর্দ্দভ, গরু, ছাগল, কুকুর প্রভৃতি যানের বাহন ছিল এবং যানের মধ্যে নানা আকারের কাষ্ঠ-নির্ম্মিত যান ছিল। যোদ্ধারা রথ ব্যবহার করিতেন। স্ত্রীলোকেরা পাল্কী বা চতুর্দ্দোলার ন্যায় যানে করিয়া গমনাগমন করিতেন।

বর্ত্তমান যুগে যান-বাহনের আশাতীত উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও গো-শকট, ঘোড়ার গাড়ী, দেশবিদেশে উট ও হাতী এবং পাল্কী, টাঙ্গা, একা, ডাণ্ডি,

ডুলি প্রভৃতির চলন এখনও একেবারে উঠিয়া যায় নাই। ভারতের পল্লী অঞ্চলে এখনও গো-শকট এবং পাল্কীই প্রধান যান।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে অনেক প্রতিভাবান্ বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাব হয়। তাঁহাদের মধ্যে টমাস ওয়াট প্রথম বাষ্প-শক্তির আবিষ্কার করেন। বাষ্প যে একটি শক্তিরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে এবং তাহার দ্বারা যে কলকারখানা বা যান চালানো সম্ভব হইতে পারে তাহা কেহই তাঁহার আগে কল্পনা করে নাই। ইহার পূর্ব্বে কলকারখানা হাতে চলিত এবং অনেক স্থানে উইণ্ড-মিল বা ওয়াটার-মিল ছিল। ওয়াটের আবিষ্কার যান-বাহনের ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায় আনয়ন করিল। দেখিতে দেখিতে সকল দেশেই ষ্টীম বা বাষ্পের সাহায্যে কল চালানোর কাজ হইতে লাগিল এবং এক প্রকার যান নির্ম্মিত হইল যাহা লৌহনির্ম্মিত লাইনের উপর দিয়া চলিতে লাগিল। বর্ত্তমান যুগের রেল গাড়ীর সেটি শৈশব অবস্থা।

বাষ্প-শক্তির আবিষ্কারের সঙ্গে ভূপৃষ্ঠের যান-বাহনের সহিত জলপথে নৌকা বা জাহাজেরও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইল। ষ্টীমের সাহায্যে জাহাজ প্রভৃতি নীল সাগরের বুকে অবাধে চলাচল করিতে লাগিল। পূর্ব্বে যে কোন প্রকার যানের পক্ষে একসঙ্গে অনেকগুলি যাত্রী বহন করা অসম্ভব ছিল এবং উহাতে দ্রুত গমনাগমনও করা যাইত না। বাষ্পীয় রথে বা বাষ্পীয় পোতে করিয়া একসঙ্গে অনেকগুলি যাত্রীকে লইয়া অনেক দ্রুতগতিতে গমনাগমন সম্ভব হইয়া উঠিল। মালপত্র চালানের সুবিধা হওয়াতে ব্যবসা-বাণিজ্যও দ্রুত প্রসার লাভ করিতে লাগিল।

বিদ্যুৎ আবিষ্কারের সহিত যান-বাহনের চরম উন্নতির সূচনা হইল। বিদ্যুৎকে কাজে লাগাইয়া মানুষ যে কত উপকৃত হইয়াছে তাহা নিঃশেষে বর্ণনা করা যায় না। আজ জগতে যা কিছু উন্নতি—সকলের মূলে এই নৈসর্গিক শক্তিই নিহিত রহিয়াছে। বিদ্যুতের সাহায্যে মানুষ অসম্ভবকে সম্ভব করিতেছে। বিদ্যুৎ আবিষ্কারের সহিত নূতন নূতন নানাপ্রকার যান-বাহনের সৃষ্টি হইল। মোটর, ট্রাম, বাস, লরী, এরোপ্লেন প্রভৃতি যানের সৃষ্টি হইয়াছে। এখন

বিদ্যুতের সাহায্যে কত প্রকার যানের পরিকল্পনা চলিতেছে। আজকাল যান-বাহনের সমস্যা আর নাই। এবার কত দ্রুতগতিতে যান্ চালানো যাইতে পারে তাহা লইয়া বৈজ্ঞানিকেরা মাথা ঘামাইতেছেন। এরোপ্লেন সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগতিতে যায়, কিন্তু বর্ত্তমানে আমেরিকায় মোটরের গতি সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুত করিবার আয়াসে বহু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। এখন আমরা অতি অল্প খরচেই ঘণ্টায় পঞ্চাশ, ষাট মাইল করিয়া বহুদূর স্থানে গমন করিতে পারি। একশত বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশে যে সমস্ত স্থানে গমনাগমন সম্পূর্ণ অসাধ্য ছিল এখন সে সকল স্থান দিয়া রেলের লাইন বসিয়াছে, মোটরের পথ প্রস্তুত হইয়াছে। এখন ইচ্ছা করিলেই আমরা ঐ সকল স্থানে অতি সহজেই গমন করিতে পারি। কি স্থলপথে, কি জলপথে, কি আকাশপথে সর্ব্বস্থানে এখন মানুষের গতিবিধি অবাধ হইয়াছে।

একশত বৎসর পূর্ব্বে যে প্রশ্ন লইয়া মানুষকে মাথা ঘামাইতে হইয়াছিল সেই যানবাহনের প্রশ্ন এখন আর উঠে না। এখন গতিবৃদ্ধি করিয়া সময় এবং দূরত্বের ব্যবধান দূর করিবার জন্য অনেকেই মাথা ঘামাইতেছেন। যানবাহনের উন্নতির জন্যই সভ্যতা এরূপ দ্রুত বিস্তার লাভ করিয়াছে। আজ পৃথিবীর যে কোন স্থান হইতে ইচ্ছা করিলে অন্য যে কোন স্থানে যাওয়া যায়। এক দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি অপর দেশের লোকেরা গ্রহণ বা অনুকরণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। সাম্রাজ্য-বিস্তার, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার, বিভিন্ন দেশীয় বা জাতীয় লোকচরিত্র শিক্ষা প্রভৃতি—যদি যানবাহনের উন্নতি না হইত, তাহা হইলে কখনই সম্ভব হইত না। যানবাহনের উন্নতি ও বিকাশের আলোচনা জগতের সভ্যতার উন্নতি ও বিকাশের আলোচনার একটি বিশিষ্ট অংশ।

অশোক

চন্দ্রগুপ্ত যে বিশাল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন তাহা তাঁহার পুত্র বিন্দুসারের দ্বারা শাসিত হইয়া অবশেষে তাঁহার পৌত্র অশোকের নিকট

উপস্থিত হইল। অশোক বাল্যকালে অত্যন্ত দুর্দান্ত ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। সম্ভবতঃ যে অসাধারণ প্রতিভার অপূর্ব্ব স্ফুরণের ফলে চন্দ্রগুপ্ত সহস্র প্রকার প্রতিকূল অবস্থাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন সেই রক্তধারা অশোকের বালক-দেহের শিরায় উপশিরায় উন্মাদের নৃত্য করিত, এ অবস্থায় অশোক দুর্দান্ত দুর্জ্জয় সাহসী না হইয়া স্থির ধীর প্রকৃতির হইতে পারেন কি? অশোক রাজ্য-কর্ণধার হইয়া প্রথমতঃ যেন বংশধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য রাজ্যবিস্তারে মনোযোগী হইলেন। অশোক তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের জন্য তখন চণ্ডাশোক নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

রাজ্যলাভের আট বৎসর পরে রাজ্যলোলুপ চণ্ডাশোক কলিঙ্গ-বিজয়ের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। কলিঙ্গ পরাজিত হইল। দেড় লক্ষ কলিঙ্গবাসী যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিল। চারিদিকে আহতের আর্ত্তনাদ, নিরন্নের হাহাকার। চণ্ডাশোকের চণ্ডমূর্ত্তি যখন সহসা ক্লান্তিতে অবসাদে ম্লান হইয়া পড়িল। অশোক শোকে, ব্যথায় উন্মত্তপ্রায় হইলেন। বিরাট রাজ্যপিপাসা আজ অসীম হাহাকারে পরিণত হইল। কিছুকাল পরে শান্তি ও অহিংসার বার্ত্তা লইয়া উপস্থিত হইলেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী উপগুপ্ত। অশোক সন্ন্যাসীর নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। অহিংসার নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া নব-জীবন লইয়া অশোক পুনরায় সিংহাসনে আসিয়া বসিলেন।

বুদ্ধদেবের দিব্য মন্ত্রে উদ্দীপিত সম্রাট্ দিকে দিকে অহিংসার বার্ত্তা প্রেরণ করিলেন। প্রস্তরস্তম্ভে গিরিগাত্রে প্রভু বুদ্ধের উপদেশ খোদিত করিয়া দিলেন। পালিভাষায় লিখিত তাঁহার অনুশাসন প্রজাগণকে মাতাপিতৃভক্তি, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা, অসৎকার্য্য হইতে বিরতির পথে অনুপ্রাণিত করিল। অশোক তাঁহার রাজ্যে নিরর্থক জীবহিংসা নিষেধ করিয়া দিলেন। ভারতবর্ষ একটি প্রশান্ত দিব্যজীবন লাভ করিল। সন্ন্যাসীর জয়গানে মুখরিত ভারত নির্ব্বাণের ভাবে প্রভাবিত হইল। সম্রাটের অহিংসার বিজয়বাণী শুধু ভারতবর্ষকে মহীয়ান্ করিয়াই ক্ষান্ত হইল না। তাঁহার পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রা প্রভু বুদ্ধের অমৃতময়ী বার্ত্তা লইয়া সিংহলে চলিয়া গেলেন সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে।

তিব্বতে চীনে অশোকের ধর্ম্মপ্রচারকগণ বৌদ্ধ-ধর্ম্মকে প্রসারিত করিয়া দিলেন। আন্টিওকাস, টলেমি, আন্টিগোনাস, মাগাস ও আলেকজাণ্ডার প্রভৃতি গ্রীক রাজার রাজ্যে অশোক তাঁহার প্রভুর উপদেশ প্রচারের জন্য বৌদ্ধপণ্ডিত ও সাধুদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে আলেকজাণ্ডার আসিয়াছিলেন যুদ্ধ করিয়া ভারতবর্ষ জয় করিতে, আর অশোক তাহার প্রত্যুত্তরে ধর্ম্মের নীতির, অহিংসার মন্ত্র পাঠাইয়াছিলেন গ্রীসে। এই বিশালহৃদয় সম্রাট্ আজীবন ধর্ম্মপ্রচাররূপ যে বিরাট সাধনা করিয়াছিলেন তাহার ফলে আজও চীন, জাপান তিব্বত, ব্রহ্ম, সিংহল প্রভৃতি দেশ বুদ্ধের নামে মস্তক অবনত করে। সম্রাট্ অশোক শুধু বিশাল ভূমিখণ্ডের সম্রাট্ ছিলেন না, তিনি ছিলেন ধর্ম্মরাজ্যের সম্রাট্।

অশোক ছাড়া আরও একজন ভারতীয় সম্রাট্ বৌদ্ধধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি কুষাণসম্রাট্ কণিষ্ক। কিন্তু কুষাণগণ ভারতবর্ষে আক্রমণকারিরূপে আসিয়াছিলেন এবং বৌদ্ধপ্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। তাহারই ফলস্বরূপে কণিষ্ক হইয়াছিলেন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারক। আর অশোক এই দেশের জলে মাটিতে রাজোচিত দোর্দ্দণ্ড প্রতাপসম্পন্ন হইয়া এবং রাজ্যবিস্তার-প্রয়াসী হইয়া অবশেষে বৌদ্ধধর্ম্মে শান্তি লাভ করিলেন এবং সেই শান্তির বার্ত্তা বিশ্বে ঘোষণা করিলেন।

অশোকের পরে আরও দুইজন প্রতিভাশালী হিন্দু সম্রাট্ ভারতকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। একজন থানেশ্বরের হর্ষবর্দ্ধন এবং আর একজন বহুগুণ-বিভূষিত সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাসম্পন্ন সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্ত। ভারতের জাতীয় জীবন এই দুই সম্রাটের সাম্রাজ্য-মাহাত্ম্যে কম উন্নত হয় নাই। কিন্তু হর্ষবর্দ্ধন ও সমুদ্রগুপ্ত শুধু ভারতবর্ষের, আর সম্রাট্ অশোক বিশ্বের। অশোকের ধর্ম্ম-সাম্রাজ্যের প্রভাবে সমগ্র জগৎ উন্নীত হইয়াছে—শুধু ভারতবর্ষ নহে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ইংরাজী যুগে যে সকল ব্যক্তি স্বীয় প্রতিভাবলে স্বনামধন্য হইয়াছেন তাঁহাদের অধিকাংশই ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত। কিন্তু বিদ্যাসাগর তাহার বিপরীত। বিদ্যাসাগরের জীবন যেন ঘোষণা করিতেছে শুধু স্কুল কলেজের ছাত্রই নয়, টোলের ছাত্রও মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিতে পারে। টোলের ছাত্রও সমাজ ও স্বদেশের সেবা করিতে পারে এবং জ্ঞানী, গুণী হইয়া আদর্শস্থানীয় হইতে পারে।

ঈশ্বরচন্দ্রের নাম উচ্চারণ করিবার যোগ্যতাও আমাদের মত সাধারণ বাঙ্গালীর নাই। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এই মহামানবের জীবন-কথা বলিতে যাইয়া শ্রদ্ধাবনতভাবে বলিয়াছিলেন, সাধারণ মেরুদণ্ডহীন বাঙ্গালী-চরিত্রের সহিত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত্রে এতখানি পার্থক্য যে সহসা সন্দেহ হয় ইউরোপীয় প্রভাবে বিদ্যাসাগর মানুষ হিসাবে অত বড় হইয়াছিলেন কি না? কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র আচারে ব্যবহারে বিদ্যায় তাঁহার আত্মভোলা সহানুভূতির মধ্য দিয়া বাঙ্গালীই ছিলেন। যদিও পুরুষকার আজ বাঙ্গালী-চরিত্রে দুর্লভ বস্তু, তবুও পুরুষানুক্রমে ব্রাহ্মণ্য-সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ বহনকারী তাঁহার পিতৃপুরুষগণের অস্থি-মজ্জা হইতেই তিনি এই পৌরুষ লাভ করিয়াছিলেন।

বাল্যে গ্রাম্য পাঠশালায় পাঠরত ঈশ্বরচন্দ্র, কলিকাতায় পিতার আদেশে পাচকের কাজ করিয়া সংস্কৃত শিক্ষায় মনঃপ্রাণ-সমর্পণকারী ঈশ্বরচন্দ্র, যৌবনে অধ্যাপক ঈশ্বরচন্দ্র, পরবর্ত্তী জীবনে বাঙ্গলা সাহিত্যের অন্যতম স্রষ্টা ও প্রাথমিক শিক্ষার গ্রন্থ-প্রণয়নে রত ঈশ্বরচন্দ্র, ব্যাকরণ-কৌমুদী-প্রণেতা ঈশ্বরচন্দ্র বাঙ্গলা দেশের কতখানি সেবা করিয়া গিয়াছেন, আজ সহসা আমাদের পক্ষে তাহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন। দীন-দুঃখীর দুঃখ দূর করিবার জন্য আত্মভোলা পরোপকারীর কথা ঐ রকম আর আমরা শুনিতে পাই না। দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করিয়া আরও অনেকে ছাত্রজীবনে সফলতা অর্জ্জন করিয়াছেন,

কিন্তু সে সংগ্রামে মনুষ্যত্বের উগ্র বীর্য্য ঐ রকম আর কাহাকেও লাভ করিতে দেখি না।

হঠাৎ কোন মানুষ বড় হয় না। আমরা অবশ্য পড়ি মেদিনীপুর জেলায় বীরসিংহ গ্রামের ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণের পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র বহু কষ্ট করিয়া লেখাপড়া শিখিয়া বড় হইয়াছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে দরিদ্র ব্রাহ্মণ-গৃহে আমাদের দেশে প্রতি বৎসর বহু সন্তান জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু সবাই ঈশ্বরচন্দ্র হয় না। আমরা অবশ্য বলিতে পারি প্রতিভাবান্ ছেলে জন্মগ্রহণ করে না, এইজন্য সকল দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তান ঈশ্বরচন্দ্র হয় না। কথাটা আংশিক সত্য। কিন্তু মেধাবী দরিদ্র বহু ছাত্র আমাদের দেশে আছেন, কঠোর জীবন-সংগ্রামে কেহ সফলতা অর্জ্জন করেন, কেহ বা করেন না। যাঁহারা সফল হন তাঁহারাও ঈশ্বরচন্দ্রের ন্যায় দয়ার সাগর, মাতৃভক্ত, সমাজ-সেবক হন না। ঈশ্বরচন্দ্র বড় হইয়াছিলেন শুধু তাঁহার মেধার জন্য নয় শুধু দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করার জন্য নয়। ব্রাহ্মণোচিত ত্যাগের আদর্শের মধ্যে আবাল্য প্রতিপালিত হওয়ার জন্যই তিনি মহাপুরুষ হইয়াছিলেন। তাঁহার মাতা ভগবতী দেবী দরিদ্র ব্রাহ্মণপত্নী হইলেও যথাসাধ্য দরিদ্র ও দুঃস্থ ব্যক্তিগণের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। পিতা ঠাকুরদাস কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে জীবনকে পরিচালিত করিয়াছেন। এইরূপ মাতাপিতা লাভের সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল। তাই তিনি বিরুদ্ধপক্ষীয়গণের নিকট কঠোর ও দুঃস্থ দরিদ্রগণের প্রতি দয়াশীল হইতে পারিয়াছিলেন। 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি'—মহাপুরুষের এই লক্ষণ তাঁহার জীবনে পরিপূর্ণ হইয়াছে।

এইদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের প্রথম যুগে ঈশ্বরচন্দ্র প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছেন, গ্রামে উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় ও কলিকাতায় মেট্রোপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউসান স্থাপন করিয়াছেন, সংস্কৃতশিক্ষা সকল শ্রেণীর লোকের জন্য উন্মুক্ত করিয়াছেন, তাহারই ফলে আজ দেশ শিক্ষা-বিষয়ে কিছু অগ্রসর হইয়াছে। ইংরাজীযুগে বলিতে গেলে বিদ্যাসাগরই প্রথম

শিক্ষাপ্রচারে ব্রতী। কেবল পাণ্ডিত্যে ও বিদ্যাবত্তায় নয়, চরিত্রের তেজস্বিতা ও দৃঢ়তায়, অন্তরের কোমলতা ও সরলতায়, স্বাভাবিক ঔদার্য্যে ও মহানুভবতায় ঈশ্বরচন্দ্র বিগত যুগের শ্রেষ্ঠ পুরুষ। শিক্ষাপ্রচারে, সাহিত্য-সেবায়, সমাজসংস্কারে তাঁহার দানের তুলনা নাই।

একটি ছোট গল্প

অবসরপ্রাপ্ত সাবজজ মুকুন্দরাম সান্যালের বড় ছেলে পরিমল সান্যাল অর্থনীতিতে এম্. এ. পরীক্ষায় প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে এই সংবাদে বাড়ীতে ভয়ানক সোরগোল পড়িয়া গিয়াছে। পরিমলের বি. এ. পড়িবার সময় হইতেই বহুস্থানের জমিদার, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে তাঁহাদের মেয়ের সহিত বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাঁহারা যথেষ্ট পরিমাণ যৌতুক বাবদ অর্থ, গহনা এবং বিলাত যাওয়ার খরচ বহন করিতে রাজী হইয়াছেন; কারণটা অবশ্য সুস্পষ্ট, বড়লোকের একমাত্র ছেলে, লেখাপড়ায় ভাল, সুদর্শন এবং বিলাত গেলেই হোমরা-চোমরা হওয়া অবশ্যম্ভাবী। মুকুন্দবাবু ছেলের পড়াশুনা শেষ হয় নাই বলিয়া রাজী হন নাই। এইবার ছেলের এম্. এ. পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, ফলও বাহির হইয়াছে এবং তাহা ভাল; কাজেই তিনি রাজামহারাজার বৈবাহিক হইবার সুযোগ খুঁজিতেছেন। পাশের সংবাদে ভবানীপুরের সাবজজ সাহেবের বাসাটি টলমল করিতেছে। বহু জায়গা হইতে তারে 'কন্‌গ্র্যাচুলেসান' আসিতেছে। অনেকটা হৈ-হৈ ব্যাপার!

পাশের উৎসব শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন মুকুন্দবাবু ছেলেটিকে কি ভাবে পাত্রীস্থ করিয়া বিলাত পাঠান যায় ভাবিতেছেন এবং তাঁহার এই ভাবনাও যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু পরিমল আপাততঃ বিবাহ করিবে না বলিয়া মত প্রকাশ করিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাল ছেলে, পিতার সুপুত্র হইয়া মুকুন্দবাবুর কোন কার্য্যে অমত করিবে না ইহাই আশা করা গিয়াছিল, কিন্তু এক্ষেত্রে সে-আশা

পূর্ণ হইল না। পরিমল বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি রিসার্চ্চ স্কলারশিপ যোগাড়ের জন্য ব্যস্ত এবং শীঘ্রই তাহা পাইবে বলিয়া অনুমান করা গেল। বিদেশযাত্রায়ও পরিমলের অমত আছে বলিয়া অনুমান হয় না, তবে তাহা মুকুন্দবাবুর টাকায় অথবা গবর্ণমেণ্টের স্কলারশিপ হইতে হইলে পরিমল প্রস্তুত, এই প্রকার কথা পরিমলের বন্ধুবর্গ বলিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য পরিমলের ব্যবহারে তাহার পিতৃদেব অসন্তুষ্ট। পরিমল যথারীতি কলেজ-ছাত্রের মত ১০টার সময় খাওয়া-দাওয়ার পর ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরীতে গিয়া পড়াশুনা করিয়া ৩।৪টার সময় ফেরে, আবার বৈকালে বেড়াইতে বাহির হয়, সন্ধ্যার পরে বন্ধুবর্গের গৃহাদিতে কোন কোন দিন তাশ-পাশা খেলিয়া রাত্রি ৯টার সময় বাড়ী ফেরে। পরিমল এখন বাঙ্গালা দেশের গ্রামগুলির পুনর্গঠন করিতে হইলে অর্থনৈতিক বনিয়াদ কিরূপ হওয়া উচিত, এই সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণা করিবে স্থির করিয়াছে।

নিয়মিতভাবে পরিমলের দিনের পর দিন যাইতেছে। তাহার এক বন্ধু অসীম রায় অর্থনীতিতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার পূর্ব্বক এম্. এ. পাশ করিয়া এখন কলিকাতার এক ছোট রাস্তার উপর একটি ছোট চায়ের দোকান খুলিয়াছে। চাকুরী না করিয়া স্বাধীনভাবে দাঁড়াইবার তাহার ইচ্ছা। অবশ্য চায়ের দোকান দিয়া দাঁড়ান যায় কিনা তাহার পরীক্ষা চলিতেছে। পরিমল অসীমের একজন বড় উৎসাহদাতা। প্রায় সন্ধ্যার পর গিয়া তাহার কার্য্যে সাহায্য করিয়া থাকে। অসীম এবং পরিমল একত্র হইলেই দেশের শিক্ষিত বেকারগণের জীবিকার উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করে।

একদিন সকাল বেলা কি একটা কাজে বাহির হইবে ঠিক করিয়া বৈঠকখানার ঘরে আসিয়া দেখিল জনৈক শীর্ণকায় দরিদ্র ভদ্রলোক মুকুন্দবাবুর দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইয়া আছেন। মুকুন্দবাবু "আমার বর্ত্তমানে কিছু দিবার উপায় নাই" বলিলেন—ব্রাহ্মণটি ধীরে ধীরে বাহির হইয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। পরিমল অনেকদূর পর্য্যন্ত তাঁহার অনুসরণ করিল এবং বাসা হইতে কিছুদূরে আসিলে ভদ্রলোকের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা

করিল—"আপনি বাবার কাছে কি জন্য গিয়াছিলেন?" ভদ্রলোকটি উত্তর করিলেন—"বাবা, কন্যাদায়!" ঐ শীর্ণকায় ভদ্রলোকটির উত্তরের ভিতর পরিমল যেন দরিদ্র কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোকগণের সমবেত মূক আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইল। পরিমলের পকেটে তখন ১৫।৵১০ ছিল। সে সব শুদ্ধ ভদ্রলোকটিকে দিয়া দিল, ভদ্রলোকটি অবাক্ হইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। পরিমল তাঁহাকে—বলিল "এর ভিতর অসাধারণত্ব কিছু নেই।" তারপর সে তাহার কাজে চলিয়া গেল।

পরিমল অসীমের সঙ্গে এত আলাপ আলোচনা করিলেও বাস্তবিক পক্ষে অসীমের বাড়ীর অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ সে রাখে না। হঠাৎ একদিন তুই বন্ধুর আলাপে পরিমল বুঝিতে পারিল, অসীমের বাবা অসীমের ছোট দুই ভাইয়ের পড়ার খরচ দিয়া এবং ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া আছেন। তাহার উপর একটি কন্যা বড় হইয়াছে, তাহার বিবাহের চিন্তাও আছে। স্কুল মাষ্টারী ও টিউসানি করিয়া যাহা তিনি পান তাহাতে তাঁহার বিশেষ কিছু হয় না। পাবনা শহরে তাহাদের বাসা। পরিমল তখন অসীমকে বলিল—"চায়ের ব্যবসায় সুবিধা করতে পার ভাল, নইলে তোমায় চাকরী করতে হবে, সেন্টিমেন্টের উপর কাজ করলে চল্‌বে না; তোমাদের সংসার চলা চাই ত। ভাবের ঘোরে চিরকাল কাটান যায় না।"

ছয়মাস পরে।

অসীম চাকুরী করিবে না এই ইচ্ছা রক্ষা করিতে পারে নাই। অসীমের বাবা গণপতিবাবু ইহার মধ্যে একমাস অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন, ভগবানের দয়ায় সেই সময় অসীম কর্পোরেশনে একটা স্কুল-মাষ্টারী কোন রকমে যোগাড় করিয়া লইয়াছে, সকালে বিকালে প্রাইভেট টিউসানি করে। একমাস কাজ করিবার পর গ্রীষ্মের ছুটি আসিল। অসীম সন্ধ্যাবেলায় বাড়ী আসিবার জন্য তোড়জোড় করিতেছে, পরিমল আসিয়া বলিল—"চল, কয়েক দিন বেড়িয়ে আসি তোমাদের ওখান থেকে।"

পরদিন সকাল বেলা।

গণপতি বাবুর শরীরটা এখন অনেক ভাল। অসীম ও পরিমল অসীমদের পাবনার বাসায় বসিয়া বার্ণাড্ শ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছে। চা-পানান্তে গণপতি বাবু প্রাতভ্র্মণে বাহির হইয়া গেলেন। গণপতি বাবুর মেয়ে লতিকা অসীম ও পরিমলকে চা দিয়া গেল। আলোচনা ক্রমে বার্ণাড্ শ হইতে রবীন্দ্রনাথে চলিয়া আসিল। অসীম হঠাৎ লতিকাকে জিজ্ঞাসা করিল "লতিকা, তোর ঐ রবিবাবুর 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটা মুখস্থ আছে, বলতে পারিস্ এখন ?" লতিকা কোন কথা না বলিয়া সলজ্জ হাসিয়া চলিয়া গেল। লতিকা শহরে স্কুলের অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে, শ্যামবর্ণা—যাহাকে আমরা সুন্দরী বলি তাহা নয়, তবে তাহার গঠনের মধ্যে একটা সুন্দর কমনীয়তা আছে। আধুনিকতার বাতিকগ্রস্ত সমাজ হইতে একটু দূরে মফঃস্বল শহরে আসিয়া পরিমলের চিত্ত একটু বিশ্রাম চাহিতেছে।

তারপর পৃথিবীর ইতিহাসে নরনারীর পরস্পর প্রীতিতে যাহা হইয়া থাকে তাহাই হইল। পরিমলের লতিকাকে ভাল লাগিল। প্রতিবেশী মহিলাবর্গ মেয়েটির অদৃষ্ট ভাল বলিবে। অসীমকেও কেউ কেউ বুদ্ধিমান্ বলিতে পারে।

সেইদিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত পরিমল ও অসীম গণপতি বাবুর সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা বলিল—বেশীর ভাগ কথাই গণপতিবাবুর সংসারের দুরবস্থা লইয়া। পরিমল গণপতিবাবুকে নানা কথার পর বলিল—"লতিকার ভার নিলুম—"

ইতিহাস-পাঠের প্রয়োজনীয়তা

যে কোন উচ্চ বিষয়ে জ্ঞানলাভ হিতকর সন্দেহ নাই; কিন্তু ইতিহাস এমন একটি বিষয় যাহার সম্বন্ধে জ্ঞান মানুষমাত্রেরই থাকা প্রয়োজন। মানুষের একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে তাহার পিতৃপিতামহদের কথা জানিবার। মানুষের সভ্যতার আদিম মূর্ত্তি, মানুষের সমাজের বিভিন্ন যুগের কর্ণধারবৃন্দের জীবনকথা, বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন দেশের যুদ্ধ-বিগ্রহ-সন্ধি

ইত্যাদির কথা না জানিলে মানুষ মানুষ হিসাবে অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। কোন্ সুদূর অতীতে আসিরিয়া ব্যাবিলোনিয়ায় মানব-সভ্যতা তাহার আদিম মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, কেমন করিয়া বন্য মানুষ ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন ধাতুদ্রব্যের ব্যবহার শিখিল, মানুষের মধ্যে লেখা-পড়ার প্রচলন হইল কি প্রকারে,—এই সমস্ত বিভিন্ন প্রশ্ন মানুষের হৃদয়ে সাধারণভাবে উদিত হইয়া থাকে এবং স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসাবশতঃ ছাত্রগণও ইহা জানিতে চেষ্টা করে। এই সকল কথা জানিয়া সুন্দরতর বিজ্ঞতর ভাবে নূতন সভ্যতার গোড়া পত্তন করিতে চেষ্টা করে। রাষ্ট্রই হউক আর সাহিত্যই হউক, অথবা বিজ্ঞান দর্শনই হউক, হঠাৎ একদিন সুপ্রভাতে মানুষ এতগুলি বস্তু আয়ত্ত করে নাই। ইহার জন্য মানুষকে যুগ-যুগান্তর ধরিয়া সাধনা করিতে হইয়াছে—সেই সাধনার ধারা, তাহার উত্থান-পতনের স্মৃতি মানবসভ্যতার অনন্তযাত্রার পথে মূর্ত্ত হইয়া রহিয়াছে, নূতন মানবসন্তান এই সকল জানিয়া নূতন উৎসাহে অগ্রসর হইবে।

ইতিহাস-পাঠের প্রয়োজনীয়তা প্রথমতঃ প্রাচীন জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্যই—এ কথা বলা যায়। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্র ও সমাজ মানবজীবনের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের সহিত বিজড়িত এবং ইহাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করিতে হইলে ইতিহাসের জ্ঞান সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন। ইতিহাস বাদ দিয়া রাজনীতি ও সমাজনীতির জ্ঞান সম্ভব নহে। মানব-সভ্যতার উত্তরাধিকারী হিসাবে মানব-সমাজের প্রথম কর্ত্তব্যই হইতেছে ইতিহাসের জ্ঞান লাভ করা। একটা জাতিকে বুঝিতে হইলে সে জাতির ইতিহাস জানিতে হইবে। জাতিগঠন করিতে হইলেও ঐতিহাসিক কাল হইতে বিভিন্ন যুগে জাতি যে সকল ভাব-ধারাকে বহন করিয়া লইয়া আসিয়াছে তাহা জানা প্রয়োজন। ফরাসী-বিপ্লব ফরাসী-জাতির ইতিহাসে এমন একটি ঘটনা যাহা প্রত্যেক বালকের অবশ্য জ্ঞাতব্য। ম্যাট্‌সিনি ও গ্যারিবল্ডি ইতালীকে কি ভাবে নবজীবন দানের চেষ্টা করিয়াছেন ইহা শুধু ইতালীয় বালকের জানিবার বিষয় নহে, ইহা সকল দেশের বালকবৃন্দের অবশ্য জ্ঞাতব্য। রোম একদিন কি ভাবে সমগ্র জগতে সভ্যতা ও

সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল আর তারপর এত বড় রোমান সাম্রাজ্য বর্ব্বরের আক্রমণে ভাঙিয়া গেলই বা কি করিয়া? সে কথা পাঠ করিতে করিতে প্রত্যেকটি বালক প্রাচীন জগৎ সম্বন্ধে নানা প্রকার জ্ঞানলাভ করিবে। অন্যান্য বিষয়ে পাণ্ডিত্য লাভ করিলেও ইতিহাসের জ্ঞান যাঁহার নাই তাঁহার শিক্ষা একরূপ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

একটা প্রাচীন জাতিকে নূতনভাবে উদ্দীপ্ত করিতে হইলে, তাহার জাতীয় জীবনের মরাগাঙে নূতন স্রোত আনিতে হইলে তাহাকে তাহার গৌরবময় প্রাচীন ইতিহাসের কথা স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে। পশ্চাতে ফিরিয়া যাওয়া যায় না ইহা সত্য, প্রাচীন জগতে বা প্রাচীন যুগে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা অসুস্থ মনের লক্ষণ তাহাতেও সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রাচীন জগৎ ও প্রাচীন যুগ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ না করিলে নূতনের পথে অগ্রসর হইবার উপযুক্ত পথ সন্ধান করাও সম্ভব নয় এবং সেইজন্য ইতিহাসের সুস্পষ্ট জ্ঞান প্রয়োজন।

ইতিহাসের জ্ঞান যে অতি প্রয়োজনীয় এবং তাহা সকল দিক্ দিয়া যে উপযোগী এ বিষয়ে মতানৈক্য হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। এ কথা বলিলে বোধ হয় বাহুল্য হইবে না যে ইতিহাসের জ্ঞান ব্যতীত প্রত্যেকটি বিষয়ের জ্ঞান অসম্পূর্ণ। যিনি মধ্যযুগের সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে চাহেন, তাঁহাকে সেই যুগের ইতিহাস পাঠ করিতে হইবে, যিনি মধ্যযুগের দর্শন পাঠ করিতে চাহেন, তাঁহাকেও সেই যুগের ইতিহাস সামান্য পরিমাণে জানিতে হইবে। যিনি যাহাই মানুন এবং যিনি যাহাই করুন, ইতিহাসের জ্ঞান তাঁহাকে অল্পাধিক সাহায্য করিবে। যদি দুনিয়ার বড় কর্ম্মী হইতে চাহেন, ইতিহাস পাঠ করিতে হইবে—জানিতে হইবে অতীত জগতের কর্ম্মিবৃন্দের জীবনী। যদি বড় কাব্যামোদী হইতে চাহেন, প্রাচীন জগতের কাব্য-সমুদ্রে অবগাহন করুন। যদি বড় চিন্তাবীর হইতে চাহেন, প্রাচীন জগতের চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হউন। যে কোন দিক দিয়া মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিতে হইলে, নাগরিক হিসাবে কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে হইলে, অথবা গ্রাম্য জীবনকে সুন্দরতর করিতে হইলে, ইতিহাস পাঠ করিতেই হইবে।

একটি চিঠি—বন্যার বর্ণনা

প্রিয় নিখিলেশ,

এই মাত্র স্কুল হইতে আসিয়া তোমার পত্র পাইলাম, খামে ভরা আমার নামে চিঠি দেখিয়া প্রথমটা একটু ইতস্তত: করিতেছিলাম, এমন সময় তোমার অতি পরিচিত হস্তাক্ষর দেখিয়া আশ্বস্ত হইলাম। নবাবগঞ্জ এখন জলমগ্ন হইয়াছে শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। বর্ষা এবার সর্ব্বত্রই অতিরিক্ত হইয়াছে, আমরাও সব বাঁধ-ভাঙ্গার আতঙ্কে আতঙ্কিত হইয়া আছি। মধ্যরাত্রে হঠাৎ চীৎকার শুনিয়া ঐ বুঝি বাঁধ ভাঙ্গিল ভাবিয়া সকলে ভয়ে কলরব করিয়া ওঠে। দূর হইতে কোন বৃদ্ধের কাতর আর্ত্তনাদ দিঙ্‌মণ্ডল পর্য্যন্ত শোকাকুল করিয়া তুলিতে চায়। অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রিটা নিস্তব্ধতায় থম্ থম্ করিতে থাকে। পরদিন সকালে উঠিয়া সংবাদপত্রে দেখি—দিকে দিকে বন্যা আর বিপন্নের দুর্দ্দশা। বন্যা যেন শুধু চারিদিক্ প্লাবিত করিয়াই ক্ষান্ত হইতেছে না, তাহার উপর একটি অশরীরী ভাব লইয়া প্রকাণ্ড দুঃস্বপ্নের মত সমস্ত দেশের চিত্তে প্রসারিত হইয়াছে। আজ বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বন্যাদায়!

গত শনিবার দিন আমরা কয়েকজন বন্ধুতে একটি নৌকা ভাড়া করিয়া গ্রামের দিকে অগ্রসর হইলাম। আমাদের হেডমাষ্টার মহাশয় এবং পণ্ডিত মহাশয়ও সেই নৌকাতে ছিলেন। নৌকার ভিতরে হেডমাষ্টার মহাশয় আমাদের সহিত "প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে" পুত্রের সহিত পিতার যেরূপ ব্যবহারের বিধান আছে সেইরূপ ব্যবহারই করিতেছিলেন। পণ্ডিত মহাশয়ের কল্কে সাজানোর জন্য আমাকে মধ্যে মধ্যে ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল।

আমরা বেলা প্রায় দুইটার সময় রওনা হইয়াছিলাম। মাঠের পর মাঠ আমরা নৌকায় অতিক্রম করিলাম। বর্ষার শেষে, শরতের প্রারম্ভ, কিন্তু হায় ধানের ক্ষেত দেখিতে পাইতেছিলাম না। তাহার পর একটি গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। গ্রামের দুর্দ্দশা দেখিয়া আমার মনে হইল, খবরের কাগজের

বর্ণনা একটুও অতিরঞ্জিত নয়। দরিদ্র কৃষকদের অধিকাংশের বাড়ীই জলমগ্ন। গরু-বাছুরগুলি খাদ্যাভাবে মৃতপ্রায়। আমরা গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিতেই গ্রামের একদল সাধারণ লোক অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে উপস্থিত হইল। ভাবিয়াছিল হয়ত আমরা সাহায্যদানের জন্য আসিয়াছি। আমরা অবশ্য বিতরণের জন্য কিছু চাউল আনিয়াছিলাম। কিন্তু তাহা বন্যাক্লিষ্টগণের বুভুক্ষাসমুদ্রে বারি-বিন্দুবৎ। দেখিলাম অনেকের ক্ষুদ্র চালাঘর ভাসিয়া গিয়াছে। শুনিলাম পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে শহর হইতে একটি বন্যা-সাহায্য-সমিতির কেন্দ্র খোলা হইয়াছে এবং তাহা হইতে খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করা হইতেছে। গ্রামের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকগণের অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়। তাঁহারা নিজেদের দুরবস্থার কথা প্রকাশ করিতে পারেন না। কিন্তু তবুও তাঁহারাও যে বিপন্ন তাহা বেশ বুঝা গেল। আমরা নৌকাযোগে পার্শ্ববর্ত্তী আরও কয়েকখানা গ্রামের অবস্থা দেখিলাম। অবশ্য দুই একটি গ্রামের ভিতর জল অল্পপরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে তাহাও দেখিলাম। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না। আমাদের সেদিন ফিরিতে অনেক রাত্রি হইয়াছিল।

পরদিন রবিবার। সকাল বেলাতেই টম্‌টমে চড়িয়া আমি এবং আমাদের ক্লাসের আরও দুইজন বন্ধু গ্রামের দিকে রওনা হইলাম। ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের রাস্তাটি এখনও ডুবিয়া যায় নাই, কিন্তু দুইধারে জল ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। কর্দ্দমাক্ত পিচ্ছিল পথ দিয়া অতিকষ্টে টম্‌টম্‌খানি অগ্রসর হইতেছিল। দুই পার্শ্বে জলমগ্ন গ্রামের পর গ্রাম দেখিয়া যাইতেছিলাম। কয়েকটি বাড়ীতে ঘরের ভিতর জল ঢুকিয়া কি বিশ্রী দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। চার মাইল যাইবার পর টম্‌টম্ আর চলিল না। আমরা টম্‌টম্ হইতে নামিয়া হাঁটিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

সেইদিন বেলা দুইটার ট্রেণে নাটোর হইতে সান্তাহার অভিমুখে রওনা হইব সঙ্কল্প করিয়া নাটোরে আসিলাম। মোটরযোগে আসিতে পথিমধ্যে অধিকাংশ ক্ষেতের ধানগুলি জলমগ্ন দেখিলাম। অসংখ্য নিরাশ্রয় লোক শহরের উপর আশ্রয় লইতে চলিয়াছে। ট্রেণ আসিল, টিকিট করিয়াছি, গাড়ীতে উঠিব

এমন সময় শুনিলাম মাধনগরের দিকে রেললাইন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। নিরুপায় হইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

কিন্তু চরের লোকগুলির দুরবস্থাই সব চাইতে শোচনীয়। সমস্ত চর পদ্মায় ডুবিয়া গিয়াছে। ছোট ছোট নৌকাতে চরের কৃষকগণ তাহাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের পার করিতেছে, আকাশ হইতে টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। বিক্ষুব্ধ পদ্মার সেই রুদ্রলীলা দেখিয়া কবি কবিতা লিখিতে বসিবেন কিনা জানি না। কিন্তু পদ্মার রোষ হইতে আত্মরক্ষার জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব হইবেন। সেই উদ্বিগ্ন শোক-কাতর কৃষকগণের মূর্ত্তি দেখিয়া আমি হতভম্ব হইয়া গিয়াছিলাম। গত কল্য শুনিলাম, একটি কৃষকের মাচার উপরে শোয়ান একটি ছোট ছেলে রাত্রিতে যখন জল ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিতেছিল সে সময় হঠাৎ পড়িয়া কোথায় যে ভাসিয়া গিয়াছে তাহা জানা যাইতেছে না। সেই ক্ষুদ্র শিশুর ব্যাকুলা জননীর অন্তরের করুণ ক্রন্দন কি পদ্মার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল? শহরে যাঁহারা নিয়মিত জীবন যাপন করেন, এ মৃত্যুর কথা শুনিয়া কি তাঁহাদের চিত্তে একটুও সহানুভূতির উদ্রেক হইয়াছিল?

আর পত্রের কলেবর বৃদ্ধি করিব না। নবাবগঞ্জের বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ পত্র-পাঠ জানাইবে। তোমার বাবা ও মাকে আমার প্রণাম জানাইবে। আশা করি ভালই আছ। ইতি—

তোমার
সমরেশ

আমার যদি এক কোটি টাকা থাকিত

দারিদ্র্যের তীব্র নগ্নরূপ দেখিতে দেখিতে ভুলিয়াই গিয়াছি ঐশ্বর্য্যের মূর্ত্তির কথা। জীবনের প্রাচুর্য্যের মধ্যে কেমন আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠে সে কথা কল্পনা করিবার শক্তিটুকুও কেন হারাইব? সেই কথাই সেদিন বলিতেছিলাম, কল্পনাকে কেন দীন করিব? পর্ণকুটীরে তৃণশয্যায় শুইয়া থাকিয়াও তো লোকে রাজা হইবার স্বপ্ন দেখে। রাজা বা সে নাই হইল। কিন্তু স্বপ্নের আনন্দের কি কোনই মূল্য নাই?

সেদিন ইচ্ছা করিয়াই, আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে জোর করিয়াই, কল্পনাকে উদার উন্মুক্ত করিতে চেষ্টা করিলাম। মনকে বুঝাইলাম, 'লটারী'র টিকিট কিনিয়াও তো লোকে ক্রোরপতি হইতে পারে? আচ্ছা, যদি তাহাই হই। তবে সে এক কোটি টাকা দিয়া কি করিব? সেই প্রবাদটা মনে পড়িল, "আমি যদি রাজা হইতাম, তবে সমস্ত ভাত গুড় দিয়া খাইতাম।" কিন্তু এক কোটি টাকার গুড় খাইয়া এ জীবনে শেষ করিতে পারিব কি? তবে এক কাজ করা যাক; এক কোটি টাকার গুড় কিনিয়া দরিদ্র সাধারণের মধ্যে বিতরণ করা যাক এই বলিয়া যে, রাজা হইয়া সব ভাত যাহাদের গুড় দিয়া খাওয়ার ইচ্ছা ছিল, তাহারা তাহা পূরণ করুক। কিন্তু সেটা যে নেহাৎ ছেলেমানুষী বা পাগলামি হইবে। তবে কি করা যায়?

হাঁ মনে পড়িয়াছে, একখানা এরোপ্লেন কিনিতে হইবে। তাহাতেই সব টাকা ফুরাইবে না ত? তাহা হইলে মুস্কিল; এক কোটি টাকায় ত হয় না। আচ্ছা, যদি মনে করুন ১০ লক্ষ টাকা দিয়া একটা খুব ভাল এরোপ্লেন কেনা যায়। কি ধরুন, তার চেয়ে কিছু কম টাকা দিয়া নিম্নস্তরের একটি অল্পদামী এরোপ্লেন যদি কেনা যায়। একজন পাইলট্ রাখিতে হইবে। তারপর সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণে বাহির হইতে হইবে। যদিও আমি মাত্র প্রবেশিকা-পরীক্ষার্থী তবুও অন্যান্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতবর্গের সহিত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিতে হইবে। আর বিশেষ করিয়া ঐ সকল দেশের ছাত্রগণ খেলাধূলা প্রভৃতিতে কিরূপ অগ্রসর তাহাও জানিতে হইবে। শুনিয়াছি ঐ দেশের ছাত্রবৃন্দ সিনেমার সাহায্যে নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে, আমাকে কিছুকাল থাকিয়া সে সকল সিনেমা দেখিতে হইবে এবং সেই সব বিষয় জানিতে হইবে। রুশিয়াতে কয়েক বৎসরের মধ্যে সমস্ত দেশে প্রাথমিক শিক্ষা কি ভাবে কতদূর বিস্তৃত হইল সে বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী হইতে হইবে। জার্ম্মাণী ও ইতালীতে মাধ্যমিক শিক্ষায় কি কি আধুনিক পরিবর্ত্তন হইল সে বিষয়ও কিছুটা না জানিলে চলিবে না। আমাদের দেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে সহ-শিক্ষা দেওয়া উচিত কি না

ইহা লইয়া বেশ গবেষণা আরম্ভ হইয়াছে। ওদেশের সহ-শিক্ষা-পদ্ধতিটাকেও বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিব এবং প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়া যাহা বুঝিব তাহা আমাদের দেশে সকলকে জানাইতে হইবে। ইতিমধ্যে টাকা ফুরাইয়া যাইবে না কি ? শুধু শিক্ষাপদ্ধতি দেখিয়া ফিরিলে সবাই যে অরসিক বলিবে, হয়ত বা অতি আধুনিক সমাজে সেই জ্ঞান লইয়া প্রবেশ করিতে চাহিলে পাত্তা মিলিবে না। তবে উপায় ? ওদেশের সিনেমা-নাচ-গানের রাজ্যের কিছু টাট্‌কা খবর লইয়া আসিতে হইবে। অন্ততঃ এদেশে আসিয়া নাচ-গান সম্বন্ধে অথরিটী হইব ত! ঠিক কথা—একজন রসিক বন্ধু সঙ্গে লইতে হইবে। আমি যদি হঠাৎ লটারীর টাকাই পাই, তবে ঘাড় ভাঙ্গিবার রসিকের অভাব হইবে না।

কিন্তু দেখুন, একটা কথা চুপে চুপে বলিব। কিছু মনে করিবেন না। টয়লেট সাবান ও ভাল সুগন্ধি তেল, অন্ততঃ হাজার টাকার, জীবনের মত কিনিয়া রাখিব, বলা যায় না কখন টাকা ফুরাইয়া যায়। যদি কোন দিন টাকা ফুরানোর আপশোষে মাথা গরম হয় তাহা হইলে মাথায় তেল মাখিয়া ঠাণ্ডা হইব। আর একটুখানি ভবিষ্যৎ চিন্তা করা উচিত। মানে অন্ততঃ দশ লাখ টাকার কোম্পানীর কাগজ, ইন্‌সিওরেন্স ও ৫ লাখ টাকার জমিদারী করা উচিত। জমিদারের খাজনা আদায় ক্রমশঃ কঠিন হইয়া পড়িতেছে, কাজেই বেশী টাকার জমিদারী কেনা বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না।

ওঃ হো, দেখুন আমি একটা মস্ত বড় কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, আমেরিকা পরিভ্রমণের সময় গ্রেটা গার্বো ও চার্লি চ্যাপ্‌লিনের সহিত একটু আলাপ করিয়া আসিতে হইবে। তার বাবদ যদি দুই এক লাখ খরচ হয় তবে তাহা সার্থক মনে করিব। বার্ণাড শ ও এইচ্‌. জি. ওয়েল্‌সের সঙ্গে যদি দেখা না করিয়া ফিরি তবে এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে তাড়াতাড়ি 'পজিসান' করা কঠিন হইবে না কি ? অন্ততঃ তাঁহাদের সঙ্গে কি আলাপ করিলাম তাহার একটি বিবৃতি খবরের কাগজে দিতেই হইবে। আমার টাকার কথা সাধারণে জানিতে পারিলে কাগজওয়ালারা নিশ্চয়ই আমার বিবৃতি গ্রহণ করিবে। যাহা হউক এ-বাবদ দুই এক লাখ হয়ত খরচ করিতে হইবে।

এই অর্থ-সঙ্কটের দিনে আর বেশী বাজে খরচ করিব না। তবে চীন-জাপান-যুদ্ধে চীনাদের সাহায্যের জন্য অন্ততঃ এক হাজার টাকা না পাঠান ভাল দেখাইবে না। এ বৎসর বাঙ্গলা দেশের বন্যার জন্যও ৩।৪ হাজার টাকা অন্ততঃ না দিলে সবাই বলিবে পাওয়া টাকায় এত মায়ার কোন সঙ্গত কারণ নাই। তারপর যাহা বাঁচিবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে বা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে রাখিয়া দিব। শেষকালে একটা দামী কথা মনে পড়িল, হাজার দশেক টাকা খরচ করিয়া সারা ভারতবর্ষে সোশ্যালিজমের বক্তৃতা করিয়া বেড়াইব। নতুবা দেশে 'পজিসান' করা যাইবে না।

স্বদেশ ও বিশ্বপ্রেম

যে দেশের আলো-বাতাসের সঙ্গে মানুষ ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মুহূর্ত্ত হইতে পরিচিত, যে দেশের খাদ্যে জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে, যে দেশের সমাজে মন পরিপুষ্ট হইয়াছে, যে দেশের শিক্ষায় প্রথম শিক্ষালাভ হইয়াছে, সেই জন্মভূমিকে ভালবাসা, শ্রদ্ধা করা এবং তাহার জন্য জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দেওয়া যে প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য তাহা একবাক্যে সকলেই স্বীকার করিবেন। যদিও বর্ত্তমান জগতের জাতীয়তা খুব বেশীদিনের বস্তু নহে, প্রত্যেক দেশের রাষ্ট্রনৈতিক দিক্ দিয়া স্বাতন্ত্র্যরক্ষার চেষ্টা আধুনিক ব্যাপার, তবুও স্বদেশকে ভালবাসিবার একটা অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তি মানুষের চিরকালই আছে এবং থাকিবে। মানবশিশু জ্ঞান-লাভের পর হইতে একটু একটু করিয়া পিতামাতা হইতে পরিবারের সমস্ত লোকজনকে ভালবাসিতে শিক্ষা করে। তাহার পরে বাস করিবার গ্রাম বা নগরকে ভালবাসে এবং ক্রমে ক্রমে সমগ্র দেশের মধ্যে তাহার প্রেমপূর্ণ চিত্ত প্রসারিত হয়। কিন্তু এইখানেই চিত্তের প্রসার পরিসমাপ্তি লাভ করিবে কি না? বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে মানব-হৃদয়ের প্রেম তাহার দেশের মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না, তাহা সমগ্র বিশ্বমানবের নিকট প্রসারিত হয়। সকল মানুষের মঙ্গলই সত্যকার মঙ্গল, সকল মানুষকে ভাল-বাসিয়াই মানব-হৃদয়ের ভালবাসা সার্থকতা লাভ করে।

বিশ্বমানবের মঙ্গল-কামনাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এবং হিতসাধন-প্রচেষ্টাই শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। কিন্তু স্বদেশপ্রেম কি বিশ্বপ্রেমের প্রতিকূল ? এই প্রশ্নটি আমাদিগকে ধীরভাবে আলোচনা করিতে হইবে। যদি স্বদেশের মঙ্গল-কামনা এরূপ আকারে আত্ম-প্রকাশ করে যে, যাহাতে বিশ্বসভ্যতা-ধ্বংসকেও উপেক্ষা করিবার প্রবৃত্তি হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেই স্বদেশপ্রেম মানবধর্ম্মের বিরোধী এবং বিশ্বমানবের অকল্যাণকর ; সেইরূপ স্বদেশপ্রেম বাস্তবিক পক্ষে বর্জ্জন করাই উচিত। কিন্তু যে দেশ নানা দিক্ দিয়া জগতের অন্যান্য দেশ হইতে বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে তাহাকে শিক্ষায় সংস্কৃতিতে এবং রাষ্ট্রশক্তিতে অন্যান্য দেশের সমকক্ষ করিবার চেষ্টার মধ্যে যে স্বদেশপ্রেম লুক্কায়িত আছে তাহা বাস্তবিক পক্ষে বিশ্বমানবের কল্যাণের অনুকূল। সত্যকার স্বদেশপ্রেম বিশ্বমানব-প্রীতির প্রতিবন্ধক নহে—সহায়ক। যে দেশবাসীর জাতীয়তার শেষ লক্ষ্য বিশ্বমানবকে অগ্রগতির পথে সাহায্য করা সেই জাতীয়তাই সত্যকার স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়। ম্যাট্‌সিনি একদিন এইরূপ স্বদেশপ্রেমের প্রচারক ছিলেন।

সেইজন্য আপাতদৃষ্টিতে স্বদেশপ্রেমকে বিশ্বপ্রেমের পরিপন্থী বলিয়া মনে হইতে পারে এবং জার্ম্মাণী, ইতালী ও জাপানের স্বদেশপ্রেম বর্ত্তমানে বিশ্বের পক্ষে কল্যাণকর মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে না ইহাও সত্য, কিন্তু তবুও স্বদেশপ্রেম যদি বিশ্বপ্রেমের একটি খণ্ডিত ভাবধারারূপে গৃহীত হয়, তবে তাহাই উচ্চাঙ্গের সত্যকার স্বদেশপ্রেম হইবে এবং তাহা হইতেই বিশ্বের মঙ্গল হইবে।

জাতিতে জাতিতে স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া যে বিরাট বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছে, বর্ত্তমান জগতে সভ্যতার মধ্যে তাহা একটি বিস্ফোটকের আকার ধারণ করিয়াছে এবং তাহার পরিণাম-চিন্তায় সকলেই ব্যাকুল হইয়াছেন। সে সম্বন্ধে এই কথা বলা যায় এই ধরণের মরণোন্মুখী জাতীয়তা ও স্বদেশপ্রেমের হাত হইতে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় স্বদেশপ্রেমকে বিশ্বপ্রেমের ভাবে বিশুদ্ধ করিয়া তোলা। অবশ্য যে সকল দেশবাসী উগ্র জাতীয়তার বোধে উদ্দীপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা এই সকল কথায় কর্ণপাত করিবেন না ইহা নিশ্চিত। কিন্তু

তাহা সত্ত্বেও সকল মানুষের কল্যাণ-কামনায় যে এই একটি দেশ অগ্রসর হইতেছে তাহাদের বিশ্বপ্রেম আরও গভীর হউক, তাহাদের স্বদেশপ্রেম বিশ্বপ্রেমকেই পরিস্ফুট করুক—ইহাই প্রার্থনা।

জাতীয়তা ও বিশ্বমানবতা বর্ত্তমান জগতের এই দুইটি কথা; বিশেষতঃ সমষ্টি-জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে বিচার করিতে যাইয়া আর একটি কথা বিবেচনা করা উচিত। যদি সমাজ-জীবন ভোগকেই একমাত্র লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হয় তাহা হইলে দেশে দেশে ভোগের সীমা লইয়া সংঘর্ষ অনিবার্য্য। বর্ত্তমান সময়ে আন্তর্জ্জাতিক ও অর্থনৈতিক সাম্য নাই। অবশ্য বিশ্বের এই অশান্তি ও বিক্ষোভ দূর করিবার চেষ্টা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে কিন্তু জীবনে ত্যাগপূত আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে এ সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান করা চলিবে বলিয়া মনে হয় না। দেশপ্রেম যদি একটি ধর্ম্মভাবে বিকশিত হয় তাহা হইলেই শুধু বর্ত্তমান জগতের ভোগধর্ম্মী বলস্পর্শী জাতীয়তা মন্দীভূত হইয়া বিশ্বপ্রেম ও স্বদেশপ্রেমের সামঞ্জস্য বিধান করিবে।

পরিচ্ছন্নতা

শরীরপালনে যতগুলি সাধারণ নিয়ম প্রচলিত আছে তাহাদের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা একটি অন্যতম নিয়ম। এই নিয়ম অল্পাধিক পরিমাণে আমরা অজ্ঞাতসারে পালন করিয়া থাকি; তবুও এই বিষয়ে আমাদের বিশেষ লক্ষ্য থাকা প্রয়োজন; কারণ আমাদের অসাবধানতার জন্য যে সকল রোগ হইয়া থাকে তাহার অনেকগুলি আমাদের পরিচ্ছন্নতার দিকে লক্ষ্য না রাখিবার জন্যই হয়। শিক্ষায় এবং সভ্যতায় অনুন্নত অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে সংক্রামক রোগসকল খুব তাড়াতাড়ি বিস্তৃত হইয়া থাকে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা পরিচ্ছন্নতার দিকে সচেতন না হওয়ার জন্য। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনেও অনেক রকম রোগ ভোগ করিতে এবং শারীরিক কষ্টের মধ্যে থাকিতে হয়, তাহারও কারণ পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে যত্ন না লওয়া।

ছেলেদের স্বাস্থ্যরক্ষা-সম্বন্ধীয় পুস্তকের প্রথম দুই তিন পাতা উল্টাইলেই পরিচ্ছন্নতার দিকে লক্ষ্য না রাখিবার কুফল কি, এ বিষয়ে অনেক তথ্যের অবতারণা লক্ষ্য করা যায় এবং কতকগুলি ব্যাপারে কি পরিমাণ পরিচ্ছন্নতা রাখা উচিত তাহারও একটি সংক্ষিপ্ত উপদেশ তাহা হইতে পাওয়া যায়। সে সকল উপদেশ বালকগণ মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিয়া পাশও করে; কিন্তু বাস্তব জীবনে নিয়মগুলিকে কার্য্যে পরিণত করা সকল সময়ে ঘটিয়া উঠে না। আমাদের এই কথাটা বিবেচনা করা প্রয়োজন। বাল্যকাল হইতেই নিয়ম গুলিকে আয়ত্ত না করিলে পরবর্ত্তী জীবনে উহা কখনও সম্ভবপর নহে।

ব্যক্তিগত জীবনে পরিচ্ছন্নতা আমরা চাই নিজের দেহে, বস্ত্রাদিতে, বিছানায় ঘরে, পারিপার্শ্বিক সমস্ত জায়গায় এবং খাদ্যদ্রব্যে। কিন্তু শুধু নিজের বাড়ীটা পরিচ্ছন্ন থাকিলেই জীবন নিরাপদ্ হয় না, সমস্ত প্রতিবেশীর গৃহাদি পরিষ্কার থাকিবার প্রয়োজন আছে। এমন কি বাস করিবার গ্রাম বা নগরটিও যাহাতে সমস্ত প্রকার আবর্জ্জনা হইতে মুক্ত হয়, সে বিষয়ে সচেতন না হইলে সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন হওয়া গেল না। পরিচ্ছন্নতা ব্যষ্টি-জীবনে যেমন চাই, সমষ্টি-জীবনেও ঠিক তেমনি চাই। এই কথাটা বুঝিবার অভাবেই ব্যক্তিগতভাবে আমাদের অনেকে পরিচ্ছন্ন থাকা সত্ত্বেও সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হন। আমাদের শহরের মিউনিসিপ্যালিটি এবং গ্রামের কর্ত্তৃপক্ষগণ এখনও সময়োচিতভাবে গ্রাম ও নগরগুলিকে আবর্জ্জনামুক্ত না করার জন্য প্রতি বৎসর বহু লোক সংক্রামক রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। নগরের উপকণ্ঠে সংক্রামক রোগ ক্রমশঃ আত্ম-বিস্তার করিতেছে, কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তৃপক্ষ হয়ত তখনও চেয়ার কতগুলি বেশী করিলে তাঁহাদের সুবিধা হইতে পারে তাহার বিবেচনা করিতেছেন। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে হয়ত একটি সংক্রামক ব্যাধি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু গ্রামের কর্ত্তৃপক্ষ তখনও উদাসীন বা ব্যক্তিগত জীবনে আক্রান্ত না হইবার উপায় আবিষ্কার করিয়াই ক্ষান্ত। কিন্তু আমরা আমাদের সমষ্টি-জীবনেও যাহাতে পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতন হই সে বিষয়ে লক্ষ্য না রাখিলে যে আমরা সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন হইব না, একথা আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবার জন্য যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন হয় না। শুধু এবিষয়ে সচেতন হইলে এবং দরকার হইলে নিজের বস্ত্রাদি নিজে পরিষ্কার করিলেই পরিচ্ছন্ন থাকা যায়। আমাদের দেশের জনসাধারণকে এ বিষয়ে সচেতন করিবার প্রয়োজন আছে এবং ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ম্যাণ্টার্ণ লেকচারের সাহায্যে পরিচ্ছন্নতার সাধারণ নিয়মগুলি গ্রামে গ্রামে প্রচার করিতে পারেন। মধ্যবিত্ত সমাজের সামান্য শিক্ষিতা বা অর্দ্ধশিক্ষিতা গৃহকর্ত্রী মহিলাবৃন্দকেও এ বিষয়ে যথেষ্ট শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। খাদ্যদ্রব্য এবং পারিপার্শ্বিক স্থানসমূহের পরিচ্ছন্নতা অনেক ভদ্রগৃহেও রক্ষিত হয় না।

শেষ কথা শুধু এই বলিয়া সমাপ্ত করিতে চাই যে, ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে যদি আমরা যথারীতি পরিচ্ছন্ন হই তাহা হইলে শুধুই স্বাস্থ্যরক্ষা হইবে না; আমাদের চিত্তও যথেষ্ট পরিমাণে প্রফুল্ল এবং পবিত্র হইবে। পরিচ্ছন্নতা আমাদিগকে বিলাসিতার দিকে যেন লইয়া না যায়। দেহ ও মনের শক্তি সম্পূর্ণ লাভ করিতে হইলে শুচিতাই হইবে জীবনের প্রধান লক্ষ্য।

অধ্যবসায়

একটি কাজ সম্পন্ন করিবার প্রবৃত্তি হইলেই যে সে কাজ সম্পাদিত হয় না তাহা স্বতঃসিদ্ধ। কাজ করিতে হইলে তাহার জন্য পরিশ্রম ও উদ্যম করিতে হয় এবং তাহা একবার করিলেও সকল সময় সম্পন্ন হয় না। সে ক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করা প্রয়োজন। এইরূপ চেষ্টার নামই অধ্যবসায়। এই অধ্যবসায়ের গুণেই রবার্ট ব্রুশ জয়ী হইয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। রাণা প্রতাপসিংহ এই অধ্যবসায়ের গুণেই চিতোর উদ্ধারে সমর্থ হইয়াছিলেন। যে কোন একটা বড় কাজ হঠাৎ একদিন একটু চেষ্টা করিলেই সম্পন্ন হয় না। তাই যে সকল ব্যক্তি কোন বড় কাজে সাফল্য লাভ করিয়াছেন অল্লাধিক সকলেই তাঁহারা অধ্যবসায়ী ছিলেন। প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তিও বিনা পরিশ্রমে হঠাৎ কোন কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন না। তাঁহাকে সেজন্য

সাধনা করিতে হয়। তাঁহাদিগকেও বিফলতায় ভগ্নমনোরথ না হইয়া পুনঃ পুনঃ ঐকান্তিকভাবে কার্য্য করিয়া যাইতে হয়। এই অধ্যবসায়ের শক্তি যাঁহার যত অধিক, তিনি তত অধিক প্রতিকূল অবস্থাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হন।

অধ্যবসায়ের উপকারিতা জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে আমরা উপলব্ধি করি। যে ছাত্র প্রথম চেষ্টায় কোন বিষয় বুঝিতে না পারিয়া পুনরায় তাহা বুঝিবার জন্য চেষ্টা না করে তাহার পক্ষে লেখাপড়ায় সাফল্য লাভ করা কঠিন। পরীক্ষায় একবার কৃতকার্য্য না হইলে অনেক সময় ছাত্রগণ সকলের নিকট উপহাসাস্পদ হয়। কিন্তু সে বিষয়ে উদাসীন হইয়া ছাত্রগণের পুনরায় অধ্যয়নে দ্বিগুণ উৎসাহে মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য। এই অধ্যবসায়ই মানুষকে অবশেষে সফলতা লাভে সাহায্য করে। কর্ম্মজীবনে ব্যবসা বা কৃষিকার্য্য যিনি যাহাই অবলম্বন করুন না কেন অনেক সময় অবসাদ আসিবে, অনেক বৎসর বিফলতার তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে হইবে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যিনি অধ্যবসায়ের সহিত অগ্রসর হইবেন তিনিই শুধু কৃতকার্য্য হইবেন।

ইতিহাসের পাতা উল্টাইলে এরূপ দৃষ্টান্ত বহু পাওয়া যাইবে যাঁহারা অধ্যবসায়ের সাহায্যে অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। পৌরাণিক চরিত্রগুলির মধ্যে মহাভারতের কর্ণ-চরিত্র অধ্যবসায়ের একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। জীবনের প্রথম প্রভাত হইতে অন্তিম মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি সমস্ত প্রতিকূল অবস্থাকে উপহাস করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। দ্রোণাচার্য্যের অস্ত্রবিদ্যাদানে অসম্মতি তাঁহাকে হতোৎসাহ করিতে পারে নাই, তাঁহার অস্ত্রশিক্ষাদাতা গুরু পরশুরামের অভিশাপ তাঁহাকে কর্ম্মবিমুখ করিতে পারে নাই, ব্রাহ্মণের অভিশাপেও তিনি বিচলিত-হৃদয় হন নাই। ইন্দ্র যখন তাঁহার নিকট হইতে কবচ-কুণ্ডল প্রার্থনা করেন, নিজের অবধারিত মৃত্যু জানিয়াও তিনি অম্লানবদনে তাঁহাকে তাহা প্রদান করিয়াছিলেন। সকল রকম বাধাবিপত্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া তিনি অধ্যবসায়ী বীরের মত তীব্র বেগে কর্ম্ম-জীবনে সাফল্যের পথে অগ্রসর হইয়াছেন। রণক্ষেত্রে মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি প্রকৃত অধ্যবসায়ী কর্ম্মী ছিলেন।

এইরূপ আর একটি দৃষ্টান্ত হইতেছে—চিতোর-প্রেমিক মহারাণা প্রতাপ সিংহ। হলদিঘাটার যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ক্ষত-বিক্ষত দেহ লইয়া তিনি ফিরিতেছেন, তাঁহাকে সাহায্য করে এমন লোক প্রায় একটিও নাই, তবুও প্রতাপের হৃদয় অচল অটল। ঘাসের রুটি খাইয়া বন-জঙ্গলে দিনের পর দিন কাটাইয়াছেন কিন্তু তবুও তিনি স্বাধীনতার সঙ্কল্প ত্যাগ করেন নাই। অধ্যবসায়ের একটি মূর্ত্ত প্রতীকরূপে তিনি জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন।

আমাদের সাধারণ জীবনের সাধারণ কার্য্যাবলীর মধ্যে অধ্যবসায়ের এই সকল অমূল্য দৃষ্টান্ত স্মরণ রাখিয়া চলিতে পারিলে অনেক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তকে বিনা আয়াসে অতিক্রম করিতে পারি। ধৈর্য্য ধরিয়া দিনের পর দিন একটি উদ্দেশ্য সফল করিবার চেষ্টা করিলে ক্রমশঃ অন্তরেও একটি অদম্য শক্তি সঞ্চারিত হয়। বাহিরের বাধাকে আর অনতিক্রমণীয় বলিয়া মনে হইবে না। নিন্দা বা প্রশংসা দ্বারা পরিচালিত হইবার প্রবৃত্তি আর থাকিবে না। উদ্দেশ্য-সাফল্যের এক লক্ষ্য সমস্ত মন প্রাণকে অধিকার করিয়া বসিবে।

নৈতিক সাহস

যাহা আপন অন্তর দ্বারা সত্য বলিয়া অনুভব করা যায় তাহাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে দ্বিধাহীন-চিত্তে যিনি অগ্রসর হইতে পারেন, সেই সত্যকে প্রচার করিতে যাঁহার কোন প্রকার সঙ্কোচ বোধ হয় না, যিনি প্রয়োজন হইলে নির্ম্মমভাবে আপন আত্মীয় প্রতিবেশীর সকল প্রকার বিরুদ্ধতাকে উপেক্ষা করিয়া আপন কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন, তিনি সত্য সত্যই বীর; নৈতিক সাহস সত্যই তাঁহার হৃদয়ের মূলধন। সমাজ যখন সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে তখন এইরূপ লোকের সংখ্যা সমাজে অপেক্ষাকৃত অধিক থাকে। কিন্তু সমাজের পতনশীল অবস্থায় এই প্রকার নৈতিক সাহস-সম্পন্ন ব্যক্তি বিরল হইয়া যায়। তখনই এক একজন যুগ-প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ আসিয়া সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্ম্মের গ্লানি দূরীভূত করেন, সমাজের শিরায় উপশিরায় পুনরায় নৈতিক সাহস

সঞ্চারিত করিয়া দেন। নৈতিক সাহস ব্যক্তিগত জীবনেও বিশেষ প্রয়োজনীয় বস্তু। অনেক সময় অনেকে আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিতেও ইতস্ততঃ করেন। নিন্দা বা স্তুতির কথা বিবেচনা করিয়া এবং যথেষ্ট পরিমাণ সাহস না থাকিলে আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য অনেকেই সম্পাদন করিতে পারেন না। ইহা কম পরিতাপের বিষয় নহে—নৈতিক সাহস থাকিলে এই ধরণের ক্লৈব্য আমাদিগকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করিতে পারে না।

সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের আচরণ অনুকরণ করিয়া সাধারণে শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। নৈতিক সাহসের দিক্ দিয়াও যাঁহারা সমাজের নিকট আদর্শস্থানীয় তাঁহাদের জীবন আমাদিগের নিকট মূল্যবান্। পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ভ্রমণ করে, ইহা প্রমাণ করিয়া যাইয়া বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিওর জীবন কম বিপন্ন হয় নাই। ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ বক্তা মহামতি বার্ক অনেক সময় সাধারণের মতের বিরুদ্ধে মত পোষণ করিবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে সাধারণের উপেক্ষাভাজন হইয়াছিলেন ইতিহাস হইতে এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে যাঁহারা আপনাদের বিবেকের প্রেরণায় লোকমতের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া লাঞ্ছনা ও গঞ্জনাকে বরণ করিয়া লইয়াছেন।

নৈতিক সাহস শিক্ষা, বিচারবুদ্ধি ও আত্মচিন্তা প্রভৃতির অনুশীলন দ্বারা অর্জ্জন করিতে হয়। মানুষ স্বভাবতঃ সত্য ও সুন্দরের উপাসক, শুধু ঘটনার আবর্ত্তে দিশাহারা হইয়া কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞান-বিবর্জ্জিত হয়। কাজেই জীবনকে একটি মহৎ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত করিলে এবং বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া জীবনে অগ্রসর হইলে নৈতিক সাহস ক্রমশঃ বাড়িতে থাকিবে। একদিন হঠাৎ দেখা যাইবে যে সত্যের ও ন্যায়ের জন্য জীবন কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে দ্বিধা করিতেছে না। আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষা বুদ্ধিকেন্দ্রিক বা অর্থকেন্দ্রিক বলিয়া ছাত্রগণ কোনও নৈতিক শিক্ষা লাভ করে না। যদি ছাত্র-জীবন হইতেই সংযম অনুশীলনের ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে সমাজে নৈতিক সাহস-সম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা যথেষ্ট বাড়িয়া যায়।

নৈতিক সাহস দৈহিক শক্তি বা স্নায়বিক উত্তেজনার উপর নির্ভর করে না।

মানসিক শক্তি, মনের দুর্দ্দমনীয়তাই মানুষকে সাহসী করে। শারীরিক সাহস অপেক্ষা নৈতিক সাহসই মানুষের অন্তরস্থিত দেবতাকে অধিকতর শক্তিতে উদ্‌যুক্ত ও জাগ্রত করিয়া তোলে। বাহিরের সমস্ত বাধাকে তুচ্ছ করিয়া অন্তর-বলে বলীয়ান্ হইবার শিক্ষা মানুষ তাহার নৈতিক সাহসের মধ্যে পায়।

ছত্রপতি শিবাজী

মোগল-পদানত ভারতবর্ষে মারাঠা-সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা শিবাজীর অভ্যুদয় এক অপূর্ব্ব ঘটনা। তাঁহার জীবন ও কার্য্যাবলী ভারতের ইতিহাসে এক বিস্ময়কর অধ্যায়। তিনশতাধিক বৎসরের মুসলমান-শাসনে যখন হিন্দুগণ হীনবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছিলেন, হিন্দুর ভাগ্যাকাশ যখন অমানিশার গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল তখনই যেন বিধাতার কোন এক শুভ আশীর্ব্বাদের ফলে হিন্দুর শক্তি ও সাধনা শিবাজীর মধ্যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অবিচার ও অসহিষ্ণুতা সকল মুসলমান নরপতির ছিল না, কিন্তু ঔরঙ্গজেবের সময় ইহা চরম সীমায় উঠিয়াছিল। জিজিয়া করের পুনঃপ্রবর্ত্তন তীর্থযাত্রীর উপর কর নির্দ্ধারণ, নূতন ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মাণে বাধা ও নিষেধ প্রভৃতি অত্যাচারমূলক বিধিব্যবস্থা হিন্দুগণের মনে যে বিদ্রোহের আগুন জ্বালাইয়া তুলিতেছিল তাহার পূর্ণ বিকাশ দেখা গিয়াছিল দক্ষিণাপথের একটি ক্ষুদ্র প্রদেশে। ঐ বিদ্রোহ ও অসন্তোষের আগুনে মোগল সাম্রাজ্য পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল—সেই ভগ্নস্তূপের উপর বিধাতার রহস্যময় বিধানে প্রতিষ্ঠিত হইল বৃটিশ সাম্রাজ্য।

সমস্ত ভারতব্যাপী এক অখণ্ড হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপনের উচ্চ লক্ষ্য বাল্যকাল হইতেই শিবাজীর চিত্ত অধিকার করিয়াছিল। তাঁহার এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা কল্পনাবিলাসী মনের সুখস্বপ্নে পর্য্যবসিত হয় নাই; জীবনব্যাপী সাধনা ও চেষ্টার ফলে এই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হইতে চলিয়াছিল। ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে যখন তাঁহার জন্ম হয় তখন মোগলশক্তি ভারতবর্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া নিজ বিভিন্নমুখী প্রতিভা

ও ঐশ্বর্য্যের বলে সমস্ত জগদ্বাসীর বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। প্রথমতঃ আহম্মদনগর-বিজাপুর-রাজসরকারের কর্ম্মচারী শাহজীর এই পুত্রের মনে মোগল-গৌরব নিশ্চয়ই বিস্ময়ের পরিবর্ত্তে বিতৃষ্ণা উৎপাদন করিত। তিনি তাঁহার বাল্যজীবন পিতার সহিত যাপন করেন নাই; সেইজন্যই বিধর্ম্মীর আনুগত্যের বাতাস তাঁহার বন্ধনহীন মনকে স্পর্শ করিতে পারেন নাই। দাদাজী কণ্ব নামক এক সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ তাঁহার শৈশবের অভিভাবক ছিলেন। বালক শিবাজী তাঁহার নিকট রামায়ণ ও মহাভারতের বীরজীবনের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি-কাহিনী শ্রবণ করিতেন। শিবাজীর ভবিষ্যৎ মহত্ত্বের কারণ নির্ণয় করিতে হইলে বালকের এই কল্যাণকর শিক্ষার কথা মনে রাখা বিশেষ দরকার। বহু চিন্তাশীল মনীষী বলিয়াছেন যে রামায়ণ মহাভারত ভারতবর্ষের মহত্ত্ব, বীরত্ব প্রভৃতি সমস্ত মহৎ বিষয়ের উৎসস্বরূপ। শিবাজীর দেশপ্রেমের পরিপোষক অপূর্ব্ব বীরত্বের প্রবল প্রবাহের উৎস এই মহাকাব্যদ্বয়।

শিবাজী কৈশোর হইতেই তাঁহার সামরিক প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। পার্ব্বত্য ও অসভ্য মাউলি জাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ ও যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত করিয়া তিনি পরাক্রান্ত সৈনিকদল সৃষ্টি করেন ও তাহারই সাহায্যে পার্শ্ববর্ত্তী বিজাপুর-রাজ্যের কয়েকটি দুর্গ অধিকার করেন। বিজাপুররাজ তাঁহাকে দমন করিতে নানাবিধ উপায় অবলম্বন করেন এবং অকৃতকার্য্য হইয়া সেনাপতি আফ্‌জল খাঁর অধীনে এক সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। আফ্‌জল কিরূপে চতুর শিবাজী-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন তাহা ইতিহাস-পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন।

বিজাপুর-রাজ্যের বিরোধিতা ও পরাজয়ে শিবাজীর শক্তিবৃদ্ধি হইল। যে শক্তির বন্যা অদূর ভবিষ্যতে সমস্ত ভারতবর্ষকে প্লাবিত করিয়া মোগল-সাম্রাজ্যের বিলোপ সাধন করিয়াছিল, বিজাপুর-রাজ্যের কি সাধ্য যে তাহার দুর্দ্দমনীয় গতির প্রতিরোধ করে! শিবাজীর জীবনের এই অধ্যায় মোগলের সহিত সংঘর্ষের ইতিহাস। এই সময়ে তিনি মোগল-সেনাপতি শায়েস্তা খাঁকে পরাজিত ও পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়া তাঁহার চাতুর্য্যের দ্বিতীয় পরিচয় প্রদান করেন। ইহার পরেই তিনি নিয়মিতরূপে মোগল-রাজ্য লুণ্ঠন করিতে

আরম্ভ করেন। ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে দমন করিতে অসমর্থ হইয়া অবশেষে অম্বররাজ জয়সিংহকে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। শিবাজী জয়সিংহের বশ্যতা স্বীকার করেন ও সেই হিন্দুবীরের আশ্বাসবাণীতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আগ্রায় গমন করেন। কূটবুদ্ধি বাদশাহ তাঁহাকে করায়ত্ত করিয়া তাঁহার প্রতি উপযুক্ত সৌজন্য প্রদর্শন তো করিলেনই না, এমন কি তাঁহাকে কার্য্যতঃ বন্দী করিয়া রাখিলেন। শিবাজী বাদশাহের ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া মুক্তির উপায় খুঁজিতে লাগিলেন। ইহার অল্প পরেই তিনি মোগল-প্রহরীদিগের চক্ষে ধূলা দিয়া আগ্রা হইতে পলায়ন করিয়া নিরাপদে স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। পৃথিবীর তৎকালীন শ্রেষ্ঠ রাজশক্তিও মহারাষ্ট্র-বীরকে আবদ্ধ রাখিতে সমর্থ হইল না। শিবাজী এইরূপে তাঁহার চাতুর্য্যের তৃতীয় পরিচয় প্রদান করিলেন।

এই ঘটনার পর শিবাজী মোগলের সহিত সর্ব্বপ্রকার রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণাপূর্ব্বক রাজাসনে অভিষিক্ত হইলেন। তাঁহার হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপনের আশা ফলবতী হইল। তিনি সামরিক শক্তি বা বীরত্ব অপেক্ষা ধর্ম্মকেই উচ্চ আসন প্রদান করিতেন বলিয়া নিজ রাজ্যকে ধর্ম্মরাজ্য নামে অভিহিত করিতেন। গো-ব্রাহ্মণ-রক্ষাই ছিল তাঁহার জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই গভীর ধর্ম্মবিশ্বাস-প্রণোদিত মহৎ উদ্দেশ্যের ভিত্তির উপর যে শক্তি প্রতিষ্ঠা হইল, একদিন তাহাই আসমুদ্র-হিমাচল ভারতে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া এক অখণ্ড হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপনের কল্পনায় পরিণত হইয়াছিল।

শিবাজীর সৈন্যগঠন-প্রণালী তাঁহার সামরিক প্রতিভার পরিচয় দেয়। তিনি নৌবাহিনীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যশাসন-প্রণালী ও রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থাও ঐতিহাসিকের প্রশংসাপূর্ণ বিস্ময়ের উদ্রেক করে। অনুর্ব্বর ও পার্ব্বত্য মহারাষ্ট্র প্রদেশ হইতে উপযুক্ত পরিমাণে রাজস্ব সংগ্রহের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া তিনি পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যসমূহ হইতে চৌথ আদায় করিয়া রাজকোষ পূর্ণ করিতেন। ইহার ফলে ঐ সমস্ত রাজ্যেও তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল।

শিবাজীর জীবনী ও কীর্ত্তিকাহিনী ভারত-ইতিহাসের এক গৌরবময়

অধ্যায়। যে দেশ প্রায় সাত শত বৎসর স্বাধীনতা হারাইয়া বিদেশীর করতলগত হইয়া আছে সে দেশে এই অপূর্ব্ব তেজের বিকাশ সত্য সত্যই বিস্ময়কর। পরাধীন হিন্দুজাতির মধ্যে প্রাণসঞ্চারের জন্য বিধাতা তাঁহাকে ভারতভূমিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্য যেমন একদিন লুপ্তপ্রায় হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন, শিবাজীও সেইরূপ আত্মবিস্মৃত হিন্দুর মনে স্বাধীনতার বীজমন্ত্র দিয়া তাহার সুপ্তশক্তিকে প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন। রাণা প্রতাপের যে সাধনা রাজপুতানার সীমারেখার মধ্যে বিকশিত হইয়াছিল, শিবাজী তাহাকে আরও প্রাণবন্ত করিয়া জাতির দেহের প্রতি অংশে সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। বিধাতার ইচ্ছায় তাঁহার দূরপ্রবাসী কল্পনা ফলবতী না হইলেও তাঁহার আদর্শ প্রত্যেক কর্ম্মীর মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছে। বর্ত্তমান ভারতে যাঁহারা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়া গৌরব লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই শিবাজীকে স্বীয় আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতে প্রচলিত শিবাজী উৎসব এই মহামানবের প্রতি তাঁহার দেশবাসীর আন্তরিক শ্রদ্ধার পরিচয় প্রদান করে।

সময়ের মূল্য

পৃথিবীর বহু বস্তু আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, আমাদের কাম্য পদার্থও অসংখ্য। কিন্তু উহাদের কোন্‌টির মূল্য কতখানি তাহা আমরা সকল সময় নির্ণয় করিতে পারি না। সেইজন্যই সময়ের মূল্য সম্বন্ধে আমরা সর্ব্বদা সচেতন নই। কিন্তু যদি একটু গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখি তাহা হইলে বুঝিতে পারিব যে সময়ই পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ সম্পদ্। নষ্ট স্বাস্থ্য ব্যায়াম পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণ অথবা বায়ু পরিবর্ত্তন দ্বারা ফিরাইয়া পাওয়া যায়, নষ্ট সম্পদ্ পুরুষকারের সাহায্যে উদ্ধার করা যাইতে পারে, কিন্তু যে সময় নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহাকে শত চেষ্টাতেও ফিরাইয়া পাওয়া যায় না। আজিকার এই রমণীয় সন্ধ্যাটি তাহার বর্ণচ্ছটা লইয়া অন্তর্হিত হইলে কোটি কোটি যুগের

প্রার্থনাতেও আর ফিরিয়া আসিবে না। প্রতিটি মুহূর্ত্ত নূতন, প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত আপনার সমগ্র সম্ভাবনা লইয়া উপস্থিত হয়, আমাদিগকে আহ্বান করে তাহার ঐশ্বর্য্য গ্রহণ করিয়া তাহার স্বল্পস্থায়ী জীবনকে সার্থকতার গৌরবে অবিনশ্বর করিতে এবং পরক্ষণেই যেন কাহার অলঙ্ঘ্য আদেশে অনন্তকালের জন্য অন্তরের বুকে বিলীন হইয়া যায়। মুহূর্ত্ত ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহার সম্ভাবনা বিশাল;—তাহার জীবন ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু তাহার গৌরব চিরস্থায়ী। এই জন্যই সময় উপেক্ষণীয় নয়—আদরণীয়; তাহার মূল্যও স্বল্প নয়—প্রচুর। সদা জাগরূক মন লইয়া সময়ের এই ক্ষুদ্রতম অংশটিকে কাজে লাগাইতে হইবে। তাহা যদি না পারি তাহা হইলে আমাদের সময় ব্যর্থতার হাহাকারের মধ্যে চিরতরে নিমজ্জিত হইবে,—আমাদের জীবনও মাত্র কয়েকটি বৈচিত্র্যহীন বৎসরের সমষ্টিতে পর্য্যবসিত হইয়া যাইবে।

"সময় চলিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায়।" সময় কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। সম্পদ, সম্মান, প্রতিপত্তি, বংশমর্য্যাদা প্রভৃতিকে আমরা সম্মান করি বটে, কিন্তু সময় অনায়াসেই ইহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যায়। তাহার অভিধানে তোষামোদ, চক্ষুলজ্জা প্রভৃতি শব্দের স্থান নাই। ঐশ্বর্য্যের বন্ধনে সময়কে বাঁধিয়া রাখা যায় না, শক্তিশালীর ভ্রূকুটি তাহাকে ভয় দেখাইতে পারে না;—ব্রহ্মার পরমায়ুও ধীরে ধীরে ফুরাইয়া আসে। সময় নির্ম্মম, নিষ্ঠুর! আমাদের ব্যাকুল প্রার্থনা, কাতর অনুনয় তাহাকে এতটুকুও বিচলিত করিতে পারে না। মহাপ্রস্থানের পথিকের মতই সে পশ্চাতের সকল আকর্ষণ উপেক্ষা করিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। চারিদিকের অসংখ্য আহ্বান, করুণ প্রার্থনা তাহাকে বিন্দুমাত্রও টলাইতে পারে না—সম্পূর্ণ নির্লিপ্তচিত্তে সে তাহার যাত্রাপথে অবিরাম গতিতে ছুটিয়া চলে।

মানুষের জীবন চিরস্থায়ী নহে, অনন্তকালের মধ্যে তাহার পরিমাণ মহাসাগরের বুকে বুদ্‌বুদের মতই অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু শিক্ষাভাণ্ডার বিশাল ও অফুরন্ত, কর্ত্তব্য অপরিমেয়, কর্ম্মজগতের পরিধি ক্রমবর্দ্ধমান। মানুষ যদি এতটুকু সময় অপব্যবহার না করে, সে যদি তাহার প্রত্যেকটি মুহূর্ত্তকে সার্থক

করিয়া তুলিতে পারে তাহা হইলে তাহার ক্ষণস্থায়ী জীবন জ্ঞান ও কর্ম্মের মহিমায় অনন্তকাল ধরিয়া উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করে ; তাহার অস্তিত্ব অবিনশ্বর ইতিহাসে পরিণত হয়—মানুষ তাহাকে চিরকালের পরিচিত বোধ করে। আর যদি আলস্যপরবশ হইয়া বৃথা সময় নষ্ট করে, তাহা হইলে মৃত্যুতেই তাহার পরিসমাপ্তি হইয়া যায়। এই জন্যই একজনের শতবর্ষব্যাপী জীবন অপেক্ষা আর একজনের মাত্র কয়েকটি বৎসরের জীবন মহত্তর হইয়া উঠে। সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে না পারিলে সময় শুধু নিরর্থক নহে, কষ্টদায়ক ; আর সময়কে কাজে লাগাইতে পারিলে সময়ই শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ ; সাফল্যের গৌরবে সে জীবনকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলে। ব্যক্তিগত জীবন আলোচনা করিলে আমরা এই সত্যই উপলব্ধি করি। জগতে যাঁহারা শাশ্বত সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন তাঁহারা কেহই সময়ের মূল্য সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না। পৃথিবীর সমৃদ্ধ জাতিগুলির ইতিহাস পাঠ করিলেও আমরা এই সত্যই উপলব্ধি করি। অতএব জীবনকে সফল করিতে হইলে সময়ের মূল্য সম্বন্ধে আমাদিগকে সর্ব্বদা সচেতন থাকিতে হইবে।

একটি নাটকের অভিনয়

সর্ব্বজনীন দুর্গোৎসব উপলক্ষে পূজাবাড়ীর বিরাট প্রাঙ্গণে প্রতিবৎসরের মত এবারও অষ্টমী পূজার দিন স্থানীয় 'বাণী-নাট্য-সমাজ' কর্ত্তৃক একখানি নাটক অভিনীত হয়েছিল। নাটকখানি যোগেশ চৌধুরীর "সীতা"।

রাত্রি আটটায় অভিনয় আরম্ভ হবার কথা ছিল, কিন্তু আধঘণ্টা পরে গিয়েও পাকা দেড়টি ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হ'ল। এই দেরীটুকুর জন্য সকলেই বিশেষ অধীর হ'য়ে উঠেছিল,—একদল লোক দশ মিনিট অন্তর একবার ক'রে হাততালি দিয়ে চীৎকার ক'রে 'থিয়েটার-পার্টিকে' ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলছিল।

Amplifierএর সাহায্যে অনেকগুলি গান হ'য়ে যাবার পর তৃতীয় ঘণ্টা বেজে উঠ্‌লো, পর্দ্দা উঠে গেল, অভিনয় আরম্ভ হ'ল। শিশির ভাদুড়ীর

'কপি' ক'রতে গিয়ে আমাদের রামচন্দ্র এমনভাবে হাত-পা ছুঁড়্তে সুরু করলেন যে তাঁর দুঃখে সকলেই হাস্তে লাগ্লো। আমাদের পাড়ার নরেনবাবু ব'লে এক প্রৌঢ় আছেন, তাঁকে কেহ কোনদিন হাস্তে দেখেছে কিনা সন্দেহ। তিনি রামের 'আর্ট' দেখে না হেসে থাক্তে পারলেন না। দুর্ম্মুখের সংবাদ শুনে রাম একেবারে বাঘের মত লাফিয়ে এসে তার গলা টিপে ধরলেন—রামের আর্টের গুঁতোয় দুর্ম্মুখ বেচারীর শ্বাসরোধ হবার উপক্রম হ'লো। আমরা সাম্নের দিকেই ছিলাম। দুর্ম্মুখের "ছেড়ে দে, ছেড়ে দে" বলা আমরা শুনতে পেয়েছিলাম ব'লেই এমন ক'রে লিখ্তে পার্ছি।

বাল্মীকির ভূমিকায় যিনি অভিনয় ক'রেছিলেন তিনি 'জুট মিলে' কাজ করেন। একে তিনি সরস্বতীর চিরবিরোধী, তার ওপর স্ফূর্ত্তির দিনে তিনি বোধ হয় একটু সোমরস পান করেছিলেন। তাই যখন তাঁর বক্তব্য ছিল :—

"জননি আমার
হেন প্রশ্ন তুমি কর দেবী ?
বাল্মীকির রামসীতা চির-অবিচ্ছেদ ;
অন্তরে অন্তরে চিরন্তন
মিলনের প্রবাহ বহিছে।"

তখন অতি উচ্চকণ্ঠে দৃপ্তস্বরে আবৃত্তি কর্লেন,—

"জননি আমাড়
হেন পোস্‌ন তুমি কড় দেবি ?
বাল্মীকির রামসীতা চিড়-ব্যবচ্ছেদ ;
অন্তড়ে অন্তড়ে হায় হায়
মন্দাকিনী বহে যায়"

শেষের দিক্‌টিতে Prompterএর কথা শুন্তে না পেয়ে তিনি নিজের রচনাই শুনিয়ে দিলেন। কিন্তু মূর্খ 'অডিয়েন্স' হাততালি সহকারে একসঙ্গে হেসে উঠ্লো।

লব ও কুশকে বোধ হয় 'জলি' হ'তে বলা হয়েছিল। তাই হাত তিনেক

দূর থেকে তারা দুজনে লাফ্ মেরে উপবিষ্ট বাল্মীকির পায়ের উপর প'ড়ে গেল। সীতার কাছ থেকে যুদ্ধ করবার অনুমতি পাওয়া মাত্রেই তারা এমন দৌড় দিল যে, ষ্টেজের ওপর যে কাঠের বাক্সটি আগের দৃশ্যের জন্য রাখা ছিল সেটিতে ঠোক্কর খেয়ে দুজনে একসঙ্গেই 'পপাত ধরণীতলে'। চতুর্দ্দিক্ থেকে হৈ হৈ রব উঠ্‌লো, হাস্‌তে হাস্‌তে পেটে খিল ধরবার যোগাড় হয়েছিল! যাই হ'ক 'প্রম্প্‌টার' মশাই বুদ্ধি ক'রে বাঁশী বাজিয়ে দিলেন, স্ক্রীন প'ড়ে গেল—তারপর ভেতরে কি হ'ল কে জানে!

সংসারে কোন জিনিষই নিছক মন্দ হ'তে পারে না, এক্ষেত্রেও সে নিয়মটির ব্যতিক্রম হ'ল না। সীতার ভূমিকায় যিনি অভিনয় করেছিলেন তাঁর মধ্যে সত্যিকার প্রতিভা আছে ব'লে মনে হল। তাঁর অসুবিধা হচ্ছিল খুবই, তবু তিনি সব দিকে মানিয়ে নিচ্ছিলেন নিজের অভিজ্ঞতার সাহায্যে।

একটা ক'রে দৃশ্য শেষ হয়, আর অনেকক্ষণ পরে স্ক্রীন ওঠে। এমনি ক'রে রাত্রি সাড়ে তিনটায় অভিনয় শেষ হ'ল, সীতা পাতালপ্রবেশ ক'রলেন আমরাও বেলা দশটা পর্য্যন্ত একদমে ঘুমাবার ইচ্ছায় শয্যাগ্রহণের জন্য গৃহাভিমুখে যাত্রা করলাম।

পরদিন উঠে দেখ্‌লাম পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা "শীতা", "শীতা" বলে চেঁচাচ্ছে। বুঝ্‌তে দেরী হ'ল না, গত রাত্রির 'আর্ট' তারা ভাল ক'রেই আয়ত্ত করেছে।

পশুশালা দর্শন

আলিপুর পশুশালায় অনেকবার গিয়েছি, কিন্তু আমার শিশুমনে এর যে বিস্ময় ধরা পড়েছিল এখন তা একেবারেই নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে। প্রকাণ্ড বাগান আর তার ভিতরকার ছোট-বড় সুশ্রী-বিশ্রী নানা প্রকারের জন্তু পল্লীবালকের চক্ষে একটা অদ্ভুত রাজ্যের মত বোধ হয়েছিল। বহুবার দেখার ফলে এখন আমার কাছে এ পশুশালার আরও পাঁচটা জিনিষের মতই বিশেষ

কোন আকর্ষণ নেই। এইজন্যই বোধ হয় কবি ওয়ার্ডসোয়ার্থ Yarrow দেখ্‌তে যেতে প্রথমে রাজি হন নি। আজ মনে পড়ে কবির সেই কয়টি ছত্র :—

> Be Yarrow stream unseen, unknown !
> I must, or we shall rue it
> We have a vision of our own,
> Ah ! why should we undo it ?

বাস্তবিক বার বার দেখার ফলে আর তার ওপর জ্ঞানবুদ্ধির ফলেও বোধ হয় এখন আর আলিপুর পশুশালা আমার কাছে বিশেষ একটি অদ্ভুত জিনিষ ব'লে প্রতীয়মান হয় না। এই জন্যই ছেলেবেলার সেই মধুর অনুভূতিই যতদূর সম্ভব ঠিক রেখে পশুশালা দর্শনের কাহিনীটি ব'ল্‌তে চাই।

পল্লীগ্রামে থাকৃতাম। গ্রীষ্মের ছুটিতে ক'লকাতায় বেড়াতে এলাম দূর সম্পর্কের এক কাকার সঙ্গে। বয়স তখন আমার বছর নয়। ন' বছরের পাড়াগেঁয়ে ছেলে ক'লকাতায় এসে যেমন সব কিছু একসঙ্গে দেখে নিতে গিয়ে কোনটাই ভাল ক'রে দেখ্‌তে পায় না আমারও ঠিক তেমনই হ'ল। যাই হোক্ দেখা ত চাই। একদিন দুপুর বেলা কাকা নিয়ে গেলেন আলিপুর পশুশালায়। কতদিন যে সে জায়গার কত গল্প শুনেছি সেখানে গিয়ে মনের মধ্যে যে কি রকম অনুভূতি জাগ্‌লো তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কতবার কাকা এগিয়ে প'ড়্‌লেন, কতবার যে আমি এগিয়ে প'ড়্‌লাম তা গুণে রাখ্‌লে বোধ হয় দামী রেকর্ড হ'য়ে যেত। মাঝে মাঝে কাকা আমায় একটু আধটু ধমক দিচ্ছিলেন, কিন্তু তাতে কাণ দেবার মত অবসর তখন আমার ছিল না।

নানা রকমের জন্তু দেখার পর বাঘ দেখ্‌লাম—মস্ত বড় একটা বাঘ খাঁচার মধ্যে এদিক ওদিক যাতায়াত ক'রছে আর মাঝে মাঝে আমার দিকে চেয়ে হাই তুল্‌ছে। কাকার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আমি বিস্মিত দৃষ্টি দিয়ে বাঘটাকে দেখ্‌তে লাগলাম; মনে হচ্ছিল—ছাড়া পেলে ও বাগানশুদ্ধ মানুষগুলোকে বোধ হয় খেয়ে ফেল্‌তে পারে।

আর একটা প্রকাণ্ড জানোয়ার দেখ্লাম—সেটার নাম জলহস্তী। কি প্রকাণ্ড তার হাঁ। একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে সকলে তাকে দেখ্ছিল। একজন টিপ ক'রে লম্বালম্বিভাবে এক আঁটি বিচুলি তার মুখে ফেলে দিল, সে অনায়াসেই সেটাকে গিলে ফেল্লে। তারপর দেখলাম গণ্ডার। সেটিও একটি প্রকাণ্ড জানোয়ার। এই সব বিশালকায় জন্তুগুলিকে দেখে মনে মনে অরণ্যের একটা ভীতিজনক অবস্থা ধারণা ক'রে ফেল্লাম!

পাখীর রাজ্যে উপস্থিত হ'য়ে মনে হ'ল সত্যই যেন এক পরীর দেশে উপস্থিত হয়েছি। গোটাকতক পাখী ধ'রে বাড়ী নিয়ে যাবার খুব লোভ হ'লো। কাকার বোধ হয় ভাল লাগ্ছিল না। তাই তাড়া করছিলেন।

হাতীর ওপর চড়েছিলাম ;—এখন হাসি পায় সেই কাঁদ্তে কাঁদ্তে নেমে পড়া আর কাকার বকুনির কথা মনে হ'লে।

পশুশালা দেখে ফিরলাম, কিন্তু কিছুদিন ধ'রে এর জের চলেছিল মনে। রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কখনও সেই বাঘটাকে, কখনও জলহস্তীটাকে, কখনও সেই ভয়ঙ্কর সাপগুলোকে স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়ে জেগে উঠ্তাম। কোন কোন রাত্রে স্বপ্ন দেখ্তাম যেন সমুদ্রের মাঝখানে একটা দ্বীপে চ'লে গেছি, সেখানে মানুষের চিহ্নমাত্র নেই ; শুধু যেন কত রকমের সুন্দর সুন্দর পাখীতে দ্বীপটা ভ'রে গেছে। ঘুম ভাঙ্লে দেখ্তাম—মা'র কাছটিতেই শুয়ে আছি।

বঙ্গের গৃহপালিত জন্তু

এই বিচিত্র পৃথিবীর প্রাকৃতিক অবস্থা ও জলবায়ু সর্ব্বত্র একরূপ নহে। কোথাও শীতের প্রাবল্য, কোথাও গ্রীষ্মের আতিশয্য, কোন দেশ নদীমাতৃক ও বৃষ্টি-বিধৌত, আবার কোন স্থান বালুকাময় মরুভূমি ও অত্যন্ত অনুর্ব্বর। প্রকৃতির এই লীলাবৈচিত্র্যই বিভিন্ন দেশের জীবজন্তু ও উদ্ভিদাদির আকৃতি ও প্রকৃতিগত বৈষম্যের কারণ। চিরতুষারাবৃত হিমালয়ের জীবজন্তুর সহিত গ্রীষ্মপ্রধান বিষুব অঞ্চলের প্রাণীদিগের কতই না পার্থক্য! বঙ্গদেশের জলবায়ু

ও প্রাকৃতিক পরিবেশ তথাকার পশুপক্ষীদিগের আকৃতি ও প্রকৃতি গঠনে বিশেষ প্রভাবশীল হইয়াছে।

সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমি সাধারণতঃ সমতল। ইহার জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ ও কিঞ্চিৎ আর্দ্র, ইহার মৃত্তিকা বালিকর্দ্দম-মিশ্রিত ও বিশেষ উর্ব্বর। আর্দ্র জলবায়ু স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ অনুকূল নহে বলিয়া এই স্থানের অধিবাসী ও জীবজন্তু কিঞ্চিৎ খর্ব্বাকার ও অপরিপুষ্ট। সে যাহা হউক, গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলসমূহে যে সমস্ত গৃহপালিত পশ্বাদি দৃষ্টিগোচর হয় তাহার সকলই এখানে বিদ্যমান। ইহাদের মধ্যে গো, মহিষ, অশ্ব, কুকুর, ছাগল, বিড়াল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতির অপূর্ব্ব বিধানানুসারে ইহারা এই দেশবাসীর প্রভুত উপকার সাধন করিয়া তাহাদের গার্হস্থ্যজীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হইয়া রহিয়াছে।

বিভিন্ন গৃহপালিত পশুদের মধ্যে গরুই বঙ্গদেশে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। গরু না হইলে বাঙ্গালীর বিশেষতঃ হিন্দুগৃহস্থের গৃহ অসম্পূর্ণ ও অঙ্গহীন হইয়া পড়ে। বঙ্গদেশ কৃষিপ্রধান, কৃষিই ইহার অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। বলদ, বৃষ প্রভৃতি দ্বারা কৃষিকার্য্য করা হয় বলিয়া তাহারা যে জীবনযাত্রার পক্ষে কত প্রয়োজনীয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তবে উহাদের প্রয়োজনীয়তা ও সমাদর কৃষককুলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি মাতৃস্বরূপিণী সুদর্শনা সুশীলা গাভীর আদর বাঙ্গলার সর্ব্বত্র। হিন্দুগণ গাভীর বিভিন্ন গুণে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে দেবীর আসন প্রদান করিয়াছেন। গো-সেবা, গো-পালন এবং গো-রক্ষা প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থ অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া মনে করেন। দুগ্ধ, দধি, ঘৃত প্রভৃতি গব্য দ্রব্যসমূহ শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বাপেক্ষা উপাদেয় খাদ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। খড়, কুটা, খইল প্রভৃতি দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া ইহারা যে অমৃতোপম বস্তু দান করে তাহা একাধারে ঔষধ ও পথ্য, আহার ও পানীয়। বঙ্গদেশের যে বিভিন্ন মিষ্টদ্রব্যসমূহ সমগ্র জগতে খ্যাতি লাভ করিয়াছে তাহাদেরও প্রধান উপাদান এই দুগ্ধ। গোময় হিন্দুদিগের নিকট পরম পবিত্র। দরিদ্র গৃহস্থ উহা শুষ্ক করিয়া তদ্দ্বারা

জ্বালানি কাষ্ঠের অভাব নিবারণ করে। এই পরম উপকারী জন্তুটি মৃত্যুর পরেও স্বীয় দেহের বিভিন্ন অংশদ্বারা মনুষ্যের নানা প্রয়োজন ও অভাব পূর্ণ করে।

বড়ই দুঃখের বিষয় গোজাতি বর্ত্তমানে অনাদৃত ও উপেক্ষিত। বঙ্গবাসিগণ ইহাদের সম্যক্ আদর-যত্ন করিতে ভুলিয়া গিয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহাদের ভাগ্যে উপযুক্ত আহার এবং যত্ন জোটে না। এই জন্যই বঙ্গের বৃষ ও গাভীগুলি দিন দিন স্বাস্থ্যহীন ও শ্রীহীন হইয়া পড়িতেছে। জাতির স্বাস্থ্যের অবনতির সঙ্গে ইহাদের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। দেশের শাসক সম্প্রদায়ের ও নেতৃবৃন্দের মনে রাখা উচিত যে গোজাতির সম্যক্ উন্নতি বিধান করিতে না পারিলে এই ভগ্নস্বাস্থ্য বাঙ্গালী জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি অসম্ভব।

উপকার ও প্রয়োজনীয়তা হিসাবে বঙ্গের গৃহপালিত পশুদের মধ্যে মহিষকে দ্বিতীয় স্থান দেওয়া যাইতে পারে। উহারাও গরুর ন্যায় কৃষিকার্য্যে সহায়তা করে ও প্রচুর দুগ্ধ প্রদান করে; অধিকন্তু উহারা অধিকতর সবল ও কষ্টসহিষ্ণু এবং ভারবাহী পশুর কার্য্য করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যেরও সহায়তা করে। শান্তস্বভাব তৃণভোজী এই বিশালকায় পশুটি গুণ-গৌরবে গরু অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহে।

গৃহপালিত পশুদিগের মধ্যে অশ্বও স্থান পাইবার উপযুক্ত। তবে এই সুশ্রী, বলবান্, কর্ম্মকুশল ও মূল্যবান্ জন্তুটি মাত্র ধনীরই বিলাস-সামগ্রী। অন্যান্য দেশে অশ্বদ্বারা কৃষিকার্য্য সাধিত হইয়া থাকে, কিন্তু বঙ্গের আর্দ্র ভূমিতে রোমন্থনকারী ও দ্বিধা-বিভক্ত-খুর-বিশিষ্ট বলদ ও মহিষই ঐ কার্য্যে প্রশস্ত।

বঙ্গদেশে বহু লোক দুগ্ধের জন্য ছাগলও রাখিয়া থাকে। ছাগদুগ্ধ অত্যন্ত বলকর, ক্ষয়নাশক এবং উদরাময়, আমাশয় প্রভৃতি রোগে অতিশয় উপকারী। শিশুদিগের পক্ষে ইহা অমৃতের ন্যায় ফলপ্রদ। খাদ্য হিসাবে ছাগমাংসও এতদ্দেশবাসীর অত্যন্ত প্রিয়।

কুকুর গৃহপালিত পশুদিগের মধ্যে অন্যতম। অধিকাংশ গৃহস্থই এই প্রভুভক্ত, অল্পে তুষ্ট, অত্যুপকারী জন্তুটির অত্যন্ত সমাদর করেন। অবশ্য অন্যান্য শীতপ্রধান দেশের কুকুরের ন্যায় বঙ্গের কুকুর তত উৎকৃষ্ট নহে। তবে

উপযুক্তভাবে লালন পালন করিলে এতদ্দেশীয় কুকুরও স্থল-বিশেষে বিশেষ শক্তি, সাহস ও চাতুর্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। এদেশে প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থের অন্ততঃ একটি করিয়া কুকুর আছে। বহু ধনী ব্যক্তি সখ করিয়া বিদেশী কুকুর পুষিয়া থাকে। তবে তাহাদের সংখ্যা সামান্য। মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রগণ প্রয়োজনবোধেই ইহাদিগকে অত্যন্ত আদর করেন। যখন সমস্ত জগৎ নিদ্রার শান্তিময় কোলে সুখে সমাসীন থাকে, তখন এই মহোপকারী জন্তুগণ বিনিদ্র অবস্থায় স্ব স্ব প্রভুর গৃহ তস্কর প্রভৃতির উৎপাত হইতে রক্ষা করে। উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে ইহারা আরও নানাবিধ গুণের পরিচয় দিতে পারে।

মার্জ্জার অর্থাৎ বিড়ালও আর একটি গৃহপালিত জন্তু। মূষিক প্রভৃতি অনিষ্টকারী প্রাণিসমূহের বিনাশ সাধন ভিন্ন ইহাদের নিকট হইতে আর কোনও উপকার পাওয়া যায় না, কিন্তু ইহাদের আবদার ও দৌরাত্ম্য অন্য যে কোন গৃহপালিত জন্তু অপেক্ষা অধিক। ইহারা নিজগুণে মানুষের প্রিয় হইতে পারিবে না বলিয়াই বোধ হয় ভগবান্ মানুষকে ইহাদের প্রতি স্বভাবতঃ স্নেহশীল করিয়া দিয়াছেন। অনেক স্থলে এই ভাগ্যবান্ জীবটি অনেক সন্তানহীন ব্যক্তির স্নেহ ভোগ করিয়া বেশ সুখে ও স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিয়া থাকে।

গৃহপালিত জন্তুগুলি দেশবাসীর প্রভূত উপকার সাধন করিয়া থাকে। প্রত্যেকেরই উহাদিগকে স্বপরিবারভুক্ত আত্মীয়ের ন্যায় মনে করা উচিত। সামান্য আহার্য্যের বিনিময়ে তাহারা যেরূপ নিঃস্বার্থভাবে আমাদের নানা উপকার করে, তাহা মনে করিয়া তাহাদিগের রোগে শুশ্রূষা ও বার্দ্ধক্যে পালন করা উচিত। হিন্দুধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, জৈনধর্ম্ম, এমন কি বৈষ্ণবধর্ম্মও আমাদিগকে সর্ব্বজীবে দয়া প্রদর্শন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। অতএব আমরা যাহাদের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ তাহাদের প্রতি আমাদের অধিকতর সদয় হওয়া উচিত। ইহাদের সংরক্ষণ ও উন্নতিতে বাঙ্গালার উন্নতি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পাইবে।

গণতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্র

রাজার স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে প্রজাসাধারণের বিদ্রোহ পৃথিবীর ইতিহাসে একাধিক বার বহু দেশে হইয়া গিয়াছে, শুধু পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে নয়, প্রাচ্য দেশেও এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। কিন্তু ফরাসী-বিপ্লবের সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণীর ভিতর দিয়া সর্ব্বপ্রথম গণতান্ত্রিকভাবের একটা প্রচণ্ড শক্তি বিশ্বের সকল দেশে ছড়াইয়া পড়ে। কারণ তাহা শুধু বিদ্রোহ নহে, তাহা মনুষ্য-সমাজের রাষ্ট্রীয় ক্রমপ্রগতির একটি বিশিষ্ট স্তর। মনুষ্য-সমাজ যে অসভ্যতার স্তর হইতে আধুনিকতম সভ্যতার শেষ স্তর পর্য্যন্ত অবস্থানুযায়ী ও প্রয়োজন অনুসারে আপন রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিয়াছে এবং রাজা যে ঈশ্বরাদিষ্ট এবং ঐশ্বরিক শক্তি-প্রেরিত কোন ব্যক্তি নহেন, তিনি যে কোন কালে প্রজা-কর্ত্তৃক রাজকার্য্য সম্পাদনের জন্য সাধারণভাবে নির্ব্বাচিত হইয়া কাজ করিয়াছেন ইহাই গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা ঘোষণা করিতে চায়। এ কথাও বলা যাইতে পারে যে রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসাবে এবং জনসাধারণের দিক্ হইতে রাষ্ট্রীয় অধিকার অর্জ্জনের দিক্ হইতে ইহার মূল্য চিরকালই থাকিবে। গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার মধ্যেই মানুষ সর্ব্বপ্রথম আপনার স্বরূপ সম্বন্ধে সুস্পষ্টরূপে ভাবিতে শিখিয়াছে, কিন্তু জগতের সভ্যতার ক্রমপ্রগতিতে কোন বিশিষ্ট রূপই সনাতন নহে এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রণালীই চিরন্তনভাবে মনুষ্য-সমাজের সকল প্রকার অভাব অভিযোগ পূরণ করিতে পারিবে না এ কথা ভাবিবার মত মানুষ থাকা প্রয়োজন। গতানুগতিক ভাবে চলিতে চলিতে সমাজে ও রাষ্ট্রে একদিন গ্লানির আবির্ভাব হয়। যে সাম্যের পবিত্র উদ্দেশ্য লইয়া গণতন্ত্রের জন্ম হয়, ব্যাবহারিক জগতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিও তাহা শেষ পর্য্যন্ত পূর্ণভাবে আনিতে পারিল না এবং শেষ পর্য্যন্ত রাষ্ট্র হইয়া উঠিল কতিপয় বুদ্ধিমান্ ও প্রতিপত্তিশালীর একচেটিয়া কারখানা। তাহা ছাড়া জনসাধারণ কোন দিনই সমাজ ও জাতীয় জীবনের সকল জটিল সমস্যার সমাধান করিতে পারে না। নানা কারণে ক্রমশঃ আবিলতা আসিয়া রাষ্ট্রজীবনে প্রবেশ

করে এবং মানুষ চায় তাহার প্রতিকার। অনেক সময় এইরূপ গ্লানিময় মুহূর্ত্তে মানুষ সর্ব্বকর্তৃত্বময় নেতার আদেশের মধ্যে আত্মসমর্পণ করিয়া আনন্দ পায়। মনুষ্য-সমাজের এইরূপ একটি দুর্ব্বল মুহূর্ত্তেই স্বৈরতন্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছে, এবং অবসাদগ্রস্ত জাতীয় জীবনে ইহা অল্প সময়ের ভিতরে জীবনী-শক্তি আনিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে।

মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের দিক্ হইতে এবং মনুষ্যত্ব বিকাশের সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম উপায়রূপে গণতন্ত্রই মানব-সমাজের আকাঙ্ক্ষিত আদর্শ হইলেও বাস্তবিকপক্ষে সেই আদর্শ সকল সময় কার্য্যে পরিণত হয় নাই। কতিপয় বিত্তশালী ও প্রতিভাশালী ব্যক্তিই বাস্তবিকপক্ষে গণতন্ত্র-প্রণালীতে শাসিত দেশেও রাষ্ট্রকে পরিচালিত করিয়া আপনাদের স্বার্থসিদ্ধিতে যতটা সমর্থ হইয়াছেন সেই পরিমাণে জনসাধারণ বা শ্রমিকশ্রেণী উপকৃত হয় নাই। তাহা ছাড়া জনসাধারণের প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনও সব সময়ে নির্দ্দোষ বা নির্ভুল হয় না। জনসাধারণের সকল সময় গুণী ব্যক্তিকে মনোনয়ন করিবার মত বুদ্ধি বা বিচার-শক্তিও থাকে না। এই সকল নানা কারণে বাস্তবিকপক্ষে কল্পিত আদর্শ গণতন্ত্র বাস্তব জগতে সম্ভবপর কি না এই প্রশ্নও চিন্তাশীল ব্যক্তিবৃন্দের হৃদয়ে উঠা অস্বাভাবিক নহে। তদুপরি গত মহাযুদ্ধের পর দুই একটি ইউরোপীয় দেশের অবস্থা এরূপ জটিল ও সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে যে একজন শক্তিশালী জীবনী-শক্তি-সঞ্চালনকারী ব্যক্তির অভাব সেই সকল দেশে অনুভূত হইয়াছে। এই সকল জটিল কারণ হইতে ইউরোপীয় রাজনীতির এক আবিলতা-কুটিলতাময় দিকের ক্রটিপূর্ণ ফাঁক দিয়া স্বৈরতন্ত্র মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে।

স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃবৃন্দ (ডিক্টেটরগণ) জাতির সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে প্রথমেই জাতিকে আশ্বাস দেন যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহারা দেশের সঙ্কট বিদূরিত করিবেন। এই আশ্বাস জাতির দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে দেশকে যথেষ্ট শক্তি দিয়া থাকে। তাহা ছাড়া রাষ্ট্রশক্তি-বলে ডিক্টেটরগণ সমগ্র দেশের মধ্যে একটি বিশিষ্ট ভাব ও মতের প্রতিষ্ঠা স্থাপনে সমর্থ হন। ধনিক ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে উভয় শ্রেণীকে সন্তুষ্ট করিয়া একটি আপোষ-নিষ্পত্তির চেষ্টা প্রত্যেক ডিক্টেটরই করিয়া

থাকেন। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা যাইতে পারে যে শুধু ফ্যাসিষ্ট-ভাবাপন্ন দেশসকল ছাড়াও সমাজতান্ত্রিক রুশিয়াতেও ষ্ট্যালিন বাস্তবিকপক্ষে ডিক্টেটরী প্রণালীতে রাজ্যশাসন করিতেছেন এবং ডিক্টেটরী শাসনপ্রণালী অন্ততঃ ব্যাবহারিক দিক্ দিয়া তাঁহারাও অনুমোদন করিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া প্রত্যেক ডিক্টেটরই তাঁহার দেশের সংস্কৃতির দিক্ হইতে একটি ভাবাদর্শ প্রচারে সচেষ্ট হন। এই প্রসঙ্গে একটি কথা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, সিনর মুসোলিনি ইতালীতে ইতালীর যুবকবৃন্দের নিকট তিনটি দিক্ হইতে একটি ভাবাদর্শ উপস্থাপিত করিয়াছেন। ম্যাকিয়াভেলির রাজনীতি, বার্গসঁর দর্শন এবং নিট্‌শের জাতীয় অতিমানববাদ এই তিনটি ভাব একত্র মিলিয়া যে ভাবধারার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাই ইতালীর যুবকবৃন্দকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। তদুপরি ইতালীর অতীত সভ্যতাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার স্বপ্নও সিনর মুসোলিনীর হৃদয়ে যথেষ্ট শক্তি-সঞ্চার করিয়াছে। হের হিট্‌লার ভার্সাই সন্ধিতে বিপর্য্যস্ত জার্ম্মানীর নিকট আশার আলো লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। নিট্‌শের অতি-মানববাদ তাঁহাকেও কম শক্তিদান করে নাই। যাঁহারা বিবেচনা করেন, ডিক্টেটরগণ শুধু রাষ্ট্রশক্তি বা রাজনৈতিক চাল-বাজির সাহায্যে ইউরোপের রাজনীতিক্ষেত্রে ঘূর্ণাবর্ত্ত সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। তবে বিশ্বমানবতার দিক্ দিয়া তাঁহাদের আদর্শ মঙ্গলজনক কি না তাহার সদুত্তর দান বর্ত্তমানে সহজসাধ্য নহে। এইটুকু মাত্র বলা যায়, রাজনীতির চলস্রোতে কোন আদর্শই সনাতনত্ব লইয়া দাঁড়াইতে পারে এরূপ মনে করা কঠিন এবং বর্ত্তমান ইউরোপের জটিল পরিস্থিতিতে ডিক্টেটরদের আবির্ভাব কোন কোন দেশে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। গণতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের সংঘর্ষ শুধু রাজনৈতিক সংঘর্ষ নহে, উহা মানবসমাজের দুইটি ভাবাদর্শের সংঘর্ষ। গণতন্ত্র যেন মানুষের মানুষ হিসাবে যে চিরন্তন অধিকার তাহাই বিশ্বে ঘোষণা করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছিল। স্বৈরতান্ত্রিক (ডিক্টেটরী) শাসন-প্রণালী যেন তাহার সঙ্গে একটি কথা যুক্ত করিয়া দিয়া বলিতে চায় জনসাধারণের ভোট লওয়ার সার্থকতা আছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সর্ব্বকর্তৃত্বময় নেতার প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার্য্য নহে

অন্ততঃ জাতির সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে। গণতান্ত্রিক জাতি বিপৎসঙ্কুল মুহূর্ত্তে বড়ই দুর্ব্বল।

গণতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্র উভয়ই মনুষ্যসমাজের দুইটি বিভিন্ন সত্যের দিক্ হইতে স্থান, কাল ও পাত্রভেদে গড়িয়া উঠিয়াছে। হয়ত ভবিষ্যৎ রাজনীতিক্ষেত্রে উভয় প্রণালীর সামঞ্জস্য-বিধানের প্রয়োজনীয়তা লক্ষিত হইতে পারে। তবে একথাও আমাদিগের মনে রাখিতে হইবে যে স্বৈরতন্ত্র সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে যতটা শক্তিসঞ্চার করিতে পারে অন্য সময়ে তাহার প্রয়োজনীয়তা কিছুটা কমিয়া যায়। তাহা ছাড়া গণতান্ত্রিক ভাবাদর্শকে সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিতে জগৎ কোন দিনই পারিবে না। কাজেই স্বৈরতন্ত্রের সাময়িক প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও এবং ভবিষ্যৎ জগৎ স্বৈরতান্ত্রিক আদর্শের কতকটা গ্রহণ করিলেও মোটের উপর গণতান্ত্রিক আদর্শেরই প্রভাব থাকিবে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

বাঙ্গলার গ্রাম

আজও বাঙ্গলা দেশ মূলতঃ কৃষির উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিয়া আছে। এ দেশের মাটির উর্ব্বরতা, নদীর বহুলতা এবং বৃষ্টির আধিক্য কৃষিকার্য্যের চিরদিনই সহায়ক।

ইংরাজদের আগমনের পূর্ব্বে বাঙ্গালী পল্লীগ্রামে বস-বাস করিয়া সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে কালাতিপাত করিত। শহরের প্রয়োজন তেমন ছিল না, তাই শহরের সংখ্যাও খুব কম ছিল। মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহার্য্য অত্যাবশ্যক দ্রব্য প্রায়ই পল্লীগ্রামে পাওয়া যাইত। সুতরাং বাণিজ্যের জন্য রেল ষ্টীমারের আবশ্যক তখনও হয় নাই। সাধারণতঃ নদীতে নৌকার সাহায্যে কোন কোন পণ্য দ্রব্য এক স্থান হইতে অন্যস্থানে নীত হইত। আমদানি-রপ্তানির জন্য অসম্ভব ভাড়া ছিল না। অতিরিক্ত লাভের উত্তেজনায় দরিদ্রকে লুণ্ঠন করিবার লজ্জাজনক প্রচেষ্টাও ছিল না। বণিক্-সম্প্রদায় তাহার ব্যবসালব্ধ অর্থের জন্য সমাজে কোন প্রকার অতিরিক্ত আদর ও সম্মান দাবী না করিয়া শাস্ত্রের বিধি-

নির্দেশ অনুসারে যথাপ্রাপ্য স্থান অধিকার করিয়াই থাকিত। পাশ্চাত্ত্য কাঞ্চন-কৌলীন্যের বদলে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের আদর্শ অনুযায়ী ব্রাহ্মণ দেশসেবা কিংবা বিদ্যাদান কর্ম্মে ব্রতী থাকিতেন। তাঁহাদের ও অন্যান্য সকলের বুদ্ধি বিষয়-বাসনার লোভে তখনও তেমন সমাচ্ছন্ন হয় নাই।

গ্রামে গ্রামে দেবমন্দির ছিল। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের গৃহেই অধ্যয়ন-অধ্যাপনার জন্য টোল বসিত। নানা দেশের বিদ্যার্থিগণ গুরুর গৃহে অন্নলাভ করিয়া বিদ্যা-গ্রহণ করিতেন। গুরুও ছাত্রগণকে অন্নদান করিয়া কৃতার্থ হইতেন। তখন গুরু-শুশ্রূষার বিনিময়েই বিদ্যালাভ হইত। তাহাতে গুরুশিষ্যের যে সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিত, তাহার ক্ষীণাংশ আজও প্রকৃত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত অধ্যাপকের বিদ্যার্থিগণের মধ্যে দেখা যায়।

সেকালে অন্ন-বস্ত্রের জন্য সকলকে হাহাকার করিয়া বেড়াইতে হইত না। সকলেরই বাড়ী ছিল, পুকুর ছিল, চাষ-আবাদের জমি ছিল, তরি-তরকারির বাগ-বাগিচা ছিল। গোপালন গৃহ-ধর্ম্মের অন্তর্গত ছিল। দেশে আহার্য্য ছিল প্রচুর, মানুষের স্বাস্থ্য ছিল অটুট এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ছিল শান্তি ও অফুরন্ত আনন্দ। তাই পরস্পরের ভিতরে প্রীতির সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেজন্য সহজ ও অনাড়ম্বরভাবে সমাজসেবা ও দেশসেবা ধর্ম্মের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এমনই অবস্থা ও পরিবেষ্টনীর মধ্যে বাঙ্গালী গ্রামে থাকিয়া স্বাস্থ্যে, মনের সংস্কৃতিতে এবং চরিত্রবলে যে জীবন যাপন করিত তাহা আজ কল্পনা করিলেও আনন্দ বোধ হয়।

ইংরাজেরা বাণিজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্য লইয়া এ দেশে আগমন করিয়াছিল। সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যও সে দিন তাহাদের কল্পনার বিষয় ছিল কি না কে বলিবে? কিন্তু ভারতবর্ষের তৎকালীন অবস্থার পরিস্থিতি ইংরেজ জাতির ভাগ্যোদয়ের অনুকূল হইয়া দেখা দিল।

যাহাদের দেশ অল্প-পরিসর তাহাদের বাহির হইতে অনেক কিছু সংগ্রহ করিয়া আনিতে হয়। ইহা ইংরেজ জাতির সহজ বণিক্-বৃত্তির আদি কথা।

ভারতবর্ষের কৃষি-সম্ভার, পাট, তুলা প্রভৃতি কাঁচামাল নিজের দেশে লইয়া যাইবার প্রচেষ্টায় ইংরেজ জাতি দেশশাসনের অনুকূল ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যবিস্তারের বিরাট ব্যবস্থাগুলি দ্রুত অগ্রসর করিয়া ভারতবর্ষকে নিজেদের দৃঢ় করতলগত করিয়া বাণিজ্যের বিস্তারে, অর্থে সামর্থ্যে ইউরোপের মধ্যে ক্রমেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী জাতি হইয়া দাঁড়াইল। ধীরে ধীরে তাহার শৌর্য্যবীর্য্যের কাছে সমগ্র পৃথিবীকে অবনত করিল।

ইংরেজ জাতির বাণিজ্যবিস্তারের সহিত কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, করাচি প্রভৃতি নগরীর অসামান্য সমৃদ্ধির ইতিহাস বিজড়িত।

কলিকাতার সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুশাসনের ব্যবস্থার ফলে বাঙ্গলা দেশের অন্যান্য শহরেরও উন্নতি ঘটিল। সেই সঙ্গে পল্লীবাসীরা শিক্ষা-দীক্ষা এবং বিশেষ করিয়া অর্থোপার্জ্জনের প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে গ্রাম ছাড়িয়া শহরে আসিয়া বাস করিতে লাগিল।

ইংরাজি শিক্ষার প্রবর্ত্তন সর্ব্বাগ্রে বাঙ্গালা দেশে হয় এবং তীক্ষ্ণধী বাঙ্গালী সন্তান কৃতিত্ব দেখাইয়া সরকারের অধীনে মোটা বেতন পাইয়া নিরুদ্বেগে জীবন যাপন করিতে লাগিল।

কলিকাতার বাড়ী, গাড়ী, সুখসম্পদ্ পল্লী বাঙ্গালার চোখের সম্মুখে এমন একটি লোভনীয় চিত্র উদ্‌ঘাটিত করিয়া ধরিল যে পল্লী হইতে জন-স্রোত শহরের দিকে প্রবহমান হইয়া ক্রমেই গ্রামগুলিকে শ্রীহীন করিয়া তুলিতে লাগিল। সংস্কৃত-বিদ্যার আদর ক্রমেই কমিয়া আসিতে লাগিল; কেননা তাহাতে চাকুরী পাওয়া যায় না; ওকালতি কি ডাক্তারি করা চলে না। এইভাবে একদিন বাঙ্গালী জাতি ইংরেজি শিক্ষার নাগপাশে জড়িত হইয়া পল্লীর শান্তি-সুখের কথা বিস্মৃত হইল। একান্নবর্ত্তী পরিবারের আদর্শ ধূলিসাৎ হইল। বাঙ্গালীর চাকুরির মোটা বেতন আত্ম-সুখ এবং বিলাস-ব্যসনে নিঃশেষিত হইতে লাগিল।

চতুর্দ্দিকে রেলপথ বিস্তারের ফলে বাঙ্গলা দেশের জলের স্বাভাবিক প্রবাহ রুদ্ধ হইয়া সমগ্র দেশ স্থির জলাভূমিতে পরিণত হইল, ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি

কমিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়ার তাণ্ডবে পল্লীগ্রাম শ্মশানে পরিণত হইতে চলিল।

দেড় শত বৎসরের মধ্যে সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা বঙ্গভূমিতে কৃষিকার্য্য করিবার মানুষের অভাবে আবাদ কমিয়া আসিল। এদিকে শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক্ হইতে উপেক্ষিত পল্লীগ্রাম সকলের পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। এমনি করিয়া বাঙ্গলার গ্রাম আজ দুঃখ-দুর্দ্দশার চরম সীমায় পৌছিয়াছে। সকল দিক্ দিয়া তাহার অবনতি আজ মর্ম্মান্তিক হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু একটু বিবেচনা করিলেই উপলব্ধি করা যায়, পল্লীগ্রাম ব্যতীত কেবল শহরের উপর নির্ভর করিয়া বাঙ্গালী জাতি কোনরূপে বাঁচিতে পারে না। শহরে খুব অল্পসংখ্যক বাঙ্গালীর থাকিবার স্থান সংকুলান হইতে পারে। তাই শহরের উন্নতি বাঙ্গালা দেশের প্রকৃত উন্নতির সূচনা করে না। বাঙ্গালী জাতির প্রকৃত উন্নতি সাধন করিতে হইলে পল্লীগ্রামের উন্নতির দিকে দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

বলা বাহুল্য বাঙ্গালার গ্রামগুলিই বাঙ্গালার প্রাণ। তাই বাঙ্গালা দেশকে রক্ষা করিতে হইলে গ্রামকে আত্মনির্ভরশীল করিয়া না তুলিলে চলিবে না। আত্মনির্ভরশীল হইতে হইলে যে সকল উপকরণের প্রয়োজন তাহার অভাব এদেশে নাই। অভাব হইয়াছে কেবল সময়োপযোগী শিক্ষা, আদর্শ এবং কর্ম্মপ্রেরণার। বাঙ্গালার তথা ভারতবর্ষের সংস্কৃতি এবং বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে হইলে বাঙ্গালীকে উপেক্ষিত পল্লী-জননীর দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। পল্লীগ্রামকে ত্যাগ করিয়া শহর লইয়া থাকিলে কোন দিনই সভ্যতার উৎকর্ষ সাধিত হইবে না।

বন-ভোজন

বাৎসরিক পরীক্ষার ফল বাহির হইয়া গিয়াছে—আমরা প্রথম শ্রেণীতে প্রমোশন পাইয়াছি; রাত জাগিয়া পরীক্ষার পড়া মুখস্থ করিতে করিতে শরীর ও মন কেমন যেন অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে—প্রমোশনের পর দিনই

আমরা স্থির করিলাম শহর হইতে খানিকটা দূরে গিয়া একদিন একটু আমোদ করিয়া আসিতে হইবে। সকলেই আনন্দে রাজী হইল, দলে জুটিয়া গেল সতের জন। দীনেশ বলিল, পাঁউরুটি, মাখন, ডিমসিদ্ধ আর থার্মফ্লাস্কে করিয়া চা লওয়া হউক; উপেনদা' বলিলেন, লুচি-সন্দেশ টিফিন-কেরিয়ারে লইয়া যাওয়া হউক; কিন্তু রাধানাথের পরামর্শই শেষপর্য্যন্ত টিকিল। সে বলিল, ওসব কিছুই নেওয়া হবে না। পিক্‌নিক্‌টাকে দস্তুরমত adventure-এ দাঁড় করাতে হবে। রান্নার কিছু বাসন নেওয়া হবে—এই পর্য্যন্ত। সকলকেই আট আনা ক'রে পয়সা নিতে হবে—সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই শহরের এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে হবে এবং যেখানে ৯টা বাজ্‌বে সেখানেই আমরা থাম্‌ব। খাওয়া-দাওয়ার জিনিষপত্র গ্রাম থেকে যোগাড় করতে হবে—আমাদের অদৃষ্টে যা মিল্‌বে তাই খাওয়া হবে। দেখাই যাক না একদিন একটু মজা! গণেশ একটু বিরক্ত হইয়া বলিল, মজাই বটে! বেলা ৯টা পর্য্যন্ত হেঁটে হেঁটে নাড়িভুঁড়িসুদ্ধ হজম হয়ে যাবে যখন, তখন বেরুতে হবে কোথায় চাল পাওয়া যায়! কোথায় জল পাওয়া যায়! ওসব মতলব ছাড়! খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে experiment ভাল নয়। রাধানাথ এবার হুঙ্কার দিয়া কহিল—সপ্তদশ অশ্বারোহী বাংলা জয় ক'রে নিয়েছিল আর আমরা সপ্তদশটি 'ইয়ং বেঙ্গল' একবেলা দু'টি উদরান্নের যোগাড় করতে পারবো না! লুচি-মাংস-সন্দেশ কি আমরা কোন দিন খাই নি, না আর কখনও খাবো না! কপালে দুঃখ ছিল, রাধানাথের কথায় আমাদের বীরহৃদয় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল—সকলেরই চোখ মুখ উৎসাহে সমুজ্জ্বল। যেন আমরা সতেরটি বীর জীবন দান করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া এরোপ্লেনে করিয়া মঙ্গলগ্রহে যাত্রা করিতেছি!

সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের অসীমের উদ্দেশ্যে যাত্রা আরম্ভ হইল। শহরের পাকা রাস্তা ছাড়াইয়া মেটে রাস্তায় পড়িলাম, দেখিতে দেখিতে মেটে রাস্তাও শেষ হইল, মাঠের মধ্যে নামিয়া পড়িলাম। শিশিরে মোজা সুদ্ধ কেড্‌স্ ভিজিয়া উঠিতে লাগিল, কানের ভিতর দিয়া খোলা মাঠের কন্‌কনে হাওয়া একেবারে হৃৎপিণ্ডের ভিতর প্রবেশ করিতে লাগিল। পিছন হইতে রাধানাথ

ডাকিয়া কহিল, speed বাড়াইয়া দাও, সকলে একসঙ্গে chorus গাও, সকলকেই গাইতে হবে কিন্তু। কিন্তু কি এমন গান যা, আমরা সতের জনই জানি এবং গাইতে পারি! কিন্তু রাধানাথ দমিবার পাত্র নয়,—গাও সব আমার সঙ্গে তালে তালে—'পাখী সব করে রব'—বলিয়া গান ধরিয়া দিল। জীবনে অনেক কোরাস গান শুনিয়াছি, সেদিন আমরা যেমনটি গাহিয়াছিলাম তেমনটি 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি'।

অবশেষে নয়টা বাজিল। একদিকে প্রকাণ্ড সরিষার ক্ষেত, সরিষার ফুলে সমস্ত ক্ষেতখানি ভরিয়া গিয়াছে, আর একদিকে মটরের ক্ষেত, কড়াইশুঁটিগুলি এখনও তেমন শক্ত হয় নাই; সামনে আকের জমি, আকগুলি বেশ পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, একটু দূরে কয়েকজন লোক মাঠের মধ্যেই শুক্‌না পাতা দিয়া খেজুর রস জ্বাল দিতেছে। বন-ভোজনের উপযুক্ত স্থান বটে! কৈলাসদা'র হুকুমে আমরা সব চারিদিকের গ্রামে গ্রামে ছুটিলাম। চাল ডাল তেল ঘি মসলা কাঠ জল সব আনিতেই হইবে। গণেশের চোখ ছল ছল করিতেছে, মোটা মানুষ, বেলা একটার এদিকে আসল ব্যাপারের কোনও সম্ভাবনা নাই। তারপর কাবুলী স্যাণ্ডেলের চামড়ার ফিতা গানের তালে পা ঠুকিতে গিয়া ছিঁড়িয়া গিয়াছে। একেবারে নতুন জুতা, ফেলিতেও কষ্ট, বহিতেও কষ্ট। তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া আমার সঙ্গে লইলাম এবং বুঝাইলাম যে গ্রামে বেশ টাট্‌কা ঘি পাওয়া যাইবে, আর ভাইটামিনের ডিপো কড়াইশুঁটির ক্ষেত ত সাম্‌নেই আছে। খিচুড়ি একখানা যা হবে—পোলাও-এর চেয়েও খাসা জিনিষ। ভাইটামিনের কথায় গণেশের ছোট ছোট চোখ দুটি আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বেচারী কাবুলী জুতার শোক ভুলিতে পারিয়াছে দেখিয়া তৃপ্তি পাইলাম।

ঘণ্টাদেড়েক পরে আমরা সকলেই প্রয়োজনীয় উপকরণ লইয়া ফিরিলাম। রাশীকৃত নানারকমের জিনিষ মহেশ্বরদা'র সম্মুখে আনিয়া ফেলিলাম। সে কী উৎসাহ! টিফিন-কেরিয়ারে খাবার লইয়া আসিলে কি এতটা উদ্দীপনা হইত! যেন আমরা দিগ্বিজয় করিয়া লুণ্ঠনসামগ্রী আমাদের সেনাপতিকে উপঢৌকন দিতেছি! রাধানাথও খুব করিৎকর্ম্মা লোক। চমৎকার দুইটি উনান তৈরী

করিয়াছে। সের সাতেক কড়াইশুঁটি ও সের আষ্টেক শাঁক-আলু সে ইহার মধ্যেই সংগ্রহ করিয়াছে। প্রকাণ্ড একটা কড়াতে কালবিলম্ব না করিয়া খিচুড়ি চড়ানো হইল, শেষে রাধানাথ কতকগুলি ডিমের মামলেট ভাজিয়া নামাইল। প্রায় একটার সময় আহারে বসা গেল। প্রথমটা কেহই লক্ষ্য করে নাই, ক্ষুধার জ্বালায় অন্যদিকে মন দিবার কাহারও অবসর ছিল না, কিন্তু দু'চার গ্রাস মুখে তুলিবার পর সকলেই পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। ব্যাপার কি—খিচুড়ির এমন স্বাদ হইল কেন? টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া আলু দেওয়া হইয়াছে, ফুলকপি দেওয়া হইয়াছে, কুচি কুচি করিয়া আদা দিতেও ভুল হয় নাই, এতগুলি কড়াইশুঁটি দেওয়া হইল, অতটা টাট্‌কা গব্য ঘৃত দেওয়া হইল, তবুও কিসের যেন অভাব হইতেছে! ঠিক যেমনটি লাগিবার কথা তেমনটি লাগিতেছে না কেন? অবশ্য মুহূর্ত্তমধ্যেই সকলেরই বিহ্বল ভাব কাটিয়া গেল। সকলেই বুঝিতে পারিলাম খিচুড়িতে যে পদার্থটির অভাব হইয়াছে সেটি হইতেছে লবণ। হায় অদৃষ্ট! দরকার পড়িতে পারে বলিয়া টিংচার আইডিন আর বোরিক কটন আনা হইয়াছে, কিন্তু লবণের কথাটা কাহারও মনে পড়িল না। যাহা হউক জঠরানল যখন জ্বলিয়া উঠে তখন খাদ্যাখাদ্য-বিচার থাকে না। পেটের জ্বালায় সেই লবণহীন খিচুড়িই আকণ্ঠ ভোজন করিলাম। কাহারও উপর দোষ চাপাইতে পারিলে অনেকটা গায়ের ঝাল মিটিত, কিন্তু কাহাকেই বা দোষ দিব?—সকলে মিলিয়াই একস্থানে বসিয়া ফর্দ্দ করিয়াছি।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাড়ী আসিতে হইবে, সুতরাং ফিরিতে হইল। আবার সারি বাঁধিয়া তালে তালে পা ঠুকিয়া ফিরিলাম। পথচারী দুই একজন আমাদের দিকে বিস্মিতনেত্রে তাকাইল, দুই একজন মুখ টিপিয়া একটু হাসিল। শরীরের নিম্নার্দ্ধ ধূলায় ধূসর, রোদে পুড়িয়া শরীর তামাটে হইয়া গিয়াছে, চোখে মুখে মাথায় ধূলা জমিয়াছে, যেন মড়া পোড়াইয়া বাড়ী ফিরিতেছি। খানিকটা হাঁটার পরই জিভ মুখ শুকাইয়া উঠিতে লাগিল। টিউবওয়েল দেখিলেই সেখানে সকলে দাঁড়াই।—এবার খিচুড়ি পেটের ভিতর গোলমাল করিতে

লাগিল, ভাইটামিন ফুলিতে আরম্ভ করিল, পিপাসা ও অস্বস্তি ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। কিন্তু কাহারও মুখে কথা নাই, 'ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা তখন।' সকলেই ঠিক করিলাম আমাদের বন-ভোজনের ব্যাপারটা—বিশেষ করিয়া লবণের কথাটা—কাহারও কাছে প্রকাশ করা হইবে না।

কুটীর-শিল্প

ভারতের কুটীর-শিল্প একদিন কেবল এদেশবাসীর অভাব মোচন করিত না, বিদেশ হইতে প্রভূত অর্থ আহরণ করিয়া জাতীয় ধনভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিত। নানা কারণে এদেশের এই সম্পদটি দিন দিন বিলুপ্তপ্রায় হইয়া যাইতেছে। আমাদের বর্ত্তমান আর্থিক দুর্গতির ইহাই যে একটি প্রধান কারণ একথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। জাতিকে এই অকালমৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিতে হইলে, কুটীর-শিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

কি কি কারণে কুটীর-শিল্পগুলি বিনষ্ট হইতেছে এবং কি কি উপায়ে ঐগুলি রক্ষা করা সম্ভবপর ধীরচিত্তে তাহার বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। অনেকে যন্ত্র-যুগের প্রতিযোগিতাকেই ইহার একমাত্র ধ্বংসের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিশ্বাস এই যন্ত্রের যুগে কুটীর-শিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠা একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, তাঁহাদের যুক্তি সম্পূর্ণ সত্য নহে। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, সুদীর্ঘকাল যন্ত্র-শিল্পের কঠোর প্রতিযোগিতার মধ্যেও এদেশের কোন কোন কুটীর-শিল্প এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। যদি বৈদেশিক প্রতিযোগিতা কুটীর-শিল্প-ধ্বংসের একমাত্র কারণ হইত, তাহা হইলে এতদিনে ভারতীয় কুটীর-শিল্পের চিহ্নও খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। এদেশে পারিবারিক পরিশ্রমের মূল্য এত কম, এত অল্প ব্যয়ে এদেশের লোক জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে পারে যে, বহু যন্ত্র উহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াও জয়ী হইতে পারে না। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বুঝাইয়া দেওয়া

যাইতে পারে। তেলের কলে দৈনিক প্রচুর পরিমাণে তৈল উৎপন্ন হইলেও ঐ কলটির প্রতিষ্ঠায় ও পরিচালনায় যে বিপুল অর্থব্যয় হয় তাহাতে মণ-করা সেই খরচা পাইলে কলুরা অনায়াসে এই ব্যবসায় চালাইতে পারে। প্রশ্ন হইতে পারে, তবে এই কুটীর-শিল্পটি দিন দিন উঠিয়া যাইতেছে কেন? ইহার কারণ কলওয়ালাদিগের যে সমুদয় সুযোগ সুবিধা আছে, কলুদের তাহা নাই। প্রথমতঃ তাহারা ধনী, বরাবর মোকাম হইতে প্রচুর পরিমাণে সরিষা আমদানী করে। আর পল্লীবাসী কলুরা স্থানীয় মহাজনের নিকট প্রায়ই ধারে উহা খরিদ করিতে বাধ্য হয়। ইহাদিগকে কলওয়ালা অপেক্ষা অনেক চড়া দরে মাল কিনিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ কলওয়ালারা উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের অনেক সুবিধা পায়। তাহারা শহরে থাকিয়া নিত্য হাজার হাজার মণ তৈল বিক্রয় করিতে পারে। পক্ষান্তরে পল্লীবাসী কলুর সে সুবিধা নাই। সে স্থানীয় খরিদ্দার ভিন্ন অন্যত্র বেচিতে পারে না। সামান্য তৈল শহরে চালান দিতে গেলেও যথেষ্ট খরচা পড়ে। কেবল এই জন্যই উহারা কলওয়ালাদিগের সহিত পারিয়া উঠিতেছে না। অপরাপর কুটীর-শিল্প সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে।

পূর্ব্বে এদেশে বাহিরের প্রতিযোগিতা ছিল না, সেই স্থানের উৎপন্ন দ্রব্য সেই স্থানেই কাটতি হইয়া যাইত। এজন্য শিল্পকারগণকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইত না। শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয় উভয়বিধ কার্য্যই তাহারা স্বচ্ছন্দে সম্পন্ন করিতে পারিত। বর্ত্তমানে কারবারের পদ্ধতি ভিন্ন পথে চলিয়াছে। প্রত্যেক দেশে দ্রব্যের প্রস্তুত ও বিক্রয়ের ভার দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপর ন্যস্ত। শিল্পিগণ নানা দ্রব্য প্রস্তুত করে, আর একদল ধনি-সম্প্রদায় তাহাদিগকে অর্থ দিয়া সাহায্য করে ও দেশ-বিদেশে ঐ সকল দ্রব্য বিক্রয়ের সুব্যবস্থা করে। এইরূপে উভয় সম্প্রদায় পরস্পরের সহযোগে লাভবান্ হইয়া থাকে।

এই বিক্রয়-ব্যবস্থার উপর প্রত্যেক শিল্পদ্রব্যের উন্নতি ও অবনতি নির্ভর করিতেছে। যে জাতির বিক্রয়শক্তি যত অধিক বাণিজ্যক্ষেত্রে সে জাতি

তত উন্নতিশীল। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে সেই বিক্রয়কারী সম্প্রদায় নাই বলিলেই চলে। এই কারণেই পল্লীবাসী কুটীর-শিল্পিগণ একেবারে অসহায় হইয়া পড়িতেছে।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগ হইতে আমরা কুটীর-শিল্পের উন্নতিকল্পে বিভিন্ন প্রদেশে শিল্প-বিদ্যা-শিক্ষালয় ও শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের কারখানা স্থাপনেই নিযুক্ত আছি। প্রস্তুত দ্রব্য বিক্রয় সম্বন্ধে বিশেষ কোন ব্যবস্থা নাই বলিলেই চলে। আমরা একবার চিন্তা করিয়া দেখি না যে শিল্পীর অভাবে এদেশের কোন কুটীর-শিল্প ধ্বংস হয় নাই। শিল্পদ্রব্য কাটৃতির অভাবেই শিল্পীরা ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। যে কোন কুটীর-শিল্পের কাটৃতি আরম্ভ হইলে আপনা হইতেই সুদক্ষ শিল্পী গড়িয়া উঠে। উহার জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া শিল্প-শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠার কোন দিন প্রয়োজন হয় নাই। ইহাতে অর্থ ও সময়ের অনর্থক অপব্যয় হয় বলিয়াই মনে হয়। কারণ এখনও দেশে যে সমুদয় কুটীর-শিল্পী বিদ্যমান আছে, উহাদের সহিত হাতে কলমে কাজ শিখিয়া একজন যত সহজে ও স্বল্পকাল মধ্যে সুদক্ষ হইয়া উঠিতে পারে, শিল্প-শিক্ষালয়ের কেতাবী বিদ্যালয়ে পড়িয়া তাহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং এদেশের কুটীর-শিল্পের উন্নতি সাধন করিতে হইলে, শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন। বিভিন্ন পল্লী হইতে যথানিয়মে শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিলে এবং দরিদ্র শিল্পিগণকে প্রয়োজনমত অর্থসাহায্য করিলে তাহারা যৎসামান্য পারিশ্রমিক পাইলেও যথেষ্ট পরিমাণে শিল্পদ্রব্য সরবরাহ করিতে পারে। আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস এইভাবে কুটীর-শিল্পকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিলে, সাত সমুদ্র পার হইতে বিদেশী কলওয়ালারা এ দেশের কুটীর-শিল্পের প্রতিযোগিতা করিতে পারে না। ইহার কারণ এ দেশে কাঁচা মালের দাম ও মজুরী পৃথিবীর সকল দেশ অপেক্ষা সস্তা, সুতরাং কলের পড়তা যতই কম হউক না কেন, অন্যান্য ব্যয় তাহাদের এত অধিক যে, এ দেশের সহিত প্রতিযোগিতা করা কোন ক্রমেই সম্ভব হইতে পারে না।

আর এক কথা, বৈদেশিক শিল্পদ্রব্যের বাহিরের পালিশ বা চাকচিক্য

দেখিয়া সহজেই জনসাধারণ উহার পক্ষপাতী হইয়া থাকে। দেশবাসীর এই মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন করা প্রয়োজন। অধিক মূল্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া স্বদেশী শিল্পের উন্নতি সাধন করা দেশের দরিদ্র-সাধারণের পক্ষে সম্ভব নাও হইতে পারে, কিন্তু স্বদেশের কল্যাণকল্পে মানসিক রুচি পরিবর্ত্তন করা কাহারও পক্ষে কষ্টকর বলিয়া মনে হয় না। জাতির কল্যাণে কত দেশ কত কষ্ট স্বীকার করিতেছে; আর আমরা যদি সামান্য সুখ-সুবিধা বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠিত হই, তবে আমাদের মত অপদার্থ এ জগতে আর কে আছে ?

তোমার জীবনের লক্ষ্য কি ?

আজ আমরা দিগ্‌বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হইয়া কেবল অর্থোপার্জ্জনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই স্ব স্ব শিক্ষণীয় বিষয় বাছিয়া লই, কোন্ শিক্ষণীয় বিষয় কাহার পক্ষে উপযোগী তাহার বিচার করি না। ধনবান্ অভিভাবক তাঁহার ননীর পুতুল পুত্রকে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্ত্তি করেন, যিনি পাঁঠাকাটার রক্ত দেখিলে মূর্চ্ছিত হন, তিনি ডাক্তারি পড়িতে ব্যগ্র, আর সাত চড়ে যাঁহার মুখে কথা ফুটে না, তিনি ওকালতি পাশ করিয়া থাকেন।

এই নিদারুণ ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের মধ্যেও মানবমনের স্বাভাবিক বৃত্তি একেবারে বিলুপ্ত হইতে পারে না। তাই আমাদের ভাব-প্রবণ তরুণ চিত্তে নিত্য নব নব কতই না উচ্চাশা, শুভ সঙ্কল্প দেখা দেয়। যখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতগুলি আমার মন-প্রাণ পুলকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তখন মনে হয় এই শোক-তাপ-জরা-মরণ-জর্জ্জরিত মানব-সংসারে কবির জীবনই ধন্য! কাব্য-সাধনাই আমার জীবনের চরম লক্ষ্য। আবার যখন মহাপ্রাণ জগদীশচন্দ্রের ধ্যানমগ্ন ঋষি-মূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন বিশ্ব-রহস্যের গুপ্তপথে বিশ্ব-পতির রাতুল চরণে উপনীত হইবার জন্য আমার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠে! কর্ম্মবীর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অতুলনীয় স্বদেশ-প্রেম, অকুণ্ঠিত আত্মত্যাগ,

দেশ-মাতৃকার সেবায় অকাতরে জীবন-বিসর্জ্জনের বিষয় যখন চিন্তা করি, তখন স্বদেশের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করিবার জন্য মন-প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে। আবার আত্মীয়স্বজনের দুঃখ দৈন্য দেখিলে মনে হয়—আমার সকল সাধ সকল সাধনা রসাতলে যাক, আমি যে কোন উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিয়া এই নিদারুণ দুঃখ দূর করিব। কিন্তু উপায় কই, পথ কোথায়? কখন কখন মনে হয় স্যার আর. এন্. মুখার্জ্জির ন্যায় কলকারখানা করিয়া বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিব। আবার কখনও বা কোন কৃতকর্ম্মা উকীল ব্যারিষ্টার বা ডাক্তারের অতুল ঐশ্বর্য্যের প্রতি চাহিয়া উহার যে কোন একটি ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া আমার জীবন সার্থক করিতে ব্যাকুল হইয়া পড়ি। এরূপ শত সহস্র বাসনা আমার তরুণ চিত্তকে সর্ব্বদা উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া রাখে, কিন্তু কি যে আমার প্রকৃত অন্তরবাসনা, কোন দিন উহার সন্ধান করি নাই।

প্রতিবৎসর পূজার ছুটিতে কোন ধনী সহপাঠীর সহচররূপে পশ্চিমে পক্ষী শিকার করিতে যাইতাম। সেবার জানি না কোন্ অজ্ঞাত আকর্ষণে বহুদিনের পর দুঃখিনী পল্লীজননীর শান্ত-শীতল অঙ্কে ফিরিয়া গেলাম।

মহাষ্টমীর আরতি-সন্ধ্যায় যখন জনাকীর্ণ পূজা-প্রাঙ্গণ সুগভীর বাদ্যধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে, ঠিক সেই সময় আমাদের প্রতিবাসী হীরু কর্ম্মকার সেখানে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল তাহার একমাত্র পুত্র পরেশ মুমূর্ষু। মনে পড়িয়া গেল, এই ছেলেটিই তো একদিন আমার প্রিয় সহচর ছিল।

উৎসবরত পল্লীবাসী সে দিকে বড় দৃক্‌পাত করিল না। আমি হীরু কামারের সহিত সেই জনতা হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। পথে শুনিলাম আজ বাইশ দিন ছেলেটি টাইফয়েডে ভুগিতেছে। ও পাড়ার নিধিরাম গুরুম'শায় এখন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাও করিয়া থাকেন, রোগীটি তাঁহারই চিকিৎসায় আছে। গত কয়েকদিন সখের থিয়েটারের অভিনয়-ব্যাপারে ব্যস্ত থাকায় তিনি রোগী দেখিবার অবসর করিয়া উঠিতে পারেন নাই। আজ তিনি অর্জ্জুনের ভূমিকায় আসরে নামিবেন। তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না। রোগীর জীবন বাঁচাইতে গিয়া তাই বলিয়া অতবড় main part টি তিনি ত আর

murder করিতে পারেন না ! অল্পশিক্ষিত ভদ্রসন্তানটি অনন্যোপায় হইয়া গ্রামের মান ও প্রাণ রক্ষার ভার মস্তকে লইয়া কোনরূপে বেকার-সমস্যার সমাধান করিয়াছেন।

রোগীর গৃহ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সেদিন যে মর্ম্মভেদী দৃশ্য দেখিয়াছিলাম তদপেক্ষা করুণ চিত্র বোধ হয় জগতের কোনও সহৃদয় সাহিত্যকার সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। উহা আমি জীবনে ভুলিতে পারিব কিনা জানি না। প্রস্তরপ্রতিমার ন্যায় হতভাগিনী জননী মুমূর্ষু পুত্রের শিয়রে বসিয়া আছেন ; অপলক দৃষ্টিতে দুর্ভাগিনী তাঁহার প্রাণাধিক পুত্রের মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন মুখের পানে চাহিয়া আছেন। এমন অচঞ্চল মূর্ত্তি আমি জীবনে কখনও দেখি নাই। স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় আমার মুখের দিকে চাহিয়া তিনি অকম্পিত শুষ্ককণ্ঠে কহিলেন "রমেশ, ভাল আছ ত বাবা ?" সেই সহজ সরল কুশল-প্রশ্নের মধ্যে ভীতি-বিহ্বলা জননীর যে অসহায় অন্তর্ব্যথা ধ্বনিত হইয়া উঠিল, উহা শুনিবামাত্র আমি শিহরিয়া উঠিলাম।

প্রায় একক্রোশ দূরে সরকারী ডাক্তার-খানা। একাকী ঊর্দ্ধশ্বাসে সেই দিকে ছুটিলাম। সেখানে মহাসমারোহে সর্ব্বজনীন দুর্গোৎসব চলিতেছে। ডাক্তার সাহেব ও দারোগা বাবু এই পূজা সমিতির যুগ্ম-সম্পাদক। অনেক কষ্টে ডাক্তারের দেখা পাইলেও কথা কহিবার সুযোগ ঘটিল না। তিনি কোনও মোটা-চাঁদা-দাতার অভ্যর্থনায় দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন।

বাড়ী আসিয়া একখানি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-পুস্তক ও ঔষধের বাক্সটি সঙ্গে লইয়া রোগীর নিকট গিয়া বসিলাম। জগজ্জননী আদ্যাশক্তির নাম করিয়া পুস্তকের নির্দ্দেশ অনুযায়ী একটি ঔষধ দিলাম। বিজয়া দশমীর দিন রোগীর সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। সেই দিন আমার নব-জীবনের শুভ উদ্বোধন ! আমি একান্তমনে জগদম্বার চরণে কামনা করিলাম, মা ! আমি অর্থ চাই না, খ্যাতি-প্রতিপত্তি, সুখ-সম্মানও চাই না, শুধু এই করো—যেন এই অসহায় পল্লীবাসীর সেবায় আমার এই নশ্বর জীবন উৎসর্গ করিতে পারি। ইহাই যেন আমার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রত হয়।

আমার স্কুল-জীবন

যখন আমার বয়স দশ বৎসর তখন আমি স্কুলে ভর্ত্তি হই। এই দীর্ঘ দশ বৎসর আমি কোন ধরা-বাঁধা নিয়মের মধ্য দিয়া পড়াশুনা করি নাই। প্রথমতঃ জন্ম হইতে পাঁচবৎসর কাল আমার খেলা-ধূলায় কাটিয়া গিয়াছে। পাঁচ বৎসরের পূর্ব্বেই অনেক ছেলে স্কুল-পাঠশালায় ভর্ত্তি হয়, কিন্তু আমার বাবা এত অল্প বয়সে ছেলেদের শৃঙ্খলের বশবর্ত্তী করিয়া সাহসের পরিবর্ত্তে শিশুর সরল প্রাণে বিভীষিকা আনার মোটেই পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহার মত—অল্প বয়সে স্কুল-পাঠশালায় দিলে ছেলেদের বুদ্ধিবৃত্তির স্বাভাবিক বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়। শিক্ষকের ভয়ে অথবা মাতাপিতা প্রভৃতি অভিভাবকের তাড়নায় এই সব দুধের শিশুরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও পাঠ অভ্যাস করিতে বাধ্য হয়। ইহার ফল হয় যে পাঠের নামে একটা বিভীষিকা তাহাদের অন্তরকে গ্রাস করে। তাহারা বোধ হয় কখনও লেখাপড়াকে আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতে পারে না। অতএব এই পাঁচ বৎসর আমি স্বচ্ছন্দে মুক্ত বিহঙ্গের মত পল্লীর ক্রোড়ে জীবন কাটাইয়াছিলাম।

পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমকালে আমি পাঠশালায় যাওয়া স্বরু করিলাম সম্পূর্ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই। কিছুকাল অধ্যয়ন করিবার পরই আমার অধ্যয়নের প্রতি অনুরাগ জন্মিয়া গিয়াছিল। তারপর পাঁচ বৎসরের মধ্যেই আমি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর উপযুক্ত হইয়া পড়িলাম।

দশ বৎসর বয়সে হেয়ার স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে আমি ভর্ত্তি হই। হেয়ার স্কুলের কড়া শাসনের মধ্যে থাকা প্রথমটা আমার পক্ষে খুবই কষ্টকর হইলেও নিজেকে অবস্থার উপযুক্ত করিয়া লইয়াছিলাম। আমি বেশ বুঝিয়াছিলাম, স্কুলের নিয়মের বাহিরে যাইবার কোন উপায় নাই, গেলেই অনর্থের সূত্রপাত। তাই অবনত মস্তকে সব আইন-কানুন মাথা পাতিয়া লইতাম। ইহা ছাড়া আর একটি গুণ আমার সৌভাগ্যক্রমে ছিল। সেটি বাধ্যতা। ছাত্র-জীবনে, বিশেষ স্কুল-জীবনে বাধ্যতা যে কত বড় গুণ, তাহা বলিয়া শেষ করা

যায় না। পিতা আমায় শিখাইয়াছিলেন যে যাঁহার নিকট হইতে কিছু শিক্ষা করিবে তাঁহার প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা রাখিও। আমিও তদনুরূপ প্রত্যেক শিক্ষকের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা দেখাইতে সমর্থ হইয়াছিলাম। আমার এই দুইটি গুণের জন্য বিদ্যালয়ের মধ্যে অচিরে খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল। প্রত্যেক শিক্ষকের স্নেহ ও সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি আজও আমার মনে পড়ে। আমার স্কুল-জীবন যে কত সুখের, কত গৌরবের ছিল, তাহা আজ স্কুল ছাড়িয়া আসিয়া বুঝিতে পারিতেছি।

বাড়ীতে আমার কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না নিত্যকার কোন কার্য্য-তালিকাও ছিল না। অতএব স্কুলে দেওয়া কাজগুলি সমাপন করাই আমার একমাত্র কর্ত্তব্য ছিল। ইহাতে আমি প্রচুর আনন্দ পাইতাম। আমার স্বভাব ছিল, যতক্ষণ একটা কার্য্য শেষ না হইত ততক্ষণ পর্য্যন্ত অন্য কিছুই করিতাম না। অনেকদিন বিদ্যালয় হইতে ফিরিয়াই লিখিতে বসিয়া যাইতাম। কেহ কিছু করিতে ডাকিলে বিরক্ত হইতাম। স্কুল-জীবনে ছাত্রদের মনে একটা জেদ থাকা ভাল। বাবা তাই কোন দিন আমার এরূপ খেয়ালে বাধা দেন নাই। এমন কি উপর্য্যুপরি তিন চার দিন খেলিয়া বেড়াইয়াছি, তাহাতেও তিনি কিছু বলেন নাই। আমার স্কুল-জীবনের সহিত গৃহে যতটুকু স্বাধীনতা পাইয়াছিলাম তাহা আমার পক্ষে যথেষ্ট উপকারের হইয়াছে। আজকাল ছাত্রেরা ঘরে-বাহিরে তাড়া খাইয়া দিশেহারা হইয়া পড়ে।

পঞ্চম শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী পর্য্যন্ত আমি ঐ একই স্কুলে পড়িয়াছি। এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে আমি অনেকের সঙ্গে মিশিয়াছি। মুসলমান, খ্রীষ্টান, পার্শী প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ছাত্রদের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া কথাও বলিয়াছি। তাহাদের চাল-চলন, রীতি-নীতি, মনোভাব শিক্ষা করিয়াছি। আমার ঐ স্কুল-জীবনের অভিজ্ঞতাই জীবনের পুঁজি হিসাবে বড় কম নয়। তখন ইচ্ছা ছিল, প্রবৃত্তি ছিল; অনুসন্ধিৎসু ও জিজ্ঞাসু মনে যখন যাহাই উদয় হইয়াছে তাহাই জানিয়াছি। তাহার ফলে আজ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে যাইয়া অস্বস্তি বোধ করি না—সাধারণ জ্ঞানের অভাবে 'পণ্ডিতমূর্খ'ও হইতে হয় নাই।

স্কুল-জীবনের সহিত কত সুখের স্মৃতি বিজড়িত। এই জীবনের হাসি-কান্না সবই মাধুর্য্যমণ্ডিত। পরিণত বয়সে সকলে এই জীবনের স্মৃতি স্মরণ করিয়া আনন্দ লাভ করেন। বাল্যজীবনের অনাবিল আনন্দ অতুলনীয়। কত কবি কত লেখক পরিণত বয়সে এই জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কতই না আক্ষেপ করিয়াছেন, পুনরায় বালক হইতে চাহিয়াছেন। স্কুল জীবনের কীর্ত্তি-কাহিনী লইয়া অনেকে অনেক কিছু লিখিয়া গিয়াছেন। আমার স্কুলজীবন বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ ছিল। ঐ জীবনে নবীন প্রাণে কত আঘাত পাইয়াছি, অভাবের তাড়না, শোকের আঘাত, ব্যাধির আক্রমণ জীবনকে নিরানন্দ করিয়া তুলিয়াছে, তথাপি তাহা আমার নিকট স্বর্গের সমান। শত আঘাত শত অভাব-অভিযোগ কাটাইয়া জীবনের আনন্দই আমি উপভোগ করিয়াছি। তাই আজ স্কুল-জীবনের কথা স্মরণ করিলেই হৃদয় এক অবক্ত ব্যথাভরা আনন্দে ভরিয়া উঠে।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

এই মরজগতে অকস্মাৎ এমন এক একজন অসাধারণ মানব জন্মগ্রহণ করেন যাঁহার প্রভাব কালজয়ী হইয়া চিরদিন মানবের কল্যাণের জন্য সঞ্চিত রহিয়া যায়। এইরূপ অতিমানব কোনও বিশিষ্ট দেশে ও কালে জন্মিলেও কখনই দেশকালের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকেন না। ইঁহারা সকল দেশের ও সকল যুগের ইতিহাসের ঐশ্বর্য্যরূপেই আদর লাভ করিয়া থাকেন। ইঁহারা আপনাদের চরিত্র, ত্যাগ ও সত্যানুসন্ধিৎসার মাহাত্ম্যে যুগে যুগে মানুষের চিন্তাধারা ও জীবনপ্রণালী সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করিয়া উন্নত ও উদারতর মনুষ্যত্বের আদর্শ স্থাপন করিয়া যান। মরজগতে মাটির মানুষের অতি সাধারণ জীর্ণ একটানা জীবন-যাত্রার ইতিহাস এইরূপ অনন্যসাধারণ পুরুষের সংস্পর্শে প্রকৃতপক্ষে জীবন্ত হইয়া উঠে—ইঁহাদেরই কল্যাণে মানব তাহার জীবনের মূল্য বুঝিতে পারে, তাহার অস্তিত্ব তখন এক উচ্চভাবাদর্শে পুষ্পিত হইয়া উঠে।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী এই শ্রেণীর একজন লোকোত্তর পুরুষ। শুধু ভারতবর্ষের ইতিহাসে নয়, পৃথিবীর ইতিহাসে যে কয়জন অতিমানব তাঁহাদের অদ্ভুত প্রভাব চিরস্থায়ী করিয়া বসিয়া আছেন, গান্ধীজী তাঁহাদের অন্যতম। আধুনিক জগতের নানা দেশের চিন্তাশীল ও খ্যাতনামা ব্যক্তি গান্ধীজীকে বর্ত্তমান সময়ের সর্ব্বোত্তম মানব বলিয়াও বিবেচনা করিয়া থাকেন। ইঁহার জীবনীর মূলসূত্রগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে এই উক্তিকে অত্যুক্তি বলিয়া মনে হয় না।

গুজরাটের অন্তর্গত পোরবন্দর নামক স্থানে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর এই রাষ্ট্রনেতার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা সেখানকার দেওয়ান ছিলেন। বার বৎসর বয়সে শ্রীযুক্তা কস্তুরী বাই নাম্নী একজন ধর্ম্মপ্রাণ মহিলার সহিত গান্ধীর বিবাহ হয়। যখন তাঁহার বয়স মাত্র উনিশ সেই সময় ব্যারিষ্টারী পাশ করিবার জন্য তিনি বিলাত-যাত্রা করেন। ১৮৯১ অব্দে তিনি ব্যারিষ্টার হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং কিছুকালের মধ্যেই বোম্বাইয়ে সুপ্রিমকোর্টে আইন-ব্যবসায় আরম্ভ করেন। এই খানেই দাদাভাই নৌরজী প্রভৃতি চিন্তা-নায়কের সংস্পর্শে আসিয়া গান্ধীজী এক নূতন জগতের সন্ধান পান।

একটি সমস্যাবহুল মোকদ্দমার ভার লইয়া ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন করেন। সেখানকার প্রবাসী ভারতীয়গণের দুঃখদুর্দ্দশার চিত্র দেখিয়া তাঁহার মন কাঁদিয়া উঠে। অসহায়ের জন্য যে সহানুভূতি তাঁহার হৃদয়ে পরবর্ত্তী কালে উদাত্তস্বরে বাজিয়া উঠিয়াছিল, এই সময় সর্ব্বপ্রথম তাহাতে ঝঙ্কার পড়ে। তিনি সেখানে রীতিমত আন্দোলন চালান এবং নেতা হিসাবে তাঁহাকে অসহনীয় লাঞ্ছনা, কারাবাস পর্য্যন্ত বরণ করিতে হয়। তাঁহারই চেষ্টায় 'নেটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠিত হয়। 'ট্রান্সভাল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' ও 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' নামক পত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি তাঁহার মতামত ব্যক্ত করেন। তারপর যখন ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে বুয়োর যুদ্ধ বাধিল তখন তিনি একটি সেনাদল গঠন করিয়া ব্রিটিশকে সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে শিষ্ট-প্রতিরোধমূলক আন্দোলন মারফৎ

আফ্রিকায় ভারতীয়দিগের নেতৃত্ব করিয়া বিজয়গর্ব্বে গান্ধীজী মাতৃভূমিতে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার জন্য নেতার আসন পূর্ব্ব হইতেই রচিত হইয়াছিল। সমস্ত ভারতবাসী গান্ধীর নেতৃত্বে আত্মসমর্পণ করিল। বিগত মহাযুদ্ধের সময়ও তিনি ভারতের সরকারকে নানা উপায়ে সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে যখন জালিয়ানওয়ালাবাগে একটি নৃশংস হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইল এবং ভারতীয় প্রজাবৃন্দের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিল তখন বিরাট আন্দোলন আরম্ভ হইল। এই সময় তাঁহাকে কারাবাস বরণ করিতে হইয়াছে, অমানুষিক অশান্তি সহ্য করিতে হইয়াছে, কিন্তু এই দৃঢ়চেতা পুরুষ অবিচল নিষ্ঠায় তাঁহার কর্ত্তব্য করিয়া গিয়াছেন। কারাগার হইতে বাহিরে আসিয়া তিনি সমাজের মধ্যে গঠনমূলক কার্য্য করিতে থাকেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তাঁহারই নেতৃত্বে অহিংস আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয়। আবার তাঁহাকে কারাবাস বরণ করিতে হয়। তারপর ইংরাজ সরকার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গান্ধী-আরউইন সন্ধিপত্র সম্পাদন করিয়া তাঁহাকে বিলাতে গোলটেবিল বৈঠকে আমন্ত্রণ করেন। তিনি সরকারের সহিত একমত হইতে না পারায় প্রত্যাবর্ত্তন করার কয়েকদিনের মধ্যেই পুনরায় বন্দী হন। গান্ধীজী ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্র হইতে বারবার অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু যথার্থ কোন 'জনগণ-মন-অধিনায়ক' নেতা তাঁহার স্থান পূর্ণ না করিতে পারায় তাঁহাকে বারবার রাজনীতিক্ষেত্রের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে।

গান্ধীজীর জীবনে যে দুইটি পরস্পর-বিরোধী ভাব একত্রে সমানভাবে কার্য্যকরী হইয়াছে এমনটি পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম। রাজনীতিক্ষেত্রের কূট চিন্তা-পদ্ধতির সহিত প্রায়ই সত্যের মর্য্যাদা খাপ খায় না। ছলে বলে কৌশলে কার্য্যসিদ্ধিই রাজনীতিতে স্বীকৃত হয়। কিন্তু গান্ধীজী শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক হইয়াও সত্য ও অহিংসার পথ হইতে তিলমাত্র বিচলিত হন নাই। তিনি প্রেম ও সত্যের সাহায্যে শত্রু জয় করিতে চাহিয়াছেন। রাজনীতিতে এইরূপ মতবাদের পিছনে কতদূর সত্যনিষ্ঠা, ত্যাগ ও সংযম দরকার তাহা তিনি দেখাইয়াছেন।

কোনও দেশের প্রকৃত উন্নতি যে দেশের সর্ব্বসাধারণের উন্নতিতেই

একান্তরূপে সম্ভব হইতে পারে তাহা গান্ধীজী প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছেন। এইজন্য দেশীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁহার এত দরদ। তাই তিনি চরকা ও খাদির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করিলেন। যতদিন পর্য্যন্ত দেশের মধ্যে একে অপরকে ঘৃণা করিবে ততদিন পর্য্যন্ত যে দেশের প্রকৃত মঙ্গল আসিবে না তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া গান্ধীজী অস্পৃশ্যতা-দোষ নিবারণের জন্য শেষ বয়সে নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছেন এবং দেশের কর্ম্ম-প্রচেষ্টাকেও সেইদিকে পরিচালিত করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। 'সবরমতী' আশ্রমে তিনি সমাজের যে সেবাব্রত আরম্ভ করিয়াছেন জীবনযাত্রার সাহচর্য্য ব্যতীত যে এইরূপ আদর্শ বাঁচাইয়া রাখা যায় না তাহা তিনি জানিয়াছেন। তাই মাত্র সামান্য আহার্য্যে ও সামান্য খদ্দরের কৌপীন-বস্ত্রে তাঁহার দিন চলিয়া যায়। যিনি ইচ্ছা করিলেই ভোগের বিলাস-নিকেতনে ঐশ্বর্য্যসেবিত হইয়া আড়ম্বরে রাজসম্মানে জীবন কাটাইতে পারিতেন, তিনি দেশের ও দশের কল্যাণকামনায় মহাতপস্বীর ত্যাগ-পূত কঠোর সত্যনিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাই আসমুদ্র হিমাচল তাঁহাকে পূজা করিতেছে, তাই দেশবিদেশে এই অর্দ্ধনগ্ন ফকিরটির এত সম্মান!

পুরস্কারবিতরণী সভার কার্য্যবিবরণ

যেদিন আমাদের দুর্গাপূজার ছুটি আরম্ভ হয় আমাদের স্কুলের পুরস্কার বিতরণের জন্য সেই দিন ধার্য্য করা হইয়াছিল। আমরা পূর্ব্ব হইতেই স্কুলের সামনে সদর রাস্তা হইতে স্কুল পর্য্যন্ত কলাগাছ এবং দেবদারু পাতার সহযোগে কতকগুলি তোরণ তৈয়ার করিয়াছিলাম। তোরণের গায়ে গায়ে লাল নীল কাগজের ঝালর ও শিকল ঝুলাইয়া দেওয়ায় অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। আমাদের স্কুলে একটি মস্ত হলঘর আছে, সেই ঘরে পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হইবে ঠিক হইয়াছিল। এই হলটিও সুন্দরভাবে সজ্জিত করা হইয়াছিল। তাহারই একদিকে সভাপতির আসন এবং সম্মুখে দর্শকগণের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

বৈকাল ৬টায় উৎসব আরম্ভ হওয়ার কথা। কিন্তু যে গাড়ীতে কলিকাতা হইতে সভাপতি মহাশয়ের পৌঁছিবার কথা সেই গাড়ী আসিতে প্রায় আধ ঘণ্টা বিলম্ব হওয়ায় সাতটার আগে সভার কাজ আরম্ভ হইতে পারিল না। বিপুল 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনির মধ্যে সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করিয়া সভার উদ্বোধন করিলেন। প্রথমে ছাত্রগণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ডাকঘর' নাটিকাটি অভিনয় করিল। সময়-সংক্ষেপ জন্য উহার অনেক অংশ ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল; কিন্তু তাহাতে অভিনয়ের সৌন্দর্য্য ক্ষুণ্ণ হয় নাই। 'ঠাকুর-দাদার' ভূমিকায় স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র বিমলাংশু রায় অতি মনোরম অভিনয় করিয়াছিল। দর্শকগণ মাঝে মাঝে বিপুল করতালি দিয়া তাহাকে অভিনন্দিত করিয়া তাঁহাদের আনন্দ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। অন্যান্য ভূমিকায় যাহারা অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহাদের অভিনয়ও ভালই হইয়াছিল। কিন্তু অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র অমলেন্দু সেন 'অমলের' ভূমিকায় যেরূপ অভিনয়-চাতুর্য্য দেখাইতেছিল তাহাতে দর্শকগণ বিস্ময়বিমূঢ় না হইয়াই পারেন নাই। তাহার প্রত্যেকটি কথা এবং অঙ্গসঞ্চালন 'অমলে'র চঞ্চল বন্দী মনের চিত্র অতি সুন্দরভাবে দর্শকের সম্মুখে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। সভাপতি মহাশয় এই অভিনয়ে এত চমৎকৃত হইয়াছিলেন যে তিনি 'অমল'কে একটি রৌপ্য পদক দিতে স্বীকার করিয়া গেলেন।

অভিনয় শেষ হইলে স্কুলের সেক্রেটারী এবং প্রধান শিক্ষক মহাশয় যথাক্রমে তাঁহাদের রিপোর্ট পাঠ করিলেন। তারপর সমবেত ভদ্রমহোদয়-গণের মধ্য হইতে শহরের প্রবীণ জনসেবী লালমোহনবাবু অতি মনোজ্ঞ বক্তৃতায় ছাত্রদের চরিত্রগঠন বিষয়ে এবং দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহাদের কর্ত্তব্য বিষয়ে একটি সুচিন্তিত উপদেশ দিলেন। তিনি বলিলেন, ছাত্রগণ যদি নিজেদের প্রকৃত চরিত্র গঠন ও শিক্ষার প্রতি মনোযোগ দেন তাহা হইলেই তাঁহারা দেশের প্রকৃত মঙ্গল করিবেন। কারণ দেশের উন্নতি করিতে পারিবে একমাত্র তাহারাই যাহাদের জীবন শিক্ষা ও সংযমের ভিত্তিতে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

লালমোহন বাবুর হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতার পর আরও দুই একজন কিছু কিছু বলিলেন, তারপর সভাপতি মহাশয় বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদের হাতে তাহাদের কৃতিত্বের পুরস্কার নানাবিধ পুস্তক, পদক ও অন্যান্য সামগ্রী প্রদান করিলেন। এই সমস্ত পুরস্কার পাওয়ায় ছাত্রদের মধ্যে বেশ উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল। পুরস্কার-বিতরণান্তে সভাপতি মহাশয় মনোজ্ঞ ভঙ্গীতে ও সুললিত ভাষায় অতি সংক্ষেপে একটি বক্তৃতা করিলেন। তিনি প্রধানতঃ ছাত্রদিগকেই লক্ষ্য করিয়া বলিলেন যে তাঁহারাই একদিন দেশের প্রকৃত কর্ত্তা হইবেন; সুতরাং লালমোহন বাবু যাহা বলিলেন সেই দিকেই যেন তাঁহারা বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। তিনি আরও বলিলেন যে যাঁহারা এই উৎসবে পুরস্কার পাইলেন তাঁহাদের দৃষ্টান্ত যেন অন্য ছাত্রদের মনে একটি সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার ভাব জাগাইয়া দেয়—তাঁহারা যেন আজ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া যান যে আগামী বৎসর তাঁহারাও কৃতিত্ব দেখাইয়া এইরূপ সম্মানের অধিকারী হইবেন।

সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ শেষ হইলে তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়ার পর সম্পূর্ণ 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত গীত হয়; তারপর অধিকরাত্রে সভা ভঙ্গ হয়।

এই রাত্রিটি আমার জীবনে অমর হইয়া থাকিবে। আমি ঠিক মনে প্রাণে বুঝিয়াছি যে এই একটি সন্ধ্যায় যে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ পাইয়াছি তাহার মূল্য অনেকখানি।

বাঙ্গালার প্রধান প্রধান উৎসব

বাঙ্গালা দেশে উৎসবের অন্ত নাই, এখানে এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে। এখানে নাকি 'বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ'। সত্যই বঙ্গদেশের মত কথায় কথায় সামান্য সামাজিক ছুতা ধরিয়াই এমন উৎসবের ঘটা অন্য কোথাও হয় বলিয়া জানা যায় না। হিন্দুদের উৎসবের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বলা যাইতে পারে শারদীয়া দুর্গাপূজা। শরতের মহা আনন্দময় দিনে আনন্দময়ী মা দশভূজার কল্যাণমূর্ত্তির আবাহনে যখন পূজামন্দির ভরিয়া যায় তখন হিন্দুর মনে যে ভাব জাগিয়া উঠে তাহার তুলনা মিলে না। এই বিশিষ্ট দিন কয়টির

জন্য বাঙ্গালী-সন্তান বিশেষতঃ হিন্দু সমস্ত বৎসর অধীর প্রতীক্ষায় দিন যাপন করিয়া থাকে। বিদেশ হইতে আত্মীয়-স্বজন নিজের ঘরে ফিরিয়া আসে। ছোট ছোট বালক-বালিকারা নূতন পোষাকের জন্য আগে হইতেই বেশ উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে। তাহারা যখন নূতন কাপড়-জামায় সাজিয়া নানারূপ খেলার সামগ্রী লইয়া দলে দলে পাড়ায় পাড়ায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায় তখন মনে হয় স্বর্গ বলিয়া আর অন্য কোনও নূতন স্থান নাই। স্বর্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবী জগন্মাতার কল্যাণে এই পৃথিবীই স্বর্গে পরিণত হইয়াছে। তারপর সপ্তমী অষ্টমী, নবমী তিথি কোথায় দিয়া ঢাক-ঢোল-শঙ্খ-ঘণ্টার বাদ্যের মধ্যে কাটিয়া যায় তাহা বুঝা যায় না।

দশমী আসিয়া উপস্থিত হয়—পরে প্রতিমা বিসর্জ্জনের পালা। এই অনুষ্ঠানে যদিও মূলতঃ বিষাদের ছায়া রহিয়াছে—মিলনান্তে বিরহের করুণ মূর্চ্ছনা যদিও এই দিনটিতে ভাবুকের চিত্ত একটু উদ্‌ভ্রান্ত না করিয়াই পারে না, তথাপি সাধারণের পক্ষে এই দিনটাও একটি মহা-আনন্দের দিন। নদীতে নৌকায় নৌকায় দেবীর প্রতিমা স্থাপন করা হয় এবং নানারূপ আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে অপরাহ্ণ হইতে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত 'বাইচ' হওয়ার পর নদীতে সেই প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া বাড়ী ফিরা হয়। নদীতীরে এই উপলক্ষে একটি মেলা বসিয়া থাকে। সেখানে জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকেই প্রচুর আনন্দ করিয়া থাকে। তারপর আসে বিজয়ার 'কোলাকুলির' পালা। এই অনুষ্ঠানটির পিছনে যে ভাবমধুর সহজ আত্মীয়তার পরিকল্পনাটি রহিয়াছে তাহা মানুষে মানুষে বিরোধের সমাধান করিয়া দেয়। এই দিনে শত্রু-মিত্রভাব ভুলিয়া একে অপরকে আলিঙ্গন করিয়া লয় এবং বৎসরব্যাপী এই আলিঙ্গনের সন্ধিসূত্রে মিত্রতার বন্ধন দৃঢ় হইয়া পড়ে—বিজয়া এমনি একটি মাহেন্দ্রক্ষণ। এই শারদীয় দুর্গোৎসব একমাত্র বঙ্গদেশেই হইয়া থাকে। প্রবাদ এই যে রামচন্দ্র রাবণ-নিধনের নিমিত্ত শরৎকালে 'অকাল-বোধন' করিয়া মহামায়ার অর্চ্চনা করিয়া সফলকাম হন। বসন্তকালে যে দুর্গাপূজা হয় তাহার নাম বাসন্তী-পূজা।

দুর্গাপূজার পরই নাম করা যাইতে পারে সরস্বতীপূজার। বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বীণাপাণির অর্চ্চনা যে দুর্গাপূজার চেয়েও সমারোহে নিষ্পন্ন হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! প্রধানতঃ ছাত্রগণই এই উৎসবের অনুষ্ঠাতা, সুতরাং ইহাতে উদ্যোগের আড়ম্বর যে অনেকখানিই হইয়া থাকে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এই পূজাটি অবশ্য একটি দিনের ব্যাপার। কিন্তু এই একটি দিনের জন্যই অন্ততঃ একটি মাস ছাত্রদের আহার-নিদ্রা ঘুচিয়া যায়। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ছাত্রাবাস প্রভৃতির মধ্যে একটি বলিষ্ঠ নির্দ্দোষ প্রতিদ্বন্দ্বিতার সাড়া পড়িয়া যায়। পূজার প্রতিমা আবাহনে ও বিসর্জ্জনের শোভাযাত্রায়, উৎসবের আলোকসজ্জা ও নৃত্যগীতাদিতে একে অপরকে পরাজিত করিবে।

দীপালী, লক্ষ্মী-পূজা, কালী-পূজা, জগদ্ধাত্রী-পূজা, কার্ত্তিক-পূজা প্রভৃতি উৎসব ত বৎসর ভরিয়া লাগিয়াই রহিয়াছে। আষাঢ় মাসে রথযাত্রার দিনটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দিন ধনী, দরিদ্র, স্পৃশ্য, অস্পৃশ্য সবাই একত্রে জগন্নাথের রথ টানিয়া থাকে। কোনও প্রকার প্রভেদ থাকিতে পায় না।

মোটামুটি এইগুলি হইল হিন্দুর সাধারণ উৎসব। এই সমস্ত উৎসবে যে অন্য সম্প্রদায় যোগদান করে না তাহা নহে। বরঞ্চ ভ্রাতৃভাব লইয়া হিন্দু মুসলমান সবাই দুর্গাপূজা, দীপালী প্রভৃতি উৎসবের অনুষ্ঠানে আনন্দ করিয়া থাকে।

বঙ্গদেশে মুসলমানগণের পর্ব্বের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য উৎসব মহরম ও ঈদ। মহরম দশ দিন স্থায়ী হয়। মহরম নামক চান্দ্র মাসে এই পর্ব্ব হইয়া থাকে। এই পর্ব্বের ভিত্তিমূলে রহিয়াছে একটি অতি করুণ বিষাদ-কাহিনী। হজরত মহম্মদের দৌহিত্র এমাম হাসান ও এমাম হোসেনের বিষাদভয়াল মৃত্যুর করুণ স্মৃতি উপলক্ষে প্রতিবৎসর এই পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। 'কারবালা'র মরুপ্রান্তরে পিপাসায় আর্ত্তনাদ করিতে করিতে এই 'মৃত্যু' সংঘটিত হয়। এ কারণে মুসলমানগণ মহরম উপলক্ষে সেই কথা মনে করিয়া "হায় হোসেন, হায় হাসান" বলিয়া কাতরস্বরে বুকে করাঘাত করিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া থাকেন।

ঈদ, শবেরাত প্রভৃতিও মুসলমানগণের মহা-আদরের পর্ব্ব।

বঙ্গদেশের এই সমস্ত পর্ব্বোৎসবের মধ্যে একটি সুন্দর মনোবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। পরস্পরের মধ্যে বেশ একটা আত্মীয়তা বিকাশের অবসর এইখানে রহিয়াছে—সকলের চেয়ে আরাধনীয় মনোবৃত্তি ধর্ম্মবুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া। বঙ্গদেশের এই বিভিন্ন উৎসবগুলি এই সেদিনও জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে মহা-মিলনের কেন্দ্র হিসাবে বাঙ্গালীর জীবনে মঙ্গল বর্ষণ করিত। এগুলিকে ঘিরিয়া স্বতই বিরাজ করিয়া থাকে একটি কল্যাণমধুর প্রীতির ইতিহাস—যাহার পাতায় পাতায় পরমকল্যাণময় ভগবানের আশীর্ব্বাদ ও করুণার উজ্জ্বল স্পর্শ রহিয়াছে। আজকাল নানা কারণে এই পর্ব্বোপলক্ষে তেমন করিয়া আর আগমনী বাজে না, নদীতীরের মেলাগুলিতে আজ আর তেমন একটা প্রাণ-মাতানো আত্মীয়তা-স্থাপনের অবসর সম্পূর্ণ অব্যাহত নাই। ঘটনা-পরম্পরার সমাবেশ-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আস্তে আস্তে এই সমস্ত অনুষ্ঠানের পরিমাণ, প্রকৃতি ও আদর্শ বদ্‌লাইয়া যাইতেছে। এই পরিবর্ত্তন সময়ের গতিতে অপরিহার্য্য কিনা তাহা স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু যখন শৈশবের আবেগচঞ্চল উৎসবমুখর এই দিনগুলির কথা মনে পড়ে তখন স্বভাবতই একটা করুণভাবে মন ভরিয়া যায়।

আকবর

মোগলসাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা বাবরের পুত্র হুমায়ুন শত্রুকর্ত্তৃক পরাজিত ও সিংহাসনচ্যুত হইয়া রাজ্যহান, গৃহহীন ভিক্ষুকের মত যখন পারস্যে পলায়ন করিতেছিলেন, সেই ১৫৪২ খৃষ্টাব্দের একটি অনাহূত অখ্যাত মুহূর্ত্তে অমরকোটের পথের উপর সম্রাটের মহিষী হামিদা বানু একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। সেদিন কোনও উৎসব হয় নাই, দিল্লীর তোরণ হইতে মুহুর্মুহুঃ তোপধ্বনিতে সেদিন আনন্দ জ্ঞাপনের কোনও সুযোগ ছিল না। সামান্য যে কয়জন বিশ্বস্ত পরিচারক রাজ্যহীন হুমায়ুনের সঙ্গে ছিল তাহাদের পুরস্কৃত করিবার সামর্থ্যও তখন তাঁহার ছিল না। সঙ্গে একখণ্ড মৃগনাভি ছিল; হুমায়ুন তাহাই একটু একটু করিয়া সকলের হাতে দিলেন—সৌরভে অমরকোটের পথ আমোদিত

হইয়া গেল। হুমায়ুন সেদিন প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে তাঁহার এই নবজাত পুত্রটির যশের সৌরভেও যেন ভবিষ্যতে দিগ্‌দিগন্ত এমনি ভরিয়া উঠে। ভগবান্ তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে হুমায়ুন পুনরায় তাঁহার সিংহাসন উদ্ধার করেন; কিন্তু পুত্র আকবরের বয়স যখন মাত্র চতুর্দ্দশ বৎসর সেই সময় হুমায়ুন পাঠাগারের সিঁড়ি হইতে পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। বালক আকবর তখন রাজ্যশাসনের কিছুই জানে না। হুমায়ুনের সেনাপতি বৈরাম খাঁ কিছুকাল আকবরের অভিভাবকরূপে রাজ্যশাসন করেন। অবশেষে ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে কিশোর আকবর রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। তারপর বিভিন্ন প্রকারের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে এই কিশোর কিরূপে রাজ্যের পর রাজ্য জয় করিয়া চলিলেন, কিরূপে তাঁহার ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন তাহা সত্যই বিস্ময়ের বস্তু। ভারতবর্ষ তখন শতধা বিচ্ছিন্ন। চারিদিকে একটা অনিশ্চয়তার ভাব। আকবর তাঁহার অসামান্য প্রতিভার সাহায্যে এই সমস্ত ছিন্ন খণ্ড বিক্ষিপ্ত অংশের মধ্যে একটা শান্তি ও শৃঙ্খলার ভাব আনয়ন করিতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। তাঁহাকে বহু দেশ জয় করিতে হইয়াছিল এবং এ প্রসঙ্গে তাঁহার তেজস্বিতার অপরিমেয় দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তাঁহাকে প্রবল বিরুদ্ধ শক্তির সহিত শক্তিপরীক্ষা করিতে হইয়াছিল। মালবের প্রত্যন্ত হইতে আরম্ভ করিয়া একদিকে গুজরাট কাবুল কান্দাহার আর একদিকে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত তাঁহার বিজয়-সেনানী অমিতবিক্রমে তাঁহার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। তাঁহাকে বাধাও পাইতে হইয়াছে প্রচুর। দাক্ষিণাত্যের মুসলমান-শাসিত দেশগুলি জয় করিতে একদিকে যেমন আকবরকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল অন্যদিকে তেমনি রাজপুত বীরগণকে বশীভূত করিতে তাঁহাকে অপরিমেয় সামর্থ্য ব্যয় করিতে হইয়াছিল। আকবরের প্রভুত্ব অঙ্গীকারের জন্য মেবারের আত্মত্যাগ শুধু ভারতবর্ষের ইতিহাসে নয়—জগতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

আহম্মদনগরের বীর-রমণী চাঁদ সুলতানার নগররক্ষার্থে প্রচেষ্টা চিরদিন অমর হইয়া রহিবে। বাঙ্গলার ঈশা খাঁ, কেদার রায়, চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্পনারায়ণ

ও যশোহরের "বঙ্গজ কায়স্থ" রাজা প্রতাপাদিত্য প্রবল পরাক্রান্ত আকবরের শক্তির নিকট মস্তক অবনত করেন নাই। এই সমস্ত ক্ষেত্রে আকবর তাঁহার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় সম্পূর্ণ সফল হন নাই সত্য, কিন্তু ইঁহাদের বীরত্ব তেজস্বিতা ও স্বদেশবাৎসল্য বীর আকবরের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। তিনি এই সমস্ত বীরের প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে কখনও কার্পণ্য করেন নাই। সমস্ত জীবনব্যাপী সাধনার ফলে তিনি বিরাট সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াও উদার ও সত্যপরায়ণ প্রজাবৎসল সম্রাট্ হিসাবে দিল্লীর সিংহাসন পবিত্র করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রকাণ্ড রাজ্য জয় করিয়া যদি তাহার সুশাসনের কোনরূপ ব্যবস্থা করা না যায় তাহা হইলে সেই বিজয় দস্যুতারই নামান্তর মাত্র। তাই আকবর তাঁহার বিপুল সাম্রাজ্য পনরটি সুবায় বিভক্ত করিয়া যাহাতে সুচারুরূপে শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

আকবর মনে-প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে রাজপুতজাতি অতি প্রচণ্ড ও দুর্দ্ধর্ষ এবং হিন্দুগণের প্রভাব ও যোগ্যতা অপরিসীম। তাই তিনি হিন্দুগণের সহিত বন্ধুত্ব বজায় রাখিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি জিজিয়া কর ও হিন্দু তীর্থযাত্রীদের কর উঠাইয়া দেন। শক্তিশালী ও প্রতাপশালী রাজপুতগণের সহিত বিবাহ প্রভৃতি আত্মীয়তা সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাঁহাদের প্রভাব ও প্রতিভা সাম্রাজ্যের কল্যাণে নিয়োজিত করেন। সুচতুর রাষ্ট্র-বুদ্ধিসম্পন্ন উপযুক্ত সম্রাট্ হিসাবে আকবর যেমন অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, সেইরূপ ব্যক্তিগত জীবনে চরিত্র ও ন্যায়নীতির দিক্ দিয়াও তাঁহার তেজস্বিতা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। প্রজাগণের রাষ্ট্রীয় কল্যাণ তাঁহার একমাত্র আদর্শ ছিল না, যাহাতে তাহারা আধ্যাত্মিক জীবনে ও সামাজিক জীবনে উন্নত হইতে পারে সেজন্য সর্ব্বদা তিনি চিন্তা করিতেন। তাঁহার শিল্পানুরাগ তাঁহার নৃপতি-জীবনকে একটি বিশিষ্ট ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত করিয়া দিয়াছে। কাব্য-সাহিত্যিক আবুলফজল, ঐতিহাসিক বদাউনী ও নিজামউদ্দিন প্রভৃতি বিদ্বান্ ব্যক্তি তাঁহার সভায় আসন লইয়াছিলেন। রসিকপ্রবর বীরবল আকবরকে আমাদের নিকট অতি প্রিয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। শেষ বয়সে

"দীন-এলাহী" নামক একটি ধর্ম্মমত প্রচারে আকবর সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ধর্ম্ম যাহাতে সাধারণের বুদ্ধিগ্রাহ্য হইয়া সাধারণের জীবনে পূর্ণরূপে কার্য্যকরী হয় তাহারই চেষ্টা ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। একদিকে প্রজাগণের সুখ-সুবিধার প্রতি নিরপেক্ষ দৃষ্টি এবং অন্যদিকে নিজের ব্যক্তিগত জীবনে একটি মহৎ আদর্শ স্থাপন দ্বারা চারিত্রিক উন্নতির সহায়করূপে দিল্লীর সম্রাট্ আকবর ভারতবর্ষের সর্ব্বযুগের ও সর্ব্বকালের শ্রেষ্ঠ নৃপতিগণের অন্যতম বলিয়া নিঃসন্দেহে শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিয়া থাকেন। "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" উক্তি যে তাঁহার প্রতি কেন প্রযুক্ত হইত তাহার মূলসূত্র তাঁহার ঘটনা-বহুল জীবনের ইতিহাসেই স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

দেশভ্রমণ শিক্ষার অঙ্গ

মানুষকে শুধু জ্ঞান দান করিলেই শিক্ষার কার্য্য সম্পূর্ণ হয় না, শুধু কর্ম্মপ্রেরণা দিলেই শিক্ষা সার্থক হয় না। শরীর, মন ও আত্মার সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য। কিন্তু সেই লক্ষ্যকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে ঘরে বসিয়া কেবল কতকগুলি বই পড়িলেই হয় না। জগতের বিভিন্ন দেশ হইতে ঐ সকল বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের জন্য ছাত্রবৃন্দের বিশেষ সচেষ্ট হইবার প্রয়োজনীয়তা আছে। চিন্তার একটা ব্যাপকতা, চিত্তের বহুমুখে প্রসার ও কর্ম্মের একটা দূরদৃষ্টি মানুষকে শিক্ষার দিক্ দিয়া সম্পূর্ণ করিতে একান্ত আবশ্যক। তাই বর্ত্তমান যুগের শিক্ষাদানব্রতী ব্যক্তিবৃন্দ শুধু বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন, ব্যায়াম প্রভৃতিকে শিক্ষার অঙ্গ বলিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিতেছেন না, তাঁহারা ক্রমশঃ বুঝিতেছেন যে বিভিন্ন দেশের শিক্ষাধারার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছাত্রগণের জীবনগঠনের শুধু সহায়ক নয়, অনেকটা প্রয়োজনও বটে। পাশ্চাত্ত্যের উন্নত দেশসমূহে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ছাত্রগণ তাই অনেক সময় তাঁহাদের শিক্ষকবৃন্দের সহিত দেশভ্রমণে বহির্গত হন।

দেশভ্রমণের উপকারিতা শিক্ষার দিক্ দিয়া অনেক। প্রথমতঃ, বিভিন্ন দেশের বিচিত্র দৃশ্য চিত্তকে যে আনন্দ দেয়, জীবনের যাত্রাপথে শুধু যে তাহা

একটি বিশেষ পাথেয় তাহা নহে ; সে আনন্দ মনকে উন্নত ও বিকশিত করিতে সাহায্য করে এবং এইভাবে উহা শিক্ষার একটি বিশেষ অঙ্গরূপে পরিগণিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন দেশ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ভূগোলের শিক্ষাকে সম্পূর্ণতা দেয়। তৃতীয়তঃ, বিভিন্ন দেশের পথঘাট ইত্যাদির ব্যবস্থা দেখিয়া আপনার দেশের সহিত তুলনামূলক বিচার করিয়া স্বদেশের উন্নতিবিধানের চেষ্টা করিতে পারা যায়। চতুর্থতঃ, বিভিন্ন দেশের শিক্ষাপ্রণালী, সমাজব্যবস্থা এবং সভ্যতা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের দ্বারা সে সকল দিক্ দিয়াও স্বদেশের প্রগতির চেষ্টা করা যায়। ইহা ছাড়া বিভিন্ন দেশের মনীষিবৃন্দের সহিত আলাপ যে, শুধু জ্ঞানবৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক হয় তাহাই নহে, তাহা মনের দৃষ্টির সমগ্রতার দিক্ দিয়াও যথেষ্ট প্রয়োজনীয় বলিয়া গণ্য হয়। সর্ব্বশেষে মানুষের যে তাহার নিজের দেশের বা সমাজের দিক্ দিয়াই একটি সত্তা আছে তাহা নহে, মানুষের যে সার্ব্বভৌমিক অস্তিত্ব আছে, সে যে সকল দেশের বিশ্বমানবসঙ্ঘের একটি অঙ্গ, এই অনুভূতি সে দেশভ্রমণের ভিতর দিয়া শিক্ষা করিতে পারে। নানা দেশের নানা প্রকারের মানুষের সংস্পর্শে আসিয়া তাহার ভিতরের বৃহত্তর ভাবের দিক্‌টা খুলিয়া যায়।

সাধারণভাবে দেশভ্রমণের যে সকল উপকারিতা আছে তাহা ছাড়াও জীবনের অনেক মুহূর্ত্তে দেশভ্রমণে বিশেষ উপকার হইতে পারে। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার একঘেয়েমিতে মনটা অনেক সময় ক্লান্তিতে ও অবসাদে ভরিয়া উঠে ; তখন দেশভ্রমণ মনকে পুনরায় সতেজ ও প্রাণবান্ করিতে পারে। জীবনে যখন কোন রিক্ত মুহূর্ত্ত আসে তখন দেশভ্রমণে বাহির হইলে উদার উন্মুক্ত আকাশের তলে দাঁড়াইলেই দেহ মন আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একটি উপদেশের সারমর্ম্ম হইতেছে এই যে সারাজীবনই শিক্ষালাভের সময়। এই বৃহত্তর অর্থে 'শিক্ষা' শব্দকে ব্যবহার করিলে সমস্ত জীবনব্যাপী যে শিক্ষা সে শিক্ষার একটি অঙ্গরূপে দেশভ্রমণ চিরকালই উল্লেখযোগ্য।

দেশভ্রমণকে শিক্ষার একটি অঙ্গরূপে স্বীকার করিয়া লইবার পর

আমাদিগের একটি কথা বিবেচনা করিবার আছে। বুদ্ধিবৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভে যেমন সকলেই একই প্রকারের শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে, দেশভ্রমণ হইতে মানুষ সেইরূপ কোন নির্দ্দিষ্ট শিক্ষা লাভ করে না। যিনি আপনার জীবন যেভাবে গঠিত করিয়া তোলেন তিনি সেইভাবেই দেশভ্রমণ হইতে জ্ঞানলাভ করিয়া থাকেন। যদি কোন বৈজ্ঞানিক দেশভ্রমণে বাহির হন, তিনি বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিক উন্নতির দিক্‌টাই বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবেন এবং বৈজ্ঞানিকভাবে সমস্ত কিছুরই বিশ্লেষণ করিবেন। যদি কোন সাহিত্যিক দেশভ্রমণে বহির্গত হন, তিনি বিভিন্ন দেশের অবস্থার যে ভাব তাঁহার চিত্তে উদিত হইবে তাহাই হয়ত সাহিত্যের আকারে রূপ দিয়া সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিবেন। এইরূপে যিনি যে প্রকৃতির লোক তাঁহার ভ্রমণলব্ধ জ্ঞানের দ্বারা সেইরূপই উপকার হইয়া থাকে। এইজন্য দেশভ্রমণের উপকারিতার একটি সীমা নির্দ্দেশ করা যায় না।

আমাদের দেশে প্রাচীনকালে গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাগত ছাত্রগণ বিভিন্ন দেশের ভিতর দিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন এবং পুস্তকের জ্ঞান ব্যতীতও বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে অনেক জ্ঞানলাভ করিতেন। পাশ্চাত্ত্য দেশের ছাত্রবৃন্দ অবসরমত দেশভ্রমণ করেন। অনেক সময় ছুটির দিনে তাঁহারা পল্লীভ্রমণ করেন। আমাদের দেশেও তাঁহাদের অনুকরণে স্কুল-কালেজের ছাত্রবৃন্দ অনেক সময় দেশভ্রমণে বাহির হন। কিন্তু শিক্ষার একটি বিশেষ অঙ্গরূপে ইহাকে গ্রহণ করিতে এখনও আমরা শিখি নাই, এখনও ইহা ধনী ছাত্রবৃন্দের বিলাসের অঙ্গ।

রামায়ণের শিক্ষা

রামায়ণ কোন শ্রেণীবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষের সাহিত্য নহে, উহা ভারতবর্ষের জাতীয় সাহিত্য এবং উহার বাল্মীকিকৃত গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইলেও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ভাষায় উহার ভাবানুবাদ হইয়াছে এবং বিলাসী ধনী ব্যক্তি হইতে দরিদ্রতম ব্যক্তি পর্য্যন্ত রামায়ণের কাহিনী শুনিয়া

আনন্দলাভ করেন। অশিক্ষিত বিরাট জনসাধারণ রামায়ণের কাহিনী শুনিয়া আপনাদের শিক্ষার ত্রুটি বহুল পরিমাণে দূর করিতে সমর্থ হইয়াছে। যবদ্বীপ বলিদ্বীপ, শ্যাম-ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি যেখানেই ভারতীয় সভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছে, সেখানেই কোন না কোন আকারে রামায়ণের কাহিনী প্রচারিত হইয়াছে। ইহা দ্বারাই অনুমান করা যাইতে পারে যে সকল দেশের সকল যুগের লোককে শিক্ষা দিবার মত বস্তু উক্ত গ্রন্থে এমন সুন্দররূপে এবং গভীরভাবে লিপিবদ্ধ আছে, যাহার জন্য সকল দেশেই উহা লোকপ্রীতি অর্জ্জন করিয়াছে।

রামায়ণ হইতে আমরা কি কি বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে পারি, ইহার একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিবার পূর্ব্বে একটি কথা মনে রাখিবার প্রয়োজন আছে। যে গ্রন্থ হইতে শিক্ষা লাভ করা যায়, তাহা হইতে কি ধরণের শিক্ষা লাভ হইতে পারে, তাহা শুধু সেই গ্রন্থের উপরই নির্ভর করে না, যিনি শিক্ষালাভ করিবেন, তাঁহার মানসিক বিকাশের উপরও নির্ভর করে। যিনি বিভিন্ন দেশের সাহিত্য আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহার নিকট শুধু রামায়ণের ঘটনাগুলি সমুজ্জ্বলভাবে উপস্থিত হয় না, সাহিত্য হিসাবেও উহা তাঁহার নিকট পরম উপাদেয় আনন্দদায়ক বস্তু হয়। তাহা ছাড়া সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তিবৃন্দও এই সুমধুর কাব্যের মঙ্গলমধুর ভাবধারায় স্নাত হইয়া তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করেন। আর নিরক্ষর জনসাধারণও ইহার কাহিনী আলোচনা করিয়া সমস্ত দিনের ক্লান্তি অপনোদন করে।

সাহিত্য নীতিকথা না হইলেও সমস্ত দিক্ দিয়া ইহা যখন সমাজকে উন্নত ও উদার করিয়া থাকে, তখন পরোক্ষভাবে ইহা যে নীতিশিক্ষাও সমাজকে দান করিয়া থাকে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রামায়ণের ভিতর দিয়া তৎকালীন উন্নত সমাজের যে চিত্র আমাদের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহা আমাদিগকেও উন্নত করিতে যথেষ্ট সাহায্য করে। একদিন যে জাতির মানবতার আদর্শ জগদ্বাসীর শিক্ষার বিষয় ছিল, সেই জাতি সমস্ত প্রকার দৈনন্দিন গ্লানিময় অবস্থার ভিতরেও আজিও যাহাতে মনুষ্যত্বে মহীয়ান্ হইয়া উঠিতে পারে, এ শিক্ষা রামায়ণ চিরদিনই ভারতবাসীকে দিবে। রামচন্দ্রের পিতৃসত্য-

পালনের জন্য বনগমন, লক্ষ্মণের অপূর্ব্ব ভ্রাতৃভক্তি, ভরতের কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও ভ্রাতৃপ্রীতি, শত্রুঘ্নের ভরতানুগত্য, সীতার পতিভক্তি, রামের প্রজারঞ্জনের নিমিত্ত পত্নীত্যাগ, হনুমানের প্রভুভক্তি, দশরথের সত্যরক্ষা ও পুত্রস্নেহ, লব-কুশের রামায়ণ-গানের সুমধুর সুকোমল কথা যুগ যুগ ধরিয়া ভারতবাসীকে শিক্ষা ও আনন্দ দিয়াছে। ভারতবর্ষে দীর্ঘকালের রাষ্ট্রবিপ্লব ও দারিদ্র্য সত্ত্বেও পারিবারিক জীবনে একটা শান্তির সুষমা রামায়ণের প্রভাবেই অনেকটা সম্ভবপর হইয়াছে। রাম-জননী কৌশল্যার মহান্ সমুদ্রের মত সুগভীর সন্তান-স্নেহ রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্নের প্রতি সমভাবে প্রসারিত, ইহা যেরূপ সরল সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে তিনি যেন চিরকালের আদর্শস্থানীয়া জননী হইয়া আছেন।

এক রামায়ণকে কেন্দ্র করিয়া পরবর্ত্তী যুগে নানাপ্রকার সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছে; তাহার কোনটিতে বা রাম-লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে, কোনটিতে বা রাম-সীতার পরস্পর প্রেম, কোনটিতে বা রাম-রাবণের যুদ্ধ প্রভৃতি বিশেষভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। রাম যে সীতা-হরণকারী রাবণকে হত্যা করিয়াছিলেন, ইহার ভিতরেও একটি অন্তর্নিহিত নীতিকথা আছে। দুষ্টের দমন করিবার চেষ্টাও মানুষের সাধারণ ধর্ম্ম। রাজা দশরথের গভীর পিতৃস্নেহ পাঠকসাধারণের হৃদয়কে যুগ যুগ ধরিয়া স্পর্শ করিয়া আসিতেছে। বিভীষণকে রামভক্ত পাঠক অশ্রদ্ধা না করিলেও তাঁহার রাবণের পক্ষত্যাগ পাঠক-সাধারণের নীতিবোধের নিকট কখনও অনুমোদন লাভ করেন নাই। বালি-সুগ্রীবের যুদ্ধও ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব হিসাবে নিন্দনীয় বলিয়াই পাঠক-সাধারণে মনে করেন।

আমাদের দেশে জনসাধারণের নিরক্ষরতা মানুষ হইবার পথে অন্তরায় হইলেও রামায়ণের মত একখানি মহাকাব্য সর্ব্বসাধারণকে মনুষ্যত্বলাভের পথে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। আমাদের দেশের যাত্রা কথকতা প্রভৃতি লোক-শিক্ষার দিক্ দিয়া যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে ইহা প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত। আধুনিক উপায়ে বিদ্যালয় প্রভৃতির সাহায্য না লইয়াও আমাদের দেশের

মনীষিগণ জনসাধারণকে মানুষের পিতৃভক্তি ও মাতৃভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ, কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদান করিতে পারিয়াছেন এবং তাহা অনেকটা রামায়ণ মহাভারত এবং ঐ-জাতীয় সাহিত্যের সাহায্যেই সম্ভবপর হইয়াছে।

যে সহে সে রহে

প্রতিকূল অবস্থার সহিত লড়াই না করিয়া কেবল অনুকূল অবস্থার ভিতর দিয়া বর্দ্ধিত হইলে ভবিষ্যতে অস্তিত্ব রক্ষা সম্ভব হয় না। ঝড়-ঝাপ্‌টা সহ্য করা চাই নতুবা টিকিয়া থাকা যায় না। সেই কথাটাই 'যে সহে সে রহে' এই প্রবাদের মধ্যে নিহিত আছে। সংক্ষেপে—সহিষ্ণুতা দীর্ঘজীবনের সহায়ক নীতি। বোধ হয় বৃক্ষ-জীবনকে এই প্রবাদের একটি বিশেষ দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। সকল বৃক্ষ-লতার জীবন-কাল সমান নয়; তবুও সহিষ্ণুতার জোরে ঐ সকল বৃক্ষ-লতা যত দীর্ঘকাল সম্ভব আপনাদিগের অস্তিত্ব রক্ষা করে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার শিষ্যগণকে বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু হইতে উপদেশ দিয়াছেন; নতুবা ধর্ম্মজীবনে সিদ্ধিলাভ সম্ভব নহে। অবশ্য সকল ধর্ম্মেরই উপদেষ্টা মহাপুরুষবর্গ তাঁহাদের ধর্ম্মাবলম্বিগণকে সহিষ্ণু হইবার উপদেশ দিয়াছেন।

আজীবন অনুকূল অবস্থার ভিতর দিয়াই জীবন কাটাইলেন এরূপ লোকের সংখ্যা সংসারে খুব বেশী নহে। অনেকেরই অল্লাধিক প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হয় এবং সেই সময় সহিবার শক্তিই মানুষকে বাঁচিবার ও দৃঢ় হইবার ক্ষমতা দান করে। ইহা একটি বিশেষ সত্য—তাহা প্রমাণ করিবার জন্য অধিক উদাহরণের আবশ্যক হয় না। মহাভারতের পঞ্চপাণ্ডবের জীবন ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁহারা প্রথম জীবনে যথেষ্ট কষ্ট সহ্য করিয়াছেন তাই পর জীবনে আপনাদের গৌরবময় অস্তিত্বকে ঘোষণা করিতে পারিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের জীবনও বহুপ্রকার কষ্টসহিষ্ণুতার মধ্য দিয়াই সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। পতিপ্রেমের মূর্ত্তি দেবী সীতা দুঃখ-কষ্টের আগুনে পুড়িয়া পুড়িয়া খাঁটি সোনা হইয়াছেন। পাণ্ডব-জননী কুন্তীও প্রায়

সমস্ত জীবন দুঃখের ভিতর দিয়া কাটাইয়াছেন। পরিশেষে মহাভারতের মহাবীর্য্যময় মহামানব কর্ণ আজীবন প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়াও অনন্তকালের জন্য সকল মানবের শ্রদ্ধা অর্জ্জনপূর্ব্বক তাঁহার অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছেন। মহাত্মা যীশুখৃষ্ট একদিন ক্রুশবিদ্ধ হইবার মত শারীরিক কষ্ট সহ্য করিয়াছেন বলিয়াই আজও পর্য্যন্ত বাঁচিয়া আছেন বিশ্বমানবের হৃদয়ে।

ইতিহাস হইতেও বহু দৃষ্টান্ত দিয়া দেখান যাইতে পারে, যিনি সহিতে পারেন তিনিই রহিতে পারেন। মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদকে তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের প্রথম জীবনে কম গ্লানি ও গঞ্জনা সহ্য করিতে হয় নাই। এমন কি তাঁহার জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন হইয়াছিল। এতটা বাধা তাঁহাকে অতিক্রম করিতে হইয়াছিল, এতটা সহ্য তাঁহাকে করিতে হইয়াছিল বলিয়াই তিনি সেদিন দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন, আজও তিনি সমগ্র জগতে আদর্শ মানব বলিয়া শ্রদ্ধা লাভ করিতেছেন। বৈজ্ঞানিক-প্রবর গ্যালিলিওকে একদিন যথেষ্ট গ্লানি সহ্য করিতে হইয়াছিল 'পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরে' এই বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করিবার জন্য। সে দিনের সহিবার ক্ষমতা দ্বারাই তিনি আজও বৈজ্ঞানিক-জগতে অমর হইয়া রহিয়াছেন।

জীবনের বড় উদ্দেশ্য বা আদর্শ বাদ দিলেও সাধারণ জীবনের দৈনন্দিন কার্য্যাবলীর মধ্যে সহিবার দ্বারা রহিবার সম্ভাবনা আমরা সর্ব্বত্র দেখিতে পাই। জীবনের খুঁটি-নাটি অনেক কাজকর্ম্মের মধ্যে অনেক প্রকার বাধা, নিন্দা, গ্লানি সহ্য করিতেই হয় এবং যিনি এগুলি সহিবার শক্তি দ্বারা অতিক্রম করিতে পারেন তিনিই শেষ পর্য্যন্ত টিকিয়া যান। আমাদের দেশের সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মহিলাবৃন্দ সংসারের নানাপ্রকার ঝঞ্ঝাট ও অভাব অভিযোগ নীরবে সহ্য করিয়া সাংসারিক কাজকর্ম্মগুলি করিয়া অগ্রসর হন বলিয়াই আমাদের সমাজ টিকিয়া আছে। বহু বৎসরের দারিদ্র্যকে শিরোভূষণ করিয়া আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই কি অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতার জোরে আমাদের এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংসারগুলি টিকিয়া আছে, আমাদের ঘরের মহিলাবৃন্দ কি অপূর্ব্ব সহিবার শক্তি দেখাইতেছেন। এইখানেই 'যে সহে সে রহে' এই প্রবাদের সার্থকতা।

অবশ্য এ কথা সত্য যে সহিবারও একটা সীমা আছে। সেই সীমা অতিক্রান্ত হইবার পরও সহিলে তাহা জীবনহীনতা বা জড়তারই পরিচয় দেয়। কিন্তু মোটামুটি ভাবে দুঃখ-কষ্ট-গ্লানি সহ্য করিতে না পারিলে মানুষের বাঁচিয়া থাকা সম্ভব হয় না ইহা খুব সত্য কথা।

বিদ্যালয়ে ভূগোল ও প্রাথমিক বিজ্ঞান শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা

বিদ্যালয়ে যে সকল ছাত্র অধ্যয়ন করিতে আসেন তাঁহাদের সকলের একই প্রকার কর্ম্মজীবনের জন্য প্রস্তুত হইবার সম্ভাবনা থাকে না এবং তাহা উচিতও নহে। কেহ হয়ত আইনজীবী হইবেন, কেহ হইবেন শিক্ষক, কেহ হইবেন ব্যবসাদার, কেহ কৃষিজীবী। আবার কেহ বা আজীবন অধ্যয়নে ও অধ্যাপনায় কাটাইয়া দিবেন। সকলেই পণ্ডিত হইবার বা সর্ব্ববিদ্যায় বিশারদ হইবার জন্য জন্মগ্রহণ করেন না। কিন্তু প্রাথমিক এবং সম্ভব হইলে মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করার প্রয়োজন ও অধিকার সকলেরই আছে এবং মানব-সভ্যতা সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা করিবার প্রয়োজন তাঁহাদের প্রত্যেকেরই আছে। তারপর সমাজ-দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সাহায্য করিবার জন্য যিনি যেরূপ প্রয়োজন কর্ম্মক্ষেত্রে সেইরূপ দাঁড়াইবেন। সেইজন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে ইতিহাস, ভূগোল, প্রাথমিক বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষাদান করিবার যথেষ্ট সার্থকতা আছে।

এক ভূগোল শিক্ষার দ্বারা জগতের বিভিন্ন দেশ সম্বন্ধে জ্ঞান, সৌরজগৎ, নক্ষত্রমণ্ডল, দিবারাত্রি কি ভাবে সংঘটিত হয়, ঋতু-পরিবর্ত্তন হয় কেন ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যায়। প্রাথমিক বিজ্ঞানের সাহায্যেও বিজ্ঞানের অতি সাধারণ সত্যগুলি সম্বন্ধে ধারণা হয়। মানব-সভ্যতার ক্রম-প্রগতির অবস্থায় এ সকল জ্ঞান যে মানুষমাত্রেরই প্রয়োজন একথা অস্বীকার করার উপায় নাই। বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করিবার প্রবৃত্তি মানুষের সহজাত। সেইজন্য প্রাচীন সাহিত্য হইতে যতটুকু আদিম সভ্যতার

আভাস পাওয়া যায় তাহা হইতে অনুমান করা যায় যে প্রাচীন মানব-কল্পনাও পৌরাণিক কাহিনী সৃষ্টি করিয়া বা তাহার সাহায্যে বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে একটি মোটামুটি ধারণা করিবার চেষ্টা করিত। ক্রমশঃ মানুষের চিন্তাধারা বিজ্ঞানাভিমুখী হইয়াছে এবং ইউরোপ মধ্যযুগীয় সভ্যতা হইতে মুক্ত হইয়া নূতনভাবে গড়িয়া উঠিবার পর বিজ্ঞানের প্রসার অত্যন্ত দ্রুতগতিতে হইয়াছে। বর্ত্তমান সভ্যতা সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞানের ভিত্তিতে দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। সমগ্র বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে ধারণা এখন বিজ্ঞানের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিতেছে এবং তাহাই বর্ত্তমান চিন্তাশীল মনীষিগণের মতে সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত এবং সত্যসম্মত। অতি সংক্ষিপ্তভাবে এবং মোটামুটিভাবে ভূগোলের সাহায্যে বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান এবং প্রাথমিক বিজ্ঞানের সাহায্যে সামান্য একটু পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন এবং উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান বর্ত্তমান যুগের মানুষমাত্রেরই প্রয়োজন হইয়াছে। সেইজন্য বিদ্যালয়সমূহে ভূগোল ও প্রাথমিক বিজ্ঞানের সামান্য মাত্রায় পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক এবং তাহা বাধ্যতামূলক করিলে অসঙ্গত হয় না।

ভৌগোলিক জ্ঞান ছাড়াও অন্য কারণে ভূগোল-শিক্ষার প্রয়োজন আছে। বিভিন্ন দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানলাভ ভূগোলের সাহায্য ব্যতীত সম্ভবপর নহে। যে সকল ছাত্র পরবর্ত্তী জীবনে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে বা বিভিন্ন প্রদেশের সহিত সংশ্লিষ্ট হইবেন তাঁহাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভকালে ভূগোল-শিক্ষার এবং ব্যবসা-সম্বন্ধীয় ভূগোল (Commercial Geography) শিক্ষার প্রয়োজন আছে। সকল ছাত্রেরই রাজনৈতিক দিক্ হইতে জগতের কোন্ দেশ কিরূপ অবস্থায় আছে তাহা জানিবার জন্য ভূগোল পাঠ করিবার আবশ্যক আছে। ইহা ছাড়া ভূগোল দ্বারা যে গ্রহ, নক্ষত্র ও সৌরজগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয় তাহাও বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য অত্যাবশ্যক।

যে সকল বৃক্ষ-লতা দিবা-রাত্রি আমাদের চক্ষুর সম্মুখে বীজাদি হইতে প্রথমে অঙ্কুরিত ও ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া বিভিন্ন আকার ধারণ করে তাহাদের

সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান আমাদের সকলেরই লাভ করা উচিত। সূর্য্য ও পৃথিবী পরস্পর আকর্ষণে আকৃষ্ট, শীতকালের সকালে যে শিশিরবিন্দু দেখা যায় তাহা কি ভাবে গঠিত হয়, বায়ুর চাপ সমুদ্রের উপর কি পরিমাণ এবং পৃথিবী হইতে ৫০০ মাইল উর্দ্ধেই বা কি পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য মানুষের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে। জলে হাইড্রোজেন্ ও অক্সিজেন এই দুইটি উপাদান (element) কি ভাবে সংযুক্ত হইয়া আছে, বাতাসে কি কি উপাদান আছে, সর্ব্বশুদ্ধ কয়টি মৌলিক উপাদান আছে, তাহাও জানিবার জন্য সকলেরই ঔৎসুক্য হয়। এই জাতীয় প্রাথমিক জ্ঞান সকল ছাত্রেরই লাভ করিতে হইবে। এই সকল কারণে বিজ্ঞানের আত প্রাথমিক জ্ঞান বিদ্যালয়সমূহে বিতরণের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। ক্রমশঃ তাহা প্রবর্ত্তিতও হইতেছে।

ভূগোল এবং প্রাথমিক বিজ্ঞানের সাহায্যে বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে একটি মোটা-মুটি ধারণা সমগ্রভাবে করা সম্ভব। তাহা হইলে মানুষের জগৎসম্বন্ধে জ্ঞান-লাভের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সার্থকতা লাভ করিবে এবং বালকবৃন্দের বাল্যাবধি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যুক্তিসম্মতভাবে বিচার করিবার ক্ষমতা বর্দ্ধিত হইবে। ভূগোল ও প্রাথমিক বিজ্ঞান শিক্ষাদ্বারা বাস্তব জীবনে যে ব্যাবহারিক উপকারিতা ছাত্রবৃন্দ পাইয়া থাকেন, তাহা ছাড়া চিন্তাজগতেও যথেষ্ট স্বাধীনভাবে অগ্রসর হইবার প্রেরণা তাঁহারা লাভ করেন। ইহাই এই সকল বিদ্যা-শিক্ষার উপকারিতা।

কামাল আতাতুর্ক

নব্য তুরস্কের স্রষ্টা মুস্তাফা কামাল স্যালোনিকার কোন এক দরিদ্র বংশে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ভূমিষ্ঠ হন। জীবনের প্রারম্ভে,—শৈশবেই কামাল পিতৃহীন হন। পিতামহী ও মাতার নিকট কামালের বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়। কামাল পিতৃহীন হইবার পর স্থানীয় উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থিরূপে প্রবিষ্ট হন্। একদা বিদ্যালয়ে তিনি একজন শিক্ষককর্ত্তৃক প্রহৃত হন এবং

তারপরই চিরদিনের মত স্কুল পরিত্যাগ করেন। কামাল রাজপথে খেলা করিয়া বেড়াইতেন। বাল্যকাল হইতেই বীর হইবার এবং যোদ্ধা হইবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয়। অবশেষে তিনি মাতা ও পিতামহীর মতের বিরুদ্ধে স্যালোনিকার উচ্চ সামরিক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন এবং সেইখান হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর কামাল জঙ্গী কলেজে ভর্ত্তি হন। এই সময় ইস্তাম্বুলের সামরিক বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ তুর্কী ছাত্রবৃন্দ কর্ত্তৃপক্ষ-কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ বিপ্লবী গ্রন্থসমূহ পাঠ করিতেন এবং ক্রমে তাঁহারা উপলব্ধি করিলেন যে দেশের শাসন-পদ্ধতি অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী। তুরস্কে তখন নানা স্থানে বিপ্লবীপন্থী গুপ্ত-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে এবং কামাল তাঁহার সহপাঠীদের লইয়া 'মুক্তি-সঙ্ঘ' নামে একটি গুপ্তদল গঠন করেন। সেই সময় ঐ দল হইতে কামাল একখানি গুপ্ত-পত্রিকা পরিচালনা করিতেন। তুর্কী সরকার কামাল ও তাঁহার দলের সভ্যগণকে ধরিয়া ফেলেন এবং তাঁহাদের জেলে পাঠান হয়। চার মাস পর কামাল মুক্তি পাইয়া সেনানায়করূপে সিরিয়াতে প্রেরিত হন। সিরিয়াতে তিনি ইস্তাম্বুলের মেডিকেল কলেজ হইতে নির্ব্বাসিত জনৈক বিপ্লবপন্থী ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের সহিত মিলিত হইয়া দেশময় গণশাসনের বাণী প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। অতঃপর সিরিয়া হইতে কামাল গোপনে মিশর ও গ্রীস্ ঘুরিয়া স্যালোনিকায় আসিয়া পুরাতন বন্ধুদের লইয়া বিপ্লবী-সমিতি পুনরায় স্থাপিত করেন। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার সন্ধান করায় তিনি সিরিয়াতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ত্রিপোলী ও বল্কানযুদ্ধে পরাজিত হইয়া তরুণ তুর্ক নানাদিক্ দিয়া স্বদেশের উন্নতিবিধানে সচেষ্ট হয়। আনোয়ার পাশাই তখন তুর্কের নব্য সংগঠনে শাসন-কার্য্য পরিচালন করেন। তখনও কামাল জনপ্রিয়তা ও খ্যাতিলাভ করেন নাই।

তারপর আসিল মহাযুদ্ধ। এই যুদ্ধে কামাল ব্যক্তিগতভাবে তুরস্কের জার্ম্মানীর পক্ষে যোগদানের পক্ষপাতী ছিলেন না। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে কামালকে সেনাদল লইয়া অগ্রসর হইতে হইল। তিনি যুদ্ধে জাতির মান রক্ষা করিলেন। আনোয়ার পাশা কিন্তু তাঁহার এই বীরত্বের কথা বাহিরে প্রচারিত হইতে দেন

নাই। যুদ্ধ অবসানের পর আনোয়ার প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ দেশত্যাগ করেন যুদ্ধবিরতির সর্ত্তানুসারে যুদ্ধের সরঞ্জামাদি মিত্রশক্তির হস্তে তুলিয়া দিবার কথা ছিল। কিন্তু কামাল যুদ্ধশেষে আনাতানিয়ার দিকে অগ্রসর হইয়া ফরাসী-দিগকে সে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিলেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে কামাল ডিক্টেটরের ক্ষমতা লাভ করিলেন এবং তারপর গ্রীক্‌দিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণ পরাজিত করিলেন।

এইবার তুর্ক জাতির পুরোভাগে দাঁড়াইয়া জাতিকে নূতন আদর্শে ও ভাবে উদ্বুদ্ধ করিবার বিরাট দায়িত্ব আসিল কামালের। তুরস্কের নামমাত্র অধিকার ইরাকে ও মিশরে প্রতিষ্ঠিত ছিল—ক্রমে ইরাক ও মিশর স্বতন্ত্র হইয়া গেল এবং তুর্কীর শক্তি তুরস্কে কেন্দ্রীভূত হইল। কামাল দেখিলেন, জাতির অগ্র-গতির পথে একটি অন্যতম বাধা তাহার প্রাচীন প্রথা। বৈপ্লবিক মনোবৃত্তি লইয়া তিনি দেশের ও সমাজের স্তরে স্তরে বিরাট পরিবর্ত্তন সাধন করিলেন—তিনি খিলাফতের উচ্ছেদ সাধন করিলেন—সুলতানকে বিতাড়িত করিলেন—গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিলেন। হারেম-বোরখা সব চলিয়া গেল, প্রাচীন পদ্ধতির যুদ্ধসজ্জাও পরিবর্ত্তিত হইল। গ্রীসের তুর্কীদিগকে তিনি স্বদেশে আনয়নের ব্যবস্থা করেন এবং তৎপরিবর্ত্তে তুরস্কের গ্রীক্‌দিগকে গ্রীসে প্রত্যাবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়া দেন।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে কামাল তুরস্ক হইতে বৈদেশিক সৈন্য অপসারণ করিয়া আঙ্গারাতে তুরস্কের নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ঐ বৎসরেই সাধারণতন্ত্রের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে খলিফা-পদের বিলোপ সাধন করিয়া তিনি দেশের ধর্ম্মান্ধতা বিদূরিত করেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য যাহারা ষড়যন্ত্র করিয়াছিল তাহাদিগকে তিনি বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। ঐ বৎসরেই তিনি 'ফেজে'র পরিবর্ত্তে 'হ্যাট্' পরিধান করিবার বিধি প্রবর্ত্তন করেন। ইহার পর কামাল তুরস্কে ল্যাটিন-বর্ণমালার প্রবর্ত্তন করেন। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই নভেম্বর ৭টা ৪ মিনিটের সময় তুরস্কের এই নবজীবনদাতার জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাপিত হয়।

কামাল আতাতুর্কের বিরাট কর্ম্মবহুল গৌরবোজ্জল জীবনের এই অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয়। তাঁহার জীবনের প্রথম উন্মেষ হইতে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যে অসাধারণ কর্ম্মধারা তাঁহাকে অতিমানব করিয়াছে তাহা প্রত্যেকটি ঘটনা জাতির অগ্রগতির সহিত গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট। একটা জীবন কিরূপে জাতীয় জীবনের সহিত মিশিয়া যাইতে পারে এবং উহার ফলে একটা সঙ্ঘবদ্ধ রাষ্ট্রে একতাবদ্ধ জাতীয় জীবন গড়িয়া উঠিতে পারে তাহার অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত এই কর্ম্মবীর। আফগানিস্থানের রাজা আমানুল্লাও দেশের সংস্কার সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সফলকাম হন নাই। কিন্তু কামাল আতাতুর্ক অতি বিচক্ষণতার সহিত পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যেরূপ ধীর অথচ দৃঢ় পদবিক্ষেপে একটি একটি করিয়া পুরাতন প্রথার পরিবর্ত্তন ও বিভিন্ন প্রকার সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয়। অবশ্য ইয়োরোপীয় সভ্যতার অতি নিকটবর্ত্তী দেশ তুরস্ক; এ কারণে ভৌগোলিক অবস্থান কামালের সংস্কার-সাধনের পক্ষে অনেকটা সহায়ক হইয়াছে। তাঁহাকে একসঙ্গে ধ্বংস ও সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। তাঁহার কর্ম্মমার্গ প্রাচীন রাজনীতির ব্যবহারে অভ্যস্ত জাতিকে নূতনের পথে উদ্দীপিত করিবার অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত। আজও যে সকল দেশ অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, আজও যেখানে ধর্ম্মান্ধতা জাতির শুভবুদ্ধিকে সমাচ্ছন্ন করিয়া সংস্কৃতির পথে অন্তরায় হইয়া আছে তিনি সে সকল দেশবাসীর নিকট আদর্শ পুরুষ এবং সমগ্র জগদ্বাসীর তিনি বরণীয়। তিনিই সকল দেশের সকল যুগের আদর্শ নেতা, জাতির সঙ্কটমুহূর্ত্তে আবির্ভূত হইয়া যিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করিতে পারেন,—

"আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগো রে সকল দেশ।"

একটি ফুটবল ম্যাচ

যশোহর জেলার সুদূর পল্লী অঞ্চল হইতে কোন অখ্যাত বিদ্যালয়ের অজ্ঞাত ছাত্রেরা যেদিন আমাদের বিখ্যাত Champion Club-কে challenge করিয়া বসিল,সেদিন অল্পশিক্ষিত গ্রাম্য বালকগণের দুর্দ্দান্ত দুঃসাহস্ স্মরণ করিয়া আমরা সত্যই স্তম্ভিত হইয়াছিলাম। ছুটির পর যখন আমাদের স্কুলের সুপ্রশস্ত Common Roomটি বিচিত্র সমালোচনায় মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে, ঠিক সেই সময় আমাদের মহামান্য কাপ্তেন সাহেব ধীরে ধীরে তথায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মুখ অসম্ভব রকম গম্ভীর। তিনি বয়সে বালক এবং বিদ্যায় বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে না পারিলেও স্কুলের প্রতিষ্ঠাতৃ-স্থানীয় জমিদারের একমাত্র পুত্ররূপে বিদ্যালয়ের একরূপ অভিভাবক ছিলেন। তিনি সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার বিজয় অভিযান গৌরবময় করিয়া তুলিতে চান। তাহাতে যত টাকা লাগে লাগুক।

আগামী রবিবার খেলা, মাত্র সাতদিন সময়। আমাদের দলের দুজন ওস্তাদ প্লেয়ার অসুস্থ; মেডালিষ্ট মাখনলাল মাতুলালয়ে, মহা মুস্কিল। স্থির হইল চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না। যে কোন উপায়ে কলিকাতা হইতে কয়েকজন নামজাদা অথচ অল্পবয়স্ক খেলোয়াড় ধরিয়া আনিতে হইবে। এখানকার অত্যাবশ্যক গুরুতর কর্ত্তব্যগুলি যত সত্বর সম্ভব সম্পাদন করিয়া কাপ্তেন সাহেব কলিকাতা রওনা হইলেন। আমরা যথাযোগ্য উদ্যোগ আয়োজনে রত হইলাম।

শুক্রবার বৈকালের গাড়ীতে বিশেষ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সহ কাপ্তেন সাহেব ফিরিয়া আসিয়া আনন্দ সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে সাত-জন পাকা খেলোয়াড় পাওয়া গিয়াছে। পরদিন যখন সেই তালপাতার সিপাহীদল আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন আর জয়সম্বন্ধে কোন সংশয় আমাদের রহিল না। তাঁহাদের মেদ-মজ্জা-মাংসশূন্য 'প্রবাসী'র ভারতীয় আর্টের চিত্রের মত সূক্ষ্ম শরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সকলেই একবাক্যে তাঁহাদিগকে আদর্শ ফুটবল-প্লেয়ার বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন।

শনিবার চার ঘটিকার সময় আমরা নিশান তুলিয়া নানাবিধ ধ্বনি করিতে করিতে করিতে মহাসমারোহে জয়যাত্রা করিলাম। গ্রামের এক ক্রোশ দূরে ইচ্ছামতী নদী। ঘাটে চারিখানি নৌকা পূর্ব্বাহ্লেই প্রস্তুত ছিল।

আমরা প্রায় চল্লিশজন তরুণ যুবক কয়েকখানি তরী অধিকার করিয়া বসিলাম। পরদিন সাড়ে বারটার সময় আমরা গন্তব্যস্থানে উপনীত হইলাম। প্রতিপক্ষেরা আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মধ্যরাত্রি হইতে মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ায় নৌকা যথাকালে পৌঁছিতে পারে নাই। সমস্ত রাত্রি বৃষ্টিতে ভিজিয়া আমরা অবসন্ন দেহে কাঁপিতে কাঁপিতে তীরে উঠিলাম। আমাদের বিরাট সাজসরঞ্জাম ও লোকজন দেখিয়া তাহারা স্তম্ভিত হইয়া গেল। শত্রুপক্ষকে বিধ্বস্ত করিতে হইলে এইরূপ অভিযানের সার্থকতা আছে। সমর-রীতিতে প্রোপাগ্যাণ্ডার মূল্য সর্ব্বজন-স্বীকৃত।

আহারাদি ও বিশ্রামের পর, আমাদের নির্ব্বাচিত একাদশ জন প্লেয়ার যথারীতি সুসজ্জিত হইল। বেলা পাঁচটার পূর্ব্বে আমরা ক্রীড়াক্ষেত্রে উপনীত হইলাম। চতুর্দ্দিক্ লোকে লোকারণ্য। এরূপ জনতা আমরা পল্লী-অঞ্চলে পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। শুনিলাম ১০।১২ ক্রোশ দূর হইতেও দলে দলে দর্শক আসিয়া সমবেত হইয়াছে। ক্রীড়াক্ষেত্রের অপর সীমায় একদল লোক দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু কাহারা আমাদের প্রতিপক্ষ তখনও বুঝিতে পারি নাই। স্থানীয় স্কুলের জনৈক শিক্ষক-মহাশয় রেফারিগিরি করিবেন। তিনি আসিয়া আমাদের সহিত যথারীতি কর-মর্দ্দন করিলেন। তিনি প্রথম সাঙ্কেতিক বংশীধ্বনি করিবামাত্র জনতার পশ্চাৎ হইতে যাঁহারা ক্রীড়াভূমিতে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন, তাঁহাদের বিপুল বিরাট মূর্ত্তি দেখিয়া আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। বিদ্যালয়ের ছাত্রের দলে ঐরূপ বিশ্বম্ভরমূর্ত্তির আবির্ভাব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলাম না। আমরাও অন্যত্র হইতে খেলোয়াড় আনিয়াছি, কিন্তু আমাদের মাত্রাজ্ঞান ছিল। আমাদের দলের একজনেরও একের কোঠা উত্তীর্ণ হয় নাই, অনেকেই উনষোড়শ-বর্ষীয়। আমাদের নাবালক কাপ্তেন কাঁপিতে কাঁপিতে প্রতি-

বাদ করিতে গেলেন; কিন্তু তাঁহার কাতর প্রার্থনায় কেহ কর্ণপাতও করিলেন না।

আমরা মরিয়া হইয়া খেলায় নামিলাম। কলিকাতার প্লেয়ার কয়টির শরীর শীর্ণ হইলেও মনের বল অসীম, ক্রীড়াকৌশলেও তাহারা যথেষ্ট সুদক্ষ ছিল। আমাদের ভিতরও অনেকেই বেশ ভালই খেলিত। কিন্তু এরূপ অসম্ভব অসম পক্ষের বিরুদ্ধে আমরা কখনও নামি নাই। খেলা আরম্ভ হইবার ৫।৭ মিনিটের মধ্যে আমরা পর পর দুইখানি গোল দিলাম। আমাদের যে কয়জন দর্শকগণের মধ্যে দণ্ডায়মান ছিল, তাহারা আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল; ইহাতে বিক্ষুব্ধ জনসমুদ্র যে ভাবে ও যে ভাষায় আমাদের প্রতিপক্ষকে উত্তেজিত করিতে লাগিল, উহা না লেখাই ভাল। ইহার পর হইতেই ভীষণ ব্যাপার আরম্ভ হইল। বিপক্ষদল ক্ষিপ্ত মহিষের ন্যায় আমাদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিল। তাহারা বল ছাড়িয়া খেলোয়াড়দিগকে এমন কিক্ করিতে লাগিল যে আমরা এক এক ধাক্কায় দশ বার হাত দূরে ছিট্‌কাইয়া পড়িতে লাগিলাম। সেই সুপ্রচণ্ড শক্তির সম্মুখে আমাদের সকল সুচিন্তিত কলাকৌশল চূর্ণ হইয়া গেল। আমাদের সুরক্ষিত বাহিনী যূথভ্রষ্ট ও পরিশেষে বিধ্বস্ত হইয়া গেল। হাফ্ টাইমের পূর্ব্বেই আমাদের কাহারও অঙ্গ আর অক্ষত রহিল না। গোলের সংখ্যাও অল্প সময়ের মধ্যে পাঁচটিতে দাঁড়াইল। দর্শকেরা 'আধ ডজন' 'আধ ডজন' বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল। বাম সীমান্ত দিয়া আক্রমণ করিবার ভার আমার উপর ছিল; কিন্তু আত্মরক্ষাই করিতে পারিতেছি না, আক্রমণ করিব কিরূপে? কাপ্তেন সাহেব নির্দ্দেশ দিলেন পিছাইয়া পড়—গোল যেন আর বেশী না হয়, গ্রামে ফিরিতে হইবে ত? কিন্তু আমাদের অবস্থা তখন বঙ্কিমচন্দ্রের হরবল্লভের মত—মরিয়া যখন হইয়াছি তখন দুর্গানাম করিয়া আর কি হইবে! প্রতিপক্ষের মনে অনুকম্পা জাগিলেই রক্ষা, নতুবা আমাদের কেরামতিতে বিশেষ কিছু হইবে বলিয়া আমাদের ভরসা ছিল না। আমরা শেষ পর্য্যন্ত প্রাণপণে আত্মরক্ষা করিয়া খেলার মাঠে দণ্ডায়মান থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। গুণিবার মত মনের

অবস্থা তখন আমাদের ছিল না। খেলা শেষ হইলে শুনিলাম, আমরা নয় গোলে হারিয়াছি। ক্ষুব্ধচিত্তে ভগ্নদেহে আমরা নৌকায় আসিয়া উঠিলাম। সুখের বিষয় তাঁহারা কেহ আর আপ্যায়িত করিতে আসেন নাই। গৌড়ের যশঃ অপহরণ করিয়া যশোহরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল কিনা জানি না, তবে আমাদের বহু কষ্টার্জ্জিত সুযশঃ সুখ্যাতি সেদিন আমরা ইচ্ছামতীর জলে বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছি।

যীশু খ্রীষ্ট

পৃথিবীর ইতিহাসে যাঁহারা ধর্ম্মবিপ্লব সৃষ্টি করিয়া সেই বিপ্লবাগ্নি পৃথিবীময় ছড়াইয়া দিয়াছেন যীশু খ্রীষ্ট তাঁহাদের অন্যতম। ইহুদীধর্ম্মের প্রাণশক্তি স্বাভাবিকভাবে যখন ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া আসিতেছিল সেই সময় তাঁহার আবির্ভাব। তাঁহার সংস্পর্শে, তাঁহারই তপস্যার ফলে প্রাচীন ইহুদীধর্ম্ম নবভাবে, নব উদ্দীপনায় বিশ্বমানবধর্ম্মে পরিণত হইয়াছিল। এশিয়া মাইনারে যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল যীশু-প্রচারিত ধর্ম্মের ভিতরে সূক্ষ্মভাবে তাহার প্রভাব বিদ্যমান ছিল। ইহুদীর ঈশ্বরতত্ত্বের সহিত বৌদ্ধ অহিংস ভাবের সমন্বয়ে এক অপূর্ব্ব প্রেমধর্ম্মের উৎপত্তি হয়, উহাই খ্রীষ্ট-প্রচারিত ধর্ম্ম।

পর্ব্বতের উপর ছোট ছোট তুষার-স্তূপ পড়িয়া থাকে। যে স্তূপটি অপেক্ষাকৃত বড় হয় সে আর আপন সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে থাকিতে পারে না; সে গড়াইয়া গড়াইয়া নামিয়া আসে লোকালয়ের মধ্যে, উত্তাপে গলিয়া পরিণত হয় নদীতে। তখন সে লক্ষ-কোটি মানবের কোলাহল-মুখর জনপদের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে। দুই তীরের সমগ্র ভূভাগকে শস্যশ্যামলা করিয়া সমস্ত আবর্জ্জনা বিধৌত করিয়া সে ছুটিয়া চলে সমুদ্রের দিকে। তেমনি আমাদের যে মানুষটির ভিতরে ঐশ্বরিক শক্তি অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে থাকে, তিনি স্বার্থের বন্ধন ছিন্ন করিয়া সাধারণের মধ্যে নামিয়া আসেন, দুই হস্তে মঙ্গল বিতরণ করেন এবং জগতের সমস্ত কলুষ ও যুগ-যুগ-সঞ্চিত

আবিলতা নিঃশেষে মুছিয়া লইতে যত্নবান্ হন। মর জগতের জীব হইয়াও তিনি অমর। যীশু খ্রীষ্ট এই জাতীয় মানব।

সকল ধর্ম্মপ্রচারকের জীবনেই কতকগুলি অতিমানবতার লক্ষণ ছিল বলিয়া কিংবদন্তী আছে। যীশু খ্রীষ্টের জীবনেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জুড়িয়ার অন্তর্গত বেথেলহেম নামক স্থানে কুমারী মেরীর গর্ভে যীশুর জন্ম হয়। দৈববাণী হইল সে মেরীর গর্ভে যাঁহার জন্ম হইবে, তাঁহার নাম রাখিতে হইবে খ্রীষ্ট—তিনি ঈশ্বরের পুত্র। শ্রীকৃষ্ণকে যেমন কংসের ভয়ে লুকাইয়া রাখিতে হইয়াছিল, যীশুকেও সেইরূপ শিশুহন্তা হেরডের ভয়ে লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল।

বাল্যকালেই যীশুর হৃদয়ে ধর্ম্মভাব পরিস্ফুট হইয়াছিল। কিশোর বয়সেই তিনি ইহুদীগণের ধর্ম্মশাস্ত্র গভীর মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেন ও বিজ্ঞ পণ্ডিতগণের সহিত ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। ইঁহার অলৌকিক প্রতিভা ও কার্য্যকলাপ সকলকেই চমৎকৃত করিত। এইরূপ ধর্ম্মানুকেন্দ্রিক জীবনের যাহা স্বাভাবিক পরিণতি যীশুরও তাহাই হইল। তিনি মহাত্মা জনের নিকট হইতে দীক্ষা লইয়া সত্যের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি উপবাসী থাকিয়া দীর্ঘদিন সাধনায় মগ্ন ছিলেন। একদিন প্রজ্ঞার জ্যোতিতে যীশুর আনন পরিপূর্ণ হইল। ইহার পর তিনি প্রচার করিতে লাগিলেন যে ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়, মানুষ মানুষের ভাই, মানুষকে ঘৃণা করার মত পাপ নাই, ক্ষমার তুল্য ধর্ম্ম নাই। ব্যথিত বঞ্চিত যাহারা, জীবনে যাহাদের কোনও মূল্য ছিল না, যীশুর এই প্রেমের ধর্ম্ম, তাহাদের নিকট এক নূতন আলোক বিকিরণ করিল। হীন-পতিত-সর্ব্বহারার দল যীশুর জীবনে দেবত্বের সন্ধান পাইয়া দলে দলে তাঁহার নিকট সমবেত হইল। যে দ্বাদশ জন শিষ্য তাঁহার নিকট অত্যধিক প্রিয় ছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই নিম্নশ্রেণীর লোক। যীশুর নাম যখন সকল লোকের মধ্যে প্রচারিত হইতে লাগিল, ইহুদীরা যীশুর উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল। যীশু অনেক অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিলেন, তথাপি তাহারা তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। মহাপুরুষকে বধ করিবার

জন্য তাহারা ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। যিনি ধর্ম্মের নূতন প্রাণ দান করিতে আসিয়াছিলেন, যিনি আসিয়াছিলেন মানুষের বুদ্ধিকে কল্যাণের পথে—সার্থকতার পথে পরিচালিত করিতে, তিনিই ধর্ম্মদ্রোহী বলিয়া রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইলেন। তাঁহার দ্বাদশ জন প্রিয় শিষ্যের মধ্যে জুডাস্ ইস্‌কারিয়ট্ নামে এক নরপশু উৎকোচে বশীভূত হইয়া তাঁহাকে ধরাইয়া দিল। পন্টিয়াস্ পাইলটের বিচারে যীশুর প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। যে বিরাট্ জীবন মানুষ ও ভগবানের প্রেমের সম্বন্ধ প্রচার করিতে আসিয়াছিল, মানুষই তাহাকে নিদারুণ মৃত্যু দিয়া শান্ত হইল। ইহুদীরা তাঁহাকে ক্রুশের উপর পেরেকে বিদ্ধ করিয়া অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিল। কিন্তু এই মহাপুরুষ মৃত্যুকালে এতটুকু ক্রুদ্ধ হন নাই, তাঁহার শত্রুগণের জন্য ঈশ্বরের নিকট তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রার্থনা করিয়াছিলেন যাহারা নির্ব্বোধ, যাহারা সত্যের সন্ধান লাভ করে নাই, ভগবান্ যেন তাহাদের আচরণে রুষ্ট না হন। হত্যাকারীদের হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া যীশু মানুষের ইতিহাসে এক অপূর্ব্ব অধ্যায়ের সূচনা করিলেন। মৃত্যুর তৃতীয় দিনে যীশু তাঁহার বিশিষ্ট ভক্তগণকে দর্শন দিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে ইহুদীধর্ম্ম শুধু এশিয়া মাইনরের কতকগুলি স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। যীশু তাঁহার অপূর্ব্ব অধ্যাত্ম-প্রতিভাবলে সেই ধর্ম্মের সার বস্তুকে তাঁহার প্রেমময় হৃদয়ের ভাবরসে সঞ্জীবিত করিয়া তাহাকে বিশ্বময় ছড়াইয়া দিলেন। মানুষ যাহাতে মানবত্ব অর্জ্জন করিয়াই ক্ষান্ত না হয়, দেবত্বের উর্দ্ধমুখী গতি যাহাতে মানবসমাজ লাভ করিতে পারে, যীশু তাহার পথ দেখাইয়া গেলেন।

সত্যের সুবিমল জ্যোতিতে যীশুর জীবনে অপূর্ব্ব শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছিল। প্রেমের সুরে তাঁহার হৃদয়বীণায় যে ঝঙ্কার উঠিয়াছিল তাহা অনন্তকাল ধরিয়া অমর হইয়া থাকিবে, উদ্ধত প্রাণে অন্ততঃ একটি মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার প্রতিধ্বনি বাজিয়া উঠিবে। যীশুর উপদেশের অবমাননা হইতেছে বলিয়াই পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে আজ অত্যাচারের ভীষণ মূর্ত্তি প্রকট হইয়া উঠিতেছে। যীশুর অমৃতময়ী বাণী যদি আমাদের অন্তরের মণিকোঠায় প্রতিধ্বনিত হয়

তাহা হইলে সত্যসত্যই পৃথিবী স্বর্গরাজ্য অপেক্ষাও সুখময় হইবে। সকল বিরোধিতার অবসান হইবে, জগতের একপ্রান্তের অধিবাসী স্বচ্ছন্দচিত্তে অপরপ্রান্তের সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষটিকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিতে পারিবে। যাশুর জীবন পবিত্র—তাঁহার নয়নে করুণার জ্যোতি। তাঁহার উপদেশে অমৃতের আস্বাদ। এইজন্যই সমগ্র জগৎ তাঁহার উদ্দেশ্যে আজও অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া ধন্য হইতে চাহে।

কারবালার যুদ্ধ

মানুষের ত্যাগ ও বীরত্বের কাহিনীতে ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলি সমুজ্জ্বল, আবার মানুষের নিষ্ঠুরতা ও স্বার্থপরতার কলঙ্কিত কাহিনীও ইতিহাস বুকে ধারণ করিয়া আছে। ত্যাগে, মহত্ত্বে, উদারতায় মানুষ দেবতাকেও হার মানাইয়াছে। আবার এই মানুষেরই হিংস্রতা ও নীচতা দেখিয়া বুঝি বনের পশুও লজ্জিত হয়। ঐই নিষ্ঠুরতার প্রকাশ দেখিয়াছি আমরা কারবালার যুদ্ধে। সে নিষ্ঠুরতার কথা স্মরণ করিলে শরীর কণ্টকিত হয়, সমস্ত হৃদয় মন গ্লানিতে ভরিয়া উঠে।

কারবালার মরুপ্রান্তরে যে অমানুষিক নিষ্ঠুরতা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার স্মৃতি মানুষের মন হইতে কোনও দিন মুছিয়া যাইতে পারে না। অদ্যাপি মুসলমানগণ সেই দুর্ঘটনার স্মৃতি জাতীয় জীবনে জাগরূক রাখিবার উদ্দেশ্যে বৎসর বৎসর মহরম মাসে শোকানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। শহীদের রক্তে অভিশপ্ত মরুপ্রান্তর যে দিন রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল, সে দিন বহুকাল গত হইয়াছে; কিন্তু বহুশতাব্দীর অন্তরাল হইতে সেই দুর্দিনের স্মৃতি আজও আমাদের চিত্তে অপরিসীম ব্যথার সঞ্চার করে।

যে ঘটনাস্রোতের মধ্য দিয়া এত বড় একটা শোচনীয় দুর্ঘটনার সৃষ্টি হইল, তাহার ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই—স্বার্থ মানুষকে কত নীচ করিয়া দিতে পারে! ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হজরত মোহম্মদের দেহত্যাগের পর তাঁহার একমাত্র কন্যা ফতেমার জ্যেষ্ঠপুত্র এমান হাসান খলিফা পদে

প্রতিষ্ঠিত হন। দামাস্কসের রাজা এজিদের লোভ ছিল সমগ্র ইস্‌লাম-জগতের উপর একাধিপত্য লাভ করা। হজরত মোহাম্মদের দৌহিত্রগণ বাঁচিয়া থাকিতে এজিদের অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে না। অল্পদিনের মধ্যেই এজিদ নানা কৌশলে বিষপ্রয়োগে এমাম হাসানের প্রাণ-সংহার করিল। এমাম হাসানের অকালমৃত্যুতে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা এমাম হোসেন খিলাফৎ লাভ করিলেন। পাপমতি এজিদ তাঁহাকে গোপনে নিহত করিবার জন্য নানারূপ চক্রান্ত করিতে লাগিল। বরাবর বিফল-মনোরথ হইয়া অবশেষে সে এক ভীষণ বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় লইল। এমাম হোসেনের বিশেষ বন্ধু কুফার শাসনকর্ত্তা আবদুল্লা জেয়াদকে সে অর্থের সাহায্যে বশীভূত করিয়া ফেলিল। এজিদের নির্দ্দেশমত জেয়াদ এমাম হোসেনকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইল, "হজরত, চারিদিকে আপনার শত্রু, মক্কায় বাস করা আপনার পক্ষে নিরাপদ্ নয়। কুফাবাসিগণ আপনাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল। আমরা সকলে প্রয়োজন হইলে আপনার জন্য প্রাণ দিব। আপনি সপরিবারে সত্বর কুফায় চলিয়া আসুন"।

সত্য-ধর্ম্মাশ্রয়িগণ আহ্বান করিতেছে, স্বয়ং বন্ধু আমন্ত্রণ পাঠাইয়াছেন। সরলপ্রাণ এমাম হোসেন বিশ্বাস করিয়া ফেলিলেন। মক্কার প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ বারবার নিষেধ করিলেন, কিন্তু তিনি শুনিলেন না। যুদ্ধের কোনো সম্ভাবনা নাই, তাহার আয়োজনও করা হইল না। সৈন্য নাই, সাজসরঞ্জাম নাই, অস্ত্রশস্ত্র নাই, খাদ্য ও পানীয়ের সুব্যবস্থা করা হয় নাই, শূন্যহস্তে সকলে চলিয়াছেন। আরব দেশের মরুভূমি পার হইয়া তিনি ইরাকের সীমানায় পৌঁছিলেন। পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া জনমানবশূন্য এক বিশাল প্রান্তরের মধ্যে উপনীত হইলেন। এইখানে তিনি জানিতে পারিলেন কুফাবাসীর চরম বিশ্বাসঘাতকতার কথা। কিন্তু আর ফিরিবার উপায় ছিল না—বাধ্য হইয়া তিনি কারবালা-প্রান্তরে শিবির সংস্থাপন করিলেন।

জলপিপাসায় হোসেনের অনুচরবৃন্দ অস্থির হইয়া উঠিল। জল আছে, নিকটেই ফোরাত নদী; কিন্তু এজিদের অসংখ্য সৈন্য ফোরাত নদীর তীর

অধিকার করিয়া আছে। কিন্তু জল না হইলে ত চলে না। দেহরক্ষী অনুচরগণ পিপাসায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, জলের অভাবে শিবিরে আর্ত্তনাদ উঠিল, হোসেনের শিশুপুত্র তৃষ্ণায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। এই মুমূর্ষু শিশুকে কোলে লইয়া হোসেন শত্রুসৈন্যের নিকট চলিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, অসহায় শিশুর মুখের দিকে চাহিয়া সৈন্যগণ জল দিবে। হউক শত্রু, মানুষ ত!

ফোরাতকূলে উপনীত হইয়া সৈন্যগণকে ডাকিয়া হোসেন বলিলেন—"তোমাদের মধ্যে যদি কেহ মুসলমান থাক, এই শিশুর মুখের দিকে চাহিয়া একটু জল দাও।" কেহ উত্তর দিল না—কিন্তু শত্রু-হস্ত-নিক্ষিপ্ত একটি তীর শিশুর বক্ষ ভেদ করিল। হোসেন শিশুকে কোলে করিয়া শিবিরে ফিরিলেন—স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন—"এই নাও তোমার পুত্র; স্বর্গের অমৃতধারা পান করাইয়া আনিয়াছি। এ আর কোনও দিন জল চাহিবে না।" সমস্ত শিবিরে আর্ত্তনাদ উঠিল। দেহরক্ষী অনুচরগণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। এখনও তাহারা বাঁচিয়া আছে। এই অত্যাচার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাদের রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। এই অমানুষের দলের যতগুলিকে পারা যায় মারিয়া মরিতে হইবে। হোসেন স্থির করিলেন—যুদ্ধ করিয়া নদীতীর অধিকার করিতে হইবে। তাঁহার অনুচরগণ অমিতবিক্রমে শত্রুধ্বংস করিয়া প্রাণত্যাগ করিল—কিন্তু নদীতীর অধিকার করিতে পারিল না। হাসান ও হোসেনের পুত্রগণ বীরদর্পে যুদ্ধ করিয়া সম্মুখসমরে প্রাণ দিলেন। এমাম হোসেন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তরবারি হস্তে তিনি শত্রুসৈন্যের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। অসংখ্য শত্রুসৈন্য ধ্বংস করিয়া তিনি নদীতীরে উপস্থিত হইলেন, রক্ষিসৈন্যগণ কেহ যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিল, কেহ প্রাণভয়ে পলায়ন করিল—নিকটে আর শত্রু রহিল না। হোসেন জলে নামিলেন। অঞ্জলি ভরিয়া জল তুলিয়া এতদিনের পিপাসা তিনি মিটাইবেন। জল মুখে তুলিতেছেন, এমন সময় তাঁহার মনে হইল তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচরগণ পিপাসা লইয়াই প্রাণ দিয়াছে। তাঁহার পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র

সকলে শুষ্ককণ্ঠে প্রাণত্যাগ করিয়াছে—মৃত্যুকালেও তাহাদের মুখে তিনি একবিন্দু জল দিতে পারেন নাই। শিবিরে ভূলুণ্ঠিত হইয়া মহিলাগণ এখন তৃষ্ণার জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে—কোন্‌ প্রাণে তিনি এই অভিশপ্ত বারি মুখে তুলিবেন। নদী হইতে উঠিয়া পুনরায় তিনি শত্রুসৈন্য আক্রমণ করিলেন। চতুর্দ্দিক্‌ হইতে ঘিরিয়া এবার শত্রুসৈন্য তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। অনাহারে, পিপাসায়, রক্তপাতে দুর্ব্বল হইয়া হোসেন ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। সীমার নামে একজন দুর্ব্বৃত্ত অস্ত্রাঘাতে তাঁহার মস্তক কাটিয়া লইল। 'হায় হোসেন! হায় হোসেন'! শব্দে কারবালার প্রান্তর পূর্ণ হইল। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার কারবালার প্রান্তর ঢাকিয়া ফেলিল। তখন আহত ও মুমূর্ষুর আর্ত্তনাদ থামিয়া গিয়াছে, চতুর্দ্দিক্‌ নিস্তব্ধ; কেবল মরুর বায়ু রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া নির্জ্জন প্রস্তরের উপর দিয়া শোঁ শোঁ করিয়া বহিয়া যাইতেছিল।

এমাম হোসেনের সামান্য একটি মুখের কথায় সহস্র সহস্র লোক হাসিমুখে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে কাতর হইত না। কারবালার যুদ্ধে তাঁহার এই শোচনীয় মৃত্যু মানুষের হৃদয় ব্যথিত না করিয়া পারে না। মক্কায় থাকিলে যাঁহার কেশাগ্র স্পর্শ করিবার সাধ্য কাহারও হইত না, তিনি সম্পূর্ণ অসহায়ভাবে বিশ্বাসঘাতকের চক্রান্তে পড়িয়া প্রাণ হারাইলেন। সম্মুখ-যুদ্ধে বীরত্ব দেখাইয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ বীরের অভাব নাই। কিন্তু ভয়াবহ বিশাল মরু-প্রান্তরে পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ ভয়ার্ত্ত স্বজন ও অনুচরবর্গের আর্ত্তনাদের মধ্যে যে অটল সহিষ্ণুতা এমাম হোসেন দেখাইয়াছেন, তাহার তুলনা পাওয়া কঠিন। চারিদিকে বালুকাময় প্রান্তর, শিশুগণ একে একে শুষ্ককণ্ঠে প্রাণত্যাগ করিতেছে, মরুভূমির উত্তাপ দেহের রস ও রক্ত যেন শুষিয়া লইতেছে। এই অবস্থায় মানুষ উন্মাদ হইয়া যায়। কিন্তু চারিদিকের মৃত্যুর এই বিভীষিকার মধ্যে এমাম হোসেন যে মানসিক বল দেখাইয়াছেন, তাহা অতুলনীয়।

স্ত্রীশিক্ষা

সভ্যতার উষাকাল হইতেই দেখা যায় বাল্যে ও কৈশোরে মানুষ শিক্ষালাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। ভবিষ্যতে যাহাতে বাঁচিয়া থাকিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়—এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই মানুষ শিক্ষালাভ করিয়াছে। সমাজে সাধারণতঃ পুরুষই নেতৃত্ব করিয়াছে আর নারী পুরুষের সাহায্যকারিণী সঙ্গিনীরূপে অগ্রসর হইয়াছে। অর্থনৈতিক দায়িত্ব, আত্মরক্ষায় দৃঢ়তা পুরুষকেই অধিকতর গ্রহণ করিতে হইয়াছে। নানারূপ ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইতে মানব-সমাজ আদিম যাযাবর অবস্থা হইতে ধীরে ধীরে যখন বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইল,তখন হইতেই দেখিতে পাওয়া যায়—যে শিক্ষায় অর্থাগম হয় সেইরূপ শিক্ষালাভে পুরুষের আগ্রহ অধিক, আর পুরুষকে সাহায্য করিতে যে শিক্ষা নারীর একান্ত প্রয়োজন তাহা সে পরিবারের মধ্য হইতেই অর্জ্জন করিতে লাগিল। সন্তানপালনে, রন্ধনে, সেবায়, শুশ্রূষায় নারীকে অধিক যত্নবতী হইতে হইয়াছে।

কর্ম্মক্ষেত্র যতই বিভিন্ন হউক, পুরুষও মানুষ আর নারীও মানুষ এবং মানুষ হিসাবে নারীরও একটা দাবী আছে। সেই কথা শিক্ষাক্ষেত্রেও। পুরাতন সমাজ ভাঙ্গিয়া পৃথিবীর সকল দেশেই নূতন সমাজ গড়িয়া উঠিতেছে। পুরুষ ও নারী কি ভাবে সমাজের কোন্ কোন্ দায়িত্ব গ্রহণ করিবে—ইহা বর্ত্তমান যুগের একটি সমস্যা। এই সমস্যার যুগোপযোগী মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত স্ত্রীশিক্ষার যথার্থ আকার কিরূপ হইবে, নারী ও পুরুষের সম্পূর্ণ একই প্রকার শিক্ষাব্যবস্থা হইবে কিনা—তাহা বলা যায় না। পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার, সমান দাবী, একই কার্য্যক্ষেত্র—এই কথাগুলি ইউরোপের প্রায় সর্ব্বত্রই স্বীকৃত হইয়াছিল ; কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে যে একটি প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে তাহা জার্ম্মানীতে নারীগণের প্রতি হিট্‌লারের 'রন্ধনশালায় ফিরিয়া যাও' এই উপদেশ হইতে বুঝিতে পারা যায়। ইটালীতে স্ত্রীলোকদিগের জন্য শুশ্রূষা-বিদ্যা, শিশুমনস্তত্ত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব প্রভৃতি শিক্ষণীয় বিষয় বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে।

বর্ত্তমান ইউরোপের নারীগণের শিক্ষাব্যবস্থায় এই সমস্ত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিবার বিষয়। পুরুষ ও নারীকে এই প্রকার শিক্ষা দিয়া সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করা সুকঠিন। স্বাভাবিকভাবেই নারী সন্তানপালন, শিশুশিক্ষা প্রভৃতি কার্য্যে অধিকতর উপযুক্ত ও গৃহস্থালীর দায়িত্বগ্রহণে অধিকতর সমর্থ। সাধারণ-শিক্ষা কিয়ৎপরিমাণে নারী-পুরুষ সকলকেই লাভ করিতে হইবে সত্য, কিন্তু তাহার পর পুরুষ অর্থকরী শিক্ষায় ও নারী গৃহস্থালী-পরিচালনা, সন্তান-পালন প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা লাভ করিবে—এই সিদ্ধান্তই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্য্যন্ত বালক-বালিকার শিক্ষাবিষয়ে অনেক সাদৃশ্য থাকিতে পারে, কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই যাহাতে বালিকাগণ তাহাদের ভবিষ্যৎ নারীজীবনের উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিতে পারে সেইদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যে সকল বালিকার কোন বিশেষ বিষয়ে আগ্রহ ও প্রবীণতা দেখা যাইবে তাহারা সেই বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য অগ্রসর হইবে—ইহাতে কোন আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না। স্ত্রীশিক্ষা যে আমাদের দেশে নূতন তাহা নহে। পূর্ব্বে আমাদের দেশে অনেক বিদুষী মহিলাও ছিলেন। শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক্ দিয়া তাঁহারা তাঁহাদের যুগের পুরুষগণের অপেক্ষা কোন অংশে কম ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। মুসলমানগণের রাজত্বের সময় হইতেই বোধ হয় এই অগ্রগতিতে বাধা পড়িতে থাকে। তখন হইতেই নারীগণ অন্তঃপুরচারিণী, অবগুণ্ঠনবতী ও অসূর্য্যম্পশ্যা হইতে থাকেন। যাহা হউক, তখনও স্ত্রীশিক্ষা ছিল, এখনও স্ত্রীশিক্ষা চলিতেছে, তবে পদ্ধতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আর এই পদ্ধতির পরিবর্ত্তনই যত গণ্ডগোল সৃষ্টি করিয়াছে।

যাহা হউক, নূতন পুরাতনের মীমাংসা করিয়া সাধারণ শিক্ষার সহিত গার্হস্থ্য স্বাস্থ্যনীতি, রোগি-চর্য্যা, সূচীশিল্প, সঙ্গীত, রন্ধন, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, গার্হস্থ্য অর্থনীতি প্রভৃতি বিশেষ শিক্ষা দ্বারা দেশকালোপযোগী একরূপ স্ত্রীশিক্ষার প্রচার ও প্রসার আমাদের দেশে অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এই সঙ্গে আমাদের দেশের প্রাচীন মহিলাবৃন্দের জীবনের আদর্শ ও বিভিন্ন যুগে ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ

সম্বন্ধে শিক্ষাদানও অত্যাবশ্যক। দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবৃন্দের এ বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

স্ত্রীশিক্ষাকে এখন পর্য্যন্ত আমরা জাতীয় জীবনের প্রয়োজনের দিক্ হইতে গ্রহণ করিতে পারি নাই—অনেকটা ফ্যাসান হিসাবে আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষা চলিতেছে। স্ত্রীশিক্ষা দূরের কথা, পুরুষদের শিক্ষারও একটা যুগোপযোগী পদ্ধতি আমাদের দেশে এ পর্য্যন্ত গড়িয়া উঠে নাই। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে সামাজিক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন দূরদর্শী নেতৃবৃন্দের সাহায্যে স্ত্রীশিক্ষার উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা আমাদের দেশে গড়িয়া উঠিবে। আমাদের গৃহের শান্তি ও কল্যাণ সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য তাহাতে বৃদ্ধি পাইবে এ আশা আমরা রাখি।

চরিত্র

চরিত্র মানুষের হৃদয়ের সম্পূর্ণ রূপ। বাহিরের দিক্ হইতে বিচার করিয়া চাল-চলন, কার্য্যকলাপ, বসন-ভূষণ ও আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়া মানুষটির যে পরিচয় পাওয়া যায় সেই পরিচয়টাকে আমরা তাহার চারিত্রিক রূপ বলিতে পারি। মানুষের চিন্তার, হৃদয়ের প্রসারের, ভাবের উচ্চতার একটা বিশিষ্ট রূপ আছে; যিনি এই দিক্ দিয়া সুন্দর ও প্রশান্ত তাঁহাকে আমরা সচ্চরিত্র ব্যক্তি বলিয়া থাকি। তাঁহার অন্য কোনও গুণ না থাকিলেও চারিত্রিক উৎকর্ষের জন্য তিনি সমাজে প্রভূত শ্রদ্ধা লাভ করিয়া থাকেন। মানুষ তাহার চরিত্রের উৎকর্ষের জন্য দেবত্ব, অথবা চরিত্র হারাইয়া পশুত্ব, এ উভয়ই লাভ করিতে পারে। পশু হইতে মানুষ যে বড় তাহা কেবল মানুষের একটা বিশেষ বুদ্ধি আছে বলিয়াই নয়, চরিত্রের দিক্ দিয়া সে বড় হইতে পারিয়াছে বলিয়াই মানুষ পশুত্বের উপরে উঠিতে পারিয়াছে। মানবসমাজ সভ্যতার দিক্ দিয়া যে এতখানি অগ্রসর হইতে পারিয়াছে তাহা কতকটা তাহার ব্যক্তিগত, কতকটা তাহার সমষ্টিগত জীবনের চারিত্রিক আদর্শের জন্য। শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া, নানা বিধি-নিষেধের গণ্ডীর মধ্য দিয়া সমাজ জীবনে সমষ্টিগত চরিত্রকে বড় করিবার জন্য মানুষ চেষ্টা করিয়াছে, আর সমাজের দুই চারিজন মহাপুরুষ আপনাদের

জীবনের উজ্জ্বল আদর্শ দ্বারা সমাজের সমস্ত লোককে চরিত্রগঠনে উৎসাহিত করিয়াছেন।

চরিত্র যে মানুষের একটা প্রধান শক্তি তাহা অনেক প্রতিভাবান্ ব্যক্তির জীবন আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়। বহু প্রতিভাবান্ ব্যক্তি তাঁহাদের অসাধারণ প্রতিভা সত্ত্বেও চরিত্রের দুর্ব্বলতার জন্য সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই। চরিত্রহীন প্রতিভাশালী বা ক্ষমতাবান্ ব্যক্তিকে লোকে ভয় করিলেও শ্রদ্ধা করিতে পারে না। চারিত্রিক বলে বলীয়ান্ না হইলে কেহ জগতের যথার্থ কল্যাণসাধন করিতে পারে না। চারিত্রিক আদর্শের বিভিন্নতা দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে হইতে পারে, কিন্তু সংযম, অটুট শৃঙ্খলা, একটা উচ্চ আদর্শকে সর্ব্বপ্রযত্নে অনুসরণ করিবার চেষ্টা—এইগুলি চারিত্রিক উৎকর্ষের সর্ব্ববাদিসম্মত লক্ষণ। একটা নির্দ্দিষ্ট প্রণালী বা ভাবকে অনুসরণ করিয়াই চরিত্র ধীরে ধীরে দৃঢ়ভিত্তি লাভ করে। চারিত্রিক শক্তিকে লোকে অস্বীকার করিতে পারে না, তাই চরিত্রহীন প্রতিভাকে গন্ধবর্জ্জিত পুষ্পের ন্যায় লোকে বর্জ্জন করিতে চাহে। জ্ঞান বা প্রতিভা মস্তিষ্কের, চরিত্র সম্পূর্ণ হৃদয়ের। জ্ঞান বা প্রতিভা সমাজ-দেহের মস্তিষ্ক হইতে পারে; কিন্তু চরিত্র তাহার বিবেক। বিবেকহীন জীব সমাজের অনিষ্টকারী।

চরিত্রকে সুগঠিত করিবার কোন সাধারণ সূত্র বা 'ফরমূলা' নাই। মানুষের জীবনে বৃহতের একটা প্রেরণা আসিলেই একটি নিয়মতান্ত্রিক সুন্দর জীবন আপনা হইতেই গড়িয়া উঠে। নিয়ম ততটা বাহিরের বস্তু নয়, যতটা ইহা অন্তরের শৃঙ্খলা-প্রীতির বস্তু। সেইজন্য এমন অনেক মহাপুরুষ দেখা যাইবে, যাঁহাদের জীবনে বাহিরের শৃঙ্খলার কঠোরতা ততটা নাই; কিন্তু অন্তরের মধ্যে তাঁহাদের আছে একটা সুন্দর ছন্দোময়ী শৃঙ্খলা। অবশ্য নৈতিক জীবনের দৃঢ়ভিত্তির কতকগুলি লক্ষণ বাহির হইতেও লক্ষ্য করা যায়। চরিত্রবান্ ব্যক্তি কখনও কাপুরুষ হইতে পারেন না। তিনি তাঁহার জীবনকে ধর্ম্মের জন্য, ন্যায়ের জন্য, সত্যের জন্য বলি দিতে পারেন। মৃত্যুকে তিনি ভয় করেন না, বিপদের সম্মুখে পড়িয়া তিনি বিচলিত হন না। তাঁহার হৃদয়

অপরাধীর প্রতি ক্ষমায়, ব্যথিতের প্রতি ভালবাসায় ও সর্ব্ববিষয়ে মহত্ত্বে পরিপূর্ণ।

আত্মসংযম, সাধুতা, ধৈর্য্য, কোমলতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, সত্যবাদিতা ইত্যাদি গুণ সাধু চরিত্রবান্ ব্যক্তির জীবনে আত্মপ্রকাশ করে। কাজেই এই সকল সদ্গুণের অধিকারী হওয়ার চেষ্টা করিলে চরিত্র সুগঠিত হয়। কিন্তু কাহার জীবন কোন্ প্রেরণায় একটা মহান্ আদর্শের দিকে ধাবিত হইবে, তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলিয়া দিবার কোন সহজ উপায় নাই। অন্তরের মধ্যে কোন মহৎ উদ্দেশ্যে যখন কঠোর প্রণালীবদ্ধ জীবনের অনুপ্রেরণা আসে, তখনই একটা নৈতিক দৃঢ়ভিত্তি স্থাপিত হইবার সম্ভাবনা।

চরিত্রগঠনের প্রথম স্থান গৃহ। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের স্তর অনুযায়ী শিশুর চরিত্র গঠিত হয়। মাতা পিতা আত্মীয় হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবের মধ্য দিয়া শিশু-চরিত্র গড়িয়া উঠে। বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাসকালীন বা সমবয়স্কগণের সহিত খেলাধূলায় সঙ্গপ্রভাবে চরিত্র রূপ পরিগ্রহ করে। সেইজন্য অভিভাবক বা শিক্ষকবৃন্দের লক্ষ্য করা উচিত—বালকগণের খেলাধূলা, চিন্তা ও পড়াশুনার মধ্য দিয়া কিরূপ চরিত্র গড়িয়া উঠিতেছে। যৌবনে মানুষের জীবনের কর্ম্মশক্তি সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পায়, সেইজন্য যৌবনেই মানুষের চরিত্র একটা সুস্পষ্ট আকার লইয়া প্রকাশিত হয়। যিনি কর্ম্মবীর, কর্ম্মের অবিরাম ধারার মধ্যে যাঁহার জীবন নিমজ্জিত, তিনি কখনও হীনচরিত্র হইতে পারেন না। একটা উগ্র কর্ম্মপ্রেরণা ও সেই সঙ্গে সচ্চিন্তা এবং সাধুসঙ্গ জীবনে দৃঢ় চরিত্র লাভে সহায়তা করে।

মনুষ্যসমাজে চরিত্রবলেই লোকে অমরতা লাভ করিয়া থাকে। প্রতিভাবান্ বা পরাক্রান্ত যোদ্ধা বা বীর যদি চরিত্রবান্ না হন তাহা হইলে ভবিষ্যৎকালে তাঁহারা মানুষ হিসাবে শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারেন না।

চরিত্রসম্বন্ধে কোন প্রবন্ধ বা উপদেশ বালক-বালিকাগণকে সহসা উন্নত-চরিত্রের করিয়া তুলে না ইহা নিশ্চিত, তথাপি এ জাতীয় উপদেশেরও একটা ব্যাবহারিক মূল্য আছে। তবে আসল কথা, আজকাল ছেলেরা বুদ্ধিমান্ হউক,

চালাক-চতুর হউক—অভিভাবকগণ প্রধানতঃ ইহাই চাহেন। তাহার ফলে বর্ত্তমানে চরিত্রগঠনের উপদেশ কি ছেলে কি বুড়ো—কাহারও নিকট আর ততটা প্রীতিকর হয় না।

স্বামী বিবেকানন্দ

কলিকাতার উত্তর উপকণ্ঠে দক্ষিণেশ্বর নামে একটি জায়গা আছে। এইখানে গঙ্গার ঠিক উপরে একটি বিখ্যাত কালীমন্দির আছে। এখানে নানাস্থান হইতে যাত্রী আসে। আশী বৎসরের কিছু বেশি হইল, একজন সাধক এই কালী-মন্দিরে নিত্য পূজা করিতেন। তাঁহার বেশভূষার কোন ঠিক ছিল না, চুল উস্কো-খুস্কো, সারাদিন খাওয়া-দাওয়া নাই, কালীমন্দিরেই পড়িয়া থাকেন আর তাঁহার অর্চ্চনা করেন। সকলে তাঁহাকে পাগল মনে করিত। ইনি বলিতেন ঈশ্বরের সঙ্গে ইনি কথা বলিতে পারেন। ইস্কুল-কলেজে-পড়া যুবকেরা ইঁহার সহিত ঠাট্টা করিত। এই সমস্ত যুবকের মধ্যে একজন প্রতিভাদীপ্ত, সুদর্শন যুবক—নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত—ক্রমে ক্রমে সাধকের গুণ বুঝিতে পারিলেন,—বুঝিলেন তিনি বুজরুকি করেন না। তাঁহার শক্তি অসীম। সত্যই তিনি তুচ্ছ নিন্দা-স্তুতির অনেক উপরে। ধীরে ধীরে নরেন্দ্রনাথ সাধকের নিকট নিজেকে সমর্পণ করিলেন, তাঁহার শিষ্য হইলেন। গুরুদেব তাঁহাকে জ্ঞান দান করিলেন। তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন—'নিজের মুক্তির জন্য সংসার ত্যাগ করিয়া বনে বনে ভগবান্‌কে খোঁজার নাম প্রকৃত ধর্ম্ম নয়। মানুষের অনেক দুঃখ-দুর্দ্দশা রহিয়াছে। সমাজ নানারকম গলদে বোঝাই। ভগবান্ সকলের পিতা—কাজেই মানুষ মানুষের ভাই। যদি একজন পাপ পথে যায়, আর একজনের কাজ তাহাকে সৎপথে ফিরাইয়া আনা। যদি একজন কষ্ট পায় আর একজনের কাজ তাহার কষ্ট ভাগ করিয়া লওয়া, তাহার কষ্ট দূর করিতে চেষ্টা করা। এমনি করিয়া যদি দেশের সকলের দুঃখ-কষ্ট দূর করা যায়, সকলেই পাপের পথ ত্যাগ করিতে শেখে, তাহা হইলেই দেশের উন্নতি—তাহা হইলেই শান্তি। ভগবান্ সকলের মধ্যেই আছেন। কাজেই সকলের সেবা করিলে ভগবান্ নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইবেন।'

নরেন্দ্রনাথ আশ্চর্য্য হইয়া গুরুদেবের এই সব কথা শুনিলেন। তাঁহার আদেশমত তিনি সেবাধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন। তাঁহার নাম হইল 'বিবেকানন্দ' —তাঁহার গুরুদেবের নাম শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। পরে এই বিবেকানন্দই হিন্দুধর্ম্মের জয়পতাকা দেশে বিদেশে উড়াইয়াছিলেন। চরিত্র-বলের জন্য সরল-চেতা বিশ্বাসী বিবেকানন্দ বাঙ্গালীর ও ভারতবাসীর আদর্শস্থল হইয়া রহিয়াছেন।

কলিকাতার 'মেট্রোপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউশান্' হইতে চৌদ্দ বৎসর বয়সে নরেন্দ্রনাথ প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন এবং পরে 'জেনারেল এসেম্ব্লিজ' কলেজে ভর্ত্তি হন। নরেন্দ্রনাথ বি. এ. পাশ করিয়াছিলেন। স্কুল ও কলেজে তাঁহার শিক্ষকগণ তাঁহার প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার শারীরিক শক্তি ছিল অসীম। তাঁহার ক্ষুরধার বুদ্ধি, মধুর কণ্ঠ এবং সকলের প্রতি মমতাপূর্ণ সরল ব্যবহার তাঁহাকে সকলের প্রিয়পাত্র করিয়াছিল।

কলেজে আসিয়া নরেন্দ্রনাথের জ্ঞানপিপাসা অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। বিশেষ করিয়া তাঁহার ঝোঁক পড়িল দর্শনের উপর। তিনি মনোযোগের সহিত অতিশয় যত্ন করিয়া দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার অন্তরে এক প্রকার অস্থিরতা আসিল, তিনি কি করিবেন কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিতে-ছিলেন না। ঠিক এমনই সময়ে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক একজন হিন্দু সাধুর ধর্ম্ম-সাধনাকে প্রথমে ভণ্ডামি ও পাগলামি মনে করিলেন। কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি নরেন্দ্র-নাথ শীঘ্রই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিলেন। তখন নরেন্দ্রনাথের মনে আনন্দ আর ধরে না।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর বিবেকানন্দ চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন,—তাঁহার দেশবাসী ভাইদের অশেষ দুঃখ-কষ্ট। তাহারা কোনও আদর্শই ধরিয়া থাকিতে পারিতেছে না। দেশব্যাপী কেবল হাহাকার। বিবেকানন্দের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল; তিনি দেশকে ঠিক করিয়া বুঝিবার জন্য ভারতভ্রমণে বাহির হইলেন। এই সৌম্য তেজস্বী পরিব্রাজক যেখানেই গিয়াছেন, সেখানেই সকলের শ্রদ্ধা

ও সম্মান পাইয়াছেন। হিন্দুধর্ম্মের মূল কথা যে মানুষের উন্নতিবিধান, সকল ধর্ম্মই যে মূলে এক—তাহা বিবেকানন্দ ভারতের ঘরে ঘরে বলিয়া বেড়াইয়াছেন। অদ্ভুত ছিল তাঁহার যুক্তিক্ষমতা। তাঁহার সরল জীবনের আদর্শের স্পর্শে যে আসিত সেই মুগ্ধ হইত। এইভাবে বিবেকানন্দ প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিলেন। দেশবাসীর দুঃখ-দুর্দ্দশায় তাঁহার মন ব্যথিত হইয়া পড়িল। হিন্দুধর্ম্ম যে ক্রমশঃই বিকৃত হইয়া যাইতেছে, তাহা তিনি লক্ষ্য করিলেন। পরোপকারের যে ব্রত হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে আছে, তাহা যদি সকলে গ্রহণ করে তাহা হইলে তো কোন কষ্টই থাকে না। ভারতবাসী ভারতবাসীর দুঃখ বুঝে না। তাই সে অপরের অবহেলার পাত্র। এইটি আরও বেশি করিয়া তিনি বুঝিলেন একটি ঘটনায়। এই সময় আমেরিকার শিকাগো শহরে পৃথিবীর সকল ধর্ম্মের একটি মহাসম্মেলন হওয়ার আয়োজন চলিতেছিল ; এই মহাসভায় জগতের সব ধর্ম্মই নিমন্ত্রণ পাইয়াছিল, কেবল পায় নাই হিন্দুধর্ম্ম। কে যেন বিবেকানন্দের কানে কানে বলিয়া দিল—'এ অনাদর সহ্য করা চলিবে না, হিন্দুত্বের পক্ষ লইয়া তোমাকে অনাহূত হইয়াই যাইতে হইবে। যে ধার্ম্মিক তাহার নিকট শত্রু-মিত্র-ভেদ নাই।' বিবেকানন্দ একমাত্র কর্ত্তব্যজ্ঞান ও চরিত্রবল সম্বল করিয়া আমেরিকা যাত্রা করিলেন। জাহাজে নানাপ্রকার ক্লেশ সহ্য করিয়া কোনমতে আমেরিকায় উপস্থিত হইলেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে শিকাগোয় বিশ্ব-ধর্ম্ম-মহা-সম্মেলন আরম্ভ হইল। সকলেই যে যাঁহার বক্তব্য বলিয়া চলিলেন, কিন্তু বিবেকানন্দ কিছুতেই আর তাঁহার বক্তব্য বলিবার অনুমতি পান না। শেষে বহু অনুনয়-বিনয়ের পর একজন মহিলা ও এক দয়ালু অধ্যাপকের চেষ্টায় তিন মিনিট সময় মিলিল। গৈরিক উত্তরীয় পরিয়া তরুণ বাঙ্গালী-সন্ন্যাসী বিশ্বের সেই মহাসভার বেদীতে দাঁড়াইয়া "আমেরিকার ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ" বলিয়া সম্বোধন করিয়া প্রথমে হিন্দুধর্ম্মের—ভারতের কোটি কোটি মানুষের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিলেন। ভোজবাজীর মত একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। সৌম্যদর্শন সন্ন্যাসীর কণ্ঠে যেন ঈশ্বরের বাণী সকলে শুনিতে পাইলেন। করতালিতে সভা ভরিয়া গেল। সময়ের কথা সকলেই ভুলিয়া গেল। তিন মিনিটের স্থলে

দেড়ঘণ্টা কাল বিবেকানন্দ ওজস্বিনী ভাষায় হিন্দুধর্ম্মের মূলতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলেন।

আমেরিকা হইতে তাঁহার নাম ইউরোপে ছড়াইয়া পড়িল, তিনি ইউরোপে ধর্ম্মপ্রচার করিতে গেলেন। এইরূপে ইউরোপ ও আমেরিকায় ধর্ম্মের বিজয়নিশান উড়াইয়া বিবেকানন্দ স্বদেশে ফিরিলেন।

দেশে আসিয়া তিনি জনসেবায় আত্মনিয়োগ করিবেন স্থির করিলেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ১লা মে এই আদর্শে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশন' প্রতিষ্ঠিত হইল। বর্ত্তমানে এই আশ্রমের শাখা সমস্ত পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

অক্লান্ত পরিশ্রমে স্বামীজির শরীর ক্রমে অসুস্থ হইয়া পড়িল; কিন্তু তবুও বিশ্রাম নাই। অবশেষে তিনি একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। তারপর বেলুড়ে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই আজন্ম ব্রহ্মচারী মহাপুরুষ দেহরক্ষা করিলেন।

বিবেকানন্দের মত মহাপুরুষ কখনও মরেন না। কারণ জাতির আদর্শ ইঁহারাই গঠন করেন। ইঁহাদের স্মৃতি জাতির জীবনে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া থাকে। তাই যে ভারতবাসীকে তিনি ভাই মনে করিতেন, যে ভারতের মৃত্তিকা তাঁহার নিকট স্বর্গ ছিল, যে ভারতের কল্যাণ তাঁহার কল্যাণ ছিল, সেই ভারত তাঁহাকে ভুলিতে পারে না। বিবেকানন্দ ও ভারতবর্ষ এক হইয়া রহিয়াছে—যতদিন ভারত থাকিবে, ততদিন বিবেকানন্দ থাকিবেন।

ভ্রমণ-কাহিনী—সুন্দরবনে দুই দিন

সেবারের বন্যায় আমাদের গ্রামখানি ভাসিয়া গেল। একপক্ষ কাল চারিদিকে জল থৈ থৈ করিতে লাগিল। না থামে বৃষ্টি, না কমে জল। আমাদের গ্রামের কাছে কোন নদী নাই। আমরা কয় বন্ধু কলাগাছের ভেলায় উঠিয়া নৌকা চড়ার সখ মিটাইতে লাগিলাম। গ্রামের চারিদিকে মাঠ। মাঠের উপর চার পাঁচ হাত জল—যেন সমুদ্রের মত তরঙ্গ খেলিতেছে।

লগি ঠেলিয়া ভেলা চালাইতে চালাইতে ক্রমে আমাদের সাহস বাড়িয়া গেল। মাঠের দক্ষিণে প্রায় আধ মাইল দূরে কালিন্দীর খাল। সেদিন

আমাদের খাল দেখিয়া আসিবার দুর্ব্বুদ্ধি চাপিল। ঐ খালটি সোজা সুন্দরবনের ভিতর দিয়া ঢুকিয়াছে।

আমরা পাঁচজন ছাত্র পরম উৎসাহে ভেলা ভাসাইয়া দিলাম। তখন বেলা "বারটা"কি একটা। জলের টান ও লগির ঠেলায় ভেলাখানি দক্ষিণমুখে ভাসিয়া চলিল। আমাদের আনন্দের সীমা নাই। কেহ ধরিয়াছে লগি, কেহ ধরিয়াছে গান। মাঝে মাঝে কলম্বসের কথা মনে পড়িতে লাগিল। ক্রমে ভেলাখানি খালের মুখে অগ্রসর হইতেছে। ক্রমেই জলের বেগও যে বাড়িতেছে সে হুঁস আমাদের ছিল না।

হঠাৎ ভেলাখানি বোঁ করিয়া ঘুরিয়া গেল। আর যায় কোথা? খালের মাঝখানে পড়িয়া একেবারে পাখীর মত উড়িয়া চলিল। খালে তখন অথৈ জল, লগি মারে কার সাধ্য? এত দুঃখও যে অদৃষ্টে ছিল, তাহা স্বপ্নেও জানিতাম না। চতুর্দ্দিক জলময়, লোকজনের চিহ্নও নাই। আমরা পাঁচটি অসহায় জীব, প্রবল স্রোতে ভাসিয়া চলিলাম। কলার ভেলাটি মজবুত করিয়া বাঁধা ছিল। কিন্তু ভয় হইতে লাগিল, এই প্রবল স্রোতে দড়ির বাঁধন কতক্ষণ টিকিবে। হঠাৎ যদি ভেলাখানি ধাক্কা খায়, তবে তো আমরা সঙ্গে সঙ্গেই ছিটকাইয়া পড়িব। সুন্দরবনে কুমীরের গল্প শুনিয়াছিলাম, বড় একটা কুমীরই যদি লেজের এক বাড়ি দেয়, তবে আমাদের পাঁচজনকেই একসঙ্গে গাঁথিয়া লইয়া যাইতে পারে।

নিশ্চয় মৃত্যু স্থির করিয়া আমরা ক'জনে নীরবে বসিয়া রহিলাম। স্রোতের বেগ ক্রমেই বাড়িতেছে। ভয়ে মুখ শুকাইয়া গেল। চীৎকার করিয়া কাঁদিতে পারিতেছি না। কোথায় ভাসিয়া চলিয়াছি, কতদূরে আসিয়া পড়িলাম, কিছুই জানি না। খালের ধারে দূরে দূরে দুই একখানি গ্রাম দেখা যায়। কিন্তু উপায় কি! জনমানবের সাড়া সন্ধান নাই।

কিছুক্ষণ পরে বিপদের প্রথম ধাক্কাটা একটু কাটিয়া গেল—আমরা সাহসে বুক বাঁধিলাম। এতক্ষণও যখন মরি নাই, তখন হয়ত এ যাত্রা বাঁচিয়াই যাইব।

ক্রমে সেই খাল একটি বনের ভিতর প্রবেশ করিল। প্রবেশপথে কি ভীষণ জলের তোড়—বোধ হয় কুটা পড়িলে ছিড়িয়া যায়! আমাদের ভেলাখানা ওলটপালট খাইতে খাইতে ছুটিতে লাগিল। কিন্তু তখন আমাদের কিছুমাত্র ভয় ছিল না। সেখানে খালটি যথেষ্ট সরু। মাঝে মাঝে ভেলাখানা পাড়ে যাইয়া লাগিতে লাগিল। এখন চেষ্টা করিলে পাড়ের গাছ ধরিয়া তীরে উঠা যায়। খালের উভয় তীরে সারি সারি কেওড়া গাছ, আরও কত কি বন্য বৃক্ষ।

ক্রমে আমরা গভীর বনের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলাম। কিছু দূর গিয়া দেখিলাম, দুইজন রাখাল কয়েকটি গাভী তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছে। নিকটে কোন গ্রাম আছে কিনা, আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম। উত্তরে তাহারা কহিল, "হ্যাদে মোদের গাঁ। কিন্তু জল ভাঙে সেখানে আপনারা যাতি পার্‌বা না। এর দু'বাঁক পরে বনকর আফিস আছে; সেখেনে যাও।"

একটা আশ্রয় মিলিবে শুনিয়া আমরা মনে মনে খুব খুসী হইলাম। তখন প্রাণের আনন্দে বনভূমির শান্তিময় সৌন্দর্য্য নয়ন ভরিয়া দেখিতে লাগিলাম। কোথাও খালের দুই তীর হইতে দুইটি প্রকাণ্ড শালবৃক্ষ যেন হস্ত প্রসারিত করিয়া পরস্পর করমর্দ্দন করিতেছে। কোথাও অগণিত বন্যলতা নতমস্তকে স্রোতের জলে সন্ধ্যাস্নান করিতেছে। নানাজাতীয় বনফুল খালের দু'কূল আলো করিয়া ফুটিয়া আছে। বিজন বনভূমির এমন মনোহর শোভা আমরা জীবনে কখনও দেখি নাই। দূর হইতে দুইটি শৃগাল বোধ হয় বেহুলার কলার ভেলা মনে করিয়া আমাদের দিকে লুব্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

অবশেষে আমাদের ভেলাখানি বনকর আপিসের গেটে আসিয়া আটক খাইল। সেখানে সারি সারি জেলে ডিঙি বাঁধা ছিল। আমরা সেই নৌকাগুলির উপর দিয়া গিয়া তীরে উঠিলাম। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। গেটের মুখে পাকা গাঁথ্‌নির উপর বসিয়া দুইজন হিন্দুস্থানী দরোয়ান মনের আনন্দে 'রামাহো' সঙ্গীতে বিভোর ছিলেন। আমরা বার বার 'জমাদার সাহেব'

বলিয়া আপ্যায়িত করা সত্ত্বেও তাঁহারা আমাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। অগত্যা আমরা নিজেরাই আফিসের দিকে অগ্রসর হইলাম।

সন্ধ্যা হইলেও তখনও অন্ধকার হয় নাই। দূর হইতে দেখিলাম একটি বাবু আফিস-ঘরের বারান্দায় বসিয়া আপন মনে গড়গড়া টানিতেছেন। আমাদের জহর হঠাৎ 'দাদাবাবু' বলিয়া ডাকিয়া উঠিল। তিনি সেই ডাক শুনিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন। তাড়াতাড়ি আমাদের নিকটে আসিয়া বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে, এখানে কোত্থেকে এলি? কার সঙ্গে এসেছিস্ তোরা? তোদের নৌকায় আর কে কে আছেন?" জহব হাসিতে হাসিতে কহিল, "সে সব কথা পরে হবে দাদাবাবু, এখন আমাদের ভারি ক্ষিদে পেয়েছে। সঙ্গে আর কেউ নেই কেবল আমরাই।" জহরের দিদিও বাড়ীর ভিতর ছিলেন। আমাদের গলার আওয়াজ পাইয়া তিনি তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে রাজু, সতু, মিনু, সীতা হৈ হৈ বেগে ছুটিয়া আসিল; দেখিতে দেখিতে নীরব বনকর আফিস আনন্দ-কোলাহলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

বিজন বনের মধ্যে সে কি ভূরি-ভোজনের ধূম। ফরেষ্টার রসিক বাবুই সে রাজ্যের নবাব-বাদ্শা। তাঁহার হুকুমে চারিদিকে লোক ছুটিল। ঘরে কোন জিনিষেরই অভাব ছিল না। পাঁচ জন কেন পঞ্চাশ জন আসিলেও অভাব হইত না। কিন্তু তাহাতে জাঁক হয় না, মনের তুষ্টি হয় না। এক ঘণ্টার মধ্যে এক ঘড়া দুধ আসিয়া পড়িল। পরাণ জেলে একটি বৃহদাকার মাছ আনিয়া ধড়াস্ করিয়া উঠানে ফেলিল। ছিদাম বুনো এক ঝুড়ি মৃগ-মাংস লইয়া হাজির। কেহ কাঁকড়া, কেহ হাঁসের ডিম, কেহ বা এক কেঁড়ে গব্য ঘৃত উপহার আনিল। দুঃখের পর সুখ যে কত মধুর, সেই দিন আমরা প্রথম বুঝিতে পারিলাম।

রসিকবাবু তাহার পরদিনও আমাদের ছাড়িয়া দিলেন না। সেদিন বৈকালে আমরা নৌকা করিয়া সুন্দরবনের নিবিড় অরণ্যমধ্যে বেড়াইতে গেলাম। প্রকৃতি দেবী সেখানে যেন অনন্ত সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার খুলিয়া বসিয়া

আছেন। সে শোভা যথার্থই অনির্ব্বচনীয়। সেদিন পূর্ণিমা তিথি। বনের ভিতর চাঁদ উঠিয়া যেন মুহূর্ত্তমধ্যে স্বপ্নরাজ্য সৃষ্টি করিল। সে শোভা আমরা জীবনে কখনও ভুলিব না। পরদিন আটটার মধ্যে গুরু ভোজন করিয়া আমরা সরকারী পান্‌সীতে গিয়া উঠিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ঝুড়ি পাঁচেক বাছাই-বাছাই ভেটকি মাছ আরও কত কি নৌকায় আসিয়া উঠিল। দক্ষিণ-বাতাসে পাল তুলিয়া দিয়া আমাদের নৌকাখানি পক্ষিণীর মত উড়িয়া চলিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমরা যেখান হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম সেখানে উপনীত হইলাম। আমাদের অকস্মাৎ অদর্শনে বাড়ীতে কান্নাকাটি পড়িয়া গিয়াছিল। বকুনির ভয়ে আমাদের বুক দুরু দুরু করিতেছিল। কিন্তু সুখের বিষয় বিরাটকায় মীনের মূর্ত্তি দেখিয়া সকলের মাথা ঘুরিয়া গেল। ঘৃত-মৎস্যের কল্যাণে আমরা সে যাত্রা বকুনির হাত হইতে রক্ষা পাইলাম।

২

নাট্যাকারে লিখিত একটি গল্প

অতিথি-সেবা

[স্থান—দরিদ্র ব্রাহ্মণের কুটীর—ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ-পত্নী, পুত্র ও পুত্রবধূ বিষণ্ণবদনে বসিয়া আছেন]

ব্রাহ্মণ-পত্নী—যাও বাবা, আর একবার দেখে এসো। বেলা যে শেষ হ'য়ে এলো। নারায়ণ কি করলে ?

পুত্র—আর কোথায় যাব মা! যাঁকে জিজ্ঞাসা করি, তিনিই ক্রুদ্ধ হন। রাগ হওয়ারই ত কথা। তাঁরা কতদূর থেকে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে নিমন্ত্রণ খেতে যাচ্ছেন। সেখানে কত উত্তম উত্তম খাদ্য তাঁরা ভোজন করবেন। মনে মনে কত আশা ক'রে যাচ্ছেন। আমাদের বাড়ী কদন্ন ভোজন করতে কে আস্‌বেন মা?

ব্রাহ্মণ—তাই ত, আমরা সপরিবারে আজ বাইশ দিন উপবাসী। আজ সূর্য্যাস্তের মধ্যে অন্ন-গ্রহণ না করলে সকলেরই নিশ্চিত মৃত্যু। অতিথি

সেবা না ক'রে কোন্ প্রাণেই বা অন্ন-গ্রহণ করবো! শেষে কি ব্রতভঙ্গ হবে! অগ্র-পশ্চাৎ চিন্তা না ক'রে, কি কঠিন ব্রতই আমরা গ্রহণ করেছিলাম।

পুত্রবধূ—বাবা, কেন আপনি চিন্তিত হচ্ছেন? তুচ্ছ জীবনের ভয়ে আমরা কেহই ব্রতভঙ্গ করবো না। কিসের দুঃখ! ধর্ম্মের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দেওয়া, সে ত সৌভাগ্যের কথা! আমরা সকলে কঠিন কৌলিক ব্রত উদ্‌যাপন ক'রে এক সঙ্গে হাসিমুখে অনন্তধামে চ'লে যাব।

ব্রাহ্মণ—অপত্য-স্নেহ যে কি কঠিন আগে বুঝ্‌তে পারি নি। আমরা বৃদ্ধ হয়েছি। মৃত্যুই এখন আমাদের পরম আশ্রয়। কিন্তু কোন্ প্রাণে আমরা তোমাদের কচি মুখে মৃত্যুর ছায়া স্বচক্ষে দেখ্‌বো? না না, তা কখনই হবে না। বৎস, আমরা অনুমতি দিচ্ছি, তোমরা অন্নগ্রহণ কর। আমরা জন্ম-জন্মান্তরে এই ব্রতভঙ্গ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো।

ব্রাহ্মণী—দেখুন, দেখুন! কে যেন একজন ব্রাহ্মণ এই বনপথ দিয়ে এই দিকেই আস্‌ছেন!

ব্রাহ্মণ—আজ অনেকেই ত ও পথ দিয়ে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে নিমন্ত্রণ খেতে যাচ্ছেন। কত লোককেই ত অনুনয় বিনয় করলাম। কৈ, কারও ত দয়া হ'ল না! এইবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখি।

(ব্যস্তভাবে একজন পথচারী ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

পথচারী ব্রাহ্মণ—ওহে, ওহে, ও ভিখারী ঠাকুর! বলি লোকটা কালা নাকি! একবার কথাটাই শোন না—মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে যাব কোন্ পথে বল্‌তে পার?

ব্রাহ্মণ—(স্বগতঃ) ইনি নিমন্ত্রণ খাবার জন্য যেরূপ উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠেছেন, এঁর কাছে প্রস্তাব ক'রে কোন ফল হবে ব'লে ত মনে হচ্ছে না।

পথচারী ব্রাহ্মণ—তুমি আচ্ছা লোক ত! আপন মনে বিড় বিড় কচ্ছ। দেখ্‌ছো না বেলা বেশী নাই। সন্ধ্যে হ'য়ে গেলে কি আর ব্রাহ্মণভোজন হয়? যদিও বা দয়া ক'রে খেতে দেয় ভোজন-দক্ষিণাটা মাঠে মারা যাবে

ব্রাহ্মণ—ঠাকুর, আজ দয়া ক'রে যদি এই গরীবের একটা অনুরোধ রক্ষা করেন, তা হ'লে আমরা সপরিবার আপনার কেনা হ'য়ে থাক্‌বো।

পথচারী ব্রাহ্মণ—পথের মাঝখানে উত্তম প্রস্তাব! ক্ষিদেয় আমার নাড়ী জ্ব'লে যাচ্ছে। ওদিকে সূর্য্যি ঠাকুর পাটে বস্‌ছেন। তোমার অনুরোধ রক্ষে করতে গিয়ে আমি উপবাস ক'রে মরি আর কি! কেনা থাক্‌বেন, তবেই আর কি! কুকুর, বিড়াল, কাঠবেড়ালীর পর্য্যন্ত দাম আছে। লোকে পোষ্‌বার জন্য তাদের কেনে। গরীব লোকের কাণা-কড়িও মূল্য নেই। লোকে বরং তাদের গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে বিদেয় ক'রে দেয়। বলি, তোমার প্রস্তাবটা কি শুনি।

ব্রাহ্মণ—আজ দয়া ক'রে যদি এ দীন দরিদ্রের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন, তবে—

পথচারী ব্রাহ্মণ—থাম, থাম, তোমার সাহস ত কম নয়। কি আয়োজন করেছ শুনি।

ব্রাহ্মণ—আমরা উঞ্ছবৃত্তি-পরায়ণ ব্রতচারী ব্রাহ্মণ-পরিবার।

পথচারী ব্রাহ্মণ—তা তোমার চেহারাতেই মালুম হয়েছে। ভিক্ষে ক'রে বেড়াও ত।

ব্রাহ্মণ—আজ্ঞে না, কৃষিক্ষেত্রে যে শস্য মাটিতে প'ড়ে নষ্ট হয়, আমরা তাই সংগ্রহ ক'রে প্রতি বাইশ দিনের দিন অতিথিসেবার পর সকলে আহার করি।

পথচারী ব্রাহ্মণ—সর্ব্বনাশ! একুশ দিন উপোস ক'রে থাক! তোমরা ত দেখ্‌ছি সাক্ষাৎ বাল্মীকি মুনির বংশধর। বলিহারি ব্রত বাবা! দুর্ভিক্ষের বাজারে খুব খরচ বাঁচাচ্ছ ত!

ব্রাহ্মণ—তা হ'লে—

পথচারী ব্রাহ্মণ—সিধে পথ দেখ। কোথায় রাজসূয়-যজ্ঞের ভূরিভোজন—মোণ্ডা, মেঠাই, রাব্‌ড়ি, রসোমালাই—আর কোথায় ক্ষুদ-কুঁড়োর জাউ, আর তেঁতুলপাতার অম্বল! রাম রাম! (প্রস্থান করিলেন)

[ব্রাহ্মণ বিষণ্ণ-বদনে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন]

ব্রাহ্মণী—কিছু হ'ল ?

ব্রাহ্মণ—না ব্রাহ্মণী, এসো আমরা সকলে একত্র হ'য়ে প্রায়োপবেশন করি। আর বেলা নাই।

[এমন সময়ে একজন অতি বৃদ্ধ শীর্ণকায় ব্রাহ্মণ ধীরে ধীরে প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলেন]

ব্রাহ্মণ—(সসম্ভ্রমে উঠিয়া) আসুন, আসুন। আপনি কি সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব! ব্রাহ্মণ-পরিবারের জীবন রক্ষা করতে বৈকুণ্ঠ থেকে মর্ত্ত্যে এসেছেন!

অতিথি—কে বাবা, বড় ক্ষুধা, কিছু ভোজন করাতে পার? রাজসূয়-যজ্ঞে যেতে যেতে ত সন্ধ্যে হ'য়ে যাবে। কাল বরং সকাল-সকাল সেখানে যাবো।

[ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ অতিথিকে পাদ্য-অর্ঘ্য দিলেন। তাঁর পা ধোয়াইয়া দিয়া ভোজনের আসন দিলেন। অতিথি আহার করিতে বসিলেন। খাদ্যগুলি পাঁচটি অংশে ভাগ করা হইল। উহার একটি ভাগ ব্রাহ্মণ অতিথিকে আনিয়া দিলেন]

অতিথি—(পরিতৃপ্তির সহিত উহা আহার করিলেন) উত্তম, উত্তম, অতি উৎকৃষ্ট রন্ধন হয়েছে! বড় সুস্বাদু! কিন্তু পেট ত ভরল না। আর আছে কি ?

ব্রাহ্মণ—(স্বগতঃ) সর্ব্বনাশ! কার অংশ এনে দেব! সে ত অন্নাভাবে নিশ্চয় প্রাণত্যাগ করবে।

[তিনি চিন্তিত মনে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঘরের ভিতর হইতে সকলেই অতিথির কথা শুনিয়াছিলেন]

ব্রাহ্মণী—সেজন্য চিন্তা কি? আপনি স্বচ্ছন্দে আমার অংশটি অতিথিকে দিন। আমার জীবনের কর্ত্তব্য শেষ হ'য়েছে।

পুত্রবধূ—না, বাবা, আপনি আমার ভাগটি দিন। আমি সামান্যা নারী। আমার মৃত্যুতে সংসারের কোন ক্ষতি হবে না। আপনি পুনরায় পুত্রবধূ পাবেন। অতিথি-সেবায় জীবন উৎসর্গ ক'রে আমি স্বর্গলাভ করব।

পুত্র—পিতা, আমি জীবিত থাকতে আমি কিছুতেই আপনার ভাগ অতিথিকে দিতে দিব না। আপনি নিশ্চিন্তমনে আমার ভাগটি অতিথিকে দিন।

পুত্রবধূ—বাবা, আপনার পায়ে ধরি, স্বহস্তে আপনি পুত্রবধূর বৈধব্য ঘটাবেন না! আমার অংশ অতিথিকে দিন।

[ব্রাহ্মণ কম্পিতহস্তে পুত্রবধূর ভাগটি অতিথিকে আনিয়া দিলেন]

অতিথি—(উহা পরিতোষ-পূর্ব্বক ভোজন করিয়া) চমৎকার, চমৎকার! কিন্তু পেট ত ভরল না। বড় ক্ষুধা, আর কিছু আছে ?

[এবার ব্রাহ্মণ পত্নীর ভাগটি আনিয়া দিলেন]

অতিথি—(উহাও শেষ করিলেন) বেশ! বেশ! উত্তম রান্না হয়েছে। কিন্তু এখনও ত পেট ভরল না। আর কিছু আছে কি ?

[ব্রাহ্মণ গৃহে প্রবেশ করিয়া নিজের ভাগটি আনিতে উদ্যত হইলেন ; ব্রাহ্মণের পুত্র তাঁহার চরণে ধরিয়া কহিলেন]

পুত্র—পিতা, আপনার অংশটি দিলে, এই অতিথি-সেবা পণ্ড হবে। ঐ দেখুন, আমার স্নেহময়ী জননী, পতিপ্রাণা পত্নী প্রাণত্যাগ করছেন। আপনার ভাগটি দিলে আপনাকেও দেহত্যাগ করতে হবে। অতিথি পুনরায় চাইলে কে তাকে পরিবেশন করবে পিতা? আপনি প্রাণত্যাগ করেছেন শুনে তিনি যদি আহারত্যাগ করেন। আমাদের সকল সাধনা ব্যর্থ হবে। আপনি প্রসন্নমনে আমার অংশটি দিয়ে অতিথি-সেবা করুন।

[ব্রাহ্মণ পুত্রের ভাগটি গ্রহণ করিয়া এবার সতৃষ্ণনয়নে পুত্রের দিকে চাহিলেন]

ব্রাহ্মণ—বাবা, এ ত অন্ন নয়, এ যে আমার একমাত্র প্রাণপুত্রের জীবন-সুধা। আমি কোন্ প্রাণে অতিথির পাতে স্বহস্তে এ অন্ন পরিবেশন করব ?

পুত্র—পিতা ধর্ম্মই একমাত্র আশ্রয়। আপনি শীঘ্র যান, বিলম্বে অতিথি ক্ষুণ্ণ হ'তে পারেন।

[ব্রাহ্মণ মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় অতিথির পাতে পুত্রের ভাগটি ধরিয়া দিয়া অনিমেষনয়নে অতিথির মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন]

অতিথি—আহা হা! বড় সুমিষ্ট, বড় সুস্বাদু! ব্রাহ্মণ, আর কিছু আছে? এখনও আমার উদর পূর্ণ হয় নি।

ব্রাহ্মণ—আছে, আছে। (তাড়াতাড়ি নিজের ভাগটি অতিথিকে ধরিয়া দিয়া) ঠাকুর, ঠাকুর! এই আমার গৃহের শেষ অন্ন-কণা। কৃপা ক'রে গ্রহণ করুন। পরিতৃপ্ত হোন।

অতিথি—কি সুন্দর! কি সুন্দর! ব্রাহ্মণ, আজ তুমি রাজসূয়-যজ্ঞ করলে! আমি পরম পরিতৃপ্ত।

[অতিথি আচমন করিতে বসিলেন। ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণ গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া পুত্র, পত্নী ও পুত্রবধূর পার্শ্বে শয়ন করিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন]

দেখিতে দেখিতে স্বর্গ হইতে পুষ্পরথ নামিয়া আসিল। স্বয়ং নারায়ণ অতিথি—তাঁহার স্বরূপ ধারণ করিলেন। তাঁহার শ্রীচরণস্পর্শে ব্রাহ্মণ-পরিবার জীবিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা প্রভুর সহিত দিব্য-রথে আরোহণ করিয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন।

সমাপ্ত